নির্বাচিত প্রবন্ধ

১

নির্বাচিত প্রবন্ধ - ১

মাসিক আলকাউসার-এ প্রকাশিত গবেষণামূলক
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-সংকলন

[মহররম '২৬হি.-মহররম '৩২হি. = ফেব্রু.'০৫ঈ.-ডিসে.'১০ঈ. পর্যন্ত]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

প্রকাশনা বিভাগ
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

নির্বাচিত প্রবন্ধ - ১

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক

প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
প্রধান দপ্তর : ৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১৩
ফোন : ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫
E-mail : publisher.markaz@yahoo.com

প্রকাশকাল

জুমাদাল আখেরা ১৪৩৭ হি.
এপ্রিল ২০১৬ ঈ.

মূল্য

৪৪০ (চারশ চল্লিশ) টাকা মাত্র

Nirbachito Probondho -1 By : Mawlana Muhammad Abdul Malek, Published by Department of Publication Markazud Dawah Alislamia Dhaka.
Price : Tk. 440.00 Us$ 12.00.
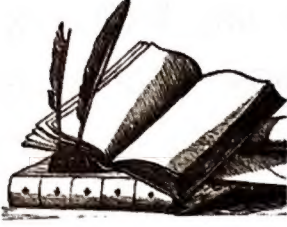
আমাদের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

আলহাম্‌দু লিল্লাহ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর প্রকাশনা বিভাগের নতুন বই 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'এর দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হল। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব কর্তৃক মাসিক আলকাউসার-এ লিখিত প্রবন্ধগুলোর সংকলিত রূপ হচ্ছে 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব ইলমী ও তাহকীকী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। আল্লাহ তাআলার রহমতে তাঁর হাতে বাংলাদেশে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক গবেষণার ময়দানে অনেক বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম পেয়েছে। তাঁর দেশী-বিদেশী জগদ্বিখ্যাত আসাতেযায়ে কেরাম যেমনিভাবে তাঁর ইলম ও তাহকীকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর উপর আস্থা রেখেছেন, তেমনি এদেশের উলামা-তালাবা ও দ্বীনদার সমাজ তাঁকে ইলম ও তাহকীকের ময়দানে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন।

মহররম ১৪২৬ হি. মোতাবেক ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে মারকাযের পক্ষ থেকে বের হওয়া শুরু হয় মাসিক আলকাউসার। মাসিক আলকাউসারের লেখাগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও তাহকীকী মানে উত্তীর্ণ হয় মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেবের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে। অন্যান্য লেখার ইলমী সম্পাদনার পাশাপাশি প্রথম সংখ্যা থেকেই তিনি আলকাউসারের বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত লিখে আসছেন। শিক্ষার্থীদের পাতা ও প্রচলিত ভুল বিভাগ দু'টি তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হয়। এ ছাড়া প্রায় প্রতি মাসেই সাধারণ পাঠক মহলের উদ্দেশ্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নিবন্ধ আলকাউসারে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বক্ষ্যমাণ 'নির্বাচিত প্রবন্ধ ১ ও ২' সে নিবন্ধগুলোরই সংকলিত রূপ। আলকাউসারের প্রথম সংখ্যা থেকে ২০১০ ঈ. সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত নিবন্ধগুলো এই দু'টি মলাটে স্থান পেয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব তাঁর লেখায় যেসব বিষয় খেয়াল রেখে থাকেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সময়ের প্রয়োজনীয়তা, অহেতুক বিতর্ক এড়িয়ে চলা, ইলমী ভ্রান্তি-নিরসন ও তাহকীকের যথাযথ মান নিশ্চিত করা। এ মলাট দু'টোতেই তাঁর এমন কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে যেগুলো লেখার জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করেছেন, দেশের লাইব্রেরিগুলো ছাড়াও বিভিন্ন দেশের বহু নামী-দামী গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এরপর তা আলকাউসারের পাঠকদের জন্য পেশ করেছেন।

আলকাউসারে প্রকাশিত এ নিবন্ধগুলো বই আকারে প্রকাশের জোর দাবী চলছে বিগত কয়েক বছর থেকেই। দেরীতে হলেও এখন তা আপনাদের সামনে রয়েছে। বই দু'টি পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার বিভিন্ন স্তরে যারা বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়েছেন আমি তাদের সকলের এবং বিশেষত মাওলানা মুতীউর রহমানের শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। পাঠক মহলের কাছে কোন ভুল বা অসংগতি প্রকাশ পেলে তা আমাদেরকে অবগত করার জন্য বিনীত অনুরোধ থাকল, যেন তা পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দেওয়া যায়।

আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া-তাআলা তাঁর অনুগ্রহে বই দু'টি, এগুলোর লেখক, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা, মাসিক আলকাউসার এবং দু'টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেকোনভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
রঈস, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
২৪-০৬-১৪৩৭ হি.
০৩-০৪-২০১৬ ঈ

পেশ লফজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

কখনো বড়দের নির্দেশে, কখনো দোস্ত-আহবাবের কথায়, আবার কখনো দিলের তাকাযা থেকেই মাসিক আলকাউসারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখার সুযোগ হচ্ছে। পাঁচ-ছয় বছর আগে মারকাযুদ দাওয়াহর দারুত তাসনীফের দায়িত্বশীলগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, আলকাউসারে প্রকাশিত এসব প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হবে। অনেক পাঠকের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ের তাগাদা অব্যাহত ছিল।

আমি বেরাদারে আযীয মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন এই প্রবন্ধগুলো নযরে সানী করেন। কারণ, এই প্রবন্ধগুলো তিনিই উর্দূ থেকে বাংলায় তরজমা করেছেন। তিনি সাধ্যমত সুন্দর ও সুচারুরূপেই নযরে সানীর কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এতে মাশাআল্লাহ অনেক প্রবন্ধের বিষয় ও ভাষা আগের চেয়ে বেশি গতিশীল ও সাবলীল হয়েছে। কিছু কিছু প্রবন্ধ আমিও নযরে সানী করেছি।

এই সংকলন প্রায় চার বছর আগেই ছাপার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বিভিন্ন ওযর ও সীমাবদ্ধতার কারণে ছাপার কাজ বিলম্ব হতেই থেকেছে। আল্লাহ তাআলার শোকর যে, এখন ছাপার সুযোগ হচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

ধারাবাহিকতার দাবী তো এটাই ছিল যে, প্রথমে আলকাউসারের সম্পাদক, মারকাযুদ দাওয়াহ্‌র মুদীর ও ইফতা বিভাগের প্রধান হযরত মাওলানা মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুমের প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করা হবে। আসলে ওগুলোও ছাপার জন্য প্রায় প্রস্তুত। আমরা আশা করি, কিছু দিনের মধ্যেই সেগুলো পাঠকের সামনে পেশ করতে পারব।

সম্মানিত পাঠকের কাছে অনুরোধ, এই কিতাবে কোন স্থানে ভুল নযরে এলে মেহেরবানী করে মাসিক আলকাউসারের ঠিকানায় চিঠি লিখে বান্দাকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা আপনার তাসহীহ ও সংশোধন থেকে উপকৃত হব।

এই সংকলনটি প্রস্তুত করার পেছনে বেরাদারে মুহতারাম মাওলানা মুতীউর রহমানের অনেক শ্রম ও মেহনত শামিল আছে। আল্লাহ তাআলা তাকে আপন শান মোতাবেক সওয়াব ও প্রতিদান দান করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সবরকমের কল্যাণ ও তারাক্কী নসীব করুন। আমীন।

هٰذَا وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
২৪-০৬-১৪৩৭ হি.
রবিবার, বাদ আসর

কেন্দ্রীয় কুতুবখানা
প্রধান প্রাঙ্গণ
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

(৩) হাদীস ও ফিক্হ

আকীদা বিশুদ্ধ করা সর্বপ্রথম ফরয

বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম, সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয হল আকীদা-বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করা। ইসলামী আকীদাসমূহ –যা কুরআন-সুন্নাহ্য় স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে এবং যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনা মোতাবেক ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে তা– সংশয়হীনচিত্তে নিশ্চিত সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং সবধরনের কুফরী, শিরকী ও বিদআতী আকীদা থেকে মুক্ত হয়ে সহীহ আকীদার উপর অটল ও অবিচল থাকাই হল আকীদা-বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি। বিষয়টির গুরুত্ব এ থেকে অনুমান করা যায় যে–

১. বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় হক এবং সবচেয়ে বড় ফরয হল ঈমান। ঈমানই বান্দার প্রকৃত সম্পদ এবং এটিই তার জীবন ও প্রাণ। সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভুর মহব্বত লাভ এবং তাঁর কাছে সম্মানিত হওয়ার এ-ই প্রধানতম পথ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের এ-ই প্রধানতম পন্থা।

আর এ কথাতো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ঈমানের সর্বপ্রথম সম্পর্ক হল আকীদার সাথে। আকীদার বিশুদ্ধতা ছাড়া ঈমানের কোন ধারণা ইসলামে নেই এবং ঈমান ছাড়া বান্দা যে আল্লাহর কাছে শুধু মূল্যহীন তাই নয়, বরং সে বিদ্রোহের অপরাধে আল্লাহ তাআলার কাছে চরম ঘৃণিত ও বিতাড়িত; এর চেয়ে বড় বঞ্চনা আর কিছুই হতে পারে না।

২. দ্বীন ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক স্পষ্ট নিদর্শন হল এই আকীদার বিষয়টি। হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী একটি নির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাসের দাওয়াত দিতেন, যা তাঁরা ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের উম্মতদের প্রতি এই আকীদার দাবিই তাঁরা জানাতেন। সকল নবী-রাসূলের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক তাগিদ ছিল আকীদা বিশুদ্ধ করার ব্যাপারেই। কুরআন কারীম আম্বিয়ায়ে কেরামের

দাওয়াতের যে চিত্র তুলে ধরেছে তা থেকে এ বিষয়টি একদম স্পষ্ট যে, তাঁদের দাওয়াতের সূচনাই হয়েছিল আকায়েদের মাধ্যমে। তাঁদের নিকট উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর এবং মহৎ থেকে মহত্তর কীর্তির অধিকারী ব্যক্তি, তার মাধ্যমে যত উন্নত সমাজই অস্তিত্ব লাভ করুক বা যত উপকারী বিপ্লবই সাধিত হোক সবই মূল্যহীন ছিল, যতক্ষণ না তারা সেই আকীদাকে বরণ করবে এবং তাদের সকল কর্ম ও সাধনা সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে হবে, যা নবীগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে লাভ করেছেন। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে–

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থাৎ যার ঈমান শুদ্ধ নয় তার সকল কর্ম অর্থহীন এবং সে আখেরাতে ব্যর্থ মনোরথ হবে। –সূরা মায়িদা ৫

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا، اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا، اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

“বল, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব কাদের কৃতকর্ম বেশি নিষ্ফল? যাদের চেষ্টা পার্থিব জীবনে হয় বিভ্রান্ত অথচ তারা মনে করে যে, তারা খুব ভাল কাজ করছে। তারাই সেই লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলি ও তাঁর সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করে। সুতরাং তাদের কৃতকর্ম পণ্ড হয়ে গেছে। কাজেই কেয়ামতের দিন তাদের জন্য তুলাদণ্ড খাড়া করব না।” –সূরা কাহফ ১০৩-১০৫

৩. সঠিক আকীদাসমূহ যা ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে তাই সত্য, তাই সঠিক এবং একমাত্র তাই জ্ঞান ও হেদায়াতের আলো। অপরদিকে এর বিপরীত ধারণাসমূহ নিঃসন্দেহে মিথ্যা, বাতিল এবং নিঃসন্দেহে অজ্ঞানতা ও গোমরাহি। এজন্য সঠিক বিচার-বুদ্ধি এবং সুস্থরুচি ও বিবেকের দাবি হল, এসব আকীদাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা এবং তা থেকে এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত না হওয়া। কেননা সত্যের সাক্ষ্য দান করা একজন সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাবজাত হয়ে থাকে।

৪. একজন বান্দার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত এবং আল্লাহ তাআলাও এই চান যে, স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক উন্নততর এবং দৃঢ়তর হবে। তার অন্তঃকরণ আল্লাহর মহব্বতে টইটুম্বুর হবে; তাকওয়া ও খোদাভীতিতে তার হৃদয় হবে আবাদ,

অন্তরে বিনয়-নম্রতা ও আল্লাহ-মুখিতা থাকবে, অল্পেতুষ্টি ও অমুখাপেক্ষিতা থাকবে, আশা ও স্থিরতা থাকবে, সবর ও তাওয়াক্কুল থাকবে, সাহায্য ও বীরত্ব থাকবে এবং সবধরনের দোষ ও ত্রুটি যথা অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, নাশুকরি ও অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি থেকে তার অন্তর থাকবে মুক্ত ও পবিত্র।

কিন্তু এই অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য –কলবের পরিচ্ছন্নতা ও আল্লাহর মুহাব্বত– এবং অন্যান্য উত্তম গুণাবলি অর্জনের সর্বপ্রথম সোপান হল আকীদা বিশুদ্ধ করা। ঈমান ও আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া ছাড়া এই সমুন্নত মাকসাদ অর্জনে সফল হওয়ার অন্য কোন পথ নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আকীদা-বিশ্বাসের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে যত্নবান হওয়া অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয।

৫. সঠিক আকীদার এমনই প্রভাব রয়েছে যে, যদি তা মানুষের অন্তরে ভালভাবে বসে যায় এবং তার রক্ত-মাংসের সাথে মিশে যায়, তবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে, অন্তরে পবিত্রতা এবং কাজকর্মে পরহেযগারি আসে, জন্ম নেয় আইন-কানুন ও নীতিনৈতিকতা মেনে চলার অনুভূতি এবং আমীরের আনুগত্য ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন-যাপনের যোগ্যতা। তাই একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আকীদার দৃঢ়তা ইসলামের সকল আইন-কানুন ও নীতিমালা বাস্তবায়িত হওয়ার এক মৌলিক শক্তি। ইসলাম হালাল ও হারামের যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছে, তা বাস্তবায়নের মূল নির্ভর পুলিশ বাহিনী নয়, বরং ঈমান ও আকীদার বিশুদ্ধতা এবং আখেরাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিতির অনুভূতি জাগ্রত রাখা।

৬. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈমান ও আকীদার পরিশুদ্ধি ছাড়া কোন ইসলামী সমাজ তো দূরের কথা, একটি সুস্থ সমাজের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। পুরো মানবেতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, ইসলামে ঈমান ও আকীদার বিশুদ্ধতার এই যে গুরুত্ব তা শুধু চারিত্রিক পবিত্রতা বা সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনেই নয়, বিষয়টি অপরিহার্য হওয়ার মূল কারণ হল, মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার সবচেয়ে বড় হক বান্দার প্রতি তা-ই এবং এ জিনিসটিই রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র মাধ্যম। শুধু এ পথেই মহান রাব্বুল আলামীনের প্রিয়পাত্র ও নৈকট্যশীল হওয়া যায় এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের ব্যর্থতা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

৭. এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ কথা হল, ইসলাম দ্বীন ও আকায়িদের 'মুসাল্লামাত' তথা সর্বস্বীকৃত বিষয়াদির ব্যাপারে কোন ধরনের শিথিলতা বা আপোষরফার মনোভাব কখনো সমর্থন করে না। কেননা এগুলো এমন বিষয়ই নয়, যাতে যৌক্তিক কোন

মতভেদ হতে পারে। অতএব মতামতের স্বাধীনতার মূলনীতি এখানে অচল। এ বিষয়গুলো এমনই বাস্তবসত্য যে, এতে দ্বিমত পোষণ কেবল উন্মাদ ও হঠকারী ব্যক্তির পক্ষেই হতে পারে। এজাতীয় আরো বহু জানা-অজানা হেকমতের কারণে –যার কিছু আলোচনা বক্ষমান নিবন্ধে বিদ্যমান– ইসলাম আকীদার ক্ষেত্রে কঠিন ও দৃঢ়পদ থাকার আদেশ করেছে এবং এ ব্যাপারে এতটাই জোর দিয়েছে যে, এতে কোন ধরনের শিথিলতা বা আপোষমূলক মনোভাবকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছে।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ.এর ভাষায়, "ঈমান ও আকীদার ব্যাপারে এই দৃঢ়তা ও অনমনীয়তাই হল সেই সুস্পষ্ট বিভাজনরেখা যা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াত আর শক্তিমান নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক লিডার, বিপ্লবী এবং ওই সব ব্যক্তিবর্গের মাঝে টেনে দেওয়া হয়েছে, যাদের চিন্তা-ভাবনার মূল উৎস নবীগণের শিক্ষা, নির্দেশনা এবং পবিত্র সীরাতের স্থলে অন্য কোন কিছু।"

তিনি আরো লেখেন, "বর্তমান যুগের ক্রমবনতিশীল অবস্থায় যারা দুঃখিত তাদের কারো কারো মধ্যে এই স্বভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, যখনই কোন ব্যক্তি সংস্কার ও বিপ্লবের শ্লোগান দেয় অথবা কোন বড় শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বসে, এখন তার আকীদাগত যে কোন ত্রুটি, চিন্তা-দর্শনের যে কোন বক্রতা ক্ষমার্হ মনে করে এবং আকীদার বিষয়টিকে বিবেচনাযোগ্য কোন বিষয়ই মনে করে না। উল্টা ওই সব মানুষকে ভর্ৎসনার টার্গেটে পরিণত করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাতিল শক্তির সাথে গোপন আঁতাতের অপবাদও আরোপ করে, যারা এ ক্ষেত্রে আকীদার বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসে এবং আকীদার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে। এই চিন্তা-রীতি ও কর্ম-নীতির সাথে বিশুদ্ধ দ্বীনীরুচি ও নববী পথ ও পন্থার কোনই মিল নেই।" –দস্তূরে হায়াত ২১-২২

কুরআন মাজীদ, খাতামুন নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন চরিত এবং পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের ইতিহাসে এই দাবি ও বাস্তবতার পক্ষে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। সেসবের আলোচনায় না গিয়ে শুধু সূরা মুমতাহিনার ৪নং আয়াতের নিম্নোক্ত অংশটিতে চিন্তাভাবনা করুন :

قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ.

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, তারা

তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা তোমাদের প্রতি ও তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমরা তোমাদেরকে অমান্য করি আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে গেল, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।" –সূরা মুমতাহিনা ৪

অথচ কুরআন মাজীদ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহনশীলতা ও অন্তঃকরণের কোমলতার নিম্নোক্ত শব্দে প্রশংসা করেছে–

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ

"নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিলেন সহিষ্ণু প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়।" -সূহা হূদ ৭৫

আকীদার গুরুত্ব এবং তা শত্রুতা ও মিত্রতার মাপকাঠি হওয়ার এরচেয়ে বড় দলীল আর কী হতে পারে যে, সূরা কাফিরূন মক্কা মুকাররামায় ওই সময় অবতীর্ণ হয়েছে যখন নম্রতা, কৌশল এবং আকীদা ও ইবাদতের ব্যাপারে শত্রুতা পয়দা না করা এবং বিষয়টিকে ইসলামের শক্তিমত্তা ও নিরাপদ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখাই ছিল সময়ের বাহ্যত দাবি। কিন্তু কুরআন স্পষ্ট বলেছে–

قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، لَاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ، وَلَاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَاَ اَعْبُدُ، وَلَاَ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَاَ اَعْبُدُ.

"বল, হে কাফিরগণ! না আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি, আর না তোমরা আমার মাবূদের উপাসনা কর। আর না (ভবিষ্যতেও) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করব আর না তোমরা আমার মাবূদের উপাসনা করবে।" –সূরা কাফিরূন ১-৫–দস্তূরে হায়াত ২৪

বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং সঠিক আকীদার উপর দৃঢ়পদ থাকা এবং এ ব্যাপারে কোন ধরনের আপোষরফার অবৈধতার সপক্ষে এর চেয়ে বড় দলীল আর কিছুই হতে পারে না।

আকীদার শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

আকীদার এই গুরুত্বের দাবি হল, এর শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে সর্বাধিক জোর ও তাকিদ দেওয়া। সমাজের সম্মানিত দাঈ ও সংস্কারকবৃন্দ, ইমাম ও খতীব এবং ওয়ায়েয ও মুদাররিসগণকে সহীহ আকীদার প্রচার-প্রসারে অক্লান্ত

পরিশ্রম করতে হবে। তালেবে ইলম ও আহলে-ইলমকে পূর্ববর্তী ইমামগণের রচিত তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ এবং দলীলভিত্তিক গ্রন্থাদি গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করতে হবে। পাঠতালিকায় আকীদার ওই সব গ্রন্থাদি অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত, যা কুরআন সুন্নাহ এবং 'খাইরুল কুরূনে'র 'ইজ্‌মা' ইত্যাদি দলীল-প্রমাণ দ্বারা সমৃদ্ধ এবং বর্ণনা ও উপস্থাপনায় সহজ। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের এবং বর্তমান সময়ের অনেক আহলে-ইলম লেখকের এজাতীয় বেশ কিছু রচনা রয়েছে, যথা 'শরহুল আকীদাতিত তহাবিয়্যা' ইবনে আবীল ইয্‌ ও 'আকীদাতুল মুমিন' শায়খ আবু বকর জাবের জাযায়েরী। পাশাপাশি ওই সব কিতাব থেকেও উপকৃত হওয়া উচিত যা আধুনিক বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য অংশের আলোকে লিখিত। এ প্রসঙ্গে শায়েখ জামালুদ্দীন কাসেমী রহ. [১৩৩২ হি.] রচিত 'দালায়িলুত তাওহীদ' কিতাবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া সঠিক আকীদার নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ –যা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিতও হয়েছে– সবার জন্য সহজ ও বোধগম্য এবং সর্ব সাধারণের পাঠ উপযোগী :

১. ইসলাম কেয়া হ্যায়, মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী ২. দীন ও শরীয়ত, মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী ৩. কুরআন আপসে ক্যায়া কাহ্‌তা হ্যায়, মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী ৪. দস্তূরে হায়াত, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী ৫. তালীমুদ্দীন, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ৬. হায়াতুল মুসলিমীন, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ৭. বেহেশতী জেওর (আকায়েদ অধ্যায়) মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ৮. তাকবিয়াতুল ঈমান ওয়া তাযকীরুল ইখওয়ান, হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)।

এছাড়া বাংলা ও ইংরেজিতে আরো বেশ ক'টি মৌলিক রচনা ও অনুবাদ রয়েছে। কোন বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শক্রমে এর যেকোনটা নির্বাচন করা যেতে পারে। আকায়েদের জ্ঞান যথাসম্ভব প্রত্যেক আকীদার হাকীকত, কুরআন হাদীসে উল্লেখিত ব্যাখ্যা, কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ইঙ্গিত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত প্রভাব ও উপকারিতাসহ জানার ও বোঝার চেষ্টা করা উচিত। কেননা আকীদার বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবেও উদ্দেশ্য, আবার আমলের জন্যও উদ্দেশ্য। যেমন ধরুন, 'তাকদীর'বিষয়ক আকীদা শিক্ষাদান শুধু বিশ্বাসের জন্যই নয় বরং তাকদীরের বিশ্বাসের পাশাপাশি বিপদ-আপদে স্থীর-চিত্ত থাকা, প্রত্যেক মুসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত জেনে পেরেশান না হওয়া; অনুরূপ নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে উদ্ধত ও অহঙ্কারী না হওয়া এবং একে নিজের যোগ্যতা মনে না করা ইত্যাদি আমলও এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য। অনুরূপ তাওহীদের আকীদার উদ্দেশ্যের মধ্যে

এও শামিল যে, গাইরুল্লাহর ভয় ও তার প্রতি কোন ধরনের লোভ না থাকা। –কামালাতে আশরাফিয়া ৪৫

বলাবাহুল্য, সঠিক আকীদা থেকে এসব উপকারিতা তখনই লাভ হবে, যখন আকীদার জ্ঞান উপরোক্ত পন্থায় বিস্তারিতভাবে অর্জিত হবে এবং এভাবেই তা অন্তরে দৃঢ় ও বদ্ধমূল হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল ও অবিচল রাখুন এবং শরীয়ত ও সুন্নতকে মজবুতভাবে অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

[মার্চ '০৫ঈ.]

শাআইর ও ইবাদত : কিছু প্রয়োজনীয় কথা

গত ১৮ যিলকদ '৩০হি. মোতাবেক ৭ নভেম্বর '০৯ ঈসায়ী মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা'এ অনুষ্ঠিত মাসিক দ্বীনী মাহফিলে মারকাযের আমীনুত তালীম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব উপরোক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আলোচনা করেছিলেন। 'শাআইর'এর পরিচয় ও মর্যাদা, দ্বীনী বিষয়ে 'ইনকার', 'ইছতিহযা' ও আমলী দুর্বলতার শরয়ী বিধান, ইবাদতের হাকীকত বোঝার প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামের ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মের উপাসনা-উৎসবের মাঝে পার্থক্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয় ছাড়াও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ও তাতে উঠে এসেছে। আলোচনাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা আলকাউসারের পাঠকদের সামনেও পেশ করা হল। ইনশাআল্লাহ এতে সবাই উপকৃত হবেন। –সম্পাদক

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ... أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

আমি সূরায়ে হজ্বের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এরপর যে আরবী বাক্যগুলো বলা হয়েছে তা কুরআন মাজীদের আয়াত নয়। কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করার পর এ ধরনের বাক্য বলা হয়ে থাকে। এগুলো বলা জরুরি নয়, তবে বললে কোন দোষও নেই।

আল্লাহর কালামের প্রতি স্বীকৃতি ও মনের ঈমানী অনুভূতি প্রকাশ করে এই বাক্যগুলো বলা হয়। প্রথম বাক্যটির অর্থ হচ্ছে– 'আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন।' একথা বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। তাঁর চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ হতে পারে না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

"আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য আর কার কথা হতে পারে?"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'লা রায়বা ফীহি' এটা ওই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হল, 'এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সত্য বলেছেন।' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কালাম, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ সম্পূর্ণ সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর সাথে পৌঁছিয়েছেন। তাঁর পৌঁছানোর মধ্যে কোন ধরনের ত্রুটি নেই।

তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যের অর্থ হচ্ছে– "আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী ও শোকরগোযারকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" অর্থাৎ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহর কালাম সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবেই তা আমাদের নিকট পৌছে দিয়েছেন। এই মহা নেয়ামত লাভ করে আমরা কৃতজ্ঞ।

পঞ্চম বাক্যের অর্থ হচ্ছে– "সকল প্রশংসা আল্লাহর।"

কথাগুলোর ভাব ও মর্ম অত্যন্ত সুন্দর। কুরআন মাজীদের কিছু অংশ তেলাওয়াতের পর এভাবে মনের অনুভূতি, আস্থা ও স্বীকৃতি প্রকাশ করতে দোষ নেই। তবে এটা কোন নির্ধারিত বিধান নয় যে, তা বলতেই হবে। কখনো কখনো বলা যায়। না বললেও অসুবিধা নেই।

অনেককে দেখা যায়, যেভাবে কুরআন মাজীদের আয়াত তেলাওয়াত করেন, ঠিক সেভাবেই, একই সূরে এই বাক্যগুলোও বলেন। যদিও সম্ভাবনা কম, তবুও এতে কারো কারো ভুল ধারণা হতে পারে যে, বোধ হয় এই কথাগুলোও কুরআন মজীদের আয়াত। এই দেশে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কি না জানি না, কিন্তু পাকিস্তানে এমন ঘটেছে বলে জানি। পাকিস্তানের করাচি বা অন্য কোন শহরের ঘটনা। এক মজলিসে বক্তা কুরআন মাজীদের আয়াত তেলাওয়াতের পর বয়ান আরম্ভ করলেন। এই বাক্যগুলো বলেননি। এক শ্রোতা দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, জনাব আপনার একটি আয়াত তো রয়েছে গেছে। অর্থাৎ সে মনে করেছে,

কুরআনের যেখান থেকেই পড়া হোক সেখানে একটি আয়াত আছে– "সাদাকাল্লাহুল আযীম।' তো পরে ওই বক্তা সাদাকাল্লাহু বলার বিরুদ্ধে একটি বই লিখে দিয়েছে। এটা অবশ্য বাড়াবাড়ি। কেননা, 'সাদাকাল্লাহ' পড়াই যাবে না এমন বিধান দেওয়া ভুল। তবে 'সাদাকল্লাহ' পড়াকে জরুরি মনে করা বা তাকে কুরআনের আয়াত মনে করাও ভুল।

যাক, সূরা হজ্বের এই আয়াতে বলা হয়েছে, "যে শাআইরুল্লাহ'এর সম্মান করে এটা তার অন্তরের তাকওয়া ও খোদাভীতির পরিচায়ক।" আল্লাহর শাআইরকে সম্মান করার দ্বারা বোঝা যায়, অন্তরে ঈমান আছে এবং আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা আছে।

'শাআইর' কাকে বলে

'শাআইর' আরবী শব্দ। 'শায়ীরাতুন'এর বহু বচন। 'শায়ীরাতুন' অর্থ হচ্ছে নিদর্শন, প্রতীক। তাহলে 'শাআইরুল্লাহ' অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন। কুরআন হাদীসে শাআইরের ব্যাখ্যা এসেছে, যার সারসংক্ষেপ এই যে, আল্লাহ তাআলা বিশেষ কিছু স্থান, কিছু কাজ এবং কিছু বস্তুকে সম্মানিত করেছেন এবং সেগুলোকে তাঁর কুদরত ও আযমতের চিহ্ন সাব্যস্ত করেছেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিদর্শন ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলার আদেশের কারণে এগুলো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। শীর্ষস্থানীয় শাআইরের মধ্যে রয়েছে, কালামুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন মাজীদ এবং কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কালেমা। কালেমা তাইয়েবা, কালেমা শাহাদত ইত্যাদি। বিশেষ স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে বাইতুল্লাহ, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং ইহুদীদের কব্জায় থাকা মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসা। এরপর সকল মসজিদ। তেমনি আরাফা, মিনা-মুযদালিফা 'শাআইরুল্লাহ'এর অন্তর্ভুক্ত। কুরবানীর পশুও শাআইরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষ কাজের মধ্যে রয়েছে নামায। কেউ যখন নামায পড়ে তখন বোঝা যায়, সে মুমিন। যে কোন ধর্মের লোক তাকে দেখুক, বলবে যে, এই মানুষটি মুসলমান। এ জন্য নামায শাআইরের অন্তর্ভুক্ত। জামাতের নামায, জুমার নামায, ঈদের নামায–এগুলোও শাআইরুল্লাহ।

তেমনি 'হজ্ব' শাআইরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আমি এই আরবী শব্দটি বারবার এজন্য ব্যবহার করছি যেন তা আমাদের সবার ইয়াদ হয়ে যায়। শরীয়তের পরিভাষাগুলো আমাদের মুখস্থ থাকা উচিত।

কিছু যিকির অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ করা হয় এমন কিছু বিষয় শাআইরুল্লাহর মধ্যে গণ্য। যেমন আযান। কোন জনপদে আযান হলে যে কেউ বুঝবে যে, এখানে মুসলমানদের বসবাস আছে এবং তাদেরকে ইবাদতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। আযান ইসলামের শীর্ষস্থানীয় শাআইরের অন্তর্ভুক্ত। মুমিনের অন্তরে আযানের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা না থেকে পারে না। একজন সাধারণ দ্বীনদার মানুষ আমাকে বলেছেন যে, আমার কাছে আযান শুনতে খুব ভাল লাগে। যখন আযান হয় তখন ছেলেদের বলি যে, সব জানালা খুলে দাও। আমি আযান শুনব। আর অনেকে তো শুধু এই কারণে বাসা পরিবর্তন করে ফেলে যে, সেখানে আযানের আওয়াজ শোনা যায় না।

পক্ষান্তরে এই দেশে এমন লোকও আছে যারা বলে, আযানের কারণে শব্দ দুষণ হয়! আহারে বাংলাদেশ! যে দেশে চারদিকের অনাহূত শব্দে কান পাতা দায় সেই দেশে নাকি আযানের কারণে শব্দ দুষণ হয়! এমন কথা যে বলে সে কখনো মুমিন হতে পারে না। সে হয় মুনাফিক নয়তো বেদ্বীন। আর এই সব লোক তো এখন আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিরও হর্তাকর্তা! যাহোক, মুমিনমাত্রই শাআইরুল্লাহর সম্মান করবে। শাআইরুল্লাহর প্রতি তার ভক্তি ও আস্থা থাকবে। কোন মুমিন কখনো এটাকে কটাক্ষ করতে পারে না।

দাড়ি ও মেসওয়াক

ইসলামের 'শাআইর' অনেক এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার ও পর্যায়ক্রমও রয়েছে।

ক্রমান্বয়ে আসতে আসতে একপর্যায়ে আসবে দাড়ি-টুপি, মেসওয়াক ইত্যাদি। এগুলো সাধারণ বিষয় নয়। দাড়িকে অনেকে সাধারণ সুন্নত মনে করে এবং এ কারণে এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে। অথচ সাধারণ সুন্নতেরও গুরুত্ব কম নয়। আর দাড়ি তো 'সুন্নতে ওয়াজিবা'। অর্থাৎ ওয়াজিব পর্যায়ের সুন্নত। এর গুরুত্ব অনেক বেশি। হযরত আদম (আ.) থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর দাড়ি ছিল। তাই দাড়ি কখনো সৌন্দর্য হানিকর হতে পারে না। বিকৃত পরিবেশের কারণে কারো কাছে দাড়ি কামানো সৌন্দর্যের বিষয় মনে হতে পারে। কিন্তু এটা হচ্ছে বিকৃতি। প্রকৃত সৌন্দর্য দাড়ি রাখার মধ্যেই রয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয়েও সাবধান হওয়া দরকার। তা হচ্ছে দাড়ি না রাখা গোনাহ; কিন্তু দাড়ি অবজ্ঞা করা বেদ্বীনী। যেসব মুসলমান দাড়ি রাখে না তাদের

নিজেদেরকে অপরাধী মনে করতে হবে। তাদের এই অনুভূতি থাকতে হবে যে, একটি গোনাহের কাজে তারা লিপ্ত। এটা যদি না থাকে তাহলে গোনাহ আরো বেড়ে যাবে। আর যদি দাড়িকে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে তো ঈমানই থাকবে না।

মেসওয়াকও সাধারণ সুন্নত নয়, শাআইর পর্যায়ের সুন্নত। এজন্য কেউ যদি কখনোই মেসওয়াক না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। মাঝে মাঝে করল না তাহলে মেসওয়াকের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে।

দেখুন, আবারো বলছি, ইসলামের কোন একটি বিধান পালন করতে না-পারা অপরাধ, কিন্তু এর দ্বারা ঈমান নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে সেই বিধান অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে ঈমান চলে যায়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা আকীদা পর্যায়ের। এটা ভালভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

ইনকার, ইছতিহযা ও আমলী দুর্বলতা

এখানে তিনটি বিষয় আছে: 'ইনকার', 'ইছতিহ্যা' ও 'আমলী দুর্বলতা।' ইনকার অর্থ অস্বীকার করা আর ইছতিহ্যা অর্থ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করা। ইনকার দ্বারাও ঈমান নষ্ট হয় তবে সবক্ষেত্রে নয়। ইসলামের যে বিষয়গুলো অকাট্য এবং কুরআন-হাদীস দ্বারা সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তা অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত–এগুলো ইসলামের অকাট্য ইবাদত। এগুলো অস্বীকার করলে ঈমান চলে যাবে। এমন আরো বহু অকাট্য বিষয় আছে যা জেনে নেওয়া আমাদের কর্তব্য। আর যেসব বিধান ইজতিহাদী পর্যায়ের তা অস্বীকার করাও গোনাহ; কিন্তু এর দ্বারা ঈমান একেবারেই নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে ইছ্‌তিহ্যা এত মারাত্মক যে, শরীয়তের সামান্য কোন বিষয়কে ইছতিহযা বা বিদ্রূপ করলে ঈমান চলে যাবে। আপনি মেসওয়াক করেন না–এটা অপরাধ; কিন্তু যদি মেসওয়াককে বিদ্রূপ করে বলেন, ব্রাশ আছে পেস্ট আছে তা বাদ দিয়ে এই সব কী, ছাগলের খুটা পকেটে ভরে রেখেছে। তাহলে সাথেসাথে ঈমান চলে যাবে।

কোন আলেম ফতোয়া দিয়েছেন। তখন আপনি যদি বলেন, না না, আপনি ঠিক বলেননি। বিষয়টা এমন নয়।' তবে এটা ইনকার হল। এটা অবশ্যই অপরাধ। কেননা ফিকহ-ফতোয়ার লোক না হয়েও আপনি এ বিষয়ের লোকের কথা অস্বীকার করেন কীভাবে? এটা তো অনধিকার চর্চা। তবে এর দ্বারা ঈমান নষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে 'ফতোয়া' বিষয়টাকেই যদি অবজ্ঞা করা হয়–আরে রাখেন আপনার ফতোয়া, কে মানে ফতোয়া? আদিকালের কথাবার্তা নিয়ে বসে আছেন! তাহলে এটা 'ইছতিহযা'। এ কারণে ঈমান চলে যাবে।

দ্বীনের কোন বিষয়কে উপহাস করার দ্বারা বোঝা যায়, দ্বীনের প্রতি তার ভক্তি নেই। আস্থা ও ভালবাসা নেই। কেননা, যার প্রতি আস্থা থাকে মানুষ কখনো তাকে উপহাস করে না।

ইছতিহযা মুমিনের স্বভাব নয়, মুনাফিকদের স্বভাব। কুরআন মাজীদে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মুসলমানের সাথে 'ইছতিহযা' করে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.

তৃতীয় বিষয় হল আমলী দুর্বলতা। শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করা গোনাহ। আর গোনাহ মানুষের আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর। দ্বীন ও ঈমান এবং আমানতের জন্য ক্ষতিকর।

এজন্য অনুতপ্ত থাকা চাই এবং গোনাহ ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা চাই। অনুতাপের বিপরীত হল অহংকার। এটা মানুষকে ইনকার ও ইছতিহযাতে লিপ্ত করে।

হজ্ব শাআইরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত

মূল কথায় ফিরে আসি। শাআইরুল্লাহর সম্মান হচ্ছে ঈমানের অংশ এবং তা তাকওয়া ও খোদাভীতির পরিচায়ক।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, শাআইরুল্লাহর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তার মধ্যে কিছু শাআইর আছে কর্মগত। অর্থাৎ এমন কিছু কাজ, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরত ও আযমতের নিদর্শন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের চিহ্ন হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এই সব কাজের মধ্যে অন্যতম হল হজ্ব। মুসলমানগণ নির্ধারিত স্থানে একত্র হয়ে প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করে। এটা ইসলাম ও মুসলমানদের চিহ্ন। হজ্বের কাজগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এর মূল বিষয় হল আল্লাহ তাআলার ইবাদত। ইসলাম তাওহীদের দ্বীন এবং এর সকল ইবাদতের মূল বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। এটা এতই পরিষ্কার যে, এ বিষয়ে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। অন্যান্য বাতিল ধর্মের সাথে ইসলামের কোন মিল নেই এবং এখানে কোন তুলনাও চলে না। তবে নাম ও বাহ্যিক কিছু বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য মনে হতে পারে। যেমন হজ্বের সময় মুসলমানরা আরাফার ময়দানে, মিনায়, মুযদালিফায় জমায়েত হয়। অন্য ধর্মের লোকদেরও বিভিন্ন তীর্থস্থানে জমায়েত হওয়ার রেওয়াজ আছে।

কিন্তু এটা তো শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্য। স্বরূপ, তাৎপর্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই সকল বিষয়ে ইসলামের ইবাদত অন্য সকল ধর্মের উপাসনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ আমাদের সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের প্রবণতা হল তারা সব বিষয়কে সমান বলতে আগ্রহী। এ জন্য তারা ইসলামের ইবাদত-বন্দেগী, হজ্ব-কুরবানী-ঈদ ইত্যাদিকে ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করে যেভাবে উপস্থাপন করে হিন্দুদের পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় আচার-উৎসবকে। মুসলিম সমাজে মুসলিম নাম পরিচয় বহন করেও তারা এইসব কাজ করে। অথচ ইসলামের ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মের পূজা-অর্চনায় কোন মিল নেই।

ইসলামের ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মের উপাসনার মাঝে পার্থক্য

ইসলামের ইবাদতের মূল ভিত্তি হল তাওহীদ ও সুন্নাহ। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মের উপাসনার মূল বিষয় শিরক ও বেদআত। কোন মুসলমান কীভাবে সকল ধর্মকে সমান মনে করতে পারে? দেখুন, প্রথম পার্থক্য তো এখানেই যে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। পক্ষান্তরে অন্য সকল ধর্ম তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যাত। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন শুধু ইসলাম।"

আল্লাহ তাআলা ইসলামকেই সবার জন্য পছন্দ করেছেন, কিন্তু যারা তা মানল না, অন্য ধর্মে গেল তারা আল্লাহর দ্বীনকে পরিত্যাগ করল।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল ইসলামের ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নির্দেশিত। এখানে কারো নিজস্ব মতের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। সুতরাং নামায পাঁচ ওয়াক্তই। পৃথিবীর কোন মুসলমান নামাযকে ছয় ওয়াক্ত বানাতে পারবে না। ফজরের নামায দুই রাকাত, যোহর-আসর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত, ইশা চার রাকাত—এভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং সারা মুসলিম জাহানে নামায এভাবেই। কেউ একথা বলতে পারবে না যে, আসরের নামায চার রাকাত পড়লাম, সামনে ইশাও চার রাকাত পড়ব, মাঝে মাগরিব তিন রাকাত কেন? এটাও চার রাকাত পড়ি। এখানে নিজের ইচ্ছার কোন অবকাশ নেই। নামায শুরু হবে তাকবীর দ্বারা শেষ হবে সালাম দ্বারা। এটাই নামাযের নিয়ম। পৃথিবীর কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই।

নামাযের কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে যেসব পার্থক্য দেখা যায় এটাও এজন্য নয় যে, কেউ মনগড়াভাবে কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে; বরং ওই একাধিক পদ্ধতি হাদীস শরীফেই আছে। এক মুজতাহিদ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, অন্য মুজতাহিদ অন্য পদ্ধতি। কিন্তু সবগুলো হাদীস শরীফ থেকেই নেওয়া হয়েছে।

এবার অন্যান্য ধর্মের উপাসনা ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজ নিন। দেখবেন যে, এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে যে, আমরা বাপ-দাদাদের এভাবেই করতে দেখেছি কিংবা এমন কিছু গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেবে যেগুলো বিকৃত, পরিবর্তিত ও ভিত্তিহীন। বাইবেল সম্পর্কে খোঁজ নিন। তা প্রকৃত ইঞ্জিল নয়। ইঞ্জিল ছিল আসমানী কিতাব। কিন্তু তা সংরক্ষিত থাকেনি। লোকেরা তা বিকৃত ও পরিবর্তিত করে ফেলেছে। এখন বিভিন্ন ভাষায় যেসব অনুবাদ পাওয়া যায় সেগুলো তুলনা করে দেখুন, যত অনুবাদ তত পার্থক্য। শুধু শব্দের পার্থক্য নয়, তথ্যের পার্থক্য। মোটকথা, সেসব ধর্মের উপাসনা ও উপাসনা-পদ্ধতির কোন ভিত্তি নেই। পক্ষান্তরে ইসলামের সকল ইবাদত আল্লাহর তাআলার পক্ষ হতে নির্দেশিত ও প্রমাণিত।

তৃতীয় বিষয় হল ইসলামের ইবাদতের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ও সুন্নাহ। পক্ষান্তরে অন্য সকল ধর্মের উপাসনার মূল ভিত্তি হল শিরক ও বেদআত। এভাবে একেক দিক থেকে যদি বিচার বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন, ইসলামের ইবাদতের সাথে অন্যান্য ধর্মের উপাসনার কোন মিল নেই।

হজ্বের মূল বিষয় আল্লাহর ইবাদত

আমাদের আলোচ্য বিষয় হজ্ব সম্পর্কেই চিন্তা করুন। হজ্বে আমরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করি। কিন্তু এটা বাইতুল্লাহর সম্মানের জন্য করা হয় না। করা হয় আল্লাহর ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহর চারপাশে তাওয়াফ করতে বলেছেন তাই তাওয়াফ করা হয়। এটা ঠিক যে, আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহকে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তাওয়াফ সে সম্মানের জন্য নয়। বরং তা আল্লাহর ইবাদত। দেখুন, তাওয়াফ শুরু হয় হজরে আসওয়াদ থেকে। বাইতুল্লাহকে বাম পাশে রেখে তাওয়াফ করতে হয়। তাওয়াফের হালতে বাইতুল্লাহর দিকে তাকানো নিষেধ। বাইতুল্লাহর দিকে সীনা ফেরানোও নিষেধ। কেউ যদি বাইতুল্লাহর দিকে সীনা ফেরায় তাহলে যতটুকু সময় সীনা বাইতুল্লাহর দিকে ছিল ওই পরিমাণ তাওয়াফ হয়নি। আবার পিছিয়ে এসে তাওয়াফ করতে হবে। কী প্রমাণ করে এই

মাসআলাগুলো? এটাই প্রমাণ করে যে, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ বাইতুল্লাহর জন্য নয়, আল্লাহর জন্য। এটা আল্লাহর ইবাদত।

হজরে আসওয়াদে চুম্বন করার বিষয়টি দেখুন। নিয়ম হল, অন্যকে কষ্ট না দিয়ে যদি হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা সম্ভব হয় তাহলে চুম্বন করবে। তবে সাধারণত হজ্বের মৌসুমে এটা সম্ভব হয় না। একেবারে মৌসুমের শেষে যদি কেউ থেকে যায় তাহলে চুম্বনের সুযোগ পাওয়া যায়। অন্যথায় তা পাওয়া যায় না। দূর থেকে হাত উঁচিয়ে হাতে চুম্বন করবে।

হজরে আসওয়াদে চুম্বনের বিষয়টি বাহ্যত মনে হতে পারে পাথরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ। অথচ মোটেই তা নয়।

হজরে আসওয়াদ হচ্ছে বেহেশতী পাথর। আল্লাহ তাআলা বেহেশত থেকে তা পাঠিয়েছেন এবং এতে চুম্বন করলে তিনি বান্দার গোনাহ মাফ করবেন। লক্ষ করুন, গোনাহ মাফ করবেন আল্লাহ তাআলা। তাই আল্লাহর আদেশে হজরে আসওয়াদে চুম্বন করা হয়।

হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলে তা কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে যে, এ ব্যক্তি তাওহীদের লোক ছিল। দেখুন, তাওহীদপন্থী ছিল বলে সাক্ষ্য দেবে। কেননা, তা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশিত।

হযরত ওমর ফারূক (রা.)এর ঘটনা অনেকেরই জানা আছে। হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার সময় তিনি বললেন, আমি জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র। কল্যাণ বা অকল্যাণের কোন ক্ষমতা তোমার নেই। আমি যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না। তাহলে পরিষ্কার পার্থক্য হয়ে গেল হিন্দুদের পাথর-পূজা ও আমাদের হজরে আসওয়াদে চুম্বনের মাঝে।

এ মাসআলাও আপনাদের জানা আছে যে, বাইতুল্লাহ-এর যে সব স্থানের 'ইস্তিলাম' বা চুম্বন করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা দ্বারা প্রমাণিত শুধু সেসব স্থানের 'ইস্তিলাম' বা চুম্বন করা মুস্তাহাব। যেমন হজরে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামানী; এগুলো ছাড়া বাইতুল্লাহর অন্য কোন অংশের ইস্তিলাম বা চুম্বন করাকে মুস্তাহাব মনে করা জায়েয নেই এবং এতে সওয়াবের আকীদা রাখাও জায়েয নেই। এই বিধান সম্পর্কে চিন্তা করলে উপরোক্ত বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। যদি বাইতুল্লাহই উদ্দেশ্য হত বা নিজের ইচ্ছেমত ইবাদত করা জায়েয হত তাহলে এই বিধানের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠত না।

এভাবে হজ্বের সকল কাজকর্মের সম্পর্কে চিন্তা করুন। দেখা যাবে যে, এর হাকীকত হচ্ছে তাওহীদ ও ইবাদত। আর তা আদায়ের পদ্ধতি রয়েছে কুরআন সুন্নাহয়। তাই স্বরূপ, তাৎপর্য এবং সম্পাদনের পদ্ধতি কোন বিষয়েই অন্যান্য ধর্মের পূজা-অর্চনার সাথে এর মিল নেই। তাহলে ইসলামের ইবাদত-বন্দেগী এবং ঈদ ও কুরবানীকে অন্যান্য ধর্মের উৎসব ও উপাসনার সাথে এক কাতারে কীভাবে নিয়ে আসা যায়? অথচ এ কাজটিই আমাদের দেশের সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের প্রধান প্রবণতা। এটি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক।

এজন্য ইবাদত-বন্দেগীর হাকীকত ও স্বরূপ পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত। হাকীকত না বোঝার কারণে ইবাদতের প্রসঙ্গটি আমাদের অনেকের কাছেই অনেক হালকা ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তারা একে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে এর তাৎপর্যগত বিকৃতি সাধন করে থাকে। বস্তুত এটা ইবাদতের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল।

হজ্বের তাৎপর্যগত অপব্যাখ্যা

অনেকে হজ্বকে মুসলমানদের বৈশ্বিক পর্যায়ের মহাসমাবেশ বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। এটা বিকৃতি। হজ্বকে যেমন অন্য ধর্মের উপাসনার সাথে মেলানো যাবে না, তেমনি একে নিছক সম্মেলনও বলা যাবে না। মুসলমানরা অবশ্যই একত্র হবেন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। তবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। হজ্বকে এর সাথে মেলানো যাবে না। হজ্ব খালেছ ইবাদত। দেখুন, হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে সামর্থ্য। সামর্থ্যবান ব্যক্তি শিক্ষিত হোক কি অশিক্ষিত, তার উপর হজ্ব ফরয। হজ্ব যদি মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনই হত তাহলে শুধু বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকদেরকেই সেখানে যেতে বলা হত।

বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবী

প্রসঙ্গত বলি, আমি কিন্তু বুদ্ধিমান বলছি, বুদ্ধিজীবী বলছি না। আমি এ দুটো শব্দের মধ্যে পার্থক্য করি। বুদ্ধিমান হচ্ছে যারা বুদ্ধির দ্বারা খালেকের পরিচয় পেয়েছে, রাসূলের পরিচয় পেয়েছে এবং বুদ্ধিকে মানুষের সেবা ও কল্যাণের কাজে নিবেদিত করেছে। এরা হচ্ছে বুদ্ধিমান। কুরআনের ভাষায় 'উলুল আলবাব'। পক্ষান্তরে বুদ্ধিজীবী হল যারা বুদ্ধি বিক্রি করে খায়। তাদের বুদ্ধি সমাজের কোন ক্ষতি ছাড়া উপকার করে না। বর্তমানে বুদ্ধিজীবী নামে যে মহলটি প্রসিদ্ধ তাদের

কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করলে এটাই বলতে হয়। আমরা কখনো কখনো বুদ্ধিমান অর্থে বুদ্ধিজীবী শব্দ ব্যবহার করি তবে তা ঠিক নয়।

যাহোক, হজ্ব যদি নিছক মুসলমানের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হত তাহলে শুধু বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানুষকেই দাওয়াত দেওয়া হত। যেন তারা একত্র হয়ে মুসলিম উম্মাহর সঙ্কট ও সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। অথচ বিষয়টি এমন নয়।

তেমনি হজ্বের কাজকর্মগুলো লক্ষ করুন, আজ মিনায়, পরদিন আরাফায়, এরপর মুযদালিফায়, আবার মিনায়, এরপর মক্কায়, এভাবে হাজীরা শুধু সফরের ওপর থাকেন। পক্ষান্তরে সম্মেলনের দাবি হচ্ছে, একস্থানে শান্ত হয়ে বসে চিন্তা-ভাবনা ও মতবিনিয়ম করা। এটা তো এ আমলের সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এজন্য ইবাদত-বন্দেগীর হাকীকত সঠিকভাবে বোঝা উচিত। অন্যথায় এ ধরনের বিভিন্ন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক দান করুন। আমীন। #

[ডিসেম্বর '০৯ঈ.]

নবী-নামের প্রতি সম্মান ঈমানের অংশ

আল্লাহর বান্দার উপর আল্লাহর নবী খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হক রয়েছে। সবচেয়ে বড় হক হল তাঁর প্রতি অন্তর থেকে ঈমান আনা এবং পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, এমনকি নিজ প্রাণের চেয়েও তাঁর প্রতি অধিক মহব্বত রাখা, তাঁর যথাযথ সম্মান করা এবং তাঁকে অনুসরণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে ইসলামের যে আকীদাসমূহ রয়েছে তা অন্তর থেকে বিশ্বাস করার পাশাপাশি তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা এবং তাঁর যথাযথ সম্মান ঈমানের জন্য অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু শিক্ষার নিছক অনুসরণ ঈমানদারীর জন্য যথেষ্ট নয়। পশ্চিমা দুনিয়াও পার্থিব স্বার্থে তাঁর অনেক শিক্ষা অনুসরণ করে থাকে। এমন অনুসরণ মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং তাঁর শর্তহীন আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর আদব-ইহতেরাম রক্ষা করা এবং তাঁর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা পোষণ করা ফরয এবং ঈমানের অপরিহার্য অংশ। এটা ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখার মতো একটি সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আল্লাহকে ভালোবাসার মানদণ্ড স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন। সেই মানদণ্ড হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেউ যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে এবং আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চায়, তবে এর একমাত্র পথ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত রাখা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এটাই একমাত্র মানদণ্ড এবং এ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি স্বয়ং আল্লাহর কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. (آل عمران: ٣١)

মুমিনের অন্তরে নবীর মহব্বত কী পরিমাণ থাকা উচিত–এ প্রশ্নের উত্তরও কুরআন মজীদে এসেছে। ইরশাদ হয়েছে– اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ "নবীর সঙ্গে ঈমানদারের প্রাণেরও অধিক সম্পর্ক। তিনি তাদের সত্তা থেকেও তাদের কাছে অগ্রগণ্য।" –সূরা আহযাব ৬

মুমিন উম্মতের সঙ্গে নবীর এবং নবীর সঙ্গে মুমিন উম্মতের যে সম্পর্ক তার প্রকৃতিই ভিন্ন, মাহাত্ম্যই আলাদা। এর সাথে পার্থিব কোন সম্পর্কের তুলনাই হতে পারে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন উম্মতের জন্য পিতামাতার চেয়েও অধিক মমতাবান, আর তার নিজের চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। উম্মতের ঈমানী ও রূহানী অস্তিত্ব নবীর রূহানিয়াতেরই অবদান। যে স্নেহ-মমতা ও দীক্ষা-তরবিয়ত নবীর নিকট থেকে উম্মত লাভ করেছে এর কোন নমুনা গোটা সৃষ্টি-জগতের মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পিতামাতা এর দৃষ্টান্ত হতে পারেন না। পিতার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে দান করেন ক্ষণস্থায়ী জীবন আর নবীর মাধ্যমে হাসিল হয় শাশ্বত ও চিরস্থায়ী জীবন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ মমতা ও কল্যাণকামিতার সাথে তরবিয়ত করে থাকেন, যে সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতা আমাদের পক্ষে নিজ সত্তার জন্যও সম্ভব নয়। স্ত্রী-সন্তান এমনকি পিতা মাতাও অজ্ঞতা বা অসচেতনতায় আমাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে, আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সর্বদা ওই পথই দেখিয়ে থাকেন, যে পথে রয়েছে তাদের প্রকৃত সফলতা। মানুষ নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করে, নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজের ক্ষতি সাধন করে, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ওই নির্দেশই দান করেন, যাতে বাস্তবিকই তার কল্যাণ রয়েছে। এজন্য উম্মতের উপর নবীজীর এই হক প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁকে নিজের পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান এবং প্রাণের চেয়েও অধিক ভালোবাসবে। নিজের মতামতের উপর তাঁর মতামতকে এবং নিজের সিদ্ধান্তের উপর তাঁর সিদ্ধান্তকে অগ্রগণ্য রাখবে। আর তাঁর আদেশকে শিরোধার্য করবে।

আমাদের জান-মাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ অধিকার রয়েছে, যা পৃথিবীতে আর কারো নেই। শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী (রহ.)এর ভাষায়– "নবী আল্লাহর নায়েব। ব্যক্তির জান-মালের উপর তার নিজেরও অতখানি কর্তৃত্ব নেই, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রয়েছে। নিজেকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা বৈধ নয়, কিন্তু নবী যদি আদেশ দেন তবে তা ফরয হয়ে যায়।"

ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের যে আয়াত উল্লেখিত হয়েছে তার মর্মবাণী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে এভাবে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে, সকল মানুষের চেয়ে, এমনকি তাঁর প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় না হই।" –সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান

বড়কে সম্মান করা একটি স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। ইসলামও বড়দেরকে সম্মান করার এবং আলেমদেরকে শ্রদ্ধা করার আদেশ দিয়েছে। তাহলে যাঁকে আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মাকাম দান করেছেন দুনিয়াতে ও আখেরাতে, যাঁকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামসহ সমগ্র বনী আদমের সাইয়েদ ও সরতাজ বানিয়েছেন, রাব্বুল আলামীনের পর জগৎবাসীর উপর যাঁর অনুগ্রহই সর্বাধিক এবং স্বয়ং রাব্বুল আলামীন যাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামীন ও খাতামুন নাবিয়্যীন উপাধীতে ভূষিত করেছেন, তাঁর তাজীম ও সম্মান যে গোটা মানবজাতির জন্য ফরয ও অপরিহার্য হবে, তা তো বলাই বাহুল্য।

এখানে যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও তাজীমের বিষয়কে আল্লাহ তাআলা শুধু বড়দের সম্মান করার সাধারণ আদেশের মধ্যেই ছেড়ে দেননি; বরং তাঁর তাজীম-সম্মানের বিষয়ে বিশেষ বিশেষ বিধান নাযিল করেছেন। তাঁর আদব-ইহতেরাম আল্লাহ তাআলা এমন অপরিহার্য করেছেন যে, এটা ছাড়া কারো ঈমান তাঁর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমন সকল কথা-কাজ, আচার-আচরণ আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন এবং লানত ও অভিশাপের কারণ বলে ঘোষণা করেছেন, যা নবীকে কষ্ট দেয়। তেমনি এমন কিছু আচরণকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, যা অসতর্কতার কারণে প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব-ইহতেরাম ক্ষুণ্ন হতে পারে। আর সাবধান করে দিয়েছেন যে, এর অন্যথা হলে সকল আমল বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।" –সূরা আরাফ ১৫৭; সূরা ফাত্হ ৯; সূরা হুজুরাত ১-৫; সূরা নূর ৬৩; সূরা আহযাব ৫৩, ৫৬-৫৮; সূরা তাওবা ৬১; সূরা বাকারা ১০৪; সূরা নিসা ৪৭

মহব্বত ও তাজীমের বিষয়টি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও তাজীমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁর সঙ্গে যাদের বিশেষ সম্পর্ক আর যে জিনিষগুলো তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, তাদের সঙ্গেও মুমিনের

ভালোবাসার সম্পর্ক হওয়া জরুরি। প্রেম-ভালোবাসার ধর্ম হচ্ছে প্রিয়জনের যা কিছু প্রিয় তার সাথেও ভালোবাসা হবে। তা হলে নবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল কিছুর সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক কায়েম হওয়া নবী-মহব্বতের স্বাভাবিক দাবি, আর শরীয়তও এর তাকীদ করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সম্মান

মানুষের নাম তার সত্তার পরিচয় বহন করে। নাম দ্বারাই তাকে স্মরণ করা হয় এবং নামের দ্বারাই সে পরিচিতি লাভ করে। এ জন্য কারো নাম তার সত্তা থেকে ভিন্ন নয়। নামের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা মূলত ব্যক্তির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তেমনি নামের প্রতি বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা মূলত ব্যক্তির প্রতিই বিদ্রূপতা ও অবজ্ঞার শামিল।

শরীয়ত যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম সর্ম্পকে বহু হুকুম প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনে হাকীমের একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর হাদীসের কিতাবে এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ অধ্যায়ই বিদ্যমান রয়েছে। নাম সম্পর্কিত শরয়ী হুকুমসমূহের মধ্যে একটি এই যে, কোনো নামেরই বিকৃতি ঘটানো যাবে না এবং তা নিয়ে বিদ্রূপও করা যাবে না। তবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের ব্যাপারটি সাধারণ এ হুকুম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। কেননা, তাঁর নামের বিষয়টি হল সরাসরি দ্বীন ও ঈমানের বিষয় এবং ইসলামের শিআর ও নিদর্শন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর ফেরেশতাগণ এ নামের তাজীম করেছেন এবং স্বয়ং আল্লাহ এ নামের তাজীমের আদেশ করেছেন।

আর এরচেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা কালেমায়ে তাওহীদ, কালেমায়ে শাহাদাত, যা ঈমানের কালেমা ও ইসলামের শিআর, তাতে নিজের নামের সঙ্গে রাসূলের নাম যুক্ত করেছেন। আযানে ও নামাযের তাশাহহুদে প্রিয়তমের নামও শামিল করেছেন। সূরা 'আলাম নাশরাহ' আয়াত–وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "আর আমি আপনার আলোচনা সমুচ্চ করেছি।" এই আসমানী ইকরামের কথা বলা হয়েছে।

আমরা কি কখনো ভেবেছি, প্রতিদিন পাঁচ বার কত লক্ষ মসজিদের মিনারে মিনারে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিত হয়। আর তারই সাথে ধ্বনিত হয় 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'র সুমধুর ধ্বনি কিংবা এভাবেও কি ভেবেছি যে, যে নামের কালেমা পাঠ করে মানুষ ঈমানদার হয় আর যে নামের কালেমা অস্বীকার করে ঈমান হারায় তার মাহাত্ম্য কতখানি। এ নামের সঙ্গে সামান্যতম বেআদবি

কত বড় অপরাধ। বলাবাহুল্য, এটা এমন কোনো অস্পষ্ট বিষয় নয়, যা বোঝানোর প্রয়োজন হতে পারে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকের তাজীমের আরেকটি দৃষ্টান্ত এই যে, তাঁর নাম উচ্চারিত হলে দরূদ পাঠের আদেশ করেছেন এবং জিব্রীলের (আ.) যবানীতে এই বদদুআ করিয়েছেন যে, "যার সামনে হাবীবে পাকের আলোচনা হয় অথচ সে দরূদ পড়ে না, তার বিনাশ হোক।" উপরন্তু এর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে আমীন বলিয়েছেন। –সহীহ ইবনে খুযাইমা, সহীহ ইবনে হিব্বান, দেখুন আলকাওলুল বাদী' ২৯২-২৯৮

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের কোথাও তাঁর হাবীবকে নাম ধরে সম্বোধন করেননি। বান্দাদের আদেশ করেছেন, তারা যেভাবে একে অপরকে নাম ধরে কিংবা পারিবারিক, বংশীয় বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্বোধন করে থাকে, সেভাবে যেন রাসূলকে সম্বোধন না করে। –সূরা নূর ৬৩

বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি অবগত। কেননা, তিনিই তাঁর স্রষ্টা এবং তিনিই তাঁকে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন। রাসূলের উম্মতী যতই তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করুক, পরিশেষে অক্ষমতা স্বীকার করে বলতে হয় যে–

داماں نگہ تنگ وگل حسن تو بسیار ☆ گلچین تو از تنگی دامن گلہ دارد

"ভাবনার আঁচল খাটো, অথচ সৌন্দর্যের বাগানে ফুটে রয়েছে অসংখ্য ফুল।"

কিংবা বলতে হবে–

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

"খোদার পরেই তোমার মকাম।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি নাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। তবে তাঁর ব্যক্তি-নাম দুটি– 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমদ'। উভয় নামের মূল ধাতু এক, 'হামদ'। এটি প্রশংসা, সম্মান, শোকর ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। এ বিষয়গুলোর প্রকৃত হকদার হলেন আল্লাহ তাআলা। সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে কারো প্রশংসা করা হলে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই প্রশংসা। কেননা, আল্লাহই তাকে নিজ অনুগ্রহে সে গুণের অধিকারী করেছেন এবং কাজের তাওফীক দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলার 'আসমায়ে হুসনা'র মধ্যে একটি হচ্ছে 'হামীদ'। এরও মূল ধাতু 'হামদ'। অর্থাৎ যে সত্তা চির প্রশংসিত, যিনি সকল প্রশংসার প্রকৃত অধিকারী, যেখানেই যার প্রশংসা করা হোক তা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই প্রশংসা। আল্লাহ তাআলা তাঁর পাক নাম 'হামীদ' থেকে নির্গত দুই নাম 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমদ' দ্বারা তাঁর হাবীবের নাম রেখেছেন। 'মুহাম্মাদ' অর্থ 'অতিপ্রশংসিত'। আর 'আহমদ' শব্দের অর্থ দুটি–এক অর্থ অনুযায়ী তা 'মুহাম্মাদ'-এর সমার্থক অর্থাৎ অতিপ্রশংসিত। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে 'সর্বাধিক প্রশংসাকারী'।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম 'মুহাম্মাদ' কেন? এজন্য যে, তিনি আল্লাহর কাছে প্রশংসিত, ফেরেশতাদের মাঝে প্রশংসিত, পৃথিবীবাসীর নিকট প্রশংসিত, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদের কাছে প্রশংসিত, যারা ঈমান আনেনি তাদের কাছেও তিনি তাঁর গুণ ও মাহাত্ম্য, চরিত্র ও মহানুভবতার কারণে প্রশংসিত। সৃষ্টির মধ্যে যাঁর প্রশংসা সবচেয়ে বেশি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত যাঁর প্রশংসা অব্যাহত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ', তিনি প্রশংসিত। আর প্রশংসা ও হামদের সাথেই তাঁর গভীর সম্পর্ক। ময়দানে হাশরে যে স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি শাফায়াত করবেন, সে স্থানের নাম 'মাকামে মাহমূদ'। সেদিন 'লিওয়ায়ে হামদ'– প্রশংসার ঝাণ্ডা তাঁর পবিত্র হস্তেই উড্ডীন থাকবে।

তিনি মুহাম্মাদ, কুল মাখলুক তাঁর প্রশংসাকারী। তিনি আহমদ, স্রষ্টার প্রশংসায় সবার চেয়ে অগ্রগামী। মরুভূমির বালুকারাশি আর আকাশের মেঘমালা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার চেয়েও তিনি অধিক বিস্তৃত করেছেন রাব্বুল আলামীনের হামদ ও ছানা। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত নামসমূহের ব্যাখ্যা ও মর্ম জানার জন্য দেখুন 'রহমাতুল লিল আলামীন' আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী ৩/১৪-১৫, ১৭৮-১৯৮)

এ নামের সঙ্গে উম্মতের প্রীতি ও ভালোবাসা

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে আরব ভূখণ্ডে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলে কারো নাম 'আহমদ' রাখা হয়নি। মুহাম্মাদ নামটিও তাঁর আগমনের আগে প্রসিদ্ধ ছিল না। আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কেউ কেউ তাদের সন্তানের নাম 'মুহাম্মাদ' রেখেছিল। এদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে পাঁচ-সাত জন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর লোকেরা আদরের সন্তানের নাম মুহাম্মাদ বা আহমদ রাখা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেছে। মুহাম্মাদ নামের বহু মানুষ তাদের পরিচয়, কীর্তি ও অবদানসহ ইতিহাসের পাতায় এখনো জীবন্ত রয়েছেন। উম্মতের যে শ্রেণী ইলমে দ্বীনকে ধারণ করেছেন, বর্ণনা করেছেন, তাঁদের জীবন ও কর্মের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য মুসলমানরা এমন এক 'শাস্ত্র' উদ্ভাবন করেছে, যা কমবেশি চল্লিশটি শাখায় বিস্তৃত। এ শাস্ত্রের নাম 'ইলমু আসমাইর রিজাল'। এ শাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ হচ্ছে 'তাকরীবুত তাহযীব'। এতে সাহাবী যুগ থেকে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের হাজারো মনীষীর মধ্য থেকে একটি সংক্ষিপ্ত জামাআতের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে 'মুহাম্মাদ' নামের সাতশ'রও অধিক এবং 'আহমদ' নামের শতাধিক ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। এরা সবাই ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর আলেম এবং তাঁদের অনেকেই হলেন সাহাবী, তাবেয়ী ও উম্মাহর বিশিষ্ট ইমাম।

ইমাম বুখারী (রহ. ১৯৪-২৫৬হি.)এর 'আততারীখুল কাবীর' ইলমু আসমাইর রিজালের মাঝারি মাপের গ্রন্থ, তাতে 'মুহাম্মাদ' নামের আটশত একাত্তরজন ব্যক্তির আলোচনা রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এ কিতাবের ভূমিকায় লেখেন, "এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নাম আমি বিন্যস্ত করেছি বর্ণানুক্রমিকভাবে। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম করে 'মুহাম্মাদ' নামের ব্যক্তিদের আমি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি। কেননা, এ নাম আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম।"

وإنما بدئ بمحمد من حروف أ، ب، ت، ث، لحال النبي صلى الله عليه وسلم لأن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من المحمدين أبتدئ في الألف ثم الباء ...

এটা শুধু ইমাম বুখারী (রহ.)-এরই নীতি নয়, আরো অনেক গ্রন্থকার তাঁদের গ্রন্থ বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করার পরও 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমদ' নামের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করেছেন এবং এ দুই নামকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন।

হিজরী অষ্টম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুয়াররিখ (জীবনীকার) আব্দুল কাদের কুরাশী (৭৭৫ হি.) 'আলজাওয়াহিরুল মুযীআ' গ্রন্থে লেখেন, "সমরকন্দের শহর 'জাকরদীযাহ'য় একটি কবরস্তান আছে, যার নাম 'তুরবাতুল মুহাম্মাদীন'। অর্থাৎ মুহাম্মাদ নামীয় উলামা-ফুকাহার কবরস্তান। এখানে এমন চারশ আলেম-ফকীহ সমাহিত আছেন, যাঁদের প্রত্যেকের নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ। অর্থাৎ তাঁর নামও মুহাম্মাদ, পিতার নামও মুহাম্মাদ।'

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবুল হাসান আলমারগীনানী (৫৯৩ হি.) যাঁর রচিত গ্রন্থ 'আলহিদায়া' সুবিখ্যাত ও সর্বজনসমাদৃত, ইন্তেকালের পর তাঁকে দাফন করার জন্য ওই কবরস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু কবরস্তানের দায়িত্বশীলরা বিনয়ের সাথে বলে দেন যে, 'হযরতের নাম তো মুহাম্মাদ নয়।' পরে নিকটবর্তী একস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মোটকথা, সাহাবা-যুগ থেকে এ নামের সঙ্গে মুসলমানের হৃদয়ের সম্পর্ক এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে ইনশাআল্লাহ। অনেক ভাগ্যবান পিতা তাদের সকল সন্তানের নাম 'মুহাম্মাদ' রেখেছেন। এরপর পার্থক্যের জন্য নামের সঙ্গে আওয়াল (প্রথম) ছানী (দ্বিতীয়) যোগ করেছেন।

পাক-ভারত-বাংলা অঞ্চলের মুসলিমদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম থেকে বরকত হাসিলের দু'টি পন্থা প্রচলিত আছে। সন্তানের নাম মুহাম্মাদ রাখা কিংবা অন্য নাম রাখা হলেও নামের শুরুতে 'মুহাম্মাদ' শিরোধার্য করা। আমাদের এ অঞ্চলে দ্বিতীয় পদ্ধতিই অধিক প্রচলিত।

ইসলামের দুশমনদের এ নামের প্রতি দুশমনী

বর্তমান মুসলিম সমাজে ক্রমবর্ধমান ঈমানী দুর্বলতার কারণে যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের হক আদায় হয় না, তবুও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা নবী মুহাম্মাদ-এর মহব্বত অন্তরে ধারণ করে। এই মহব্বতেরই বহিঃপ্রকাশ যে, তারা বরকতের জন্য নবীয়ে পাকের পবিত্র নাম তাদের নামের সাথে শিরোধার্য করে। যদিও সামান্য, তবুও তা রাসূলের সঙ্গে সম্পর্ক। এ সম্পর্কটুকুও একশ্রেণীর ইসলামবিদ্বেষীর গাত্রদাহের কারণ। এই পাক নামের চর্চা ও প্রচলন তাদের মর্মপীড়া উৎপাদন ক রে; কিন্তু আসমানী ঘোষণা যখন এই ورفعنا لك ذكرك তখন এই বিদ্বেষের আগুনে যে নিজেরাই জ্বলেপুড়ে মরবে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

দু'মাস আগে একটি দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে যে কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল, তা ওই বিদ্বেষ ও অন্তর্জ্বালারই একটি দৃষ্টান্ত। সে সময় চতুর্দিক থেকে এ কাজের কঠোর সমালোচনা হয়েছে এবং সকল শ্রেণীর মানুষ এর প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। ফলে ওই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছে। সে সময় জুমার বয়ানে এবং বিভিন্ন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে যা বলা হয়েছিল তার মধ্যে থেকে কিছু কথা আলকাউসারের পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

১. শরীয়তের দৃষ্টিতে 'শাআয়েরে ইসলামে'র বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল। শাআয়েরে ইসলাম বা ইসলামের নিদর্শনাবলির সম্মান ঈমানের প্রধান দাবিগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে কোনো একটি সম্পর্কেও সামান্য তাচ্ছিল্য ও অসম্মান ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। কেননা, এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, 'শাআয়ের'-এর সম্মান ঈমানের পরিচায়ক আর তার কোন একটির সামান্য অসম্মান ও তাচ্ছিল্য মুনাফিকী ও ইসলামবিদ্বেষের দলীল। শাআয়েরের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

১. কুরআনে কারীম।

২. রাসূলে কারীম।

৩. কালেমায়ে ইসলাম।

৪. ইসলামের ইবাদতসমূহ যথা : নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, দুআ, দরূদ ইত্যাদি।

৫. বিশেষ ফযীলতপূর্ণ স্থানসমূহ যথা : বায়তুল্লাহ, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা, এরপর অন্যান্য মসজিদ।

২. আমলে শিথিলতা অবশ্যই অপরাধ, কিন্তু যদি ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ হয়, 'শাআয়েরে ইসলামে'র সম্মান করে, গোনাহ হয়ে গেলে নিজেকে অপরাধী মনে করে, তবে এই অপরাধ আল্লাহ তাআলা তওবা ছাড়াও মাফ করতে পারেন। গাফলতি ও অলসতার কারণে যদি কোনো ফরয ছুটে যায়, তবুও মানুষ ঈমান থেকে খারিজ হয় না; কিন্তু অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের বিষয়টি অতি মারাত্মক। ফরয আমলের কথা তো বলাই বাহুল্য, কেউ যদি দ্বীনের কোনো মুস্তাহাব আমল, কোনো ছোটখাট বিষয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ছোট সুন্নতের দিকেও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়, সে সম্পর্কে কোন অবজ্ঞাসূচক বাক্য ব্যবহার করে কিংবা অবজ্ঞা প্রকাশক কোনো আচরণ করে, তাহলে এটা সুস্পষ্ট কুফরী। এর দ্বারা প্রমাণ হবে যে, ওই লোকের অন্তরে ঈমান নেই, তার অন্তর দ্বীনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত থেকে একেবারে শূন্য।

আর শাআয়েরে ইসলামের মধ্যে সামান্য কোনো বিষয়ের সাথেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য যে ইরতেদাদ বা ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার কারণ তা সর্বজনবিদিত। 'শাআয়েরে ইসলামে'র মর্যাদাহানী, ইসলামের নবীর সঙ্গে মশকরা, তাঁর নামের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ইসলামের কেন্দ্র বায়তুল্লাহর সঙ্গে বিদ্রূপ, এরপর আবার ইসলামের দাবি!

৩. সে সময় যখন চারদিক থেকে প্রতিবাদ হচ্ছিল তখন একজন সাদাসিধা ভালো মানুষ বললেন যে, কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা এবং বেদ্বীন লোকেরা তো এমন করবেই, তাদের তো আর আমাদের নবীর প্রতি ঈমান নেই!

তাকে বলেছিলাম, বিষয়টি এমন নয়, যেকোনো জাতি বা ধর্মে যে ব্যক্তিত্বগণ সম্মানিত, তাঁদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক বাক্য ব্যবহার না করা সাধারণ মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সকল জাতি, ধর্ম ও মতবাদ– সে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হোক কি নাস্তিক্যবাদী সবার কাছেই বিষয়টি স্বীকৃত। যেকোনো ধর্মের বা গোষ্ঠীর সম্মানিত ব্যক্তিত্বের মান হানী, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য আন্তর্জাতিক আইনেও অপরাধ। এজন্য এই কথা ঠিক নয় যে, বদদ্বীন ও বেদ্বীন লোকেরা তো এমন করবেই! প্রশ্ন হল, কেন করবে? আল্লাহ তাআলার কাছে 'শাআয়েরে ইসলাম' বিশেষত ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলার বিধানে 'মুয়াহিদ' ও 'আহলে যিম্মা'র সাথে (অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম জনগণ, যারা বিশেষ অঙ্গীকারসূত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে বসবাস করে) চুক্তি ও অঙ্গীকার ততক্ষণ পর্যন্তই বহাল থাকে যে পর্যন্ত তারা 'শাআয়েরে ইসলাম' ও নবীয়ে ইসলামের প্রতি কোনোরূপ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে। (আহকামু আহলিয যিম্মা, ইবনুল কাইয়িম; আসসারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল, ইবনে তাইমিয়া)

৪. ওই দৈনিকে যে ক্ষমাপ্রার্থনা সে সময় প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে সর্বশেষ বক্তব্য এখানে সংরক্ষণের জন্য উল্লেখ করে দিচ্ছি–

"আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী
মতিউর রহমান

গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আলপিন'-এ প্রকাশিত একটা অনাকাঙ্ক্ষিত, অগ্রহণযোগ্য কার্টুন-কাহিনী প্রকাশের জন্য আমরা আবারও দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পাশাপাশি বিষয়টিকে ভুল হিসেবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সবার প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

ওই কার্টুন-কাহিনী সংবলিত আলপিনসহ ১৭ সেপ্টেম্বরের পত্রিকা ছাপা হয়ে বাজারে চলে যাওয়ার পর ধরা পড়ে যে, একটা বড় অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল হয়ে গেছে। এ এমন একটা ভুল, যার পক্ষে কোনো যুক্তিই যথেষ্ট নয়। প্রথম আলো সব সময়ই ইসলাম ধর্ম ও ধর্মীয় আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পাঠক ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের আবেগ ও অনুভূতিতে যাতে আঘাত না লাগে, সে ব্যাপারে আমরা সব

সময় সচেতন এবং তা রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে, এত সতর্কতা, এত চেষ্টার ভেতরও কী করে এ রকম একটা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য কার্টুন ছাপা হয়ে গেল? বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আলো ঘটনার কারণ অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত নেয়, নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত যে সহসম্পাদকের বিবেচনায় এই ভুল ধরা পড়েনি, তাকেও অপসারণ করা হবে। প্রথম আলোর পাঠকদের অনেকেই ফোন করে জানিয়েছেন, এই কার্টুনটি তাঁদের আহত করেছে। আমরা তাঁদের সমব্যথী। প্রথম আলোর সম্পাদকীয় নীতির একটি হলো– ভুল যাতে না হয় সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, তারপরও ভুল হয়ে গেলে তা বোঝার বা জানার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনী ছাপানো ও দুঃখ প্রকাশ করা। কারণ যে পত্রিকাটি প্রায় ২৫ লাখ পাঠকের কাছে প্রতিদিন যায়, তাতে একটা ভুল হলে তার নেতিবাচক প্রভাবও হয় ব্যাপক। অনেকে এ জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, অনেকে মানসিকভাবে আহত হতে পারেন।

এই নীতি অনুসরণ করে গত ১৮ সেপ্টেম্বর পত্রিকার মাধ্যমে প্রথম আলো ওই কার্টুন-কাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ওই প্রদায়ক কার্টুনিস্টের আর কোনো লেখা বা কার্টুন পত্রিকায় না ছাপার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সহসম্পাদককে অপসারণের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয় পাঠকদের। প্রথম আলো পর পর দুই দিন সবার কাছে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় এই আবেদন প্রকাশিত হয়। গতকাল ২০ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। অনিচ্ছাকৃত ভুলটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন।"

সরকারও গত বুধবার আলপিনের ১৭ সেপ্টেম্বরের সব কপি বাজেয়াপ্ত করে এবং প্রদায়ক কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এ রকম একটা অনাকাঙ্ক্ষিত কার্টুন প্রকাশিত হওয়ার জন্য আজও প্রথম আলো দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করছে আন্তরিকভাবে। কারণ এই ভুলটি একেবারেই অনিচ্ছাকৃত ও অসাবধানতাবশত। ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুলের পুনারাবৃত্তি না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে এই পত্রিকা। একই সঙ্গে ১৩ জন সম্পাদকের গতকালকের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত।

প্রথম আলো আশা করছে, সবাই বিষয়টা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।"
–প্রথম আলো ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭

৫. কোনো কোনো দৈনিকে উপরোক্ত ক্ষমাপ্রার্থনাকে 'তওবা' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত এটা তওবা নয়, এটা তো দুঃখ প্রকাশ মাত্র। একে যদি 'তওবা' বলা হয় তবে তা হবে একটি রাজনৈতিক তওবা, দ্বীনী ও ঈমানী তওবা এটা নয়। তওবার জন্য অপরিহার্য হল, নতুন করে ঈমান আনা ও কালেমা পড়া, যে কুফরী কাজ করা হয়েছে তা কুফরী কাজ বলে জেনে তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর নামের প্রতি ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও সম্মান প্রদর্শনের ঘোষণা প্রদান করা। এ শর্তগুলো পূরণ হলে দুনিয়ার ইসলামী আদালত বলবে, সে 'তওবা' করেছে। তবে এর দ্বারা রিসালাতের অমর্যাদা ও শাআয়েরে ইসলামের অসম্মানের শাস্তি মওকুফ হবে কি না সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। আর আল্লাহর কাছে তওবা কবুল হওয়ার জন্য এ কাজগুলো অন্তর থেকে হতে হবে। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়। আল্লাহর কাছে সব কিছুই প্রকাশিত। কোনো কিছুই তার কাছে গোপন নয়।

৬. সে সময় কিছু বেদ্বীন ভাবাদর্শ সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, 'এই কার্টুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কিছু বলা হয়নি।'

বলাবাহুল্য যে, একেই বলে চুরি ও সীনাজুরি। যারা এই ঘৃণ্য কাজ করেছে তারা একে মানহানীকর বিষয় বলে স্বীকার করে বার বার দুঃখ প্রকাশ করছে এবং ক্ষমা চাচ্ছে। তাদের পক্ষ থেকে অন্যান্য ক্ষমাপ্রার্থনাকারীরাও একে মানহানীকর বলে স্বীকার করছে অথচ এরা বলছে যে, এটা মানহানীকর নয়। কারো নামকে পশুর জন্য ব্যবহার করা মানহানীকর নয় তো সম্মান প্রদর্শন? স্পষ্ট ভাষায় অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশের চেয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ আরো মারাত্মক। কেননা, এখানে কুফরের সঙ্গে মুনাফিকীও যুক্ত হয়েছে। 'আলকিনায়াতু আবলাগু মিনাস সারীহ' সব ভাষাতেই স্বীকৃত।

মনে রাখা উচিত যে, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ইশারা-ইঙ্গিত এবং স্পষ্ট বক্তব্য সবগুলোর বিধান এক। এটাই সাধারণ নীতি; এরপর শাআয়েরে ইসলাম ও নবীয়ে ইসলামের বিষয় তো আরো সংবেদনশীল।

ইসলাম অবশ্যই উদারতার ধর্ম, কিন্তু তারও আগে ইসলাম স্পষ্টবাদিতা, সত্যবাদিতা এবং আমানতদারীর ধর্ম। শিথিলতা ও মুনাফিকী কোনো ক্রমেই ইসলামে সহনীয় নয়।

দুনিয়াবী বিষয়ে কার্টুন বানিয়ে কৌতুক করার বিধান কী তা আলেমদের কাছে জেনে নেবেন; কিন্তু দ্বীন ও ঈমান, শরীয়ত ও সুন্নাহ এবং শাআয়েরে ইসলামের

মতো সংবেদনশীল বিষয়কে কৌতুকের বিষয় বানানোর দ্বারা যে এদের মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য বিনষ্ট করা হয় এবং তুচ্ছ বিষয়ে পর্যবসিত করা হয় তা খুব সামান্য চিন্তাতেই বোঝা যায়।

'কৌতুক'-এর মূল কথাই হল হাস্যরস। আর ঈমান ও ঈমানিয়াত, ইসলাম ও ইসলামিয়াত বিশেষত শাআয়েরে ইসলামের বিষয়গুলো হচ্ছে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয়। এগুলোকে যারা হাস্যরসের বিষয়-বস্তুতে পরিণত করে আল্লাহর কাছে তারা অবিশ্বাসী হিসাবে পরিগণিত। ঈমান থেকে খারিজ হওয়ার জন্য সংকল্প করে কুফরী কাজ করতে হয় না; বরং কথা বা আচার-আচরণের কুফরও অনেক সময় অধিক মারাত্মক হিসাবে পরিগণিত হয়।

৭. এ প্রসঙ্গে মুসলমানের করণীয় কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—

১. সরকারের কর্তব্য হল, আলোচিত পত্রিকা এবং এ ধরনের আরো যেসব পত্র-পত্রিকা ইসলাম-বিদ্বেষ ও মুসলিম-বিদ্বেষের মানসিকতা নিয়ে কাজ করে, সবগুলোর প্রকাশনা বন্ধ করা এবং ডিক্লারেশন বাতিল করা। দেশ ও জাতির দুশমনদেরকে দুশমনী চরিতার্থ করার কোনো সুযোগই না দেওয়া।

২. সরকারের আরো কর্তব্য হচ্ছে, 'শাআয়েরে ইসলাম' সম্পর্কে পরিষ্কার আইন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। আর তা ওই আইনই হতে হবে যা ইসলামের আইন। যে বিষয়গুলো 'ইরতিদাদে'র কারণ, সেগুলোর শাস্তিবিধানের আইন এবং শক্ত হাতে তা বাস্তবায়িত হওয়া মুসলিম জনপদে বসবাসকারী মুসলিমদের একটি সামান্য অধিকার। এই অধিকার পূরণ করা সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৩. মুসলিম জনগণের করণীয় হল, যৌক্তিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকারকে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করা এবং এই দ্বীনী অধিকার সরকারের কাছ থেকে আদায় করা।

৪. মুসলমানদের জন্য সবসময়ের, বিশেষত এ সময়ের করণীয় হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য, গুণ ও মাহাত্ম্য অধিক পরিমাণে চর্চা করা, তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও অতুলনীয় শিক্ষা প্রচার-প্রসার করা, তাঁর সুন্নত ও আদর্শকে নিজের মধ্যে ও পরিবারের সবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এহ্ইয়ায়ে সুন্নত ও মহব্বতে রাসূলের পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত থাকবে সেখানে কোনো বেদ্বীন প্রকাশ্যে 'শাআয়েরে ইসলাম' ও নবীয়ে ইসলামের অবজ্ঞা করতে অবশ্যই একাধিকবার চিন্তা করবে।

৫. সকল ইসলাম-বিদ্বেষী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং

তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সবধরনের সহযোগিতা পরিত্যাগ করা।

৬. ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের সঠিক ইলম হাসিল করে সে অনুযায়ী নিজের বিশ্বাস দুরস্ত করা এবং তার উপর অবিচল থাকা।

৭. 'শাআয়েরে ইসলাম সম্পর্কিত শরয়ী বিধানের ইলম হাসিল করা এবং সেগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শাআয়েরে ইসলাম ও নবীয়ে ইসলামের মাহাত্ম্য অনুধাবন করার তাওফীক দিন এবং নবী-আদর্শকে জীবনের সকল অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করার তাওফীক দিন। আমীন

শনিবার

১২/১১/১৪২৮ হি.=২৪/১১/২০০৭

[ডিসেম্বর '০৭ঈ.]

দুআ : হাকীকত ও ফযীলত

বর্তমান বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার যুগে আমাদের চিন্তা-চেতনা থেকে দুআ ও যিকিরের গুরুত্ব ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে এবং এ বিষয়ে উদাসীনতা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। এখন এর গুরুত্ব প্রকাশ পায় বিশেষ বিশেষ সময়ে দুআর আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমে আর কোন কোন মহলে তো এই উদাসীনতা উন্নাসিকতার পর্যায়ে পৌছেছে। তারা নিজেরা এই গুরুত্বপূর্ণ আমলের প্রতি যত্নবান হওয়ার পরিবর্তে যারা এ ব্যাপারে যত্নবান তাদেরকে উপহাসের দৃষ্টিতে দেখে।

আরেক বিপদ এই যে, দ্বীনদার শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দুআ ও যিকিরের ব্যাপারে যত্নবান নন। তাঁরা সাধারণত দুআ করেন অন্য লোকের অনুরোধে। তাও এমন লোকদের অনুরোধে যারা এর সাথে সম্পৃক্ত লোকদের তাচ্ছিল্যের পাত্র মনে করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এবং পুরো মুসলিম উম্মাহকে দুআ ও যিকিরের গুরুত্ব অনুধাবন করার এবং আদব ও শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ আমলের প্রতি যত্নবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। সাথে সাথে এ বিষয়ে সব ধরনের ভুল-ভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন!

দুআর গুরুত্ব ও ফযীলত

দুআর স্বরূপ ও সুফল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

দুআ কী

দুআ হচ্ছে (ক) আল্লাহ তাআলার ইবাদত। হাদীস শরীফে দুআকে ইবাদতের সারাংশ বলা হয়েছে।

(খ) দুআ হচ্ছে 'ইনাবাত ইলাল্লাহ' অর্থাৎ প্রতাপশালী স্রষ্টার দরবারে অক্ষম সৃষ্টির সবিনয় প্রত্যাবর্তন এবং এমন সত্তার প্রতি মনোনিবেশ যিনি পরম করুণাময় অতীব দয়ালু। যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা, মহানদাতা, যিনি শক্তি ও প্রজ্ঞার আধার এবং ধৈর্য ও ক্ষমার উৎস।

(গ) দুআ হচ্ছে পরম দয়ালু আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা, যিনি প্রার্থনা করলে এবং বার বার প্রার্থনা করলে খুশি হন এবং প্রার্থনা না করলে অসন্তুষ্ট হন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّهُ مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে না আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৭৩

(ঘ) দুআ হল তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ বা আল্লাহ-নির্ভরতার অপর নাম। দুআর মাধ্যমে তাওহীদী চেতনার প্রকাশ ঘটে। কেননা তা প্রমাণ করে যে, এই বান্দা 'বস্তু'কে খোদার মর্যাদা দেয় না। 'বস্তু' তার নিছক উপকরণ মাত্র। সকল লাভ-ক্ষতি, উপকার ও অপকারের সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তার বিশ্বাস এই যে–

لَوْ أَنَّ الْخَلْقَ اجْتَمَعُوْا لِيَنْفَعُوْكَ لَا يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوْا عَلٰى أَنْ يَضُرُّوْكَ لَا يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. جَفَّتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ.

"যদি সকল সৃষ্টি তোমার কল্যাণ সাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় তবুও তারা এতটুকু কল্যাণই করতে সক্ষম হবে যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করেছেন। তেমনি সকল সৃষ্টি তোমার ক্ষতি সাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হলেও তারা এতটুকু ক্ষতিই করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। 'লিখা শুকিয়ে গেছে এবং কলম উঠিয়ে ফেলা হয়েছে।' (এটি একটি আরবী প্রবাদ, যার অর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে এবং এতে কোন রদবদলের সুযোগ নেই।)

তার বিশ্বাস এই যে– اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا.

"ইয়া আল্লাহ! শুধু তাই সুগম হয় যা তুমি সুগম কর এবং তুমি যখন চাও দুর্গমকে সুগম করে দাও।" অর্থাৎ সকল কঠিন সহজ হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলারই শরণাপন্ন হয় তার নিকট উপায়-উপকরণ থাক বা না থাক এবং তার প্রয়োজন ছোট হোক বা বড়।

(ঙ) বাস্তবিক পক্ষে দুআ হচ্ছে তাওহীদে বিশ্বাসের অপরিহার্য ফলাফল। দুআ সর্বাবস্থায় এই বিশ্বাসের বাহক যে–

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ.

"আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত (যথা বৃষ্টি, শস্য ইত্যাদি; তেমনি রাসূল প্রেরণ, কিতাব প্রেরণ ইত্যাদি) উন্মুক্ত করেন কেউ তা আবদ্ধ করতে পারে না এবং যা তিনি বন্ধ করেন কেউ তা উন্মুক্ত করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নেয়ামতরাজিকে স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি, যে তোমাদেরকে আকাশ ও ভূমি থেকে রিযিক প্রদান করে? তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা (তাঁর তাওহীদ পরিত্যাগ করে) কোনদিকে ফিরে যাচ্ছ?" –সূরা ফাতির ২-৩

বস্তুত দুআ এই বিশ্বাসের বাহ্যিক প্রকাশ যে–

اَلَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ وَالَّذِيْۤ اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَلِيْ خَطِيْۤـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

"(আমার পালনকর্তা তিনি) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর আমাকে পথ দেখান এবং একমাত্র যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন। যখন আমি অসুস্থ হই তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন। যিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন এবং আমি যার ব্যাপারে এই আশায় বুক বেঁধে আছি যে, প্রতিদান দিবসে তিনি আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন।" –সূরা শুআরা ৭৮-৮২

দুআর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আদেশের অনুগত হয়–

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَّلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ. وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ، وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ. يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"তুমি অটল অবিচল থাক দ্বীনের উপর এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডেকো না যা তোমার উপকার বা অপকার কোনটাই করতে পারে না। যদি তুমি এমন কাজে লিপ্ত হও তবে নিঃসন্দেহে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অকল্যাণ তোমাকে স্পর্শ করে তবে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না আর তিনি যদি তোমার ব্যাপারে কোন কল্যাণের ইচ্ছা করেন তবে কেউ রহিত করতে পারে না তাঁর অনুগ্রহকে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকে দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল নেহায়েত মেহেরবান।" –সূরা ইউনুস ১০৫-১০৭

মুনাজাতকারী প্রিয় নবীর নিম্নোক্ত আদেশের অনুগত হয়–

وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ

"যখন তুমি চাইবে আল্লাহর কাছেই চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর।"

(চ) দুআ হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন। এর মাধ্যমে রাব্বুল আলামীনের সাথে বান্দার সেতুবন্ধন রচিত হয় এবং তাঁর সাথে একান্ত আলাপের তৃপ্তি ও মর্যাদা লাভ হয়। দুআ যদি কবুল হয় তবে তো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। আর যদি বাহ্যিকভাবে কবুল নাও হয়, তবুও দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা এতে আল্লাহর সাথে পুনরায় একান্ত আলাপের সুযোগ সৃষ্টি হল। সুতরাং দুআ সর্বাবস্থায়ই সফল।

(ছ) ইস্তিগ্না অর্থাৎ সৃষ্টির মুখাপেক্ষিতা পরিত্যাগ করে স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হওয়া।

আল্লাহ তাআলা চান যে, বান্দা তার সকল প্রয়োজন তাঁর দরবারে পেশ করুক এবং সৃষ্টির করুণাকামী না হয়ে একমাত্র স্রষ্টার করুণা প্রার্থনা করুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

وَاسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ يُغْنِكَ اللّٰهُ

"তুমি মানুষের মুখাপেক্ষিতা বর্জন কর, আল্লাহ তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন।"

এই চেতনার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় সেই বুযুর্গের ঘটনায়, যাকে এক লোক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট সুপারিশ করার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তখন উত্তরে বলেন–

يَا أَخِيْ! قُمْ نُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَنَسْأَلِ اللّٰهَ تَعَالٰى فَإِنِّيْ لَا أَتْرُكُ بَابًا مَفْتُوْحًا وَّأَقْصِدُ بَابًا مُّغْلَقًا.

"এসো ভাই, আমরা দুই রাকাআত নামায পড়ি। এরপর আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি। কেননা আমি খোলা দরজা ছেড়ে কখনো বন্ধ দরজায় হাত পাততে যাব না।" –যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা ১/২২৪; রিসালাতুল মুসতারশিদীন (টীকা) ৮২

শায়খ আব্দুস সামাদ ইবনে ইবরাহীম আলফিহরী বলেন, "জনৈক ব্যক্তি প্রয়োজনে কোনো একজন আমীরের নিকট এলো। এসে দেখে আমীর সেজদাবনত হয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করছেন। এ দৃশ্য দেখে তার বোধোদয় হল। সে তখন বলল, আমীর নিজেই যখন অন্যের মুখাপেক্ষী তখন আমি কেন তাঁর মুখাপেক্ষী হতে যাব? আমি কেন আমার প্রয়োজন ওই সত্তার দরবারে উপস্থিত করছি না, যাঁর নিকট অসংখ্য প্রার্থনাও একাকার হয়ে যায় না? তার এই কথা আমীরের শ্রুতিগোচর হল। তিনি দুআ ও সেজদা থেকে ফারেগ হওয়ার পর লোকটিকে তার সামনে উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে দশ হাজারের একটি থলে দান করলেন এবং বললেন, নাও! এটা সেই সত্তার পক্ষ থেকেই তোমাকে দেওয়া হচ্ছে যাঁর দরবারে আমি এতক্ষণ সেজদাবনত ছিলাম এবং যাঁর দিকে তুমি প্রত্যাবর্তন করেছিলে।" –আল্লুকাত ফী হিকায়াতিস সালেহীন ৫০৮–হাশিয়াতু রিসালাতুল মুস্তারশিদীন ৮২ (টীকা)

(জ) দুআ আল্লাহর স্মরণের একটি উত্তম উপায়, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক মজবুত হতে থাকে এবং অন্তরে আল্লাহ তাআলার করুণা ও রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। আর যেহেতু 'উবূদিয়্যাত' বা আল্লাহর সামনে বান্দার দাসত্বের প্রকাশ আল্লাহ তাআলার নিকট অতি পছন্দনীয় এজন্য দুআর ব্যাপারে যত্নবান ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়।

(ঝ) দুআ পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং তাঁর

বিশেষতম বৈশিষ্ট্য। এজন্য ইত্তিবায়ে সুন্নত বা সুন্নতের অনুসরণের দৃষ্টিকোণ থেকেও দুআর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া কাম্য এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

(ঞ) দুআ মুমিনের জন্য দুর্গ। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাকে দেওয়া এমন একটি সহজ আমল, যার দ্বারা সকল কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং সকল অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা পাওয়া যায়। দুআর মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কাম্য বস্তু আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে মঞ্জুর করাতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল উপস্থিত বা সম্ভাব্য বিপদ-আপদ ফেতনা-ফাসাদ ও সব ধরনের অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

(ট) দুআ এমন একটি আমল যদি এর মৌলিক শর্তাবলি পালন করে সম্পাদন করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা কবুল হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যখন কোন মুসলিম দুআ করে যাতে কোন পাপের কথা বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা নেই, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে এই দুআর বিনিময়ে তিনটি বিষয়ের কোন একটি দান করেন– হয়ত তাঁর প্রার্থিত বস্তু দান করেন অথবা আখেরাতে এর বিনিময় দেওয়ার জন্য সঞ্চিত রাখেন অথবা ওই দুআর সমপরিমাণ কোন অকল্যাণ হটিয়ে দেন।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তবে তো আমরা খুব বেশি বেশি দুআ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, আল্লাহর দানও অসীম।" (ইমাম আহমদ, আবু ইয়ালা হাদীসটি জায়্যেদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।) –আততারগীব ওয়াত-তারহীব ২/৪৭৮

(ঠ) দুআ একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ছাড়াও একটি বিশেষ ফায়েদা এই যে, প্রত্যেক দুআর বিনিময়ে আলাদা সওয়াব পাওয়া যায়। এ ছাড়া ইবাদতের অন্যান্য উপকারিতা তো আছেই।

দুআর কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে যার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দুআ করলে দুআয় প্রাণ সঞ্চার হয় এবং তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় এবং দুআর দ্বারা পূর্ণ সুফল লাভ হয়। আগামী সংখ্যায় ইনশাআল্লাহ দুআর শর্তাবলি ও আদবসমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোকপাত করার চেষ্টা করব। #

[জানুয়ারি '০৬ঈ.]

দুআর কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ও আদব

দুআ ও মুনাজাত ইবাদত হওয়ার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যথা :

১. মুনাজাতকারীর পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান হালাল হওয়া।

২. প্রার্থিত বিষয় নাজায়েয না হওয়া।

৩. বাহ্যিকভাবে দুআ কবুল হতে বিলম্ব হলে ধৈর্যহারা না হওয়া এবং এই অভিযোগ না করা যে, আমি দুআ করেছিলাম, কিন্তু কবুল হয়নি।

৪. দুআ কবুল হওয়ার আরেকটি শর্ত হল মুসলিম উম্মাহর মাঝে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' বিদ্যমান থাকা। কেননা ব্যাপকভাবে এই আমল বন্ধ হয়ে গেলে দুআ কবুলের প্রতিশ্রুতি বলবৎ থাকে না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তাআলা তোমাদের বলেছেন, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর। এমন সময় যেন না এসে যায় যে, তোমরা দুআ করবে, কিন্তু তা কবুল হবে না। তোমরা চাইবে কিন্তু তা দেওয়া হবে না। তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা কবুল হবে না।" –সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৯০

দুআর বেশ কিছু আদব রয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব উল্লেখ করা হল–

১. দুআর আগে কোন নেক আমল করা।

২. অজুর সাথে দুআ করা।

৩. আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও কাতরতার সাথে দুআ করা।

৪. কিবলামুখী হয়ে দুআ করা।

৫. দুআর শুরুতে ও শেষে আল্লাহ তাআলার হামদ করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা।

৬. আল্লাহ তাআলার 'ইসমে আযম' ও অন্যান্য 'আসমায়ে হুসনা' দ্বারা সম্বোধন করে দুআ করা।

৭. হাত উঠিয়ে দুআ করা এবং দুআর শেষে চেহারায় হাত মোছা।

৮. পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সকল মুসলমানকে দুআয় শামিল করা।

৯. শুধু বিপদাপদের সময় দুআর আশ্রয় না নিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ও দুআয় অভ্যস্ত হওয়া। হাদীস শরীফে আছে, "যে ব্যক্তি চায় যে বিপদাপদের সময় তার দুআ কবুল হোক সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ও দুআয় অভ্যস্ত থাকে।" –জামে তিরমিযী ৫/৪৩১, হাদীস ৩৩৮২

দুআর ব্যাপারে কিছু ভ্রান্তি

দুআর ব্যাপারে আমাদের সমাজে অনেক ধরনের ভুল ধারণা ও বাতিল রেওয়াজ প্রচলিত আছে, যা সংশোধন করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য সর্বপ্রথম দুআর শরয়ী নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। নিম্নে এসংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

দুআকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা :

১. 'দুআউল মাসআলা' কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট যে দুআ করা হয় তাকে দুআউল মাসআলা বলে।

২. বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় পাঠযোগ্য কুরআন ও হাদীসের দুআসমূহ।

৩. কুরআন হাদীসের সাধারণ দুআ যা কোন সময় বা অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট নয়। উল্লেখ্য, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহকে 'আদ্‌য়িয়ায়ে মাসূরা' বলা হয়।

প্রথম প্রকার

এ ধরনের দুআ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। দুআর আদব ও শর্তাবলির প্রতি লক্ষ রেখে যে কোন ভাষায় এই দুআ করা যায়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ.

"তোমাদের প্রত্যেকে সকল প্রয়োজন তার রবের নিকট প্রার্থনা করবে। এমনকি লবন বা জুতোর ফিতা পর্যন্ত।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৮৪৭

যেহেতু মানুষের সকল প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই পূরণ হয়ে থাকে এজন্য আল্লাহ-বিশ্বাসী বান্দার জন্য সকল প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলার প্রতি ধাবিত হওয়া উচিত। এতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের ভুল এই যে-

প্রথমত আমরা প্রয়োজনের মুহূর্তে শুধু উপায়-উপকরণের কথা চিন্তা করি। এসব উপকরণের সৃষ্টিকর্তা এবং তাতে গুণাগুণ দানকারী মহান সত্তার প্রতি মনোনিবেশ করি না। এটি যুক্তির বিচারেও অন্যায় এবং বিবেকের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত গর্হিত। (আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন) সকল প্রয়োজনে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা উচিত। এরপর তাঁরই নির্দেশিত পন্থায় তাঁর দেওয়া উপায়-উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। এটি হচ্ছে ইসলামের অনুপম শিক্ষা।

দ্বিতীয়ত বড় কোন বিপদাপদ উপস্থিত হলে আমরা দুআর আশ্রয় নেই। সেক্ষেত্রেও নিজেরা দুআ না করে অন্যদের দিয়ে দুআ করাই। কোন বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট দুআ চাওয়া নিষেধ নয়; বরং তা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের রীতি হল নিজে দুআর বিষয়ে যত্নবান না হয়ে শুধু অন্যের কাছে দুআ চাওয়া। অথচ কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা হচ্ছে, মানুষ তার সকল প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করবে। সকল বিপদাপদে তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তাঁর নিকটে সাহায্য চাইবে। এজন্য প্রত্যেক মুমিনের ব্যক্তিগতভাবে দুআর বিষয়ে যত্নবান হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

দ্বিতীয় প্রকার

বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় পাঠযোগ্য যেসব দুআ হাদীস শরীফে এসেছে যেমন সকাল-সন্ধ্যার দুআ, ঘুমানোর সময়ের এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দুআ, আহারের আগের ও পরের দুআ ইত্যাদি-এসব দুআর বিধান হল তা নির্দিষ্ট সময়ে শরীয়তের নির্ধারিত শব্দেই পাঠ করতে হবে। এ ধরনের দুআ হিসনে হাসীন, মুনাজাতে মকবুল-এর পরিশিষ্ট এবং অন্যান্য কিতাবে সংকলিত হয়েছে।

এ জাতীয় দুআসমূহ ওযীফা আকারে একসাথে পড়ার জন্য নয়; বরং হাদীস শরীফে যে দুআ যে সময় বা যে অবস্থায় পড়ার নির্দেশ আছে সে সময় বা সে অবস্থায়ই দুআটি পড়তে হবে, তাহলেই এর উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

সমাজে একটি ভুল প্রচলন রয়েছে যে, মানুষ এ জাতীয় দুআও ওযীফার মত

পাঠ করে থাকে। যেমন হিসনে হাসীন কিতাবটি দৈনিক এক মঞ্জিল করে পড়ার রেওয়াজ আছে। অথচ এটি (পঞ্চম পরিচ্ছেদ ছাড়া) কোন ওযীফার কিতাব নয়। বরং বিভিন্ন অবস্থায় পাঠযোগ্য কুরআন হাদীসের দুআসমূহই তাতে সংকলিত হয়েছে। তাই সঠিক পদ্ধতি হল, এতে উল্লিখিত দুআসমূহ মুখস্থ করে নির্ধারিত সময়ে আন্তরিকতার সাথে পাঠ করা। যাতে দুনিয়ার শত ব্যস্ততার মাঝেও সদাসর্বদা আল্লাহ তাআলার স্মরণ অন্তরে জাগরুক থাকে। এটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ। হাদীস শরীফে আছে–

كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْ كُلِّ أَحْيَانِهِ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকির (স্মরণ) করতেন।'

তৃতীয় প্রকার

কুরআন হাদীসে যেসব ব্যাপক অর্থবহ দুআ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর বিধান এই যে, এসব দুআ যে কোন সময় করা যায়। তবে শুধু উচ্চারণ নয়, দুআর অর্থ ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করে সচেতনভাবে পাঠ করা উচিত।

এ ধরনের দুআ 'হিসনে হাসীন'এর পঞ্চম পরিচ্ছেদ, আলহিযবুল আযম, মুনাজাতে মকবুল ইত্যাদি কিতাবে সংকলিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দুনিয়া বা আখেরাতের ব্যাপক কল্যাণ লাভের দুআ করার সময় যথাসম্ভব দুআর শব্দ নিজ থেকে না বানিয়ে কুরআন হাদীসের বর্ণিত শব্দে দুআ করা উচিত। থানভী (রহ.) বলেন, "এটি বিভিন্ন কারণে উত্তম। যথা–

* শাসক যখন নিজেই আবেদনের বিষয়বস্তু বলে দেন তখন তা মঞ্জুর হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তেমনি যেসব দুআ আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন সেসব দুআ আল্লাহ তাআলার নিকট অধিকতর গ্রহণীয়।

* এসব দুআয় মানুষের দুনিয়া আখেরাতের প্রয়োজনসমূহ এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে, আমরা কেয়ামত পর্যন্ত চিন্তা করলেও এত ব্যাপক অর্থবহ দুআ তৈরি করতে সক্ষম হতাম না।

* স্বরচিত দুআয় অনেক সময় অকল্যাণমূলকও প্রার্থনা এসে যায়, যা পরবর্তী সময়ে বিপদের কারণ হয়। যেমন এক ব্যক্তি দুআ করছিলেন, ইয়া আল্লাহ, আখেরাতে যত আযাব হওয়ার তা যেন দুনিয়াতেই হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ জাতীয় দুআ করতে নিষেধ করেন।" –মুনাজাতে মকবুল ৭৭-৭৮

কুরআন হাদীসে বর্ণিত নয় এমন দুআয় শরীয়তের অকাম্য বা অসুবিধাজনক কোন কিছু না থাকলে সেসব দুআও জায়েয আছে। তবে এ জাতীয় দুআসমূহকে আদ্য়িয়ায়ে মাসূরা তথা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহের উপর প্রাধান্য দেওয়া কিংবা আদ্য়িয়ায়ে মাসূরা ছেড়ে তাতে মশগুল হওয়া কিছুতেই ঠিক নয়। যেমন হিযবুল বাহার একটি সুন্দর দুআ। এর অধিকাংশ বাক্যাবলি কুরআন হাদীসে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান থাকলেও পূর্ণ দুআ এভাবে বর্ণিত নেই।

হযরত থানভী (রহ.)এর অনুমতিক্রমে 'হিযবুল বাহার' মুনাজাতে মকবুলের শেষে সংযোজিত হয়েছে; কিন্তু সেখানে এই নির্দেশনাও রয়েছে যে, "নিঃসন্দেহে এটি একটি বরকতপূর্ণ দুআ তবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহের মর্যাদা ও প্রভাব এর চেয়ে অনেক বেশি।" –মুনাজাতে মকবুল ২০৮

এরপর থানভী (রহ.) হিযবুল বাহারের ব্যাপারে মানুষের বাড়াবাড়ি লক্ষ করে বলেন, "সাধারণভাবে মানুষের অন্তরে হিযবুল বাহার সম্পর্কে এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস রয়েছে যা আদ্য়িয়ায়ে মাসূরার ব্যাপারেও নেই। এর অযীফা বন্ধ রাখা উচিত। –কামালাতে আশরাফিয়া ৪১

তবে আদ্য়িয়ায়ে মাসূরার প্রতি যত্নবান থেকে এবং এর ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি স্মরণ রেখে উপরোক্ত দুআ পাঠ করায় কোন অসুবিধা নেই।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, আমাদের সমাজে বিভিন্ন নেক আমল বা বুযুর্গ ব্যক্তিদের ওসীলা দিয়ে দুআ করার প্রচলন আছে। যিনি দুআ করছেন তার ব্যক্তিগত নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দুআ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, দুআর আগে কিছু নেক আমল করে নেওয়া দুআর আদবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে আল্লাহর দরবারে দুআ কবুলের সম্ভাবনা শক্তিশালী হয়। আর কোন ব্যক্তির ওসীলা দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি হল– এরূপ বলা যে, "হে আল্লাহ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় বা সাহাবীগণের ওসীলায় বা অমুক বুযুর্গের ওসীলায় দুআ করছি।" নিয়ত এই থাকবে যে, আমার জানা মতে তিনি (সেই বুযুর্গ) আপনার প্রিয় পাত্র এবং তাঁর সাথে আমার মুহাব্বত রয়েছে, এই মুহাব্বতের বদৌলতে দুআটি কবুল করে নেওয়ার দরখাস্ত করছি। –তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম ৫/৬২৯; ফাতাওয়া শামী ৬/৩৯৭

অনেকে এরূপ বলে থাকেন যে, হে আল্লাহ! অমুকের হকের দাবিতে বা অমুকের মর্যাদার ওসীলায় আমার দুআ কবুল করুন। এ ধরনের ওসীলা উল্লেখ করা কোন কোন বুযুর্গ থেকে বর্ণিত থাকলেও ফুকাহায়ে কেরাম তা মাকরূহ বলেছেন। তাই এ জাতীয় ওসীলা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। –ফাতাওয়া শামী ৬/৩৯৭; ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানভী ১/৫১#

[ফেব্রুয়ারি '০৬ঈ.]

বালা ও মুসীবত : সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা

দুনিয়াতে মানুষের জীবন এক অবস্থায় থাকে না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি সত্য জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও। এ জীবনে যেমন সুখের পর দুঃখ, সুস্থতার পর অসুস্থতা আসে, তেমনি দুঃখের পরে সুখ এবং অসুস্থতার পরে সুস্থতা আসে; সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতা আসে। তেমনি অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতাও আসে। পরিবর্তনের এই চলমান ধারাই হল পার্থিব জীবন।

আল্লাহ তাআলা মানুষের এই জীবনকে এরূপ পরিবর্তনশীল বানিয়েছেন এবং পেছনে রয়েছে অনেক তাৎপর্য ও হেকমত, যার সম্যক জ্ঞানও তাঁর নিকটেই রয়েছে। তবে আল্লাহ যাদেরকে চিন্তাশক্তি দান করেছেন তারা কিছু কিছু হেকমত অনুধাবনও করে থাকেন।

বাহ্যত মুমিন যে অবস্থার মুখোমুখিই হোক, সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। এটা মুমিনের সৌভাগ্য, তবে বিদ্যমান অবস্থায় আল্লাহর কী হুকুম, সে সম্পর্কে অবগত থাকা এবং তাঁর অনুগত থাকা।

কখনো কোন বড় ধরনের মুসীবত এসে পড়লে বা কোন দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি হলে তা কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে এবং কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে–এসব বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে কখনো কখনো আমরা ভুলত্রুটির শিকার হয়ে যাই। এমন বেফাঁস মন্তব্যও মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, যা একেবারেই অসমীচীন। তেমনি করণীয় সম্পর্কে গাফেল হয়ে অকরণীয় কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যাই। এজন্য বিভিন্ন আসমানী মুসীবতে এবং সাধারণ বিপদাপদে চিন্তা ও কর্মের গতি কোন পথে চালিত হবে সে সম্পর্কে অবগতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন, তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা রয়েছে। বর্তমান আলোচনায় শুধু কয়েকটি বিষয় স্পর্শ করতে চাই। আশা করি,

এতেও আল্লাহ তাআলা কিছু না কিছু উপকার আমাদের দান করবেন।

১. বিভিন্ন আসমানী মুসীবত যথা বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির কিছু পরিবেশগত কার্যকারণ আছে, যা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ণিত। এ কারণগুলো যদি শুধু ধারণা ও অনুমানভিত্তিক না হয়ে সঠিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নির্ণিত হয়, তাহলে তা মেনে নিতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মনে রাখতে হবে যে, এসব বাহ্যিক ও পরিবেশগত কার্যকারণের পশ্চাতে এমন কিছু কার্যকারণ রয়েছে, যা বিজ্ঞানের বস্তুনির্ভর সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ-দৃষ্টির আওতা-বহির্ভূত। শুধু 'ওহী'র মাধ্যমে তা জানা যায়। এরূপ কিছু কার্যকারণ আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন ওহীর মাধ্যমে। এই ওহীভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেই একজন মুমিন এ ধরনের আসমানী মুসীবতগুলোকে বিশ্লেষণ করেন। বস্তুগত কার্যকারণকে তারা স্থান দেন দ্বিতীয় পর্যায়ে।

২. এসব দুর্যোগ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল, এগুলো অবশ্যই আযাব ও গযব, যা ব্যাপক পাপাচারের শাস্তি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সে অবশ্যই এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর দিকে রুজু করে, সবর করে এবং তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে সংশোধিত হওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু ঈমানী দুর্বলতার কারণে কারো কারো মনে বিভিন্ন প্রশ্নেরও উদ্রেক হয় এবং আল্লাহ মাফ করুন, কখনো কখনো তা মুখেও উচ্চারিত হয়। যেমন, যদি এটা গোনাহ ও অপরাধের শাস্তিই হয়ে থাকে তাহলে সবচেয়ে বড় অপরাধী আমেরিকা, বৃটেন, ইসরাইল, ওদের ওখানে আযাব আসে না কেন? এরপর এই ভূখণ্ডেই যদি আযাব আসার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে এ ভূখণ্ডেরই অন্যান্য অংশেও তো পাপাচার হয়ে থাকে। সে অংশগুলো কেন ক্ষতিগ্রস্ত হল না? আর দুর্যোগগ্রস্ত এলাকায় সবাই কি পাপী-গোনাহগার? ওখানেও তো মসজিদ আছে, মাদরাসা আছে, নিষ্পাপ শিশু ও নেককার মানুষ আছে? তাদের অপরাধ কী? তাহলে কি বড়লোকের পাপের সাজা গরীব-দুঃখীকে ভুগতে হচ্ছে?

তেমনি কারো মনে এই ওয়াসওয়াসাও সৃষ্টি হতে পারে যে, এগুলো যখন আযাব-গযব তাহলে আমাদের বোধ হয় দুর্যোগগ্রস্ত স্থানে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, আযাব-গযবের স্থান থেকে দূরে থাকাই হল হাদীস শরীফের নির্দেশনা।

এগুলো ভুল চিন্তা এবং এক ধরনের অবাধ্য মানসিকতা থেকে সৃষ্ট ওয়াসওয়াসা। এ অবাধ্য ও ভ্রান্ত চিন্তা দূর হওয়ার জন্য খাঁটি মনে আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা করা এবং 'লা-হাওলা' পড়ে এই দুআ করা কর্তব্য যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে বিশুদ্ধ ঈমান দান করুন। আপনার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার

তাওফীক দান করুন। শোকরের সময় শোকর আর সবরের সময় সবর করার তাওফীক নসীব করুন। এরপর নিম্নোক্ত কথাগুলো স্মৃতিতে বসিয়ে নেওয়া উচিত।

ক. আসমানী মুসীবত সর্বদা আযাবরূপে আসে না। কখনো পরীক্ষার জন্যও আসে। সূরা আরাফে (আয়াত ১৬৮) তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি সুঅবস্থা ও দুরবস্থা দ্বারা, যাতে তারা ফিরে আসে।"

আবার কখনো আযাব হিসাবে আসে। সূরা রূমের ৪১ নম্বর আয়াতে এবং সূরা শূরার ৩০ নম্বর আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে।

এজন্য যেকোন দুর্যোগ ও বিপদ-আপদকে নিশ্চিতভাবে আযাব-গযব বলে আখ্যায়িত করা উচিত নয়। কেননা, তা যেমন আযাব হতে পারে, তেমনি পরীক্ষাও হতে পারে।

খ. কোথাও কোন বিপদ-আপদ যদি আযাব হিসাবেও আসে তবুও অপরিহার্য নয় যে, এটা শুধু ওই সব লোকের গোনাহর কারণে এসেছে যারা এ বিপদে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত; বরং ভূপৃষ্ঠে সংঘটিত সকল গোনাহই এর কার্যকারণ হিসাবে গণ্য। তবে যেহেতু কেয়ামতের আগে সকল জনপদ এক সাথে ধ্বংস করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় নয়, (আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর বরকত) তাই বালা-মুসীবত একেক সময় একেক স্থানে আপতিত হয়। অতএব মুসীবত যেখানেই আসুক ভাবতে হবে যে, এর পেছনে আমার গোনাহও দায়ী রয়েছে। অতএব গোনাহ পরিহার করা আমার কর্তব্য।

গ. যে মুসীবত আযাব হিসাবে এসেছে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত সবার জন্যই তা আযাব– এটা অপরিহার্য নয়; বরং এ মুসীবতই আল্লাহ তাআলা কারো জন্য রহমত বানিয়ে থাকেন। আল্লাহর নেককার বান্দা, যারা এ মুসীবতে মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা শহীদের সওয়াব লাভ করবেন, আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বুলন্দ করবেন।

ঘ. যে বিপদ আযাব হিসাবে আসে তার সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলার নীতি এই যে, তাতে শুধু অপরাধীরাই আক্রান্ত হয় না, সবাই আক্রান্ত হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেছেন–

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً

"ওই ফেতনা ও মুসীবত সম্পর্কে সতর্ক হও, যা এসে গেলে শুধু অপরাধীদের উপরই আসবে না, সবার উপর আসবে।" –সূরা আনফাল ২৫

এজন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আগে স্মরণ করা উচিত যে, আমি এ গোনাহর মাধ্যমে শুধু আমার নয়, গোটা সৃষ্টিজগতের ক্ষতি করছি। নেককার মানুষদেরও শুধু নিজের চিন্তা করাই যথেষ্ট নয়, পরিবার ও সমাজ সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে। দাওয়াত ও তালীমকে ব্যাপক করতে হবে এবং সাধ্যমত 'আমর বিল মারূফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

মোটকথা, এটা নিশ্চিত যে, যেসব বিপদগ্রস্ত মানুষ গোনাহ ও অপরাধ থেকে মুক্ত বা শরীয়তের বিধান ও বাধ্যবাধকতা এখনো তাদের উপর আসেনি যেমন নাবালেগ শিশু, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা এ মুসীবতকে রহমত বানিয়ে থাকেন।

ঙ. ব্যাপকভাবে সংঘটিত গোনাহ ও অপরাধের সাজা আল্লাহ তাআলা শুধু আসমানী বালা-মুসীবতের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন–এই ধারণা ঠিক নয়; বরং এটা আযাবের একটি প্রকার মাত্র। সবচেয়ে বড় আযাব হচ্ছে সমাজ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিদায় নেওয়া, সততা ও আমানতদারি বিলুপ্ত হওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, শান্তির সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকা ইত্যাদি। এসব আযাবে আক্রান্ত লোকেরা যদি এই সুখ-চিন্তায় বিভোর থাকে যে, আমাদের উপর আযাব আসেনি, আযাব এসেছে ওই দুর্যোগগ্রস্ত এলাকায়, তবে এটা তাদের ভ্রান্তিবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এটাও হচ্ছে এক স্বতন্ত্র আযাব।

তাছাড়া একটি বড় মুসীবত যদি কোন অঞ্চলে আসে তাহলে তা পরোক্ষভাবে আশপাশের গোটা ভূখণ্ডকে, বরং কখনো গোটা পৃথিবীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই মুসীবতের প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে প্রাণে বেঁচে একথা ভাবতে থাকা যে, 'বেঁচে গেলাম', এক ধরনের অপরিণত চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়।

চ. আল্লাহ তাআলা মুমিন ও কাফেরের সাথে এক আচরণ করেন না। মুমিন হচ্ছে আল্লাহর বান্দা, মুসীবতের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে সতর্ক করেন এবং তার দরজা বুলন্দ করেন। পক্ষান্তরে কাফের হল আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহী। আল্লাহ তাআলা কখনো তাদের উপর আযাব নাযিল করলেও তাঁর সাধারণ নীতি এই যে, তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন। এভাবে যখন পাপের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আখেরাতে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন। কখনো দুনিয়াতেও তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে থাকেন। এজন্য কাফেরদের ওপর যদি আযাব না আসে বা

কম আসে তাহলে তাদের আনন্দিত হওয়ার সুযোগ নেই; বরং এটা তো সাধারণ আযাবের চেয়েও বড় আযাব। আর এজন্যই মুসীবতের সময় কাফেরদের প্রসঙ্গ টেনে আনা অত্যন্ত গর্হিত মানসিকতা। এতে আল্লাহ তাআলার তাম্বীহ ও সতর্কবাণীকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়।

ছ. যে বিপদাপদ পরীক্ষা হিসাবে আসে সেগুলো শুধু তাদের জন্যই পরীক্ষা নয়, যারা এগুলোতে সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে; বরং তা সবার জন্য, গোটা পৃথিবীর সকলের জন্য পরীক্ষা। পাকিস্তানের ভূমিকম্প শুধু পাকিস্তানিদের জন্য পরীক্ষা নয়; তেমনি বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ও শুধু বাংলাদেশিদের জন্য পরীক্ষা নয়; বরং গোটা পৃথিবীর সবার জন্যই পরীক্ষা ও তাম্বীহ। আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করছেন– কে সবর করে, আর কে ইলাহী ফয়সালার সমালোচনা করে; কে মুসীবত দেখে সজাগ-সতর্ক হয় এবং তওবা করে নিজেকে সংশোধন করে, আর কে আগের মতই উদাসীনতার নিদ্রায় বিভোর থাকে; কে সামর্থ্য অনুযায়ী বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আর কে নিজ স্বার্থ-চিন্তাতেই ডুবে থাকে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় এই যে–

১. 'সবর' ও 'তাফবীয' অর্থাৎ নিবেদিত চিত্তে ধৈর্যধারণ করা এবং 'রিযা বিল কাযা' অর্থাৎ আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা।

২. সব রকম গোনাহ থেকে তওবা করা এবং অনতিবিলম্বে নিজের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা। আর অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করা।

৩. সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিপদগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তা-ই নিবেদন করা। একথা চিন্তা করে পিছিয়ে থাকা উচিত নয় যে, আমার সামান্য অংশগ্রহণে এত মানুষের কী সাহায্য হবে; বরং বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসার নবী-সুন্নত পালনের এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য তো এই ছিল–

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

"আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, অক্ষমদের বোঝা বহন করেন, কর্মহীন নিঃস্ব ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান করেন, মেহমানদারি করেন এবং বিভিন্ন বিপদাপদে মানুষের সাহায্য করেন।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩

৪. হাদীস শরীফে আযাব-গযবের স্থানে যাওয়া সম্পর্কে যে নিষেধ এসেছে তা

ওইসব স্থান সম্পর্কে, যেখানে আপতিত বিপদাপদ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা রয়েছে যে, এটা কুফর-শিরক ও আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ এসেছে। যেখানেই কোন মুসীবত আপতিত হয় সেখানেই যাওয়া অনুচিত–এটা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অর্থ নয়; বরং হাদীস শরীফে বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসাকে অপরিহার্য করা হয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণেরও সুযোগ হয় এবং এই অনুভূতিও জাগ্রহ হয় যে, আল্লাহ যে আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, আমরা কি তাঁর শোকর আদায় করছি এবং নিজেকে সংশোধিত করছি?

৫. বাহ্যিক মুসীবতের সময় কর্তব্য পালনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ মুসীবত, যা সর্বদা ঈমান-আমলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, সে বিষয়েও কর্তব্য পালনে সচেতন হওয়া কর্তব্য। এ উদ্দেশ্যে দ্বীনী তালীম ও দ্বীনী দাওয়াতকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করাও কর্তব্য।

৬. সবশেষে যবানের হেফাযতের বিষয়ে সচেতন থাকা কর্তব্য, না আল্লাহর ফয়সালা সম্পর্কে আপত্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ, আর না অন্য কারো গীবত-শেকায়েত; শুধু নিজের গীবত ও নিজের শেকায়েত, আর নিজের ও পরিবার-পরিজনের সংশোধনের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রয়াস গ্রহণ। #

[জানুয়ারি '০৮ঈ.]

ই স লা মে র পূ র্ণা ঙ্গ তা

প্রসঙ্গ : রাষ্ট্র ও জীবন ব্যবস্থায় ইসলাম

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : জনাব, দৈনিক কালের কণ্ঠে (১৯/০২/২০১০ ঈ.) 'ইসলাম ধর্ম রাজনীতির উর্ধ্বে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রবন্ধটি পড়ে খুব আশ্চর্য হয়েছি। কেননা, এতে দাবি করা হয়েছে যে, ইসলাম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয় এবং ইসলাম রাজনীতির প্রসঙ্গে অনুপ্রবেশ করে না। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়তে রাজনীতি সম্পর্কে কোনো বিধি-বিধান নেই। মদীনা-মুনাওয়ারা ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না; বরং তা ছিল একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র! আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের নয়, তিনি ছিলেন মদীনা-রাষ্ট্রের কর্ণধার! বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ধারণা দ্বীন ও শরীয়তে নেই!'

আমার জানা মতে উপরের কথাগুলি সম্পূর্ণ ভুল, কিন্তু প্রবন্ধকার তার আলোচনায় কিছু যুক্তি-প্রমাণও উপস্থিত করেছেন। এজন্য কারো মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আমার কাছেও কিছু কথা জিজ্ঞাস্য বলে মনে হয়েছে। আশা করি, এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

আরেকটি বিষয় এই যে, দৈনিক নয়াদিগন্তে (০৭/০২/২০১০ ঈ.) কাদিয়ানীদের বার্ষিক সম্মেলনের উপর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বক্তারা বলেছেন যে, 'কুরআন হাদীসের কোথাও শরীয়া আইন ও ইসলামী রাজনীতির কথা নেই এবং আহমদিয়া জামাতের আকীদা হল, ইসলাম ও রাজনীতি দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।'

আমার ধারণা ছিল যে, খতমে নবুওয়তের আকীদাকে অস্বীকার করা এবং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বলে স্বীকার করার কারণে কাদিয়ানী

সম্প্রদায় কাফের। এখন মনে হচ্ছে যে, তাদের আকীদায় আরো অনেক কুফরী বিষয় রয়েছে।

আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তারা কি প্রকৃতপক্ষেই এমন আকীদা পোষণ করে, না এটি ওই সম্মেলনের বক্তাদের নিজস্ব মত, যা তারা আহমদিয়া জামাতের উপর আরোপ করেছে? আশা করি, বিস্তারিত লিখে আশ্বস্ত করবেন।

হাবীবুর রহমান বিন আবদুল হাকীম
বাগেরহাট, খুলনা

উত্তর : প্রত্যেক মুসলমানের 'জরুরিয়্যাতে দ্বীন' সম্পর্কে (অর্থাৎ দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কে) সহীহ ইলম ও বিশুদ্ধ ধারণা থাকা অপরিহার্য। একজন পাঠকের অন্তত এই পরিমাণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া আবশ্যক, যাতে সে গলদ আকীদাধারী বর্ণচোরা লেখক, কলামিস্টদের মিথ্যাচার বা অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত না হয়। বর্তমান সময়ে চিন্তা ও কলমের অনাচার এত প্রবল যে, কে কাকে বাধা দেয়! মিথ্যাকে প্রতিহত করার যে তিনটি উপায় ছিল, অর্থাৎ ভদ্রতা ও শরাফত, আখেরাতের ভয় এবং চার আসমানী কিতাবের সঙ্গে অবতীর্ণ পঞ্চম বস্তু- 'আলহাদীদ' (বা ডাণ্ডা) কোনোটাই তো কার্যকর নেই। প্রথম দুই বস্তুর কথা তো বলাই বাহুল্য। এসব থেকে পাকছাফ থাকাই প্রগতিশীলতা ও মুক্তবুদ্ধির প্রথম শর্ত। অতএব আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নিকট এসবের আশা করাও অন্যায়। আর শাসনের দণ্ড তো আজকালকার দিনে থাকে আল্লাহর দুশমন-শ্রেণীর হাতে। অতএব তাদের লেখালেখিতে যদি আপনি এ ধরনের কুফরিয়াত দেখেন, এমনকি তাতে যুক্তি-প্রমাণ এবং হাওয়ালা-উদ্ধৃতিও দৃষ্টিগোচর হয় তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তো খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ মিথ্যাচার করে থাকে।

আপনি যে প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনের কথা বলেছেন তা এখন আমার সামনে রয়েছে। আমি তো এখানে কোনো যুক্তি-প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি না, শুধু কতগুলি অসার দাবির সমষ্টি। সেগুলোও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ! আর 'প্রমাণ' হিসেবে কিছু থাকলে সেটিও অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত। 'যুক্তি' বা 'প্রমাণ' বলা যায় এমন কিছুর অস্তিত্ব এখানে নেই।

লেখকের স্ববিরোধিতার একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন :

সে একদিকে দাবি করেছে যে, ইসলামে রাজনীতির বিষয়ে কোনো বিধান নেই, অন্যদিকে দুইবার রাজতন্ত্রকে ইসলামবিরোধী বলেছে। প্রশ্ন এই যে, ইসলামে যদি রাজনীতি সম্পর্কে কোনো কিছুই না থাকে তাহলে ইসলামে রাজতন্ত্র

নিষিদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত সে কোথায় পেল?!

উল্লেখিত প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন দু'টোতেই মদীনা-সনদের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। তারা এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, মদীনা-সনদের কোথাও মদীনার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইসলাম হবে বা তা শরীয়া আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে এমন কথা বলা হয়নি।

প্রশ্নোক্ত প্রবন্ধে তো নির্লজ্জভাবে এই দাবি করা হয়েছে যে, মদীনা ছিল একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র!

দেখুন, মদীনা-সনদে পরিষ্কার বলা আছে–

وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَآمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا أَوْ يُؤْوِيهِ وَإِنَّ مَنْ نَصَرَهُ أَو آوَاهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلَا عَدْلٌ.

وَإِنَّهُ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللّٰهِ وَإِلٰى مُحَمَّدٍ.

কিছুদূর গিয়ে ইহুদীদের সাথে সংশ্লিষ্ট দফাগুলোতে বলা হয়েছে–

وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللّٰهِ وَإِلٰى مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى أَتْقٰى مَنْ فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهُ.

(মাজমূআতুল ওয়াছায়িকিছ ছিয়াছিয়্যাহ লিল'আহদিন নববী ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ, ড. হামীদুল্লাহ পৃ. ৬১, ৬২; আলমুজতামাউল মাদানী ফী 'আহদিন নুবুওয়াহ, ড. আকরাম জিয়া আল-উমারী পৃ. ১২১, ১২২)

উপরোক্ত দু'টি গ্রন্থে এই 'সনদে'র মূল সূত্রগুলো দেওয়া আছে।

গিয়োমকৃত সীরাতে ইবনে হিশামের ইংরেজি অনুবাদ যা (The Life of Muhammad (translation of Ibn-Ishaq's Sirat Rasulallah) নামে প্রকাশিত, তার ২৩১-২৩৩ পৃষ্ঠায় এই সনদটি বিদ্যমান রয়েছে। তাতে উপরোক্ত দফাগুলির যে তরজমা করা হয়েছে তা হুবহু তুলে দিচ্ছি–

It shall not be lawful to a believer who holds by what is in this document and believes in God and the last day to help an evil-doer or to shelter him, The curse of God and his anger on the day of resurrection will be upon him if he does, and neither repentance nor ransom willl be received from him.

Whenever you differ about a matter **it must be referrred to God and to Muhammad.**

If any dispute or controyersy likely to cause trouble should arise **it must be referred to God and to Muhammad** the apostle of God. God accepts what is nearest to piety and goodness in this document.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সীরাতে ইবনে হিশামের বাংলা অনুবাদ থেকে উপরোক্ত দফাগুলির তরজমা তুলে দিচ্ছি–

"২৩. আর যে মুমিন ব্যক্তি এই লিপির বক্তব্য স্বীকার করে নিয়েছে আর সে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্য কোন নতুন ফিতনা সৃষ্টিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দান বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত ও গযব হবে কিয়ামতের দিনে এবং তার থেকে ফিদয়া (মুক্তিপণ) বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।

২৪. আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা ও মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট তা উপস্থাপন করতে হবে।

৪৬. এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যদি এমন কোন নতুন সমস্যার বা বিরোধের উদ্ভব হয়–যা থেকে দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ তাআলা এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট মীমাংসার্থে উপস্থাপিত করতে হবে। ... (সীরাতুন নবী (সা.) খ. ২, পৃ. ১৭৯-১৮০)

এই 'সনদে' কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি? আর এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা কি কোনো ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজের সংবিধানে থাকতে পারে?

সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন– لَا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

"জাযিরাতুল আরবে দুই দ্বীন একত্র হবে না।" –মুয়াত্তা ইমাম মালেক পৃ. ৩৬০

এগুলো কি প্রমাণ করে যে, মদীনা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল?

গোড়ার কথা হচ্ছে, সর্বযুগের বাতিলপন্থী লোকেরা হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে থাকে। আমার ধারণা, বর্তমান যুগের বাতিলপন্থীদের মাঝে এই ব্যাধি আরো প্রকট। এজন্য তারা তাদের লালিত কুফরী চিন্তাগুলো নিজেদের পক্ষ থেকে বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। ফলে কুরআন-হাদীস, সীরাত-তারীখ, ফিকহ-তাফসীর এবং ইসলামী আকায়েদের মধ্যে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে

কিংবা মনগড়া কথাবার্তা তৈরি করে তা দ্বীনের নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা এটুকুও উপলব্ধি করে না যে, এতে তাদের প্রতারণা ও মিথ্যাচার দ্রুত প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

এটা ছিল এক প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, অর্থাৎ কাদিয়ানী সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন থেকে অনুমিত হচ্ছে যে, এ বিষয়ে আপনার অধ্যয়ন বেশ সীমিত। কারণ মির্জা কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের কুফরী শুধু এক বিষয়ে নয়, তাদের কুফরিয়াতের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এখন যেহেতু সিয়াসত সম্পর্কে কথা হচ্ছে তাই এ বিষয়ে শুধু একটি উদ্ধৃতি আপনাকে শোনাচ্ছি।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী লিখেছে যে, 'আমি সত্য সত্য বলছি, অনুগ্রহদাতার অকল্যাণ কামনা হচ্ছে হারামযাদা ও চরিত্রহীন লোকের কাজ। তাই আমার ধর্ম, যা আমি বারবার প্রকাশ করেছি, তা এই যে, ইসলামের দু'টি অংশ- ১. খোদা তাআলার আনুগত্য। ২. ওই সরকারের আনুগত্য, যে সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জালেমদের হাত থেকে আমাদেরকে তার ছায়াতলে আশ্রয় দান করেছে। সেই সরকার হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার। ... অতএব আমরা যদি বৃটিশ সরকারের অবাধ্যতা করি তাহলে প্রকারান্তরে ইসলাম এবং খোদা ও রাসূলের অবাধ্যতা করা হয়। ('গওরমেন্ট কী তাওয়াজজুহ কে লায়েক' মুলহাকা 'শাহাদাতুল কুরআন' রচনা : মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী পৃ. জিম-দাল-রূহানী খাযায়েন খ. ৬, পৃ. ৩৮০-৩৮১)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে দেখতে পাচ্ছেন যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতে সরকারের আনুগত্য ইসলামের অংশ। যদিও তা হয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার।

বর্তমান আহমদিয়া সম্প্রদায় যদি সিয়াসতকে ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন বলতে চায় তো বলতে পারে, কিন্তু অন্তত তাদের নেতার খাতিরে পশ্চিমা পিতৃকুলের আনুগত্য ও তল্পিবহনকে 'ইসলামের অংশ' বলা উচিত!!! (নাউযুবিল্লাহ)

ইহুদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের গাঁটছড়া বাঁধার কাহিনী যদি জানতে হয় তাহলে জনাব বশীর আহমদ ছাহেবের রচিত Ahmadiy Movement : British jewish connections বা তার উর্দূ অনুবাদ 'তাহরীকে আহমদিয়্যত ইহুদী ও সামরাজী গঠ্জোড়'' পড়ে দেখতে পারেন। অনুবাদ-গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৪৮।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে আপাতত এই কয়েকটি কথাই নিবেদন করলাম। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন তাহলে আগামী কোন সংখ্যায় ইসলামের

পূর্ণাঙ্গতা এবং জীবনের সকল অঙ্গনে তার দিশারী ও রাহনুমার ভূমিকা সম্পর্কে কুরআন হাদীস, ইজমায়ে উম্মত ও তারীখে ইসলামের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।#

[মার্চ '১০ঈ.]

মকতবের কায়েদা ও ইসলামী কালেমা
একটি পর্যালোচনা

ইসলামী কালেমাসমূহ দু ধরনের– ১. ঈমানের কালেমা যথা, কালেমা তাইয়েবা ও কালেমা শাহাদত। ২. যিকির বা দুআর কালেমা।

মকতবের কায়েদাসমূহে সাধারণত কালেমা তাইয়েবা, কালেমা শাহাদত এবং দ্বিতীয় প্রকারের কিছু কালেমা শিশুদের মুখস্থ করার জন্য লিপিবদ্ধ থাকে। এছাড়া কোনো কোনো বুযুর্গ ইসলামের কিছু মৌলিক আকীদা শিশুদের মুখস্থ করানোর জন্য কিছু সহজ আরবী বাক্য তৈরি করেছেন। এগুলোও কোনো কোনো কায়েদায় কালেমা শিরোনামে উল্লেখিত হয়েছে।

যেহেতু হাদীস শরীফে অনেক যিকির ও দুআর বিভিন্ন পাঠ রয়েছে, তেমনি কোনো কোনো কালেমারও একাধিক পাঠ বর্ণিত হয়েছে, তাই মকতবের কায়েদাগুলোতে এ ধরনের কালেমায় কিছু শব্দগত পার্থক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তেমনি যে আরবী বাক্যগুলো তৈরি করা হয়েছে তাতেও যদি কায়েদাভেদে কিছু ভিন্নতা থাকে, তাহলে তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কেননা পৃথিবীর সব ভাষাতেই বিশেষত আরবী ভাষায় একটি মর্ম বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করা যায়।

এসব কারণে আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন কায়েদায়, বিশেষত 'কাওয়ায়েদে বোগদাদী' ও 'নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা'–এ দুটি কায়েদায় এ জাতীয় কিছু ভিন্নতা রয়েছে। বলাবাহুল্য, এই স্বাভাবিক ভিন্নতাকে কেন্দ্র করেও যে

বিবাদ-ঝগড়া হতে পারে—এটা অনেকটা অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু শয়তান সর্বদা তার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ফলে উপরোক্ত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো এলাকায় ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিয়েছে। আর এর চেয়েও দুঃখজনক বিষয় এই যে, যাদের সম্পর্কে এই ধারণা রাখতে মানুষ ভালবাসে যে, তারা সাধারণের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেবেন, তারাই বিষয়টি আরো উসকে দিয়েছেন। ফলে তা একটি হাঙ্গামার রূপ ধারণ করেছে। পরিশেষে এলাকার কিছু শান্তিপ্রিয় ও ইনসাফপ্রিয় মানুষ দেশের বিভিন্ন ফত্ওয়া বিভাগ থেকে এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ আলেমগণের ফত্ওয়া সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। একটি প্রশ্ন মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর ফত্ওয়া বিভাগেও প্রেরিত হয়। প্রশ্নের সাথে স্থানীয় একটি আলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃত একটি প্রবন্ধও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। বিষয় ও পরিস্থিতির নাযুকতা বিবেচনা করে মারকাযুদ দাওয়ার ফত্ওয়া বিভাগ থেকে বিস্তারিতভাবে এর জবাব লেখা হয়েছিল। জবাবটি বিশিষ্টজনদের হাতে পৌঁছলে সর্বসাধারণের উপকারার্থে তারা একে আলকাউসার-এ প্রকাশ করার পরামর্শ দেন।

ফত্ওয়াটি একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছু বুনিয়াদি কথাও স্থান পেয়েছে। এগুলো স্মরণ রাখলে আশা করা যায়, এ জাতীয় বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হবে না। তাছাড়া শৈশবে পঠিত কায়েদাগুলোর কালেমা, যিকির ও দুআগুলোর উৎস জানার ব্যাপারেও সচেতন ব্যক্তি মাত্রের মনেই একটি সাধারণ আগ্রহ থাকে; কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে তা জেনে নেওয়ার ফুরসত হয়ে ওঠে না। ফত্ওয়াটি মাসিক আলকাউসার-এ প্রকাশ করার এটিও একটি কারণ।

ফত্ওয়াটি পড়ার সময় একথা মনে রাখলে ভালো হবে যে, এর ভাষা ও উপস্থাপনায় সেই বিশেষ পরিস্থিতিরও কিছুটা প্রভাব রয়েছে; যার কারণে ফত্ওয়াটি লিখতে হয়েছে এবং সেই প্রবন্ধটিরও প্রভাব রয়েছে, যা পর্যালোচনার জন্য ফত্ওয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েছিল।

—সম্পাদক

প্রশ্ন :

জনাব মুফতী সাহেব

মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

মুহ্তারাম, আমাদের এলাকায় একটি বিষয় নিয়ে জনসাধারণের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বিষয়টির শরীয়াভিত্তিক সমাধানের জন্য আপনার সমীপে আবেদন করছি। আশা করি যথার্থ সমাধান দিয়ে আমাদেরকে সঠিক বিষয় উপলব্ধি করার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন।

হযরত মাওলানা কারী বেলায়েত হুসাইন সাহেব তাঁর 'নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা' গ্রন্থে কালেমায়ে শাহাদতসহ বিভিন্ন কালেমা লিপিবদ্ধ করেছেন; যেগুলোর সাথে 'কায়েদায়ে বোগদাদী'তে কালেমাসমূহের মিল নেই। যেমন–

১. কালেমায়ে শাহাদতের মধ্যে 'ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহু' উল্লেখ করা হয়নি। তাঁর গ্রন্থে কালেমাটি রয়েছে এভাবে– 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহূ ওয়ারাসূলুহ্।'

আর বোগদাদী কায়েদার কালেমায়ে শাহাদত হল– 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহু ওয়াআশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহূ ওয়ারাসূলুহ্।'

২. ঈমানে মুজমালের মধ্যে 'ওয়াআরকানিহী' উল্লেখ করা হয়নি। নূরানী কায়েদায় আছে– 'আ-মান্তু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্মায়িহী ওয়াসিফাতিহী ওয়াকাবিলতু জামিআ আহ্কামিহী।'

আর কায়েদায়ে বোগদাদীর কালেমায়ে মুজমাল হল–'আমান্তু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্মায়িহী ওয়াসিফাতিহী ওয়াকাবিল্তু জামিআ আহ্কামিহী ওয়াআর্কানিহ্।'

৩. কালেমায়ে তামজীদ লেখা হয়েছে এভাবে– 'সুব্হানাল্লাহ ওয়াল্হাম্দু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

আর কায়েদায়ে বোগদাদীতে লেখা হয়েছে এভাবে– 'লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা নূরাইঁ ইয়াহ্দিল্লাহু লিনূরিহী মাইঁ ইয়াশা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন।'

৪. কালেমায়ে তাওহীদ লেখা হয়েছে এভাবে– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহ্য়ী ওয়াযুমীতু ওয়াহুয়া হায়্যুল লা-ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।'

আর কায়েদায়ে বোগদাদীতে লেখা হয়েছে এভাবে– 'লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহিদান লা-সানিয়া লাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুত্তাকীন রাসূলু রাব্বিল আলামীন।'

এখন আমাদের প্রশ্ন হল–

১. নূরানী পদ্ধতি বইয়ের কালেমা এবং বোগদাদী কায়েদার কালেমার কোন্‌টি সনদসূত্রে অধিক সহীহ? শুনেছি 'কালেমায়ে তাইয়েবা' একক কোনো হাদীসে বা আয়াতে নেই। কথাটি ঠিক কি না?

২. নূরানী পদ্ধতির বইটি ছাত্রদেরকে পড়ানো ঠিক হবে কি না?

৩. কায়েদায়ে বোগদাদীতে লিখিত কালেমাগুলো যদি কেউ না পড়ে। অর্থাৎ বিশ্বাস করে কিন্তু পড়ে না, তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে কি না বা তার প্রতিবাদ করা জায়েয কি না?

৪. কালেমাগুলো প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই নামে এইভাবে চলে আসছে কি না? নাকি এগুলোর অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে বুযুর্গানে দ্বীন এগুলোর নাম রেখেছেন?

উল্লেখ্য, কিছু মানুষ এসব বিষয় নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছে। তারা বলছে যে, নূরানীর লোকেরা কালেমা পরিবর্তন করে ফেলেছে। আর বোগদাদী কায়েদার যে দুটি কালেমা তারা বাদ দিয়েছে সে দুটিকে তারা অস্বীকার করে ইত্যাদি।

বি. দ্র. এ বিষয়ে লিখিত একটা প্রবন্ধের ফটোকপি প্রশ্নের সাথে দেওয়া হল। সেটাও সামনে রাখবেন।

নিবেদক
এনায়াতুল্লাহ

উত্তর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উত্তরের আগে ভূমিকাস্বরূপ কিছু মৌলিক কথা উল্লেখ করব। এরপর প্রতিটি কালেমা সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব। তারপর প্রশ্নসমূহের ধারাবাহিক উত্তর প্রদান করব ইনশাআল্লাহ।

ভূমিকা

১. কালেমার প্রকারভেদ : ক. প্রথম প্রকার কালেমা হল যা 'শাআয়েরে ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের সময় এ ধরনের কোনো একটি কালেমা পাঠ করার মাধ্যমেই মানুষ মুসলমান হয়ে থাকে

এবং এগুলোর উপরই ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি। যেমন কালেমা তাইয়েবা, কালেমা শাহাদত।

এ কালেমাগুলোর অর্থ এবং তাতে উল্লেখিত আকীদা শরীয়তের দলীল দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং তা 'যরূরিয়াতে দ্বীন' তথা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত বিষয়াদির মধ্যেও প্রধানতম। শুধু তাই নয়, এ কালেমাগুলোর পাঠও কুরআন হাদীসে হুবহু বিদ্যমান রয়েছে। এ প্রকার কালেমা যেহেতু শাআয়েরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোর পাঠও কুরআন হাদীসে বিদ্যমান, তাই নিজের পক্ষ থেকে এগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের রদবদল বা হ্রাস-বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই। শরীয়ত এ কালেমাগুলোকে যে স্থানে যে শব্দে পড়ার নির্দেশনা দিয়েছে সে স্থানে ঠিক সেভাবেই তা পড়তে হবে। যেমন ঈমান আনার সময় পূর্ণ কালেমা তাইয়েবা– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়তে হবে; কিন্তু আযানের শেষে শরীয়ত যেহেতু শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার নির্দেশ দিয়েছে, তাই সেখানে এতটুকুই বলতে হবে। তেমনি আযানের মধ্যে শরীয়ত কালেমা শাহাদত শিক্ষা দিয়েছে এভাবে– 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' তাই আযানের মধ্যে কালেমা শাহাদত হুবহু এই শব্দেই বলতে হবে। যদিও কালেমা শাহাদতের বিভিন্ন পাঠ হাদীস শরীফে এসেছে এবং সেগুলোও শরীয়তেরই শিক্ষা। তবে তা আযানের মধ্যে পড়ার জন্যে নয়; বরং ঈমান আনার সময় কিংবা ঈমান তাজা ও মজবুত করার জন্য যিকির-দুআ হিসেবে অথবা অন্য কোনো ক্ষেত্রে পাঠ করার জন্য।

খ. দ্বিতীয় প্রকার কালেমা হল, যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অবস্থায় যিকির-দুআ ও তাওবা-ইস্তেগফার হিসাবে পাঠ করার জন্যে। এই কালেমাগুলোতে তাওহীদ, হামদ ও সানা এবং আল্লাহর বড়ত্বের কথাও রয়েছে। হাদীস শরীফে যিকির ও দুআর অনেক বাক্য রয়েছে। তার মধ্যে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোকে কালেমা শিরোনামে উল্লেখ করেছেন সেগুলোর সংখ্যাও অনেক। শুধু কুতুবে সিত্তাহ (হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব) এবং সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এ ধরনের কালেমা পঞ্চাশের অধিক।

এই প্রকার কালেমার শব্দ ও মর্ম দুটোই কুরআন, হাদীস ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলেও এগুলোর অধিকাংশেরই নাম কুরআন হাদীসে উল্লেখ নেই। পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো বুযুর্গ সহজভাবে বোঝার জন্য বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কিছু কালেমার নামকরণ করেছেন। ফলে কালেমাগুলো ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য অনেক মেহনত করেছেন। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তারা বিভিন্ন কায়েদা তৈরি করেছেন। সে কায়দাগুলোতে প্রথম প্রকার কালেমার সাথে দ্বিতীয় প্রকারের কিছু কালেমাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গ. উপরোক্ত দুই প্রকার কালেমা ছাড়াও কিছু ইসলামী আকীদা শিশুদেরকে সহজভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত আরবী বাক্যে তা বর্ণনা করেছেন এবং এই আরবী বাক্যগুলোকে তারা উল্লেখ করেছেন কালেমা শিরোনামে। নিঃসন্দেহে তাদের উল্লেখিত কালেমাগুলোর অর্থ ও মর্ম কুরআন হাদীস ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। যদিও হুবহু পাঠ কুরআন হাদীসে নেই এবং সে নামগুলোও কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, এরপরও অর্থ ও মর্মের বিবেচনায় এগুলো ইসলামী কালেমারই অন্তর্ভুক্ত। এই আরবী বাক্যগুলোকে যদি কালেমা নাম দেওয়া হয় তবে তা কালেমার তৃতীয় প্রকার হতে পারে।

যেহেতু এ প্রকার কালেমার ভাষা বুযুর্গগণ নির্ধারণ করেছেন এবং এর নামকরণও করেছেন তারাই, তাই এ কালেমাগুলোর নাম ও পাঠ ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে কায়েদা ও ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্যে রচিত পুস্তিকাগুলোর মধ্যে এই তৃতীয় প্রকার কালেমার পাঠ ও নামের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। তবে এটা এমন কোনো পার্থক্য নয় যাকে 'মতবিরোধ' নামে আখ্যায়িত করা যায়। আর একে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ করা তো অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। কেননা শরীয়ত যে ক্ষেত্রে কোনো পাঠ বা নাম নির্ধারণ করে দেয়নি সেক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট পাঠ বা নির্দিষ্ট নাম গ্রহণ করতে সবাইকে বাধ্য করা যায় না। তেমনি কোনো গ্রহণযোগ্য দলীল ছাড়া এক কায়েদায় উল্লেখিত পাঠকে অন্যটির চেয়ে উত্তমও বলা যায় না।

এক্ষেত্রে যে বিষয়ে লক্ষ রাখা জরুরি তা হল, আলোচ্য কালেমার অর্থ এবং তাতে উল্লেখিত আকীদা-বিশ্বাস কুরআন হাদীস সম্মত কি না? হলে ভালো, অন্যথায় তা পাঠ করা যাবে না। অবশ্য নূরানী কায়েদা ও বোগদাদী কায়েদার কোনোটিতেই ভুল অর্থ সম্বলিত কোনো কালেমা নেই।

তবে আগেই বলা হয়েছে যে, এই তৃতীয় প্রকার বাক্যগুলোকে কালেমা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে কালেমার আভিধানিক অর্থে। আর এগুলো যেহেতু ইসলাম সম্মত অর্থ ও মর্ম বহন করে, তাই এগুলোকে ইসলামী কালেমাও বলা যেতে পারে। কিন্তু শরীয়তের নিজস্ব পরিভাষায় যাকে 'কালেমা' বলে (যেমন আমরা ইসলামের বুনিয়াদ হিসাবে কালেমা, নামায, রোযা ইত্যাদিকে উল্লেখ করে

থাকি অথবা শাআয়েরে ইসলাম তথা ইসলামের নিদর্শনসমূহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলে থাকি কালেমা, নামায, বাইতুল্লাহ ইত্যাদি) এই তৃতীয় প্রকার কালেমা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্যথায় পারিভাষিক ইসলামী কালেমার সংখ্যা হাজার অতিক্রম করে যাবে। কেননা তখন যে কেউ ইসলামের কোন আকীদা, রোকন বা হুকুম সম্বলিত একটি আরবী বাক্য তৈরি করে তাকে 'কালেমা' নামে আখ্যায়িত করতে পারবে। বলাবাহুল্য, সে ক্ষেত্রে 'কালেমার' কোনো স্বাতন্ত্র্যই বাকি থাকবে না এবং প্রতিটি নির্ভুল কথাকে ইসলামী কালেমা বলতে হবে। অথচ অতীতেও কেউ এমন করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। তাই আভিধানিক অর্থের 'কালেমা' এবং শরয়ী পরিভাষার 'কালেমার' মাঝে যে পার্থক্য তা জেনে রাখা জরুরি।

শরয়ী পরিভাষায় যাকে 'ইসলামী কালেমা' বলা হয় তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল প্রথম প্রকারের কালেমা, যা শাআয়েরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হল যা দুআ ও যিকির হিসাবে শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্দেশিত; বর্তমান আলোচনায় তা দ্বিতীয় প্রকারে উল্লিখিত হয়েছে।

আর তৃতীয় প্রকার কালেমা যা অর্থগত দিক থেকে সঠিক বটে, তবে একে কালেমা বলা যেতে পারে কালেমা শব্দের শুধু আভিধানিক অর্থ হিসাবে। মূলত এগুলো আকীদার কিছু বিষয় বা শরীয়তের আহকাম ও আরকান-এর বিবরণ মাত্র। এগুলো ছাড়াও ইসলামে এমন অনেক বুনিয়াদি আকীদা রয়েছে যেগুলো বোগদাদী ও নূরানী কায়েদায় নেই এবং থাকার কথাও নয়। এগুলোকে আলাদাভাবে জানতে হবে।

এখানে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে, এই তৃতীয় প্রকারের কালেমাগুলোকে ইসলামী কালেমা নামে আখ্যায়িত করা আপত্তিমুক্ত নয়। কেননা সাধারণ মানুষ এমনকি অনেক বিশিষ্টজনও ইসলামী কালেমা বলতে সে কালেমাই বোঝেন, যার শব্দ ও মর্ম দুটোই হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। তাই যেসব শব্দ বা বাক্য হুবহু কুরআন হাদীসে উল্লেখিত হয়নি সেগুলোকে এই নাম দেওয়া হলে প্রবল আশংকা থাকে যে, মানুষ তখন কুরআন হাদীসে নেই এমন বাক্যসমূহকে কুরআন হাদীসের বাক্য মনে করবে। এটা শুধু আশঙ্কাই নয়, বাস্তবেও এমন বিভ্রান্তি হচ্ছে। এজন্য কুরআন হাদীসে হুবহু উল্লেখিত নেই এমন বাক্যকে ইসলামী কালেমা শিরোনামে বা কালেমা নামে উল্লেখ না করাই ভালো। এক্ষেত্রে যে আকীদা বা হুকুমটি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য তা আকীদা বা হুকুম শিরোনামেই উল্লেখ করা যেতে পারে এবং এভাবেই তা শিক্ষা দেওয়া উচিত। আর এ বিষয়গুলোর জন্য আরবী বাক্য তৈরি করারও প্রয়োজন নেই; বরং শিশুদেরকে তাদের মাতৃভাষায়-ই শিক্ষা

দেওয়া উচিত। তাদেরকে শুধু সেসব আরবী বাক্যই মুখস্থ করানো যেতে পারে যা হুবহু কুরআন হাদীসে রয়েছে।

২. কায়েদায়ে বোগদাদী, নূরানী কায়েদায়ে বোগদাদী, নূরানী কায়েদা বা কায়েদায়ে নূরিয়া বা কায়েদায়ে নাদিয়াতুল কুরআন বা আলকায়েদাতুল জাদীদাহ আন্নূরানিয়্যাহ অথবা এ ধরনের যেসব কায়েদা রয়েছে তার সবগুলোর মাধ্যমেই শিশুদেরকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দান এবং ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়গুলো তালীম প্রদানের অসামান্য খেদমত হয়েছে। এগুলোর কোনোটিকেই তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা জায়েয নয়। এ কায়েদাগুলোতে কোথাও কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা উলামায়ে কেরাম এবং কেরাত ও তাজবীদ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আলোচনা করে ফয়সালা করবেন। সাধারণ মানুষের জন্য একে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয।

৩. নূরানী কায়েদার সংকলক

কায়েদায়ে বোগদাদীর সংকলক কে এবং কবে তা সংকলিত হয়েছে–এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। অনেক বয়োঃবৃদ্ধ মুরব্বীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি; কিন্তু এ ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। নূরানী কায়েদার যে সংস্করণ আমাদের দেশে প্রচলিত তা হযরত মাওলানা কারী বেলায়েত হুসাইন দামাত বারাকাতুহুমের তত্ত্বাবধানে সংকলিত হয়েছে। তবে হিন্দুস্তানের নূরানী কায়েদা হল মূল নূরানী কায়েদা। প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা নূর মুহাম্মদ লুধিয়ানভী (রহ.) তা প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি অনেক আগের ব্যক্তিত্ব। তাঁর উস্তাদ হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী (রহ., যাঁর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত সহীহ বুখারী এবং বুখারীর উপর তাঁর হাশিয়া গোটা এশিয়া মহাদেশের সব ধারার মাদরাসায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত) ১২৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। মাওলানা লুধিয়ানভী (রহ.)এর জীবনী 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে (৮/৫৩৭) রয়েছে। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, এটি অনেক পুরাতন কায়েদা এবং বহু বছর আগে থেকে প্রচলিত। আমার সামনে হিন্দুস্তানের ছাপা একটি নূরানী কায়েদাও রয়েছে, যা ১৩৫০ হিজরীর সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত। মাওলানা কারী বেলায়েত সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-সংকলিত নূরানী কায়েদায় আলোচ্য কালেমাগুলোর যে নাম ও তার যে পাঠ উল্লেখিত হয়েছে হুবহু সেভাবে এই হিন্দুস্তানী নূরানী কায়েদায়ও সেগুলো রয়েছে। হিন্দুস্তানের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক কোনো কোনো লাইব্রেরিতে নূরানী কায়েদার অনেক পুরানো সংস্করণও সংরক্ষিত আছে।

কালেমাসমূহের সূত্র

এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পর এবার প্রশ্নোক্ত কালেমাগুলো সম্পর্কে এক এক করে বিশদ আলোচনা করা হল।

কালেমা তাইয়েবা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

এতে দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদি আকীদা তথা তাওহীদ ও রিসালাতের বিবরণ রয়েছে এবং তা কুফর ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য সাধনকারী। অন্তর থেকে এই কালেমা স্বীকার করার মাধ্যমে এবং মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে মানুষ মুসলমান হয়। কালেমাটির মর্ম তো বটেই এর পাঠ, এমনকি নামও কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সূরা ইবরাহীম, আয়াত ২৪-এ একে 'কালিমাতুন তায়্যিবাতুন' তথা কালেমা তাইয়েবা বলা হয়েছে এবং সূরা ফাত্‌হ, আয়াত ২৬-এ একে 'কালিমাতুত তাকওয়া' বলা হয়েছে। এছাড়াও এই কালেমার আরো অনেক নাম রয়েছে। যেমন– কালিমাতুল ইখলাস, কালিমাতুত তাওহীদ, কালিমাতুল ইসলাম ইত্যাদি।

দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর ২/৫৮২; আদদুররুল মানসূর ৪/৭৫ ও ৬/৮০; সহীহ বুখারী ২/৯৮৮; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ১১/২৯৫; ফাতহুল বারী ১১/৫৭৫; কিতাবুল আইমান (বাবুন ইযা কালা ওয়াল্লাহি লা আতাকাল্লামু) আলকাশিফ শরহুল মিশকাত, তীবী ১/১৭৮-১৭৯; কিতাবুস সাওয়াব আবুশ শাইখ ইবনে হাইয়ান–ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন (ইহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ৫/১১; আলফুতূহাতুর রাব্বানিয়্যাহ ফী শরহিল আযকারিন নাবাবিয়্যাহ, ইবনে আল্লান ১/২১৭-২১৮

কালেমা তাইয়েবার পূর্ণ পাঠ সম্বলিত দুটি হাদীস এখানে উদ্ধৃত হল–

প্রথম হাদীস : ইমাম ইউনুস ইবনে বুকাইর (রহ.) 'যিয়াদাতুল মাগাযী' গ্রন্থে সহীহ সনদে বুরাইদা ইবনুল হুসাইব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবী (বুরাইদা) বলেন, "আবু যর এবং তাঁর চাচাতো ভাই নুয়াইম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বের হলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে ছিলাম। নবীজী একটি পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আবু যর তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি কী বলেন তা শুনতে এসেছি।' ইরশাদ হল, আমি বলি– لا إله إلا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

এতে আবু যর এবং তাঁর সঙ্গী (চাচাতো ভাই) নবীজীর প্রতি ঈমান আনয়ন করলেন।"

হাদীসটির সনদ ও আরবী পাঠ নিম্নরূপ :

يونس قال: عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: انطلق أبو ذر ونعيم ابن عم أبي ذر، وأنا معهم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستتر بالجبل، فقال له أبو ذر: يا محمد أتيناك لنسمع ما تقول، قال: أقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به أبو ذر وصاحبه.

ইমাম ইউনুস ইবনে বুকাইর (রহ.)এর কিতাব থেকে এই হাদীসটি ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেছেন। দেখুন, আলইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা ৬/৪৬৩

হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী। সনদটির সব কজন বর্ণনাকারীই 'সিকাহ' তথা নির্ভরযোগ্য। তাদের পরিচিতি এবং তাদের সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণের মন্তব্য জানার জন্য উলামায়ে কেরাম পর্যায়ক্রমে নিম্নের কিতাবগুলো দেখতে পারেন–

তাহযীবুল কামাল, আবুল হাজ্জাজ মিযযী ২০/৫২৭, ২০/৪৯০, ১০/৩৬, ৩/৩০; তাহযীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার আসকালানী ১১/৪৩৪, ৪১৫, ৫/১৫৭, ১/৪৩২; সিয়ারু আলামিন নুবালা, শামসুদ্দীন যাহাবী ৮/১৫৫, ৫/৫৩২, ৪/১০১; কিতাবুস সিকাত, ইবনে হিব্বান বুসতী ৭/৬৫১, ৭/৬৩৫, ৫/১৬, ৩/২৯

দ্বিতীয় হাদীস : প্রথম হাদীসের মতো কালেমার হুবহু পাঠ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) মুসনাদে বাযযার-এর ২২২৭ নং হাদীসেও উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) সূরা কাহাফের ৮২ নং আয়াতের তাফসীরে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/১১০। এছাড়া 'কাশফুল আসতার' (৩/৫৬-৫৭) ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/১৪৭) গ্রন্থেও হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে।

قال الراقم: وبشر بن المنذر قاضي المصيصة، قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا. وذكره ابن حبان في الثقات، كما في «لسان الميزان» ٢:٣٤. (و٢:٣١٤-٣١٥، طبع مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত নিবন্ধে বলা হয়েছে– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এ কালেমা হুবহু কুরআনের একক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। আবার হুবহু একক হাদীসের আলফাযও নয়।"

তাদের এ বক্তব্য ঠিক নয়। কালেমা তাইয়েবা হল শেআরে ইসলাম; যা ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। এমন কালেমা সম্পর্কে এ ধরনের দাবি করা বড়ই দুঃখজনক। বাস্তব কথা এই যে, কালেমা তাইয়েবা-র পূর্ণাঙ্গ পাঠ হুবহু 'সুন্নতে মুতাওয়ারাসা' দ্বারা প্রমাণিত। পাশাপাশি একাধিক হাদীসেও তা হুবহু বিদ্যমান রয়েছে। সেখান থেকে দুটি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

কালেমা শাহাদত

শাহাদত অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া। যেহেতু এই কালেমার মাধ্যমে তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তাই একে কালেমা শাহাদত বলে। এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি কালেমা। কেননা এ কালেমা দ্বারা মুখে ঈমান স্বীকার করার এবং হকের সাক্ষ্য দেওয়ার ফরয আদায় হয় এবং ঈমান প্রকাশ পায়। কালেমা তাইয়েবার মতো এটাও শেআরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। শব্দের সামান্য পার্থক্যের সাথে এই কালেমা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীস শরীফে উল্লেখিত যেকোনো শব্দেই এই কালেমা পাঠ করা যায়। এখানে হাদীসে বর্ণিত কালেমা শাহাদতের কয়েকটি রূপ উল্লেখ করা হল–

১. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

নামাযে পঠিত তাশাহ্হুদের মধ্যে এভাবেই কালেমা শাহাদত বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব ছাড়াও বড় বড় সব কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বহু সহীহ সনদে তা বর্ণিত আছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, সহীহ বুখারী ১/১১৫, ২/১০৯৮; সহীহ মুসলিম ১/১৭৩

প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত নিবন্ধে বলা হয়েছে, 'তবে তাশাহ্হুদ সর্বমোট পাঁচজন সাহাবী থেকে আরো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। শুধু একটি মাত্র বর্ণনা নয়।'

কিন্তু আমরা এই পাঁচজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো দেখেছি; যাতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত তাশাহহুদের শব্দাবলি বর্ণনা করেছেন। বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম যায়লায়ী (রহ.) 'নাসবুর রায়াহ লি-আহাদীসিল হিদায়া' গ্রন্থেও এই হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসগুলোর প্রতিটিতে কালেমা শাহাদত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তাশাহ্হুদের শব্দাবলির সাথে হুবহু মিল–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰه إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

তাছাড়া জুমার খুতবাসহ বিভিন্ন মাসনূন খুতবায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কালেমা শাহাদত পাঠ করতেন তার বিবরণসম্বলিত একাধিক বর্ণনায় কালেমা শাহাদতের উল্লেখিত পাঠ বিদ্যমান রয়েছে। দেখুন, সুনানে আবু দাউদ ১৫৬-১৫৭, ২৮৯; সুনানে নাসায়ী ১/১৫৮; মুসনাদে আহমাদ ১/৩৯২

সুতরাং উপরোক্ত শব্দে কালেমা শাহাদত পাঠ করা, লেখা ও শিক্ষা দেওয়া অবশ্যই শরীয়তসম্মত। এ বিষয়ে আপত্তির কোনো সুযোগ নেই।

২. কালেমা শাহাদত-এর আরেকটি পাঠ এই–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

কায়েদায়ে বোগদাদীতে কালেমা শাহাদত এভাবেই লেখা হয়েছে। এই পাঠ সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে। (১/১২২)

সুতরাং কায়েদায়ে বোগদাদীতে যে শব্দে কালেমা শাহাদত লেখা হয়েছে সেটিও সহীহ। এর উপরও কোনো প্রকার আপত্তি করা ঠিক নয়।

সংযুক্ত নিবন্ধে সহীহ মুসলিম ১/৪৩-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এই উদ্ধৃতি সঠিক নয়। কেননা সহীহ মুসলিম-এর উল্লেখিত পৃষ্ঠায় বর্ণিত কালেমা শাহাদত অনেক দীর্ঘ, যা তৃতীয় নম্বরে উল্লেখ করছি।

৩. সহীহ মুসলিম ১/৪৩-এ উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি বলবে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللّٰهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ.

সে জান্নাতের আটটি দরজার যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে আল্লাহ তাকে সে দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

(কালেমাটির অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। (আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে) মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা (আ.) তাঁর বান্দা ও তাঁর বাঁদীর পুত্র এবং আল্লাহর এক (আদেশ)-বাণী (দ্বারা সৃষ্ট) যা আল্লাহ তাআলা (জিব্রীল মারফত) মারয়াম পর্যন্ত পৌছিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জান (রাসূল)। জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য।)

এ হাদীস সহীহ বুখারী (১/৪৮৮) রয়েছে। সুতরাং এটিও হাদীস শরীফে বর্ণিত কালেমা শাহাদত। কেউ যদি এভাবে কালেমা শাহাদত শিক্ষা দেয় তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই।

৪. কালেমায়ে শাহাদতের আরেকটি প্রসিদ্ধ পাঠ এই–

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

এটি সহীহ বুখারী (১/৪৬৯) ও সহীহ মুসলিমে (১/১৭৪) রয়েছে। এছাড়া এ দুই কিতাবের আরো অনেক হাদীসে এবং অন্যান্য কিতাবের বহু হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস, সীরাত ও তারীখের কিতাব থেকে জানা যায় যে, মানুষ মুসলমান হওয়ার সময় এই কালেমা শাহাদতই পড়ত। আযানের মধ্যে কালেমা শাহাদতও হুবহু এরকম। কিন্তু আযানের মধ্যে যেহেতু শাহাদতের দুই অংশ ভিন্ন ভিন্ন বলতে হয়, তাই আযানের দুই অংশের মাঝে 'ওয়া' যুক্ত করা হয় না। আযানের সময় কালেমা শাহাদত যেভাবে পড়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ওখানে সেভাবেই পড়তে হবে।

সারকথা এই যে, সহীহ হাদীসে কালেমা শাহাদতের যেসব পাঠ উল্লেখিত হয়েছে তার যে কোনটি পড়া যেতে পারে এবং শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য কায়েদায় লেখা যেতে পারে। এতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। কেননা শিশুদেরকে এক কালেমার সমস্ত পাঠ শিক্ষা দেওয়া কোনোভাবেই জরুরি হতে পারে না। এটা তো প্রাপ্তবয়স্কদের উপরও ফরয নয়।

কালেমা তাওহীদ

এই শিরোনামে নূরানী কায়েদায় নিম্নোক্ত কালেমাটি লেখা হয়েছে–

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَّ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

তিরমিযী শরীফে (২/১৮১) হুবহু এভাবেই কালেমাটি বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য অনেক কিতাবের বিভিন্ন হাদীসে শব্দগত কিছু পার্থক্যের সাথে এই কালেমা বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, সহীহ বুখারী ২/৯৪৭; সহীহ মুসলিম ২/৩৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৯/২৫১

হিসনে হাসীন কিতাবের একাধিক স্থানে হাদীসের অনেক কিতাবের বরাতে

এই কালেমা শব্দগত সামান্য পার্থক্যসহ উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, হিসনে হাসীন পৃ. ১২৬ ও ২২৩-২২৪

বুখারীর প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফতহুল বারী'তে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "এই যিকিরের (কালেমার) পূর্ণাঙ্গ পাঠ তা-ই যা তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এই অধ্যায়ে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তার বিভিন্ন সূত্রে ও বর্ণনায় বিক্ষিপ্তভাবে শুধু একটি বাক্য (ওয়াহুয়া হায়্যুল লা-ইয়ামূতু) ছাড়া পুরো কালেমাই উল্লেখিত রয়েছে।" –ফতহুল বারী ১১/২০৯

এই কালেমাতে শুধু আল্লাহ তাআলার তাওহীদ (তাওহীদে যাত, তাওহীদে ইবাদত, তাওহীদে সিফাত)এর কথাই রয়েছে। এজন্যে এর নাম দেওয়া হয়েছে কালেমায়ে তাওহীদ। কালেমার অর্থ জানলেই বোঝা যাবে যে, এটি আল্লাহর তাওহীদ বর্ণনা করার কালেমা। শুধু এই কালেমাই নয় কালেমা তাইয়েবা ও কালেমা শাহাদতেও আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এগুলোকেও 'কালেমা তাওহীদ' বলা হয়েছে।

কালেমা তাইয়েবা সম্পর্কে পেছনে বরাতসহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর নাম 'কালেমা তাওহীদ'। তবে যেহেতু 'কালেমা তাইয়েবা' নামেই তা বেশি প্রসিদ্ধ, তেমনি কালেমা শাহাদতেরও প্রসিদ্ধ নাম কালেমা শাহাদত তাই এ কালেমাগুলোকে স্ব-স্ব প্রসিদ্ধ নামে লেখা হয়েছে।

যে কালেমা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি তাতে কালেমা তাইয়্যেবার প্রথম অংশ তাওহীদের বাণী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বিদ্যমান আছে; সাথে আরো কয়েকটি বাক্য রয়েছে, যেগুলো তাওহীদের বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট ও দৃঢ় করে প্রকাশ করছে। সুতরাং একে কালেমা তাওহীদ বলতে কোনো অসুবিধা নেই। হাদীস শরীফেও এই কালেমার শব্দগুলোকে তাওহীদ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন– সহীহ মুসলিম (১/৩৯০) সুনানে আবু দাউদ (১/২৬২) ও মুসনাদে আহমদ (৩/৩২০)এ হযরত জাবের (রা.) থেকে বিদায় হজ্বের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তওয়াফ ও তওয়াফের নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর) প্রথমে সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হয় এই পরিমাণ উচ্চতায় আরোহণ করলেন। এরপর তাকবীর দিলেন এবং আল্লাহর তাওহীদ বয়ান করলেন। তিনি বললেন–

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করার পর যে দুআ পড়েছিলেন তাতে আলোচিত কালেমার একটি বিরাট অংশ রয়েছে। দ্বিতীয়ত এতে উল্লেখিত শব্দাবলি দ্বারা আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বর্ণনা করা হয়েছে।

সংযুক্ত নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, 'উক্ত কালেমাকে মনগড়াভাবে 'কালিমাতুত তাওহীদ' বলা হয়েছে, যা সঠিক হয়নি।'

তাদের এ বক্তব্য মারাত্মক ভুল। নিবন্ধের এক জায়গায় তারা নিজেরাই লিখেছেন, 'বরং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কুরআনের তাফসীর ও হাদীসে 'আলকালিমাতুত তায়্যিবাহ' ও 'কালিমাতায়িশ শাহাদাতাইন'কে 'কালিমাতুত তাওহীদ' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন হয়, যখন এই কালেমায় কালেমা তাইয়েবা ও কালেমা শাহাদত-এর তাওহীদের অংশ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' রয়েছে, উপরন্তু তাওহীদের মর্মকে তাকিদকারী আরো কিছু বাক্য তাতে রয়েছে তাহলে একে কালেমা তাওহীদ বললে 'মনগড়াভাবে নাম দেওয়া হয়েছে' বলে আপত্তি করা কি যথার্থ হয়? আর বিদায় হজ্বের উল্লেখিত হাদীসে তো স্পষ্টভাবে এই কালেমার বাক্যগুলোকে তাওহীদ বলা হয়েছে। অতএব এই নামতো হাদীস দ্বারাও সমর্থিত।

একটু চিন্তা করা দরকার, কালেমা হুবহু হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে তাওহীদের কথাই বলা হয়েছে। তাকে (তাদের ভাষায়) 'কালেমা তাওহীদ' বলা ভুল। অথচ কায়েদায়ে বোগদাদীতে যে কালেমা 'কালেমা তাওহীদ' নামে লেখা হয়েছে তার ব্যাপারে তারা ওই নিবন্ধেই স্বীকার করেছেন যে, 'এই কালেমা হুবহু এই শব্দে কোন আয়াত বা হাদীসে উল্লেখ নেই।' তাহলে কি তারা বলতে চান, যে কালেমার শব্দগুলো পরবর্তী লোকেরা রচনা করেছেন তাকে 'কালেমা তাওহীদ' বলা যাবে; কিন্তু যে কালেমার শব্দাবলি হুবহু হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে এবং হাদীসেই সেই শব্দাবলিকে তাওহীদ বলা হয়েছে তাকে কালেমা তাওহীদ বলা ভুল? নাউযুবিল্লাহ!

জেনে রাখবেন, শরীয়তের পরিভাষায় কালেমা তাওহীদ নামটি শুধু কালেমা তাইয়েবার জন্য নির্ধারিত নয়; বরং খালেস তাওহীদ অর্থবোধক যেকোনো 'মাসূর' তথা কুরআন হাদীসে উল্লেখিত কালেমাকেই 'কালেমা তাওহীদ' বলা যায়। যেমন, হজ্বের তালবিয়া, যা হাদীস ও সুন্নতে মুতাওয়ারাসা দ্বারা প্রমাণিত এবং যা প্রত্যেক হাজীর ওযীফা, তাতে যদিও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বাক্যটি নেই, কিন্তু যে বাক্যগুলো রয়েছে অর্থাৎ 'লা-শারীকা লাকা' এবং 'ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা

ওয়াল্‌মুল্‌ক্' তাতে তাওহীদের কথা রয়েছে। তাই একে হাদীস শরীফে 'তাওহীদ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ (৩/৩২০)-এ সহীহ সনদে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "... এরপর যখন বাইদা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন তিনি 'তাওহীদ'-এর আওয়াজ বুলন্দ করলেন। বললেন, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...।"

কালেমা তামজীদ

এই নামে নূরানী কায়েদায় নিম্নোক্ত যিকির-দুআ উল্লেখিত হয়েছে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

এই বাক্যগুলো হুবহু এভাবেই সুনানে আবু দাউদ ১২১, সুনানে নাসায়ী ১/১০৭, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৫৬, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/১১৭সহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া 'সুব্‌হানাল্লাহি ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' এই অংশ এবং 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি' এই অংশ ভিন্ন ভিন্নভাবে হাদীসের প্রায় প্রতিটি বড় কিতাবেই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, সহীহ বুখারী ২/৯৪৪ ও ৯৪৮; সহীহ মুসলিম ২/৩৪৫, ২/৩৪৬-৩৪৭

তামজীদ অর্থ আল্লাহ তাআলার মহিমা ও বড়ত্ব প্রকাশ করা। তাঁর মর্যাদা, দয়া ও দানের কথা বর্ণনা করা। –আলকাশিফ শরহে মিশকাত, তীবী ৫/৪৫; মিরকাত শরহে মিশকাত ৫/৯০, ৫৭

ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন, "আল্লাহর জালাল (মহিমা ও বড়ত্ব) নির্দেশক গুণাবলি দ্বারা তাঁর প্রশংসা করাকে তামজীদ বলে।" –শরহে মুসলিম ১/১৭১

আলকাশিফ শরহে মিশকাত, তীবী গ্রন্থে (২/৩০৬) এবং মিরকাত শরহে মিশকাত গ্রন্থে (২/২৮৫) এভাবেই তামজীদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ('মাজ্জাদানী আব্দী' হাদীসের অধীনে)

আল্লাহ তাআলার জালাল (মহিমা ও বড়ত্ব) প্রকাশের জন্যে শরীয়ত যে সকল যিকির ও দুআ শিক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে উপরোক্ত দুআটি (আলোচিত কালেমায়ে তামজীদ)ও রয়েছে। সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭০, কিতাবুল আদব (বাবু ফাযলিত তাসবীহ) মুসনাদে আহমাদ ৪/২৬৮-এ সহীহ সনদে হযরত নুমান ইবনে বাশীর

(রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে–

إنَّ مِمَّا تَذْكُرُوْنَ فِي جَلَالِ اللّٰهِ: التَّسْبِيْحَ وَالتَّهْلِيْلَ وَالتَّحْمِيْدَ، يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تَذْكُرُ بِصَاحِبِهَا، أمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَوْ لَا يَزَالُ لَهُ مَنْ يَذْكُرُ بِهِ.

মুসনাদে আহমাদ ৪/২৬৮-এ এই হাদীসে 'তাহ্মীদ'এর সাথে 'তাকবীর'-এর কথাও আছে।

এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলার জালাল ও মাজ্দ (মহত্ব ও বড়ত্ব) বয়ান করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হল আলোচিত কালেমাটি, যাতে তাসবীহ, তাহ্মীদ, তাহ্লীল ও তাক্বীর রয়েছে।

মিরকাত ৫/৫৭-এ উল্লেখিত হয়েছে যে, 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ'-এর যিকিরও তামজীদ-এর শামিল। এটা স্পষ্ট যে, সুব্হানাল্লাহ, আল্হাম্দুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ'–এসব বাক্যের প্রতিটিই আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব, সম্মান ও মর্যাদা, দান ও অনুগ্রহ বর্ণনা করে। এ বাক্যগুলোতে আল্লাহ তাআলার সব ধরনের তাওহীদ এবং সব ধরনের গুণ (সিফাতে জামাল ও সিফাতে জালাল) বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষ বাক্য 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ'এর মধ্যে বান্দা তার অক্ষমতা এবং রাব্বুল আলামীনের দরবারে তার পূর্ণ সমর্পণ ঘোষণা করেছে। এই বাক্যগুলো সংক্ষেপে আল্লাহ তাআলার সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ধারক হওয়ার কারণে হাদীস শরীফে এগুলোকে কুরআনের পর সর্বোত্তম বাক্য এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাণী বলা হয়েছে। সুতরাং যিকিরগুলো আল্লাহ তাআলার মাজ্দ ও জালাল অর্থাৎ বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশের উত্তম উপায়–এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব বুযুর্গগণ যদি এই যিকির ও দুআকে কালেমা তামজীদ (আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনার কালেমা) নামে উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে তাঁরা ভুল করেননি; বরং একটি বাস্তব বিষয়ই প্রকাশ করেছেন। এতে আপত্তির কিছু নেই।

অবশ্য কেউ যদি এই দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলার তামজীদ (বড়ত্ব ও মহত্ত্ব) প্রকাশের একমাত্র দুআ এটি বা এই দুআকে কালেমায়ে তামজীদ নামেই উল্লেখ করতে হবে, অন্য কোনো নাম দেওয়া যাবে না; তাহলে তার দাবি ভুল হবে।

প্রেরিত নিবন্ধে এই আপত্তি করা হয়েছে যে, "তাফসীরে ইবনে কাসীর-এ

কুরআন কারীমের এ আয়াত– فَسُبۡحَانَ اللّٰهِ حِيۡنَ تُمۡسُوۡنَ وَحِيۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ-এর তাফসীরে এবং মিশকাতুল মাসাবীহ-এর ২০০ পৃষ্ঠায় 'বাবুত তাসবীহি ওয়াত-তাহমীদি ...'-এ একে 'আরবাউ কালিমাত' বলে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ২০২ পৃষ্ঠায় 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'কে দুআউন কানযিম মিন কুনুযিল জান্নাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।"

তাদের এ আপত্তির ব্যাপারে আমাদের প্রথম নিবেদন এই যে, এখানে তাফসীরে ইবনে কাসীর-এর ভুল উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের উল্লেখিত স্থানে এই দুআকে 'আরবাউ কালিমাত' বা চার কালেমা বলা সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। অবশ্য মিশকাত কিতাবে এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, 'সর্বোত্তম বাক্য চারটি।' 'আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় বাক্য চারটি।'

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাদের আপত্তির কারণ সুস্পষ্ট নয়; তবে কথার ধরনে মনে হয়, তারা বলতে চান যে, উক্ত দুআয় যেহেতু চারটি কালেমা রয়েছে, তাই একে 'কালেমায়ে তামজীদ' বলা হলে চারকে এক বলা হয়। এটিই যদি তাদের আপত্তির কারণ হয় তাহলে বলব, পৃথক পৃথক বাক্য হিসাবে এই দুআর মধ্যে যদিও চারটি বাক্য রয়েছে, কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় একাধিক বাক্যের সমষ্টির উপরও কালেমা শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে এবং হয়েও থাকে; বিশেষত যখন 'কালেমায়ে তামজীদ' শব্দ দুটি ইলমে নাহুর দৃষ্টিতে 'তারকীবে এযাফী।' 'কালেমাতুত তামজীদ' ও 'কালেমাতুন লিত-তামজীদ'–এ দুই শিরোনামের মাঝে যে পার্থক্য তা আলেমমাত্রই বোঝেন। তাই এখানে কালেমার অর্থ একটি বাক্য নয়; বরং কালেমা দ্বারা সাধারণ পরিভাষার কালেমা অর্থাৎ 'কথা' উদ্দেশ্য। এ অর্থে একাধিক বাক্যের উপরও কালেমা শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে; বরং কখনো কখনো দীর্ঘ প্রবন্ধকেও আরবী ভাষায় কালেমা বলা হয়। তাছাড়া সেই নিবন্ধেই 'আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ...'কে কালেমা শাহাদত লেখা হয়েছে অথচ তাতে দুটি বাক্য রয়েছে। একটি তাওহীদের সাক্ষ্য সম্পর্কিত, অপরটি রিসালাতের সাক্ষ্য সম্পর্কিত। এ কারণেই নিবন্ধকার আরবীতে 'কালিমাতাইশ শাহাদাতাইনি' লিখেছেন। অর্থাৎ শাহাদতের দুটি কালেমা। কিন্তু বাংলায় লিখেছেন কালেমায়ে শাহাদত; তাহলে কি এখানে দুইকে এক বলা হল? তেমনি কালেমা তাইয়েবার মধ্যেও দুটি বাক্য রয়েছে– ১. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ২. 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' এরপরেও এটাকে 'কালিমাতানি তায়্যিবাতানি' তথা দুটি কালেমা তাইয়েবা বলা হয় না; বরং কালেমা তাইয়েবাই বলা হয়। অতএব আলোচ্য কালেমা সম্পর্কে এই আপত্তি অর্থহীন।

'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' সম্পর্কে মিশকাত শরীফে (জামে তিরমিযীর বরাতে) বর্ণিত আছে- "তোমরা বেশি বেশি 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়। কেননা এটা জান্নাতের ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত।"

এখানে কালেমাটির ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে; তার নাম বলা হয়নি। ফযীলতের বিচারে যে কালেমা জান্নাতের ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত তাতে যদি আল্লাহ তাআলার মাজ্‌দ ও জালাল বর্ণনা করা হয় তাহলে বিষয়বস্তুর বিচারে তাকে কালেমায়ে তামজীদ বলা হলে এতে সমস্যার কী আছে? কায়েদায়ে বোগদাদীতে যে কালেমাকে কালেমায়ে তামজীদ বলা হয়েছে তার ব্যাপারে খোদ নিবন্ধকার স্বীকার করেছেন যে, এই কালেমার অর্থ কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও হুবহু এই শব্দে তা কুরআন হাদীসে নেই। উপরন্তু তাতে নূরানী কায়েদায় উল্লেখিত কালেমার মতো আল্লাহ তাআলার মাজ্‌দ ও জালাল- বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশক এতগুলো বাক্যও নেই। এরপরেও কায়েদায়ে বোগদাদীর কালেমাটিকে 'কালেমায়ে তামজীদ' নাম দেওয়া হয়েছে এবং একে কোন দোষের বিষয় মনে করা হয়নি। কিন্তু যে কালেমার শুধু অর্থ নয় শব্দগুলোও হুবহু হাদীস শরীফে রয়েছে এবং তাতে তামজীদের এক দুইটি নয় পাঁচটি বুনিয়াদী বাক্য একসাথে রয়েছে তাকে কালেমায়ে তামজীদ নাম দেওয়ার উপর আপত্তি করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই সংশোধন করা উচিত।

ঈমানে মুজমাল

এই শিরোনামে যে আরবী বাক্যটি লেখা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল আরবী ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে কেউ যদি ঈমানের কথাগুলো প্রকাশ করতে চায় তাহলে সে কীভাবে করবে। এই উদ্দেশ্যে কোনো বুযুর্গ এই আরবী বাক্য তৈরি করেছেন-

آمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ.

কেউ 'ওয়াআর্‌কানিহী' শব্দটি এর সাথে যুক্ত করে এভাবে বলেছেন- 'ওয়াকাবিলতু জামিআ আহ্‌কামিহী ওয়াআর্‌কানিহী।'

উভয় বাক্যের মর্ম এক। কেননা আহকামের মাঝে 'আরকান' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা 'আরকান' আল্লাহ তাআলার হুকুমেই আরকান হয়েছে। তাই আরকান শব্দটি উল্লেখ না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা তা আহকামেরই অংশ বিশেষ। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে এই আপত্তিও উত্থাপন করা

হয়েছে যে, "উক্ত কালেমাটি কুরআন হাদীসের আলোকে পরিপূর্ণ হয়নি। যেহেতু এ থেকে শেষ অংশ 'ওয়াআর্‌কানিহী' শব্দ বিয়োজন করা হয়েছে, যা বাদ দিলে পূর্ণ মুমিন ও মুসলমান হতে পারবে না। কেননা ইসলামের 'আর্‌কানে খামসা' বিশ্বাস করা ফরয।"

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

১. আলেম মাত্রই একথা জানেন যে, ঈমানে মুজমালের উল্লেখিত বাক্যে 'আহকাম' শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। এতে আকায়েদ ও আরকান থেকে শুরু করে শরীয়তের ছোট বড় সব হুকুম শামিল রয়েছে। এজন্যে আরকান শব্দ আলাদাভাবে উল্লেখ না করা ভুল নয়। যদি ভুলই হত তাহলে আকায়েদ তো আরকান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে 'ওয়াআকায়িদিহী' শব্দটিও বাড়ানো উচিত ছিল অথচ কায়েদায়ে বোগদাদীতে এ রকম করা হয়নি। তাহলে কি বলা হবে যে, কায়েদায়ে বোগদাদীতে উল্লেখিত ঈমানে মুজমাল ভুল? প্রকৃত বিষয় এই যে, আহকাম শব্দের মাঝেই আকায়েদ, আরকান ও অন্য সব হুকুম শামিল রয়েছে।

২. সেই নিবন্ধেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আহকাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, হালাল-হারাম। এরপর বলা হয়েছে যে, ইসলামের পাঁচ রোকনের উপর ঈমান আনা ফরয। তাহলে ইসলামের রোকনগুলো কি তাদের কথা অনুসারে আহকামের মধ্যে শামিল হল না? আরো দেখুন, উভয় কায়েদায় যে ঈমানে মুফাসসাল রয়েছে তাতে তো আরকান ও আহকাম কোনোটির কথাই উল্লেখ নেই। তাহলে কি ঈমানে মুফাসসালকে ভুল বলা হবে? নাকি বলা হবে যে, 'ওয়া-কুতুবিহী ওয়া-রুসুলিহী'এর অধীনে আরকান-আহকাম সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত?

৩. বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সংক্ষিপ্তভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তির জন্য শরীয়ত কালেমা শাহাদত শিক্ষা দিয়েছে। অল্প কথায় ঈমান প্রকাশের জন্যে এতটুকু যথেষ্ট। এজন্যে এর দ্বারাও ঈমানে মুজমালের কাজ হয়ে যায়। কুরআন হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে– 'রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়াবি-মুহাম্মাদিন রাসূলাওঁ ওয়াবিল-ইসলামি দীনা' অথবা 'আমান্‌তু বিল্লাহ' বা 'আমান্‌তু বি-রাব্বিল আলামীন'–এ ধরনের বাক্যও সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট। দেখুন, সূরা আরাফ ১২১; মুসলিম শরীফ ১/৪৮; মুজামে আওসাত, তবারানী ৮/২২৯-২৩০, হাদীস ৭৪৬৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৫৩

এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত ওই সব ঘটনা তো প্রসিদ্ধ যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো সম্পর্কে জানা দরকার মনে করতেন যে, সে মুমিন কি মুমিন নয়, তখন শুধু তাওহীদ ও রিসালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন।

যদি সে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিত তাহলে তার মুমিন হওয়ার ঘোষণা দিতেন। তাই একথা ভালোভাবে বুঝা উচিত যে, সংক্ষেপে ঈমান প্রকাশ করার জন্যে মকতবের কায়েদাগুলোতে লিখিত আরবী বাক্যগুলোই নির্ধারিত নয়; বরং এই স্বীকারোক্তি যেকোনো শরীয়তসম্মত পন্থায় হতে পারে। ফাতাওয়া আলমগীরীতে (২/২৫৭) উল্লেখিত নিম্নোক্ত মাসআলা থেকেও তা বুঝে আসে–

وفي فتاوى النسفي: سئل عن امرأة قيل لها: توحيد مي داني؟ فقالت: لا، إن أرادت أنها لا تحفظ التوحيد الذي يقوله الصبيان في المكتب لا يضرها، وإن أرادت لا تعرف وحدانية الله تعالى فليست بمؤمنة ولا يصح نكاحها.

ঈমানে মুফাসসাল

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

ঈমানে মুফাসসাল নামে উভয় কায়েদায় উপরোক্ত বাক্যগুলোই উল্লেখিত হয়েছে। এই আরবী বাক্যগুলোর উদ্দেশ্য হল, ইসলামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আকীদা সহজভাবে শিক্ষাদান এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপনের মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদানের জন্য একটি সহজ পাঠ নির্ধারণ। যে আকীদাগুলো উল্লেখিত হয়েছে, তা 'হাদীসে জিব্রীল' নামে প্রসিদ্ধ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। হাদীসটি এই–

"একদিন জিব্রীল আলাইহিস সালাম মানুষের সুরতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সামনে এসে বসলেন। এরপর উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নবীজীকে দ্বীনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি ছিল ঈমান সম্পর্কিত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কাকে বলে? নবীজী উত্তরে বললেন, ঈমান এই যে–

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

"তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর ফেরেশতা ও কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর রাসূলগণ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনবে এবং ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হওয়ার বিশ্বাস রাখবে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিশ্বাস রাখবে।" –সহীহ মুসলিম ১/২৭; সুনানে আবু দাউদ ৬৪৫; সহীহ ইবনে হিব্বান ১/৩৯০; আলমুজামুল কাবীর, তাবারানী ১২/৩৩০, হাদীস ১৩৫৮১ (واللفظ مأخوذ من مجموع رواياتهم)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে যে সকল বুনিয়াদী বিষয়ের উপর ঈমান আনার কথা বিশেষভাবে বলেছেন, এগুলোকে যদি কোনো মুসলিম মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে মুখে প্রকাশ করতে চায় তাহলে তা এভাবেই তো করবে–

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

"আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, কেয়ামত দিবসের প্রতি, তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়–একথার প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি।"

সহীহ মুসলিম (২/৩৯৭) এবং সুনানে তিরমিযীতে (২/৫০) উল্লেখিত অন্য একটি হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানেই এ শব্দগুলো রয়েছে–

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো দুটি কথা নিবেদন করব– (১) হাদীসে জিব্রীলের বিভিন্ন রেওয়ায়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলোর সাথে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ, জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব, মিযান–এগুলোর কথাও রয়েছে।

প্রথম কথাটি বুখারী শরীফের (১/১২) বর্ণনায় রয়েছে। আর অন্যগুলো মুসনাদে আহমাদ (১/৩১৯, ২/১২৯) এবং মুসনাদে বাযযার–মাজমাউয যাওয়ায়েদ (১/৩৮-৪০)এ এবং অন্যান্য কিতাবের বর্ণনায় রয়েছে। এজন্য উভয় কায়েদার 'ঈমানে মুফাস্‌সাল'-এর শিরোনামে উল্লেখিত আরবী বাক্যগুলোর সাথে এই বিষয়গুলোকেও যোগ করা যেতে পারে।

(২) মুফাস্‌সাল শব্দটির অর্থ বিশদকৃত। মকতবের কায়েদায় উল্লেখিত ওই আরবী বাক্যগুলোকে সম্ভবত এই কারণে ঈমানে মুফাস্‌সাল বলা হয়েছে যে, এতে 'ঈমানে মুজমাল' নামে উল্লেখিত কথাগুলোর চেয়ে তুলনামূলক বেশি বিবরণ রয়েছে নতুবা ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই বোঝেন যে, 'ঈমানে মুফাস্‌সাল'এর বাক্যগুলোও মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত। কেননা এতে ইসলামের সকল আকীদা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর যে কটি আকীদা উল্লেখিত হয়েছে তারও বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি। আর এসব তো শিশুদের জন্য প্রণীত মকতবের কায়েদায় উল্লেখ করার মতও নয়।

في «عمدة القاري» للبدر العيني ٢٩٢/١ عند ذكر الأسئلة والأجوبة: ومنها ما قيل: ظاهر الحديث يدل لى أن الإيمان لا يتم إلا على من صدق بجميع ما ذكر (أي إلا على من أظهر الإقرار باللسان بتصديق جميع ما ذكر) فما بال الفقهاء يكتفون بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله (أي على من تلفظ بالكلمة الطيبة أو بكلمتي الشهادة فقط).

وأجيب بأن الإيمان برسوله هو الإيمان به وبما جاء من ربه. فيدخل جميع ذلك تحت ذلك. انتهى، ونحوه في فتح الباري لابن حجر ١٤٥/١.

কায়েদায়ে বোগদাদীতে উল্লেখিত কালেমা তাওহীদ ও কালেমা তামজীদ সম্পর্কে কিছু কথা

কায়েদায়ে বোগদাদীতে কালেমা তাওহীদ-এর নামে–
لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ واحِدًا لا ثانِيَ لَكَ، مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ إمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

এ আরবী বাক্যটি উল্লেখিত হয়েছে এবং কালেমায়ে তামজীদের শিরোনামে– لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ نُوْرًا يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ، مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ إمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ. এই কথাগুলো লিখিত আছে।

এই দুই কালেমা সম্পর্কে প্রেরিত নিবন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সঠিক। সেখানে বলা হয়েছে, "এগুলোর অর্থ তো কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু শব্দসমূহ এভাবে কুরআন হাদীসে নেই।" এই বক্তব্য থেকে আরো পরিষ্কার হয় যে, এই কালেমাগুলোর নামও কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ শব্দগুলোই যখন কুরআন হাদীসে নেই; তো তার নাম থাকার তো প্রশ্নই আসে না। এই বক্তব্য থেকে কালেমা দুটি সম্পর্কে শরয়ী ফয়সালাও জানা যায়। তা এই যে, এই কালেমা দুটির অর্থকে ভুল বলা হারাম। এগুলোতে উল্লেখিত আকীদাগুলো অস্বীকার করলে মানুষ কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু এই কালেমা সম্পর্কে যদি এই দাবি করা হয় যে, এগুলো কালেমা তাইয়েবা ও কালেমা শাহাদতের মতো 'মাসূর' তথা হুবহু শব্দে কুরআন হাদীসে উল্লেখিত কালেমার অন্তর্ভুক্ত, তাহলে তা সম্পূর্ণ ভুল হবে। তেমনি এ কালেমাগুলোর আরবী পাঠকে

কুরআন হাদীসে শিক্ষা দেওয়া শব্দগুলোর মত গুরুত্ব দেওয়া এবং এগুলোকে মকতবের কায়েদায় ও ইসলামী বই-পুস্তকে লেখা জরুরি মনে করা এবং এ নামেই লেখা জরুরি মনে করা জায়েয নয়। তেমনি এই নামগুলোকেই উল্লেখিত আরবী বাক্যসমূহের জন্য নির্ধারিত মনে করা এবং অন্য কোনো 'মাসূর' কালেমার সাথে গ্রহণযোগ্য দলীলের ভিত্তিতেও এই নাম যুক্ত করা ভুল মনে করা এবং যিনি তার বই-পুস্তকে শুধু কিছু 'মাসূর' কালেমা (অর্থাৎ ওই কালেমা যার শব্দ ও মর্ম উভয়টি কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত) লেখেন, তাকে দোষারোপ করা, তার নিন্দা করা এবং তার উপর এই অপবাদ আরোপ করা যে, সে এই কালেমাগুলোতে উল্লেখিত আকায়েদের অস্বীকারকারী, এই কাজগুলো সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

আর কতিপয় লোক যে বলেছেন, কায়েদায়ে বোগদাদীতে উল্লেখিত কালেমা তামজীদ নূরানী বইতে উল্লেখ না করার অর্থ হল, তারা কাদিয়ানিদের মতো খতমে নবুওয়ত অস্বীকারকারী–এটা চূড়ান্ত অজ্ঞতা ও মারাত্মক মিথ্যা অপবাদ। আলেমগণের যিম্মাদারি হল সাধারণ মানুষকে সঠিক কথা বুঝানো, যাতে তারা এ ধরনের প্রকাশ্য মূর্খতা পরিহার করে। খতমে নবুওয়তের আকীদা ইসলামের অকাট্য ও সর্বজনবিদিত আকীদা। এই আকীদা অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের। এ বিষয়টি মুসলিম মাত্রই জানেন। তারা আরো জানেন যে, কাদিয়ানি সম্প্রদায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী না-মানার কারণে কাফের ও বিধর্মী।

'নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা' পুস্তিকায় খতমে নবুওয়তের আকীদা সরাসরি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে, যা বাচ্চাদেরকে অর্থসহ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পুস্তিকায় (পৃ. ৮০, হাদীস ৩৩) নিম্নোক্ত হাদীসটি অর্থসহ উল্লেখিত হয়েছে–

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

"আমি শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী নেই।"

কোনো কায়েদায় যদি কোনো একটি কালেমা উল্লেখিত না হয়, যদিও তা মাসূর হয়ে থাকুক না কেন, এর অর্থ কখনোই এই নয় যে, এ কায়েদার সংকলক এবং এই কায়েদা যিনি পড়ান এবং যাদেরকে পড়ান তারা সবাই ওই কালেমাটি অস্বীকার করে। যেমন যেকোনো কায়েদা বা যেকোনো কিতাবে একটি আকীদা লিখিত না থাকার অর্থ কখনোই এই নয় যে, কিতাবের লেখক, পাঠক ও শিক্ষক সবাই ওই আকীদা অস্বীকার করেন (নাউযুবিল্লাহ!)। এ তো এতই স্পষ্টকথা, যা বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই।

ইসলামের অনেক স্বতঃসিদ্ধ ও অকাট্য আকীদা রয়েছে যেগুলো কায়েদায়ে বোগদাদীতে অনুপস্থিত। তাহলে কি এই কায়েদা পাঠকারী ও শিক্ষাদানকারীদেরকে ওই আকীদাগুলোর অস্বীকারকারীর হবে? কায়েদায়ে বোগদাদীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী হওয়ার কথা আছে; কিন্তু তাঁর আরো যে একশরও বেশি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা তো উল্লেখিত হয়নি। এই কায়েদায় নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার আকীদা নেই। হিসাব, মীযান, আমলনামা, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নামের আকীদাগুলোও আছে কি? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের ব্যাপকতা তথা সারা জাহানের জন্যে তাঁর নবী হওয়ার আকীদা যা وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ এবং وما اَرسلناك اِلّا كافّةً لِلنّاسِ আয়াত দুটিতে রয়েছে এবং নবীজী হাদীস শরীফে وَبُعِثْتُ إلى النَّاسِ كَافَّةً ইরশাদ করে যে বিষয়ের ঘোষণা দিয়েছেন, তা-ও এই কায়েদায় উল্লেখিত হয়নি। তাহলে কি এই কায়েদা পাঠকারী, শিক্ষাদানকারী সবাই এই আকীদাগুলোর অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবেন? শিশুদের জন্য রচিত কোনো কোনো পুস্তিকায় 'কালেমায়ে রদ্দে কুফর' নামে একটি কালেমা আছে, কিন্তু কায়েদায়ে বোগদাদীতে তা নেই। তাহলে কি কায়েদায়ে বোগদাদীর পাঠকারী ও শিক্ষাদানকারীদেরকে এই কালেমা অস্বীকারকারী বলা যাবে? ইনসাফের সাথে চিন্তা করলে এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ।

মূল প্রশ্নের উত্তর

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকেই মূলত সব প্রশ্নের উত্তর সামনে এসে গেছে। এরপরও সহজে বোঝার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে সকল প্রশ্নের ধারাবাহিক উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

(১) এ প্রশ্নের উত্তর কিছুটা বিস্তারিতভাবে দেওয়া হল–

(ক) কালেমা তাইয়েবা উভয় কায়েদায় একই রকম রয়েছে এবং এমন হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা এই কালেমা উল্লেখিত শব্দেই হাদীস ও সুন্নতে মুতাওয়াতিরা দ্বারা প্রমাণিত। তেমনি ঈমানে মুফাস্‌সাল-এর আরবী বাক্য উভয় কায়েদায় একই রকম।

(খ) কালেমায়ে শাহাদত-এর পাঠ দুই কায়েদায় যেভাবে রয়েছে দু'টোই সম্পূর্ণ সহীহ এবং দু'টোই 'মুতাওয়াতিরে মা'নবী'এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাই কোন্‌টির সনদ অধিক সহীহ–এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। তবে নূরানী কায়েদায় উল্লেখিত পাঠ অধিক সংখ্যক সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু

উভয় পাঠই হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, তাই যেটিই গ্রহণ করা হোক আপত্তির কিছু নেই। আর একথা তো বলাইবাহুল্য যে, কোনো একটি পাঠ গ্রহণ করার অর্থ কখনো এই নয় যে, অন্য পাঠ অস্বীকার করা হল। তাই নূরানী কায়েদার রচয়িতা বা কায়েদায়ে বোগদাদীর রচয়িতা কারো সম্পর্কেই এই অভিযোগ করা যায় না যে, তারা অপর পাঠটি প্রত্যাখ্যান করেছেন বা অস্বীকার করেছেন। তাই এ বিষয়ে বিতর্কে জড়ানোর কোনো অবকাশ নেই।

(গ) ঈমানে মুজমালের আরবী বাক্য কোন কায়েদারটিই 'মাসূর' (হাদীস শরীফে হুবহু উল্লেখিত) নয়। তাই এই দুইটি একই শ্রেণীর। আর অর্থের বিচারে দু'টোই সহীহ। এই কালেমার উদ্দেশ্য উভয় বাক্য দ্বারাই অর্জিত হয়।

(ঘ) কালেমায়ে তামজীদ ও কালেমায়ে তাওহীদ-এর শিরোনামে যা কিছু কায়েদায়ে বোগদাদীতে লেখা হয়েছে তা অর্থের দিক থেকে সম্পূর্ণ সহীহ। তবে এগুলোর শব্দ ও নাম কোনোটিই কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাছাড়া আরবী ভাষাগত দিক থেকে এই বাক্যগুলোতে 'ফাসাহাতের' কমতি রয়েছে। যা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

পক্ষান্তরে নূরানী কায়েদায় এই দুই শিরোনামে যে কালেমা দুটি উল্লেখিত হয়েছে তা হুবহু হাদীস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে। আর প্রত্যেক কালেমার জন্য নির্ধারিত শিরোনাম বিভিন্ন হাদীসের ইঙ্গিত থেকে গৃহীত। তাই এক্ষেত্রে নূরানীর কালেমাগুলো বোগদাদী থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। তবে বোগদাদী কায়েদায় উল্লেখিত কালেমা দুটির অর্থও সম্পূর্ণ সঠিক। তাই এর পাঠকারী ও শিক্ষাদানকারী কাউকেই কটূক্তি করা যাবে না।

(ঙ) একথা একেবারেই ভুল যে, পরিপূর্ণ কালেমা তাইয়েবা একসাথে কোনো হাদীসে নেই। একাধিক সহীহ বা হাসান হাদীসে একসাথে পূর্ণ কালেমা তাইয়েবা বিদ্যমান রয়েছে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

(২) অবশ্যই ঠিক হবে। কিন্তু কেউ যদি কায়েদায়ে বোগদাদী পড়ায় তাহলে তাকে মন্দ বলা যাবে না। তবে এটির পদ্ধতি কিছুটা দুর্বোধ্য। আর এখন অনেক সহজ ও নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। তাছাড়া এই কায়েদায় কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে যা শিশুদের খাটুনি বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনো কাজে আসে না। এজন্যে আদবের সাথে মকতব পরিচালনাকারীদেরকে এই পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে, তারা যেন গবেষক আলেম ও অভিজ্ঞ কারীগণের তত্ত্বাবধানে কায়েদায়ে বোগদাদীর একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করেন।

(৩) কায়েদায়ে বোগদাদীতে একাধিক কালেমা রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন কোন্‌টির ব্যাপারে? সংক্ষিপ্তভাবে মৌলিক কথা এই যে, ঈমানের সম্পর্ক প্রথমত অন্তর থেকে ইসলামী আকীদাসমূহ বিশ্বাস করার সাথে। এরপর মুখে কমপক্ষে কালেমা তাইয়েবার বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি। এজন্য কালেমায়ে শাহাদত কমপক্ষে একবার পড়া জরুরি। এটা ছাড়া অন্য কোনো কালেমা শুধু না পড়ার কারণে কারো সম্পর্কে ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার ধারণা পোষণ করা ভুল। বিশেষত কেউ যদি কোনো 'গায়রে মাসূর' তথা হাদীস শরীফে উল্লেখিত নয় এমন কোনো কালেমাকে গায়রে মাসূর হওয়ার কারণে না পড়ে, কিন্তু তাতে উল্লেখিত ইসলামী আকীদাগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তাহলে তার উপর আপত্তি করার কোনো অবকাশ নেই।

(৪) কালেমা তাইয়েবার একাধিক নাম শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কালেমায়ে শাহাদতকে হাদীস শরীফে 'শাহাদত' ও 'তাশাহ্হুদ' শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব এই দুই কালেমার নাম স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর অন্যান্য কালেমার নাম বা শিরোনাম অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে সহজতার জন্যে বুযুর্গগণ নির্ধারণ করেছেন। একারণে এই বিষয়গুলোকে ঝগড়া-বিবাদের কারণ বানানো কখনো উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মাঝে ঐক্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মহব্বত দান করুন, আমীন।

* * *

এ ফত্ওয়াটি লেখার পর একটি ফত্ওয়া সংকলন– 'ফাতাওয়া উসমানী' নজরে পড়ল। এটি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম (সাবেক বিচারপতি, শরীয়া আপিল ব্রাঞ্চ, সুপ্রিম কোর্ট পাকিস্তান)এর নিজের লিখিত ফত্ওয়াসমূহের সংকলন। এই সংকলনটিতেও আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর রয়েছে। মাওলানা উসমানী যেহেতু বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব তাই তাঁর ফত্ওয়াটির বাংলা অনুবাদও এখানে উল্লেখ করা হল।

"**প্রশ্ন :** যখন কোনো মানুষ কালেমা তাওহীদ (কালেমা তাইয়েবা) পড়ল তো সে মুসলমান হয়ে গেল। এরপর নামায-ওযীফা ইত্যাদির ছোট ছোট পুস্তিকায় যে দুআ-কালেমা লিপিবদ্ধ আছে এবং যা শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়–এ কালেমাগুলো ইসলামের বুনিয়াদ হিসাবে পরিগণিত হবে কি না? এই কালেমাগুলো যদি কারো মুখস্থ না থাকে তবে তার মুসলমান হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : মূলত ওই সব আকীদাই হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদ, যা ঈমানে মুফাস্‌সালে উল্লেখিত হয়েছে। এজন্যে সেই আকীদাগুলোর উপর ঈমান রাখা মুসলমান হওয়ার জন্য জরুরি। তেমনি কালেমা তাওহীদ (কালেমা তাইয়েবা) বা কালেমা শাহাদতের মাধ্যমে যেহেতু সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান প্রকাশ করা হয়, তাই প্রত্যেক মুসলমানেরই তা মুখস্থ থাকা জরুরি। এছাড়া অন্যান্য কালেমা যা বিভিন্ন পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে সেগুলো মূলত শিশুদেরকে সহজভাবে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে নতুবা এগুলোর বিধান কালেমা তাওহীদ, কালেমা শাহাদত ও ঈমানে মুফাস্‌সাল-এর মতো নয়। যদি এই কালেমাগুলো মুখস্থ না থাকে তবে ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে যেহেতু এগুলোর মধ্যে যে বাক্যগুলো কুরআন হাদীসে রয়েছে তা পাঠ করা সওয়াবের কারণ; তাই মুসলমানদের উচিত এই কালেমাগুলো বারবার পাঠ করা এবং শিশুদেরকেও এই কালেমাগুলো শিখিয়ে দেওয়া।

আর বিভিন্ন পুস্তিকায় কালেমায়ে ইস্তিগফারের মাঝে ভিন্নতার কারণ হল হাদীস শরীফেই ইস্তিগফার বিভিন্ন শব্দে রয়েছে। সেসব শব্দের যেকোনোটিই গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা অর্থের দিক থেকে এগুলোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

হাদীস শরীফে যেমন দরূদ শরীফ বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি ইস্তিগফারের বিষয়টিও। তাই এ ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া মারাত্মক অন্যায়। মুসলমানদের এজাতীয় বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। –ফাতাওয়া উসমানী ১/৫৭, ৫৮#

[সেপ্টেম্বর '০৬ঈ.]

বাইতুল মুকাররমের মিম্বারে কালেমার অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা
কালেমার মূল দাবিই পরিত্যক্ত

গতকাল ২০/০৩/২০১০ঈ. শনিবার একটি দৈনিক পত্রিকায় চোখ বুলাতে গিয়ে দেখলাম, বাইতুল মুকাররম মসজিদের জুমার বয়ান ছাপা হয়েছে। বয়ানের বিষয়বস্তু ছিল কালেমা তাইয়েবা ও কালেমা শাহাদতের ব্যাখ্যা। এ প্রসঙ্গে সর্বসাকুল্যে যে কথাগুলি এসেছে তা ওই পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি।

"কালেমা শাহাদতের ১ম অংশের মর্ম হল– মহান রাব্বুল আলামীন হলেন একক, অবিনশ্বর, নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, যাবতীয় পরিপূর্ণ গুণাবলির আধার, যাবতীয় ত্রুটিপূর্ণ গুণাবলি হতে মুক্ত, পবিত্র; বিশ্বের কোন বস্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তির বাইরে নয় এবং তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে পূর্ণ অবগত। তিনি হলেন সৃষ্টির প্রতি অতিশয় দয়াবান ও অনুগ্রহশীল, বান্দার উপর চির বিজয়ী ও তার ক্রোধের উপর বিজয়ী, বিরাট ক্ষমাশীল, শিল্প কৌশল মহা বিজ্ঞানময়, অনুপম, তিনি বিশেষ কোন স্থানে সমাসীন নন, কালচক্রের ঊর্ধ্বে, তিনি আসমান-জমিনের আলো, ভাগ্য নির্ধারণকারী, বান্দার রিযিকদাতা, মৃত্যুদাতা, মহাজ্ঞানী, মহাব্যবস্থাপক, আরও অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণের অধিকারী। কালেমা শাহাদতের দ্বিতীয় অংশের মর্ম হল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ পাকের খাস বান্দা ও তাঁর রাসূল। রাসূল ও নবী সিলসিলার সর্বশেষ রাসূল ও নবী, তিনি সত্যবাদী অদৃশ্য জগৎ ও শরীয়তের আহকাম বর্ণনার ক্ষেত্রেও বিশ্বস্ত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অন্য কোন মানুষের তুলনা চলে না। তুলনা করলে তা হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবি। তাঁর উপর অবতীর্ণ কালাম তথা কুরআন হল আল্লাহ তাআলার কালাম তথা অবিনশ্বর।"
–দৈনিক ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ২

কালেমায়ে শাহাদতের ব্যাখ্যায় যে কথাগুলি বলা হয়েছে তা ভুল নয়। কিছু জায়গায় যদিও আল্লাহ তাআলার ছিফাত ও গুণাবলির জন্য যথার্থ শব্দ ব্যবহার করা

সম্ভব হয়নি, তবে মূল আপত্তি সেখানে নয়। মূল প্রশ্নটি হচ্ছে, কালেমায়ে শাহাদতে তাওহীদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার দাবি কি শুধু এটুকুই যে, আল্লাহ তাআলাকে খালিক ও রাযযাক (সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা) বলে স্বীকার করা এবং তাঁর গুণাবলি ও আসমায়ে হুসনার প্রতি ঈমান রাখা?

বস্তুত কালেমায়ে তাওহীদ ও কালেমায়ে শাহাদতের মূল অর্থ এবং এ দুই কালেমার প্রধান দাবিই উপরোক্ত বয়ানে অনুল্লেখিত। তা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, ইবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহ। তাই কর্মগত, বিশ্বাসগত ও চেতনাগত যত বিষয় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত সব একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব, তাসবীহ-তাহলীল, যিকির, কুরআন তেলাওয়াত, মান্নত, কুরবানী, দুআ, ইস্তিগাছা ও ইস্তিআনাত ইত্যাদি সকল কিছু একমাত্র আল্লাহরই জন্য হতে পারে, আর কারো জন্য হতে পারে না। اياك نعبد واياك نستعين।

এ জন্য গায়রুল্লাহর নাম জপা, গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা, গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রাণী জবাই করা, হজ্বের 'হাদী'র মত কোন দরবারের জন্য প্রাণী উৎসর্গ করে সাথে করে নিয়ে যাওয়া, গায়রুল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করা, পার্থিব উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের কোন বিষয় গায়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, গায়রুল্লাহকে প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদাপদ থেকে মুক্তি দানকারী মনে করা, কবরকে সেজদা করা, কবরের তাওয়াফ করা, কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট হাজত প্রার্থনা করা–এই সকল কাজ হচ্ছে শিরক।

মোটকথা, তাওহীদের অপরিহার্য কিছু বৈশিষ্ট্য, যা বান্দার মধ্যে বিদ্যমান থাকা একান্ত জরুরি তা হচ্ছে–

১. একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে খালিক-মালিক ও রাব্বুল আলামীন বলে বিশ্বাস করবে এবং একমাত্র তাঁকেই বিশ্বজগতের সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক বলে বিশ্বাস করবে। একমাত্র তিনিই হায়াত-মওত এবং সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক।

জগতের কোন বস্তু ও উপকরণকে স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক মনে করবে না; বরং এই বিশ্বাস রাখবে যে, জগতের সকল উপায়-উপকরণ আল্লাহরই সৃষ্টি এবং এসবের দ্বারা যে ফলাফল প্রকাশ পায় তা তাঁরই ইচ্ছা ও আদেশে হয়।

২. একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ জানাবে। ইবাদত ও ইস্তিআনাত একমাত্র তাঁরই হক বলে বিশ্বাস করবে। আশা ও ভয় এবং ভরসা ও সমর্পণে অন্য কোন কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না।

৩. একমাত্র তাঁকেই সর্বোচ্চ বিধানদাতা ও শর্তহীন আনুগত্যের হকদার বলে

বিশ্বাস করবে এবং একমাত্র তাঁর শরীয়তকে অনুসরণযোগ্য বলে মনে করবে।

কোন ব্যক্তি তাওহীদের উপর আছে তা প্রমাণ হওয়ার জন্য উপরোক্ত সকল বিষয়ে ঈমান থাকা জরুরি, যা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তাআলা, হাকিম ও বিধানদাতা আল্লাহ তাআলা, আমাদের সকল কাজের নিয়ন্ত্রণ এবং আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতা আল্লাহ তাআলার হাতে এবং আমাদের ইলাহ ও মাবূদ আল্লাহ তাআলা।

এই সকল কথা কুরআন মজীদের বহু আয়াতে এবং হাদীস শরীফের অসংখ্য জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। কালেমায়ে তাওহীদ ও কালেমায়ে শাহাদতেও এই বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তবে কালেমার 'ইবারাতুন নস' বা প্রত্যক্ষ শব্দে যে বিষয়টি বলা হয়েছে তা হচ্ছে 'তাওহীদে উলূহিয়্যাত'। অর্থাৎ কালেমার সর্বপ্রথম দাবি হচ্ছে, মাবূদ একমাত্র আল্লাহ তাআলা। ইবাদত ও ইস্‌তিআনাত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। এ জন্য কালেমার ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় এই অংশটিকেই যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে সে ব্যাখ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ!

তেমনি কালেমার দ্বিতীয় অংশ–আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদূহু ওয়া রাসূলুহু (এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল) এরও দাবি হচ্ছে একমাত্র তাঁর সুন্নতের ইত্তেবা ও তাঁর আদর্শের অনুসরণকেই নাজাতের পথ এবং সকল বেদআতকে গোমরাহি ও বিপথগামিতা বলে বিশ্বাস করা।

বাইতুল মুকাররমের মিম্বার ও মিহরাবের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে যার উপর অর্পণ করা হয়েছে এবং যিনি আজ সেই মিম্বার থেকে কালেমায়ে শাহাদতের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন কত ভাল হত, তিনি নিজেও যদি খালেস তাওহীদের আকীদাকে গ্রহণ করে নিতেন এবং শিরক ও বেদআতের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে তওবা করে কালেমায়ে তাওহীদ ও শাহাদতে রিসালাতের হক আদায় করতেন!

বাইতুল মুকাররমের মিম্বার থেকে যখন কালেমায়ে তাওহীদ ও কালেমায়ে শাহাদাতের অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে তখন পত্রিকাওয়ালাদের মনে হয়েছে যে, এখন মিম্বারের বয়ান পত্রিকায় প্রচার করা যায়! আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়াত দান করুন এবং মুসলমানদের ঈমানকে হেফাজত করুন। আমীন।#

[এপ্রিল '১০ঈ.]

সীরাতুন্নবীর অধ্যয়ন পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে হওয়া উচিত

'সীরাত' মূলত আরবী শব্দ। এই শব্দ থেকে সাধারণত যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে, কারো জীবনের দিন-রাত এবং বিভিন্ন ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য। তাই 'সীরাতুন্নবী' শব্দকল্প থেকেও অনেকে এই সংক্ষিপ্ত অর্থই গ্রহণ করেন এবং মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিলাদত থেকে ওফাত পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার নাম সীরাত এবং তা জেনে নেওয়াই সীরাতের জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট। এই ধারণা হয়ত সাধারণ কোন মানুষের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়; যাঁকে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তাহযীব। যাঁর প্রতি নাযিল করেছেন পূর্ণাঙ্গতম আসমানী কিতাব আলকুরআনুল কারীম, যাঁর রিসালাত বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠী কিংবা বিশেষ স্থান ও কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন ও খাতামুন্নাবিয়্যীন। একমাত্র তাঁরই সীরাতের সকল দিন নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত এবং সকল শ্রেণীর জন্য অনুসরণীয়। তো যাঁর মাঝে এমন অনুপম বৈশিষ্ট্যের সমাহার তাঁর সীরাতকে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর জীবনের কিছু ঘটনা ও অবস্থার মাঝে সীমাবদ্ধ মনে করা একদিকে যেমন ভুল ধারণা, তেমনি তা নবুওয়তের তাৎপর্য ও বিস্তৃতি এবং তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অসচেতনতার পরিচায়ক।

বস্তুত 'সীরাতে নববী' একটি সুবিস্তৃত বিষয়, যার অধীনে অনেক অধ্যায় ও শাখা রয়েছে এবং প্রতিটি শাখায় আছে অনেক উপ-শিরোনাম ও পরিচ্ছেদ। এসব বিষয়ের অন্তত সংক্ষিপ্ত ধারণা ছাড়া 'সীরাতে নববীর' পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। 'সীরাতে নববী' সম্পর্কে বিস্তারিত তো অনেক পরের বিষয়, প্রথমে বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিত হতে হবে এবং এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করতে হবে।

এখানে 'সীরাতে নববী'র কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম উল্লেখ করছি। এতে বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ হবে।

১. বিলাদত থেকে নবুওয়ত পর্যন্ত সময়ের অবস্থা ও ঘটনাবলি।

২. নবুওয়ত লাভের সময় হিজায ও গোটাবিশ্বের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা।

৩. নবুওয়ত প্রাপ্তি থেকে হিজরত পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলি ও অবস্থা।

৪. হিজরত থেকে ওফাত পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন অবস্থা, যুদ্ধ ও সন্ধির সন তারিখ ও বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ।

৫. নবী-যুগের রাত-দিন এবং পুরো তেইশ বছর সময়কালের ধারাবাহিক ঘটনাবলি।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিন-রাত।

৭. তাঁর শারীরিক গঠন, সৌন্দর্য ও সাধারণ জীবন-যাত্রা।

৮. তাঁর গুণাবলি ও চরিত্র-সুষমা।

৯. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক।

১০. জীবনের বিভিন্ন দিক : ক. ব্যক্তিগত জীবন, খ. দাম্পত্য জীবন, গ. সামাজিক জীবন ঘ. রাজনৈতিক জীবন।

১১. শিক্ষা ও নির্দেশনা : আকাইদ, ইবাদাত, মুআমালাত (লেনদেন), মুআশারাত (সামাজিকতা), সিয়াসিয়াত (রাজনীতি) ও আখলাকিয়াত (চরিত্র ও নৈতিকতা) তথা দ্বীনের সকল বিষয়ে উম্মতকে যে বিধান ও নির্দেশনা দান করেছেন তা কুরআন কারীমের আয়াত শিক্ষাদানের মাধ্যমে হোক, বাণী ও নির্দেশনার মাধ্যমে হোক, আমল ও কর্মের মাধ্যমে হোক কিংবা সম্মতি ও সমর্থনের মাধ্যমে হোক।

বস্তুত সহীহ হাদীসের গোটা সংকলন সীরাতের এই শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত।

১২. সুনান ও আদাব অর্থাৎ দ্বীন ও দুনিয়ার কোন্ কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে করেছেন তার বিবরণ। সীরাতের এ অংশের যথার্থ অধ্যয়ন দ্বারা প্রতীয়মান হবে যে, সকল শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষের জন্য উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।

১৩. বিশ্ব-জগতের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, যার কারণে তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন।

১৪. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্বসমূহ যা তিনি স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যমতে অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন।

১৫. 'সীরাতে নববী'র বৈশিষ্ট্যাবলি।

১৬. নবী-শিক্ষা ও নির্দেশনার মৌলিক নীতিমালা ও রুচি-প্রকৃতি।

১৭. মু'জিযাসমূহ।

১৮. ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ, যা অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে এবং সামনে প্রকাশিত হবে।

১৯. বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি।

২০. বিশেষত্ব ও আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহসমূহ।

২১. উম্মতের উপর তাঁর হকসমূহ।

২২. সাহাবায়ে কেরাম ও গোটা মানবজাতির উপর তাঁর শিক্ষার প্রভাব।

২৩. অমুসলিম চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা।

২৪. পবিত্রাত্মা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।

এই হল কিছু মৌলিক শিরোনাম, যার প্রতিটির অধীনে কোন ধরনের অতিরঞ্জন ছাড়াই শতাধিক উপ-শিরোনাম রয়েছে। এই অতি সংক্ষিপ্ত সূচি থেকেও অনুমান করা যায় যে, 'সীরাতে নববী' শিরোনামটি কত গভীর ও বিস্তৃত ভাব ধারণ করে।

পবিত্র সীরাতের জ্ঞান লাভের উৎস

উপরের আলোচনা থেকে সম্ভবত এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়েছে যে, শুধু ওইসব গ্রন্থ সীরাতের জ্ঞান অর্জনের নয় যা 'সীরাত সূত্রগ্রন্থ' নামে পরিচিত। কেননা এ নামের অধিকাংশ রচনায় শুধু তাঁর বিলাদত থেকে নবুওয়ত পর্যন্ত সময়ের অবস্থা এবং নবীর যুগের ইতিহাস স্থান পেয়েছে; সীরাতের অন্যান্য প্রসঙ্গ হয়তো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত অথবা প্রাসংগিকভাবে অন্য আলোচনার ভেতরে। শায়েখ মুহাম্মদ গাযালী 'ফিকহুস সীরাহ'র শেষ দিকে যথার্থ উক্তি করেছেন। তিনি বলেন–

قد تظن أنك درست حياة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة، وهذا خطأ بالغ، إنك لن تفقه السيرة حقا إلا إذا درست القرآن الكريم والسنة المطهرة، وبقدر ما تنال من ذلك تكون صلتك بنبي الإسلام.

"হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন বিলাদত থেকে ওফাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করে আপনার ধারণা হতে পারে যে, আপনার সীরাত-অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু এটা চরম ভুল। আপনি ওই পর্যন্ত যথাযথভাবে সীরাত অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন না যতক্ষণ না কুরআনে কারীম ও সুন্নাতে মুতাহ্হারা অধ্যয়ন করবেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যে পরিমাণ গ্রহণ করবেন ইসলামের নবীর সাথে আপনার সম্পর্কও ওই পরিমাণ হবে।"

এজন্য সীরাতের পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়নের জন্য নিম্নোক্ত সূত্র ও এ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি নিজ নিজ সাধ্যানুসারে চিন্তা-ভাবনা করে বারবার পড়া উচিত এবং সংশ্লিষ্ট আদর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পড়া উচিত।

১. আলকুরআনুল কারীম

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)কে কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল; তিনি উত্তরে বলেছিলেন– كان خلقه القرآن 'তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল কুরআন।' –সহীহ মুসলিম

অর্থাৎ কুরআন মোতাবেক আমল করাই ছিল তাঁর স্বভাব এবং তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনী চরিত্র। কুরআনই ছিল তাঁর জীবন-সাধনা এবং তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপ বরং জিন্দা কুরআন। এজন্য কুরআনে হাকীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত জানার প্রথম ও প্রধান সূত্র। কুরআন থেকেই জানা যাবে তাঁর দাওয়াত কী ছিল? তার জীবনের মিশন কী ছিল? তাঁর পবিত্র জীবনের শিক্ষা কী ছিল? আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর কী কী দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং তিনি কীভাবে তা পালন করেছেন? কাফের মুশরিকরা তাঁর সঙ্গে কী আচরণ করেছে এবং আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন? তাঁর আনীত শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা ও স্বভাবরুচি কী ছিল? জাহেলিয়াত ও অন্ধকার কাকে বলে এবং কীভাবে তিনি কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতিকে জ্ঞান ও আলোর পথ দেখিয়েছেন? তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা কী? আল্লাহ তাআলা তাঁকে কী কী গুণ, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব দান করেছেন?

মোটকথা 'সীরাতে নববী' সংক্রান্ত এ ধরনের সকল মৌলিক প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য 'সীরাত' চর্চাকারীর পক্ষে মনোযোগের সাথে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর-গ্রন্থ অধ্যয়ন ছাড়া কোন উপায় নেই। সাধারণ পাঠক এ জন্য 'তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন', 'তাফসীরে উসমানী' ও 'তাফসীরে আশরাফী' ইত্যাদি পাঠ-তালিকায় রাখতে পারেন।

২. হাদীস শরীফ

হাদীস তো বলাই হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও নির্দেশনা, কাজ-কর্ম, চরিত্র-সুষমা, আচার-ব্যবহার, জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলিকে। এজন্য সহীহ হাদীসের গোটা ভাণ্ডারই প্রকৃতপক্ষে 'সীরাতে

নববিয়া'এর বিবরণ। এটা ঠিক যে হাদীসের কিতাবসমূহের বিন্যাস জীবনী গ্রন্থের মত নয়, হাদীসগ্রন্থে প্রধানত রাসূলুল্লাহর শিক্ষা হুকুম-আহকাম, চরিত্র, নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং দ্বীন কায়েমের মুবারক মেহনত ইত্যাদি সংরক্ষিত রয়েছে। তবে সীরাতের অন্যান্য প্রসঙ্গেরও বহু মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের কিতাবসমূহে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে; যা থেকে অনেক সীরাত লেখক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সাধারণ পাঠক এ বিষয়ে 'আলআদাবুল মুফরাদ' ইমাম বুখারী (রহ.), মেশকাত শরীফ, রিয়াযুস সালেহীন–মুহিউদ্দীন নববী (রহ.), হায়াতুস সাহাবা–মাওলানা ইউসুফ কান্দলভী (রহ.), মাআরেফে হাদীস–মাওলানা মনযূর নুমানী (রহ.), 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম' ডা. আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) থেকে অতি সহজেই উপকৃত হতে পারেন। 'হায়াতুস সাহাবা' গ্রন্থের নাম দুই কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এতে প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচনা নবীজীর পবিত্র সীরাত ও সুন্নাহ দ্বারা হয়েছে; দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরামের জীবন তো নবীজীর জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের সীরাত অধ্যয়ন একদিক থেকে নবীজীর সীরাত অধ্যয়নেরই অন্তর্ভুক্ত।

ইবনুল কায়্যিম (রহ.)এর 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে হাদীস শরীফের আলোকে সুন্দরভাবে সীরাত উপস্থাপন করা হয়েছে; তবে তা আলেমদের জন্যই অধিক উপযোগী।

৩. সীরাতের কিতাবসমূহ

এ বিষয়ে বহু কিতাব রয়েছে। সাধারণ পাঠকদের জন্য 'শামায়েলে তিরমিযী, আসাহ্হুস্সিয়ার, সীরাতুন্নবী–মাওলানা শিবলী নুমানী ও মাওলানা সায়্যিদ সুলাইমান নদভী, সীরাতে মুস্তফা–মাওলানা ইদরীস কান্দলভী, রাহমাতুল্লিল আলামীন–কাযী সুলাইমান মনসূরপুরী এবং নবীয়ে রহমত–মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী ইত্যাদি অধিক উপযোগী। এসব কিতাবের মধ্যে কাযী সুলাইমান মনসূরপুরী (রহ.)এর কিতাব ছাড়া বাকি সবগুলোর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ কিতাবটিরও অনুবাদ সম্ভবত অতি তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে।

৪. ইতিহাসের কিতাবসমূহ

নবীজীর পবিত্র সীরাত ছাড়া ইসলামী ইতিহাসের কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এজন্য ইসলামী ইতিহাসের যেকোন বৃহৎগ্রন্থের একটি মৌলিক অংশ হয় সীরাতে

নববী। কিন্তু সাধারণভাবে ইতিহাস সংকলকদের উদ্দেশ্য থাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সব ধরনের বর্ণনারাজি একত্র করে দেওয়া। এসব রেওয়ায়াত ও বর্ণনার যাচাই-বাছাই এবং সহীহ-যয়ীফের পার্থক্য নিরূপণের প্রতি তারা লক্ষ করেন না। এজন্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সীরাত অধ্যয়ন সবার পক্ষে উপযোগী নয়। হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.)এর 'আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ'-এর সীরাত অংশটি যদিও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থের তুলনায় নির্ভরযোগ্য, কিন্তু এর উপস্থাপনা কিছুটা আলেমসুলভ, যা সবশ্রেণীর পাঠকের জন্য উপকারী নয়।

আজকাল ইতিহাসের ওইসব গ্রন্থও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে, যার রচয়িতাগণ স্পষ্ট বলেছেন যে, বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত যত বর্ণনা ও তথ্য তাঁরা পেয়েছেন সবই সন্নিবেশিত করেছেন। বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের কাজ তাঁরা করেননি। 'এসব বর্ণনা দ্বারা যারা কোন বিষয় প্রমাণ করতে চায়, বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করে নেওয়া তাদের দায়িত্ব।' এরপরও ওই সব কিতাব হুবহু অনুবাদ হচ্ছে এবং অনেক বাংলা পড়ুয়া বা ইংরেজি পড়ুয়া দায়িত্বহীন ব্যক্তিকে অনূদিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই সীরাত-তারীখের মহাপণ্ডিত বনে যেতে দেখা যাচ্ছে। অথচ প্রশ্ন এই যে, বর্ণনার যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়টি ছাড়াও এসব অনুবাদও কি এই মানে উত্তীর্ণ যে, এর উপর গবেষণা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করা যায়?

সীরাতে নববী ও প্রাচ্যবিদগোষ্ঠী

উপরোক্ত বিষয়ের চেয়েও মারাত্মক ব্যাধি এই যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি শ্রেণী সীরাত অধ্যয়ন করেন প্রাচ্যবিদদের রচনা থেকে, বরং তারা মনে করেন, প্রাচ্যবিদদের রচনাবলিই সীরাতের মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্র। إنا لله وإنا إليه راجعون তাদের একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, ক'জন প্রাচ্যবিদ আরবী ভাষা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন এবং তাদের ক'জন রেওয়ায়াতের শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষার যোগ্যতা রাখেন। তাদের কেউ যদি উপরোক্ত দু'বিষয়ের যোগ্যতার অধিকারী হয়েও থাকে তাহলে কি তা বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী প্রশ্নাতীত হয়ে যায়? প্রাচ্যবিদ গবেষকদের এই পরিমাণ বিশ্বস্ততা কি প্রমাণিত যে, তারা সীরাতকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করবে? যাঁর প্রতি তাদের ঈমান ও মহব্বত নেই তাঁর সীরাত সঠিকভাবে অনুধাবনের কষ্ট কেন তারা বরদাশত করবে। আর যেটুকু অনুধাবন করল তাই বা কেন সঠিকভাবে উপস্থাপন করবে?

বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী সীরাত ও তারীখ বিষয়ে যেসব প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ও তাদের রচনাবলির উপর নির্ভর করে থাকে তাদের মধ্যে

নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো বা তার কোন একটি অবশ্যই রয়েছে :

১. তথ্যচয়নে ন্যায়-নিষ্ঠার অভাব। 'সহীহ' রেওয়ায়াত পরিত্যাগ করে 'শায', 'মাতরূক', বা 'বাতেল' রেওয়ায়াতকে গবেষণা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। 'মারূফ' রেওয়ায়াতকে 'মুনকার' আর 'মুনকার' রেওয়ায়াতকে 'মারূফ' সাব্যস্ত করা তাদের সাধারণ রীতি। সম্ভবত তারা একে প্রশংসাযোগ্যও মনে করে।

২. আহরিত তথ্যের ব্যাখ্যা ও মর্ম নির্ধারণে অসাধুতা। আরবী ভাষা-ব্যাকরণ ও মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী বক্তব্যের যে অর্থ হয় তা পরিত্যাগ করে মনগড়া মর্ম বক্তব্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া।

৩. ঘটনাবলির কার্যকারণ, প্রেক্ষাপট ও ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্ণনাসমূহের স্পষ্ট বক্তব্য পরিত্যাগ করে অনুমানের উপর নির্ভর করা। তদ্রূপ যেসব বিষয়ে ইতিহাস নিশ্চুপ তা নিছক ধারণা ও অনুমান দ্বারা পূরণ করে এমন দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করা যেন তা ইতিহাসের প্রমাণিত সত্য।

৪. উদ্ধৃতির অঙ্গহানী। অর্থাৎ আলোচ্য তথ্যের হাত-পা ছেটে, কিছু সংযোজন ও কিছু বিয়োজনের মাধ্যমে দাবির উপযোগী করে তৈরি করে নেওয়া। সত্যকে বিকৃত করার এটি খুব সহজ উপায়। তবে খেয়ানত ও অসাধুতার এই পদ্ধতি যতটা সহজ, ঠিক ততটাই সহজ তা প্রকাশিত হয়ে যাওয়া। কেননা সামান্য কষ্ট স্বীকার করে উদ্ধৃত গ্রন্থের পাতা ওল্টালেই তা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু দায়িত্বহীন ও লজ্জাহীন মনোবৃত্তি তাদেরকে এই হীন কাজেও লিপ্ত করেছে।

'সীরাতে নববী', 'ইসলামের ইতিহাস' ও 'ইসলামের পরিচিতি' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তারা যদি এ ধরনের অসাধুতা না করত এবং সীরাত, ইতিহাস ও ইসলামের পরিচয় সঠিক ও যথাযথভাবে উপস্থাপন করত, তবে তো তাদের ইসলাম-শত্রুতা এবং ইসলামের রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ একটি অর্থহীন বিষয়ই হতো!!

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)এর ভাষায়, 'মুস্তাশ্রিকীন (প্রাচ্যবিদদের) মিশনই হল মুসলিম জাতিকে তাদের অতীত সম্পর্কে সন্দিহান, ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ এবং বর্তমান সম্পর্কে নির্লিপ্ত করে দেওয়া।' একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রতিপালিত কিংবা তাদের রচনাবলি থেকে জন্ম নেওয়া শ্রেণীর মাঝে এই তিনটি ব্যাধির সকল উপসর্গ সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সেই সব প্রাচ্যবিদ গবেষকদের অসাধুতার পর্দা উন্মোচন করা আমার বিষয়ও নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। এই মুহূর্তে আমি এটুকুই বলতে চাই যে, প্রাচ্যবিদদের রচনাবলি সীরাতের নির্ভরযোগ্য সূত্র নয়। অতএব সীরাতের জ্ঞান লাভের জন্য তা অধ্যয়ন করা মোটেই ঠিক নয়। তবে তাদের অসততা ও পাড়ায় পাড়ায় ছড়ানো বিষ সম্পর্কে যারা সচেতন তারা অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তা অধ্যয়ন করতে পারেন।

আমি এখানে প্রাচ্যবিদদের অসততার শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি। A. J. WENSINCK একজন প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ গবেষক। তিনি হাদীস ও সীরাতের চৌদ্দটি প্রসিদ্ধ কিতাবের জন্য مفتاح كنوز السنة নামে খুব ভাল একটি ইনডেক্সও তৈরি করেছেন যা জ্ঞানী মহলে খুবই প্রসিদ্ধ। অথচ তিনি তার কিতাব. The muslim Gud, p. 19,32. তে লেখেন 'কালিমায়ে শাহাদাত মওযূ; হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। রাসূলের ইন্তেকালের বেশ কিছু বছর পরে যখন খৃস্টানদের সাথে মুসলমানদের জানাশোনা হয়েছে এবং তারা খৃস্টানদের কাছে একটি কালিমা দেখেছে, তখন তা থেকেই নিজেদের জন্য একটি কালিমা তৈরি করেছে।'

এটা এমন এক প্রাচ্যবিদের নির্জলা মিথ্যাচার, যে তার জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহের ইনডেক্স তৈরিতে ব্যয় করেছে এবং এ কাজের জন্য না জানি তাকে হাদীস ও সীরাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি কতবার অধ্যয়ন করতে হয়েছে! তার তৈরি ইনডেক্সের সাহায্যেই হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহে অসংখ্য বর্ণনা দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব, যাতে কালিমায়ে শাহাদাত উল্লেখিত হয়েছে।

আযান –যা নববী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচবার ঘোষিত হয়– তাতে কালিমায়ে শাহাদাত বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা অনুযায়ী নামাযের প্রত্যেক বৈঠকে ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া হয়; এতেও কালিমায়ে শাহাদাত রয়েছে। জুমআ ও দুই ঈদের খুতবা –যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– তাতেও কালিমায়ে শাহাদাতের উল্লেখ আছে। মানুষের ইসলাম গ্রহণের অসংখ্য ঘটনা হাদীস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তাতেও কালিমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশের কথা আছে। এছাড়া আরো অসংখ্য ঘটনা আছে, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালিমায়ে শাহাদাত পড়া বা শেখানোর কথা বর্ণিত আছে।

এত মুতাওয়াতির বর্ণনা থাকা অবস্থায় প্রকাশ্য দিবালোকে তিনি মিথ্যাচার করলেন যে, নবী-যুগে কালিমায়ে শাহাদাতের কোন অস্তিত্ব ছিল না! কালিমায়ে শাহাদাতের হাদীস পরবর্তী সময়ে তৈরি করা হয়েছে!

যারা এ ধরনের স্বতঃসিদ্ধ ও অকাট্য বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে তাদের রচনাবলির উপর আস্থা রাখার কোন উপায় আছে কি?

আল্লাহ তাআলা আমাদের জ্ঞান-পিপাসু বন্ধুদের হেদায়াত দিন এবং দ্বীনদার ও আমানতদার ব্যক্তিদের নিকট থেকে দ্বীন ও দ্বীনওয়ালার সীরাত জানার তাওফীক নসীব করুন।

শেষ নিবেদন

এই প্রবন্ধ আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানী রহ.এর একটি বক্তব্যের মধ্যমে সমাপ্ত করতে চাই। একটি সীরাত মাহফিলে তিনি তাঁর বক্তব্যও এই কথা দিয়েই শেষ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন−

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা, আল্লাহ তাআলার পয়গম্বরগণের ও পৃথিবীর আধ্যাত্মিক রাহবরদের মধ্যে একমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্বই এমন, যাঁর জীবনের ছোট বড় ঘটনাবলি এবং শিক্ষা ও নির্দেশনা এতটা বিস্তারিতভাবে এবং এত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, আমার ও আপনার জন্য আজ তাঁর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন সেভাবেই সম্ভব, যেভাবে তাঁর প্রতিবেশী ও সঙ্গীবৃন্দ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে অবলোকন করেছিলেন। এই মুহূর্তে কোন ধরনের রাখ-ঢাক ছাড়া স্পষ্ট বলে দেওয়াই ভাল মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে যে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংরক্ষিত আছে, আমি নিজে যখন তা অধ্যয়ন করি তখন আমার মনে হয়, আমি যেন তাঁকে, তাঁর সমস্ত কর্ম-ব্যস্ততা ও তাঁর চারপাশের গোটা পরিবেশকে সচক্ষে অবলোকন করছি এবং তাঁর অমীয় বাণী নিজ-কানে শ্রবণ করছি। আমি কসম করে বলতে পারি, আমার অনেক বুযুর্গ ও বন্ধু, যাদের সঙ্গে আমার চলাফেরা ও ওঠা-বসা হয়েছে তাদেরকেও এতটা জানি না, যতটা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের মাধ্যমে আমার হাদী ও রাহনুমা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানি। আর এটা আমার কোন বিশেষত্ব নয়। আপনাদের মধ্যে যারা নেক নিয়তে তাঁর শিক্ষা ও পবিত্র সীরাত অধ্যয়ন করবেন ইনশাআল্লাহ তার অনুভূতিও এমনই হবে।

এ কথা আমি আমার মুসলিম ভাইদেরও বলছি এবং অমুসলিম ভাইদেরও

বলছি যে, এই সমুন্নত আদর্শ থেকে উপকৃত হওয়ার সকল সুযোগ ও উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা থেকে উপকৃত না হওয়া নিঃসন্দেহে অনেক বড় বঞ্চনা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সেই চক্ষু, সেই কর্ণ এবং সেই হৃদয় দান করুন, যা দ্বারা আমরা বাস্তবকে তার প্রকৃত রূপে প্রত্যক্ষ করতে পারি, শ্রবণ করতে পারি, অনুধাবন করতে পারি এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারি। আমীন।#

[এপ্রিল '০৫ঈ.]

নবীজী কীভাবে নামায আদায় করেছেন

[এখন মুসলিমসমাজ বহিরাগত হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যা এসে যুক্ত হচ্ছে। ইদানীং একটি মহল মুসলিমসমাজের অবশিষ্ট শক্তি ও একতাকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য এবং মুসলমানদেরকে মানসিক অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য নানামুখী প্রচার প্রোপাগান্ডাও জোরেসুরে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে অতি ভয়ংকর একটি প্রোপাগান্ডা হল, হানাফী ফিকহের কিতাবে নামাযের যে নিয়ম পেশ করা হয়েছে, যে অনুযায়ী হাজার বছর যাবৎ লক্ষ কোটি মুসলমান নামায আদায় করে আসছেন তা নাকি সহীহ হাদীসের খেলাফ! এর ভিত্তি নাকি যয়ীফ হাদীস বা কিয়াস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায নাকি এমন ছিল না! তাদের দাবি, যে নিয়মে তারা নামায পড়ে থাকে একমাত্র তা-ই হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায।

আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, এসব লোকদের সাথে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যদেরও সুর মিলাতে দেখা যায়, যারা নিজেদেরকে ইসলামের ব্যাপারে সজাগ ও যুগসচেতন বলে দাবি করে থাকে। এরা শায়েখ নাসীরুদ্দীন আলবানী মরহুমের একটি কিতাব –যার নামটিও সহীহ রাখা সম্ভব হয়নি– দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বলে থাকেন, 'নবীর নিয়মে নামায পড়তে হলে এই কিতাবের মত নামায পড়ুন।' এমনকি বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলের ইসলামী অনুষ্ঠানেও তা প্রদর্শন করার কথা শোনা যায়।

আলবানী মরহুমের কিতাবটির পর্যালোচনা এবং শরীয়তের দলীলসমূহের আলোকে নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে দুটি বই অচিরেই মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর রচনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। আপাতত এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি আলকাউসারের পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করা হল। প্রবন্ধটি মনোযোগের সাথে পাঠ করা হলে, আশা করি, ওইসব বন্ধুদের প্রশান্তি অর্জিত হবে, যারা উপরোক্ত প্রোপাগান্ডার কারণে মানসিক অস্থিরতার মধ্যে আছেন। পাশাপাশি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, কুরআন এক ও রাসূল এক হওয়া সত্ত্বেও মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে একাধিক মত কীভাবে সৃষ্টি হল এবং ফিক্‌হের একাধিক মাযহাব কীভাবে হল?

আশা করি, প্রবন্ধটি ইনসাফের সাথে আমলের নিয়তে পাঠ করা হবে এবং গাফলত বা জাহালাতের কারণে আমাদের নামাযে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে তা শোধরানোর চেষ্টা করা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন। আমীন। –সম্পাদক]

নামায প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর আনীত শরীয়তে তাওহীদের পরেই নামাযের স্থান। তাওহীদের পরে নামাযের মাধ্যমেই তাঁর দাওয়াতের সূচনা হত।[১] জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর সর্বশেষ ওসিয়ত ছিল নামায সম্পর্কেই।[২]

তিনি বলতেন–

جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ

'নামাযের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা বিদ্যমান।'[৩]

১–সহীহ মুসলিম ১/২১৯, হাদীস ১২, দারুল ওয়াফা, আলমানসূরা, ১ম সংস্করণ ১৪১৯হি.

২–ইবনে কাসীর, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ৪/২০৬-২০৭, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬হি.

৩–মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২৯৩, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ২য় সংস্করণ ১৪২০হি.; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৯৩৯, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব, ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৪হি.

কখনো হযরত বেলাল (রা.)কে বলতেন–

قُمْ يَا بِلَالُ! فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ

'হে বেলাল! দাঁড়াও, (আযান দিয়ে) নামাযের মাধ্যমে আমাদের শান্তি দাও।"[৪]

যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের নামাযসংক্রান্ত দিকটিতে একবারও নজর বুলিয়েছেন তিনিও বুঝতে পারবেন, নামাযের সাথে তাঁর যে গভীর প্রেমের বাঁধন ছিল তার খুব সামান্যই উপরোক্ত বর্ণনা দুটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে দুটি কথা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতি মূলত কোন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়; এর জন্য কয়েক খণ্ডের দীর্ঘ গ্রন্থ প্রয়োজন। যেসব উৎস থেকে এসংক্রান্ত তথ্য আহরণ করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ :

১. কুরআন কারীম।

২. নামাযসংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বিবরণ।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযবিষয়ক নির্দেশনাসমূহের যে অংশ আমলে মুতাওয়ারাস তথা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে পরবর্তীদের নিকট পৌঁছেছে।[৫]

৫. উম্মাহর ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নামাযবিষয়ক বিধানাবলি, যা নিঃসন্দেহে

৪–মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৫৭৮, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৪হি.; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫, ৪৯৮৬; দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

৫–হায়দার হাসান খান টোংকী, আত-তাআমুল, আররাহীম একাডেমী, করাচী, পাকিস্তান; মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী, আলইমাম ইবনু মাজাহ ওয়াকিতাবুহুস সুনান ৮৪-৯০; মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব; ইবনে হায্ম, আলফিসাল ফিল মিলালি ওয়ান-নিহাল ২/৮১-৮৪, আলমাকতাবাতুল আদাবিয়া; আলইহ্কাম ১/১০৪-১০৯, দারুল আফাফ, বৈরুত; ইবনে আব্দিল বার, আততামহীদ ৮/৬৮-৬৯, ৮৪-৮৫; তাতওয়ান মাগরিব; কাশ্মীরী, নাইলুল ফারকাদাইন ফী মাসআলাতি রাফয়িল য়াদাইন ১০৪-১০৫, আলমাজলিসুল ইলমী, করাচী; বাসতুল য়াদাইন লিনাইলিল ফারকাদাইন ৫৯, ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান; ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন ২/২৭৮-২৮২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৭হি.

উপরোক্ত এক বা একাধিক উৎস থেকে গৃহীত। তবে সে উৎস আমাদের জানা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। তেমনি তা কোন বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছতেও পারে বা নাও পৌঁছতে পারে।

৬. সাহাবায়ে কেরামের নামাযবিষয়ক কর্ম ও নির্দেশনা। কেননা, তাঁরা প্রিয় নবীজীর নিকট থেকেই নামায শিখেছেন এবং পরবর্তী মুসলমানদেরকে শিখিয়েছেন। তাই 'আসারে সাহাবা'ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতি জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

উপরোক্ত উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত তথা নামায আদায়ের পদ্ধতি ফিক্‌হের ইমামগণ বিস্তারিত ব্যাখ্যাবিশ্লেষণসহ ফিক্‌হের কিতাবে সংকলন করেছেন। পাশাপাশি হাদীস ও ফিক্‌হের ইমামগণ এবং উম্মাহর অন্যান্য মনীষী সেসব উৎসসমূহকেও যত্নের সাথে সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বর্তমান প্রবন্ধে নামাযবিষয়ক সকল তথ্য একত্র করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। তেমনি নামাযের নিয়মের যেসব অংশে নববী পন্থা নির্ধারণে বা এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে 'খাইরুল কুরূন' থেকে ফিক্‌হের ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য চলে আসছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কেননা তা করতে গেলে গ্রন্থ রচনা করতে হবে। একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

এই প্রবন্ধে সহজ-সরলভাবে (তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত) নামায আদায়ের নববী পদ্ধতির বিবরণ উল্লেখ করা হবে। তবে নামাযের যেসব অংশে নববী রীতি নির্ধারণ বা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়ে 'খাইরুল কুরূন' (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুগ) থেকে মতপার্থক্য চলে আসছে সেসব ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মতটির দিকেও ইঙ্গিত করা হবে।

প্রবন্ধটি প্রস্তুত করতে গিয়ে হাদীস, সীরাত ও 'ফিক্‌হে মুকারানের' বহু গ্রন্থের সরাসরি সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ সামনে রাখা হয়েছে–

১. জামেউল উসূল, ইবনুল আসীর (মৃত্যু ৬০৬হি.) এতে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবী দাউদ, জামে তিরমিযী ও মুয়াত্তা মালেকের হাদীসসমূহ একত্রে সংকলন করা হয়েছে।

২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭হি.) এতে মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবী ইয়ালা এবং তাবারানীর তিন 'মু'জাম'-এর ওইসব

হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে যা 'কুতুবে সিত্তায়' (হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে) নেই।

৩. নাসবুর রায়াহ, যাইলায়ী (মৃত্যু ৭৬২হি.)

৪. আততালখীসুল হাবীর, ইবনে হাজার আস্‌কালানী (মৃত্যু ৮৫২হি.)

৫. মুনতাকাল আখবার, মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু ৬৫৩হি.)

উপরোক্ত গ্রন্থাবলিতে একশরও অধিক গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে সালাতবিষয়ক হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালেহী (মৃত্যু ৯৪২হি.)

৭. যাদুল মা'আদ ফী হাদ্‌য়ি খাইরিল ইবাদ, ইবনুল কায়্যিম (মৃত্যু ৭৫১হি.)

প্রয়োজনে হাদীসের মূল কিতাবসমূহের উদ্ধৃতিও উল্লেখ করা হবে।

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

নামায আদায়ের নববী-পদ্ধতি

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে তার নিয়ত অনুযায়ী আমলের ফলাফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য হিজরত করবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়া উপার্জন বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করবে তার হিজরত সে জন্যই সাব্যস্ত হবে।"

তাই নামাযের সর্বপ্রথম ফরয হল নিয়ত খালেস করা, শুধু আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করা।

নিয়ত হল অন্তরের সংকল্প। অর্থাৎ এমন সংকল্প করা যে, আমি ফজরের ফরয বা যোহরের ফরয পড়ছি। মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। অন্তরের সংকল্প ছাড়া শুধু মৌখিক উচ্চারণে নিয়ত আদায় হয় না। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা প্রমাণিত নয়। তাই মুখে নিয়ত করাকে সুন্নত বলা ভুল। তবে অন্তরের সংকল্পের সাথে মৌখিক নিয়ত করলে তা-ও নিষেধ নয়। কিন্তু আরবী ভাষায় নিয়ত করাকে সওয়াবের কাজ মনে করা নিতান্তই ভুল এবং প্রচলিত লম্বা আরবী নিয়ত করতে গিয়ে তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হওয়া বা জোরে জোরে উচ্চারণ করে অন্যের মনোযোগ নষ্ট করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৬]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন তখন الله أكبر বলে নামায শুরু করতেন।

৩. তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত ওঠাতেন[৭] এবং ওঠানোর সময় হাতের অঙ্গুলিসমূহ খোলা (ও কেবলামুখী করে) রাখতেন।[৮] সহীহ হাদীসে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠানোর কথাও বর্ণিত হয়েছে এবং তা কোন কোন ইমামের মতে সুন্নতও বটে। কিন্তু সেই হাদীসের ব্যাখ্যা সম্ভবত হযরত ওয়ায়েল (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা হয়ে যায়, যা সুনানে আবু দাউদে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ

"তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়ালেন তখন উভয় হাত এভাবে উঁচু করলেন যে, উভয় হাত কাঁধ বরাবর এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কান বরাবর হয়ে গেল, এরপর তাকবীর দিলেন।"[৯]

বোঝা গেল, শুধু কাঁধ পর্যন্ত ওঠানো উদ্দেশ্য নয়, বরং এমনভাবে ওঠাতে হবে; যাতে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আবার এও হতে পারে যে, কাঁধ পর্যন্ত ওঠানোও একটি মাসনূন পদ্ধতি।

৪. তাকবীরের পরে ডান হাত বাম হাতের উপর (অর্থাৎ ডান হাতের কব্জি বাম

৬–ইবনে তাইমিয়া, আলফাতাওয়াল কুবরা ১/২৭৭-২৯০, দারুল ফিক্র, বৈরুত, ১৪১৪হি.; ইবনে নুজাইম, আলবাহরুর রায়িক ১/২৭৭, এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, করাচী, পাকিস্তান

৭–সহীহ মুসলিম ২/২৬৯, ২৯১ হাদীস ৩৯১, ৪০১

৮–জামে তিরমিযী ২/৫, হাদীস ২৩৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত,১ম সংস্করণ

৯–সুনানে আবু দাউদ ২/২৯২, হাদীস ৭২১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

হাতের কব্জির উপর) রেখে হাত বাঁধতেন।[১০]

৫. হাত কোথায় বাঁধতেন তা ইমাম তিরমিযী (রহ.)এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন-

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী আহলে ইলমের কর্মধারা এমনই। অর্থাৎ তাঁরা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখাকে নামাযের নিয়ম মনে করতেন। তাঁদের কতক নাভির উপরে এবং কতক নাভির নিচে হাত রাখাকে উত্তম মনে করতেন। তবে উভয় পদ্ধতিই তাঁদের সকলের মতে বৈধ ছিল।"[১১]

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমল থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নাভির নিচে হাত বাঁধতেন, কখনো নাভির উপরে। কিন্তু বুকে হাত বাঁধার কথা কোন সহীহ হাদীসে নেই এবং তা কোন সাহাবী বা তাবেয়ীর আমল দ্বারাও প্রমাণিত নয়। তাই এই রীতিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত বলা ভুল।

এখন প্রশ্ন হল, নাভির উপরে হাত বাঁধা এবং নাভির নিচে হাত বাঁধা উভয়টিই কি সুন্নত, না একটি সুন্নত ও অপরটি মুবাহ? এই প্রশ্নের উত্তরদানের ভার ফিক্‌হের ইমামগণের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর তাঁদের অনেকেই নাভির নিচে হাত বাঁধাকে সুন্নত বলেছেন।[১২]

১০-শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/২০০

১১-জামে তিরমিযী ২/৩৩, হাদীস ২৫২-এর আলোচনায়, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

১২-ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/২৪৯, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন ২/২৮৯-২৯০; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ২/২৬২, দারুর রায়্যান, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৭হি.; সহীহ মুসলিম ২/২৯১, হাদীস ৪০১

৬. তিনি 'কিয়াম' অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। নামাযে এদিক সেদিক তাকাতে নিষেধ করতেন এবং খুশূখুযূর সাথে নামায আদায়ের আদেশ করতেন। তাঁর নামায সর্বাধিক খুশূখুযূমণ্ডিত হত।

৭. এরপর অনুচ্চস্বরে কোন দুআ বা ছানা পড়তেন। সাধারণত ফরয নামাযে নিম্নোক্ত ছানা পড়তেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

এ ছাড়া আরো কিছু দুআও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত তাহাজ্জুদ নামাযে পড়তেন।[১৩] ফরয নামাযে উপরোক্ত ছানাটি পড়া খুলাফায়ে রাশেদীনেরও আমল ছিল।[১৪]

৮. ছানার পরে 'তাআওউয' ও 'তাসমিয়াহ' পড়তেন। তাআওউযের প্রসিদ্ধ পাঠ এই–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ[১৫]

তাআওউযের আরেকটি পাঠও সহীহ হাদীসে আছে, কিন্তু তা তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। 'তাসমিয়াহ'র পাঠ একটিই। অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৯. 'আমলে মুতাওয়ারাছ' (উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা) দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আউযুবিল্লাহ' অনুচ্চস্বরে পড়তেন।

১০. সহীহ হাদীসের বর্ণনা মতে তিনি 'বিস্‌মিল্লাহ'ও অনুচ্চস্বরে পড়তেন। কোন কোন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তিনি কখনো কখনো বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়েছেন, কিন্তু এসবের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞদের আপত্তি রয়েছে। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়া তাঁর সুন্নত নয়।[১৬]

১৩–ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/১৯৭-১৯৯, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ ১৪১৯হি.

১৪–মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া, আলমুনতাকা মিন আখবারিল মুস্তফা ১/৩৭০, দারুল ইফতা, রিয়াদ, সৌদী আরব, ১৪০২হি.

১৫–সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১১৫; সহীহ মুসলিম ৮/৮৪, হাদীস ২৬১০; ইবনুল জায্‌রী, আন্‌নাশর ফিল কিরাআতিল আশর ১/২৪৩

১৬–ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুস্‌লিমীন ৫০-৫১, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব, ১৪১৭হি.

১১. এরপর সূরায়ে ফাতেহা পড়তেন।

১২. সূরায়ে ফাতেহা সমাপ্ত হলে 'আমীন' বলতেন।

১৩. 'আমীন' কি উচ্চস্বরে বলতেন, না অনুচ্চস্বরে? আস্তে কেরাআতের নামাযে অনুচ্চস্বরে বলতেন। উম্মাহর কর্মধারা তা-ই প্রমাণ করে। কিন্তু উচ্চস্বরে কেরাআতের নামাযে তাঁর আমল কী ছিল–এ বিষয়ে বর্ণনা বিভিন্ন ধরনের। সহীহ হাদীসে দু'টোই পাওয়া যায়, তবে বিভিন্ন আলামত ও লক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনুচ্চস্বরে পড়াই তাঁর মূল নিয়ম ছিল; তবে আমীন বলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনো কখনো উচ্চস্বরেও বলেছেন।[১৭]

ইমাম ইবনে জারীর তবারী (রহ.) লেখেন–

والصواب أن الخبرين بالجهر والمخافتة صحيحان، وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء، وإن كنت مختارا خفض الصوت بها إذ أكثر الصحابة والتابعين على ذلك.

"সঠিক কথা হল, উচ্চস্বরে পাঠ ও অনুচ্চস্বরে পাঠ উভয় বর্ণনাই সহীহ এবং তাঁর (নবীজীর) উভয় আমলই আলেমগণ অনুসরণ করেছেন। যদিও আমি অনুচ্চস্বরের পক্ষপাতী। কেননা অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল এরূপই ছিল।[১৮]

১৪. সূরায়ে ফাতেহার পর অন্য কোন সূরা পড়তেন। তবে ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে ফাতেহার পরে কোন সূরা পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১৯]

১৫. কেরাআত তারতীলের সাথে পরিষ্কার করে পড়তেন।

১৬. কখনো অনেক দীর্ঘ কেরাআত পড়তেন এবং কখনো সফর ইত্যাদির কারণে অতি সংক্ষিপ্ত কেরাআত পড়তেন। সাধারণত মাঝারি ধরনের কেরাআত পড়তেন।[২০]

হযরত আবু বারযাহ আসলামী রা.এর বর্ণনামতে, ফজরের নামাযে ষাট থেকে

১৭–ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৬৬ (কুনূত ফিল ফাজ্‌র-এর আলোচনায়)

১৮–তাহযীবুল আসার, আলজাওহারুন নাকী ফির-রাদ্দি আলাল বায়হাকী ১/৫৮, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত

১৯–ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৩৯

২০–ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২০২

একশ আয়াত পড়তেন। হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন, নবীজী ফজরের নামাযে সূরা 'কাফ' এবং এ জাতীয় সূরা পড়তেন।[২১]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণত ফজরের নামাযে 'তিওয়ালে মুফাস্সাল'এর সূরাসমূহ পড়তেন।

যোহরের নামাযে কখনো দীর্ঘ কেরাআত পড়তেন এবং কখনো সূরা 'আ'লা' ও সূরা 'গাশিয়া' (বা এই পরিমাণ) পড়তেন। কোন কোন সহীহ হাদীসে দুই রাকাআতে সূরা 'আলিফ-লাম-মীম সাজদা'এর সমপরিমাণ (যা ত্রিশ আয়াতসম্বলিত) পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আসরের কেরাআত যোহরের কেরাআতের প্রায় অর্ধেক হত (যদি যোহরের কেরাআতকে দীর্ঘ ধরা হয়) বা তার সমান হত (যদি যোহরের কেরাআত মাঝারি ধরা হয়।)[২২]

মাগরিবের নামাযে 'কিসারে মুফাস্সাল'এর সূরাসমূহ পড়তেন, তবে সর্বদা এমন করতেন না। কেননা মাগরিবের নামাযে বড় সূরা যথা: সূরা সফ্ফাত, হা-মীম দুখান, মুরসালাত ও আ'লা ইত্যাদি পড়াও বর্ণিত আছে।[২৩]

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইশার নামাযে 'আওসাতে মুফাস্সাল'এর সূরাসমূহ পড়তেন। একবার হযরত মুআজ রা. ইশার নামাযে অনেক দীর্ঘ কেরাআত পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যখন ইমামত করবে তখন «والليل إذا يغشى» «اقرأ باسم ربك» «سبح اسم ربك الأعلى» و«الشمس وضحاها» ইত্যাদি সূরা পড়বে। কেননা তোমার পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং কোন প্রয়োজনে আগমনকারী ব্যক্তিরাও নামায পড়ে থাকে।[২৪]

জুমার দিন ফজরের নামাযে সূরা 'আলিফ লাম মীম তানযীল' ও সূরা 'দাহ্র' পড়তেন।[২৫]

২১–সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৫৮ (১৬৯); মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২০৩৩২,

২২–ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২০৩; আয্যাইলায়ী, নাসবুর রায়াহ ২/৫-৬, দারুল কিবলা, জিদ্দা, ১৪১৮হি.

২৩–ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২০৩-২০৫

২৪–সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০১; সহীহ মুসলিম ২/৩৭৮, ৩৮১, হাদীস ৪৬৫; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৪৩০৭; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৯৮২, ৯৮৩

২৫–সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮০; তবারানী, আলমুজামুস সগীর ২০৫; (বুগয়াতুল আলমায়ী'র মাধ্যমে।)

জুমার নামাযে কখনো প্রথম রাকাআতে সূরা 'জুমুআ', দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা 'মুনাফিকূন' (পুরো) এবং কখনো প্রথম রাকাআতে সূরা 'আ'লা' ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা 'গাশিয়া' পড়তেন।

দুই ঈদের নামাযে কখনো প্রথম রাকাআতে সূরা 'আ'লা' ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা 'গাশিয়া' পড়তেন এবং কখনো সূরা 'কাফ' ও সূরা 'কামার' পড়তেন।

তবে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের উদ্দেশ্য এই নয় যে, নামাযের কেরাআত উল্লেখিত সূরাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, 'মুফাস্সালের' ছোট বড় কোন সূরা এমন নেই, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফরয নামাযে পড়তে শুনিনি [২৬] বরং মুফাস্সালের বাইরে কুরআন কারীমের অন্যত্র থেকে পড়াও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামগণকে বিশেষভাবে মুকতাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখার আদেশ করতেন। তিনি ইরশাদ করেন-

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

"যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি অন্যের ইমামত করবে তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকে এবং যখন সে একাকী নামায পড়বে তখন যে পরিমাণ দীর্ঘ করতে চায় করবে।"[২৭]

একবার কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট অভিযোগ করল যে, অমুক ইমাম খুব দীর্ঘ কেরাআত পড়েন, যার কারণে আমি হয়ত জামাআতে শরীক হতে পারব না। নবীজী তা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مَنْ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ (وَ الْمَرِيضَ).

"হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি এমন আছে, যারা মানুষের আগ্রহ নষ্টকারী। তোমাদের কেউ যখন ইমামত করবে তখন সে যেন সংক্ষেপ

২৬-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮১৪

২৭-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৩; সহীহ মুসলিম ২/৩৮৩-৩৮৪, হাদীস ৪৬৮

করে। কেননা তার পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল, প্রয়োজনে আগমনকারী (ও অসুস্থ) ব্যক্তি থাকে।"[২৮]

১৮. তিনি ইমামের পেছনে ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়ার আদেশ কখনো করেননি।[২৯]

বরং বলেছেন–

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"যে ব্যক্তির ইমাম আছে ইমামের কেরাআতই তার কেরাআত"।[৩০]

আরো বলেছেন–

إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللّٰهُ، ....».

"যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াও তখন কাতার সোজা কর। এরপর তোমাদের একজন ইমাম হও। যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বল; যখন সে কেরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক; যখন সে غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলে তখন তোমরা 'আমীন' বল, আল্লাহ তোমাদের দুআ কবুল করবেন।"[৩১]

কোন কোন বর্ণনায় অনুচ্চস্বরে কেরাআতের নামাযে ফাতেহা পড়ার শুধু অনুমতি বর্ণিত হয়েছে।[৩২] তবে সে সব বর্ণনার ব্যাপারে অধিকাংশ হাদীস বিশারদের আপত্তি রয়েছে।

১৯. ফজরের উভয় রাকাআত, মাগরিব, ইশার প্রথম দুই রাকাআত, জুমা, দুই

২৮–সহীহ বুখারী, হাদীস ৯০; সহীহ মুসলিম ২/৩৮২, হাদীস ৪৬৬

২৯–ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/৩১৫, ৩২০

৩০–হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সহীহ। ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/২৭১; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/২৬৮, হাদীস ৫০০

৩১–সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০৪; সহীহ আবী আওয়ানা ২/১৩২-১৩৩, দাইরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া, হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩৮৫হি.

৩২–ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/৩৪০; কাশ্মীরী, ফাস্‌লুল খিতাব ফী ফাতিহাতিল কিতাব, আলমাজলিসুল ইলমী, করাচী, পাকিস্তান

ঈদ, ইস্তিস্‌কা ও সূর্যগ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কেরাআত পড়তেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুচ্চস্বরে পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামাযে সাধারণত কিছুটা উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করতেন।

২০. ফজরের নামাযে সাধারণত প্রথম রাকাআত দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় দীর্ঘ করতেন (যাতে মুকতাদীরা পুরো জামাআত পায়) এবং যোহর আসরেও এমন করতেন। তবে যোহর আসরের উভয় রাকাআতের কেরাআত সমান হওয়ার কথাও সহীহ হাদীসে রয়েছে।[৩৩]

২১. কেরাআত সমাপ্ত হলে কিছুটা বিরাম নিতেন, (যাতে শ্বাস ফিরে আসে।) এরপর তাকবীর দিয়ে রুকূতে যেতেন।

২২. রুকূতে উভয় হাত হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখতেন যেন তা ধরে রেখেছেন। অঙ্গুলিসমূহ ফাঁক করে রাখতেন, উভয় হাত পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন। মাথা উঁচুও করতেন না, নিচুও করতেন না; বরং পিঠের সমান্তরালে রাখতেন। এত সোজা হত যে, পিঠে পানি ঢেলে দিলে তা স্থির থাকবে। রুকূতে বার বার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলতেন। কখনো তিনবার বলতেন। রুকূতে কখনো অন্য তাসবীহ ও দুআও পড়তেন।

রুকূ অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে আদায় করতেন। তিনি বলেছেন–

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

“ওই নামায যথেষ্ট নয়, যাতে ব্যক্তি রুকূ-সেজদায় আপন মেরুদণ্ড সোজা করে না।” [৩৪]

আরো ইরশাদ করেছেন–

أَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا.

“নিকৃষ্টতম চুরি হল নামাযে চুরি করা। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

৩৩–সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৬, ১৫৭, দারুল ওয়াফা আলমানসূরা; আলউসমানী, ইলাউস সুনান ৪/২৪-২৬, ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান ১৪২৪হি.

৩৪–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৫৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৫; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ৫৯১, ৫৯২, ৬৬৬, আলমাকতাবুল ইসলামী, দামেস্ক

নামাযে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, নামাযে রুকূ-সেজদা পূর্ণাঙ্গভাবে করে না।" [৩৫]

২৩. রুকূ থেকে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলতে বলতে উঠতেন এবং অত্যন্ত শান্তভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এরপর اَللّٰهُمَّ বা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। কখনো এরচেয়ে দীর্ঘ তাহমীদও পড়তেন, যথা এক বর্ণনায় নিম্নোক্ত শব্দ উল্লেখিত হয়েছে– [৩৬]

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

২৪. 'কওমা' থেকে তাকবীর বলতে বলতে সেজদায় যেতেন। প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, এরপর চেহারা ভূমির উপর রাখতেন। কোন কোন বর্ণনায় প্রথমে হাত তারপর হাঁটু রাখার কথাও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তা সহীহ নয়। এ বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্যও রয়েছে।

২৫. সেজদায় কপাল ও নাক ভালভাবে ভূমির উপর রাখতেন। চেহারা উভয় হাতের মাঝে এবং উভয় কব্জি কান বরাবর, কখনো কাঁধ বরাবর রাখতেন। উভয় বাহু পাঁজর থেকে দূরে এবং কনুই ভূমি থেকে উঁচু রাখতেন, এমন কি নিচ দিয়ে ছাগলছানা অতিক্রম করতে চাইলে অতিক্রম করতে পারত।

সেজদা সাতটি অঙ্গের উপর ভর দিয়ে করতেন–কপাল-নাক, উভয় হাতের পাতা, উভয় হাঁটু ও উভয় পায়ের পাতার প্রান্ত। সেজদায় হাতের অঙ্গুলি মিলিত রাখতেন এবং পায়ের অঙ্গুলি কিবলামুখী রাখতেন।

সেজদা অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে আদায় করতেন। এক ব্যক্তিকে নামায শিক্ষা দিতে গিয়ে নবীজী বলেন–

إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ

৩৫–মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২১৩৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ১৮৮৮, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরুত

৩৬–সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৭৭

اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، يَقُولُ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتّٰى يُقِيمَ صُلْبَهُ فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ، فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلٰى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ.

"তোমাদের কারো নামায পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে উত্তমরূপে অযু করবে যেমন আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। এরপর তাকবীর বলবে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করবে। এরপর কুরআন থেকে পাঠ করবে, যা আল্লাহ্ তাআলা তাকে তাওফীক দিয়েছেন। এরপর তাকবীর বলে রুকূ করবে। রুকূতে উভয় হাতের পাতা হাঁটুর উপর রাখবে, যতক্ষণ না তার সকল জোড়া স্থির হয়। এরপর سمع الله لمن حمده বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং মেরুদণ্ড সোজা করবে, যাতে সকল হাড় স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে যায়। এরপর তাকবীর দিয়ে সেজদায় যাবে এবং চেহারা ভালভাবে ভূমিতে স্থাপন করবে, যতক্ষণ না তার জোড়াসমূহ স্থির হয়। এরপর তাকবীর দিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং মেরুদণ্ড খাড়া করবে।" [৩৭]

সেজদায় বারবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পড়তেন। কখনো শুধু তিনবার পড়তেন। নফল নামাযের সেজদায় দুআও করতেন। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী কখনো ফরয নামাযেও সেজদায় দুআ করতেন।

২৬. তাসবীহ্র পরে তাকবীর বলতে বলতে সেজদা থেকে উঠতেন এবং অত্যন্ত শান্ত হয়ে বসতেন। বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। ডান পায়ের অঙ্গুলিসমূহ কেবলামুখী করে রাখতেন। ফরয নামাযে এ সময় কী পড়তেন–এ বিষয়ে আমাদের জানা মতে হাদীসের বর্ণনাসমূহ নীরব। নফল নামাযে নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন–

[৩৮] اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ (وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ (وَعَافِنِيْ) وَارْزُقْنِيْ

৩৭–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৫৮; সুনানে দারেমী, হাদীস ১৪৪৫, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত

৩৮–জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৪৫; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ৮৯৮, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي বা[৩৯]

সাধারণভাবে মনে হয় যে, ফরয নামাযেও উপরোক্ত দুআ বা এ জাতীয় কোন দুআ পড়তেন। কেননা নামাযের কোন রোকন বা কোন কাজ যিকির-শূন্য রাখা তাঁর রীতির পরিপন্থী।

২৭. 'জল্সা'এর পর প্রথম সেজদার মত দ্বিতীয় সেজদা করতেন। এরপর তাকবীর বলতে বলতে দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। সেজদা থেকে ওঠার সময় প্রথমে মাথা, এরপর হাত, এরপর হাঁটু ওঠাতেন। ওঠার সময় মাটিতে ভর দিতেন না। উরুর উপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রথম বা তৃতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় সেজদার পর বসতেন না। এটিই তার সাধারণ রীতি ছিল। কোন কোন বর্ণনায় দ্বিতীয় সেজদার পরে বসার কথা আছে এবং ওঠার সময় (মাটিতে) ভর দিয়ে ওঠার কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু এই বিষয়ক সকল হাদীস ও সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদির সমষ্টিগত বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, তা কখনো ওযরবশত হয়ে থাকবে।[৪০]

২৮. রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে উঠে এবং প্রথম বৈঠক থেকে উঠে তৃতীয় রাকাআতের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রাফয়ে য়াদাইন' করতেন কি না বা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত ওঠাতেন কিনা– এ বিষয়ে হাদীসের বর্ণনাসমূহ বিভিন্ন ধরনের। সারসংক্ষেপ হল, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও 'রাফয়ে য়াদাইন' না করাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযের কিছু ক্ষেত্রে বিশেষত রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে উঠতে 'রাফয়ে য়াদাইন' করাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এখন দেখার বিষয় হল, উভয় রীতিই সুন্নত, না একটি সুন্নত অপরটি কখনো কখনো বৈধতা বোঝানোর জন্য হত, এর সমাধান দেওয়া ফিক্হের ইমামগণের কাজ এবং তাঁরা তা করেও গিয়েছেন।

'রাফয়ে য়াদাইন' না করা সুন্নত হওয়ার বা এটিই মৌলিক সুন্নত হওয়ার একটি বড় আলামত হল 'খাইরুল কুরূনে' এ অনুযায়ী আমল বেশি ছিল। খুলাফায়ে

৩৯–সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১১৪৫, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৬৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ৮৯৭

৪০–ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৩২-২৩৪; ইবনে তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/৪৫১; মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ, সৌদী আরব; আলবানূরী, মাআরিফুস সুনান ৩/৭৪-৮১

রাশেদীনের মধ্যে হযরত উমর রা. ও হযরত আলী রা. থেকে তা-ই প্রমাণিত। অপর দুইজন থেকে সহীহ সনদে 'রাফয়ে য়াদাইন' প্রমাণিত নয়। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে অধিকাংশ ফকীহর আমলও তা-ই ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে প্রথম কাতারের নিয়মিত মুসুল্লী ছিলেন, তাঁদের আমলও তাই ছিল।

কোন কোন ইমাম বিভিন্ন কারণে 'রাফয়ে য়াদাইন'কে সুন্নত বলেছেন, তবে সকল ইমামের মতে 'রাফয়ে য়াদাইন' করা বা না-করা দু'টোই জায়েয। আলোচনা শুধু উত্তম-অনুত্তমের ক্ষেত্রে।[৪১]

২৯. দ্বিতীয় রাকাআত প্রথম রাকাআতের মতই আদায় করতেন, তবে এর শুরুতে ছানা ও তাআওউয পড়তেন না।

৩০. দ্বিতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় সেজদা থেকে তাকবীর বলতে বলতে তাশাহহুদের (আত্তাহিয়্যাতুর) জন্য বসতেন। এখানেও এভাবেই বসতেন যেভাবে দুই সেজদার মাঝখানে বসতেন।

৩১. তাশাহ্হুদের প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধতম বর্ণনা এই–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

৩২. তিন রাকাআত বা চার রাকাআতবিশিষ্ট নামাযে তাশাহ্হুদের পর কিছু পড়তেন না, তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।

৪১–ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল উলফাহ্‌ বাইনাল মুসলিমীন ৫৫-৫৬, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব; ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মাআদ ১/২৬৬ (ফজরের নামাযে কুনূত পড়ার আলোচনায়।) ইবনে দাকীকুল ঈদ, আলইমাম ফী মারিফাতি আহাদীসিল আহকাম; আযযাইলায়ী, নাসবুর রায়াহ ২/৩৯৩, দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সৌদী আরব; কাশ্মীরী, নাইলুল ফারকাদাইন, ফী মাসআলাতি রাফয়িল য়াদাইন, বাসতুল য়াদাইন লিনাইলিল ফারকাদাইন; আলবানূরী, মাআরিফুস সুনান শরহু জামিয়িত তিরমিযী ২/৪৫১-৫০১; উসমানী, ইলাউস সুনান ৩/৫৬-৯১; কাউসারী, আননুকাতুত তরীফাহ (ভূমিকা) ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান; আলইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী, কিতাবুল হুজ্জাহ আলা-আহলিল মাদীনা ২৩

৩৩. তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলানোর অভ্যাস ছিল না।

৩৪. তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাআতে দ্বিতীয় সেজদা থেকে তাকবীর বলতে বলতে বসতেন।

৩৫. 'আখেরী বৈঠকে' বসার বিভিন্ন পদ্ধতি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু যে পদ্ধতি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. নামাযের প্রত্যেক বৈঠকের জন্য মাসনূন পন্থা বলেছেন এবং উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা. যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস বলেছেন তা হল, বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে তার অঙ্গুলিসমূহ কেবলামুখী রাখা। এ থেকে এবং অন্যান্য আলামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্য পদ্ধতিগুলো বিশেষ অবস্থায় বা কোন ওযরবশত হত।[৪২]

৩৬. তাশাহ্হুদের সময় উভয় হাত উরুর উপর রাখতেন। ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর। কোন কোন বর্ণনায় উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখার কথা আছে। এর অর্থ হল হাত উরুর সম্মুখভাগে এমনভাবে রাখতেন যে, অঙ্গুলিসমূহ হাঁটু স্পর্শ করত। কোন কোন বর্ণনায় বাম হাতের পাতা একদম বাম হাঁটুর উপরে রাখার উল্লেখ এসেছে। বলাবাহুল্য, এমনটি মাঝে মাঝে করে থাকবেন।[৪৩]

৩৭. তাশাহ্হুদের মধ্যে ডান হাতের অঙ্গুলিসমূহ কীভাবে রাখতেন এবং কীভাবে ইশারা করতেন–এ বিষয়ে সহীহ হাদীসসমূহে বিভিন্ন তরীকা বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু দুইটি হাদীস উল্লিখিত হল–

١– عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، وَرَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا، حَلَّقَ بِشْرٌ (الرَّاوِيْ) الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

৪২–বাদ্‌রুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী ৬/১০২-১০৩; কাশ্মীরী, ফয়যুল বারী ২/৩১০-৩১২; বানূরী, মাআরিফুস সুনান ৩/১৬০-১৬৬

৪৩–মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ ২/৩২৯, মাকতাবা ইমদাদিয়াহ, মুলতান, পাকিস্তান; শাব্বীর আহমদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম শরহু সহীহি মুসলিম ২/১৬৯, মাকতাবা রাশীদিয়া, করাচী, পাকিস্তান

"হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে বসার অবস্থা বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন। ডান কনুই ডান উরুর সমান্তরালে রাখলেন। দুই অঙ্গুলি গুটালেন ও একটি গোলক বানালেন এবং আমি তাঁকে এভাবে ইশারা করতে দেখেছি, বর্ণনাকারী বিশ্‌র মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলক তৈরি করলেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন।" [৪৪]

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তিনি নামাযে বসতেন তখন তাঁর ডান হাতের পাতা ডান উরুর উপর রাখতেন, সকল অঙ্গুলি গুটিয়ে ফেলতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির কাছের অঙ্গুলিটি দ্বারা ইশারা করতেন এবং বাম হাতের পাতা বাম উরুর উপর রাখতেন।" [৪৫]

এখন প্রশ্ন হয় যে, কখন হাতের অঙ্গুলিসমূহ মুঠ করা বা গোলাকার বানানো হবে, বসার শুরু থেকেই, না ইশারার সময়–এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা হাদীস শরীফে নেই। ফকীহগণ এ ব্যাপারে দুটি মত পোষণ করেন, যা সংশ্লিষ্ট আলামত ও হাদীসের ইশারা-ইঙ্গিতের উপর নির্ভরশীল :

(১) ইশারার সময় করবে।[৪৬] (২) বসার শুরু থেকেই করবে। [৪৭]

আর ইশারা সর্বাবস্থায় কালেমা শাহাদাত পড়ার সময় হবে। এই সিদ্ধান্ত উম্মাহর কর্মধারা ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

ইশারার পরে হাতের মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় বা গোলাকার অবস্থায় বাকি রাখতেন কি

৪৪–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৯৫৩

৪৫–সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৮০ (১১৬); মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী, মুয়াত্তা ১০৮, মাকতাবা থানভী, দেওবন্দ, ভারত

৪৬–ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/২৭২, দারু ইহ্‌ইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ ২/৩২৮

৪৭–আব্দুল হাই লাখনোভী, আসসিআয়াহ ২/২২১, সুহাইল একাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান

না; কোন কোন বর্ণনার কোন কোন শব্দ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইশারার পরে সালাম পর্যন্ত এই অবস্থা বাকি থাকত। [৪৮]

বাম হাতের অঙ্গুলিসমূহ কীভাবে রাখতেন, এ ব্যাপারে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, তা বাম উরুর উপর (সম্মুখ অংশে) বিছিয়ে রাখতেন। [৪৯]

কেউ কেউ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাহিয়্যাতুর শুরু থেকে সালাম পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি নাড়াতে থাকতেন। এই ধারণা ভুল। এর ভিত্তি একটি দুর্বল বর্ণনা, যা মুনকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ইশারা করতেন, অঙ্গুলি নাড়াতেন না আর তাও শুধু শাহাদাতের সময়, পুরো আত্তাহিয়্যাতু বা পুরো বৈঠকে নয়। [৫০]

শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা প্রথম বৈঠকের তাশাহহুদের মধ্যেও মাসনূন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেও ইশারা করতেন। [৫১]

৩৮. আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরূদ পড়ার আদেশ করতেন। সাহাবীগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁদের নিম্নোক্ত দরূদটি শিখিয়ে দেন– [৫২]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

এই দরূদকে দরূদে ইবরাহীমী বলা হয়। সহীহ হাদীসে এর বিভিন্ন পাঠ বর্ণিত হয়েছে। যেকোন পাঠ অবলম্বন করা যেতে পারে। কোন কোন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, নবীজী নিজেও নামাযে এই দরূদ পড়তেন। [৫৩]

৩৯. দরূদের পরে দুআ করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর ইরশাদ হল, হাম্‌দ ও ছানা

৪৮–বানূরী, মাআরিফুস সুনান ৩/১০৬

৪৯–সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৮০ (১১৪)

৫০–মাহমুদ সাঈদ মামদূহ, আততারীফ বিআওহামি মান কাসসামাস সুনানা ইলা সাহীহি ওয়া যায়ীফ ৪/১১-১৯, হাদীস ৩৮৫

৫১–সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১১৬১

৫২–সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৭০

৫৩–ইমাম শাফেয়ী, কিতাবুল উম্ম ১/১৪০, দারুল ফিকর, বৈরুত; বায়হাকী, সুনানে কুবরা ২/১৪৭

অর্থাৎ তাশাহ্হুদ ও দরূদের পরে যে যা প্রার্থনা করতে চাও বা যে দুআ তোমাদের অধিক পছন্দ হয় তা-ই আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা কর।[৫৪]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.এর আবেদনের প্রেক্ষিতে এই স্থলে পড়ার জন্য তাকে নিম্নোক্ত দুআটি শিখিয়েছেন-[৫৫]

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

এ ছাড়া আরো দুআ বর্ণিত হয়েছে, যা নিজে পড়তেন বা পড়ার নির্দেশ দিতেন। এখানে আরেকটি দুআ উল্লিখিত হল-[৫৬]

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

৪০. দুআর পরে উভয় দিকে সালাম ফিরাতেন। ডান দিকেও, বাম দিকেও। সালামের শব্দ হল- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন-

حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ

'সালাম বেশি দীর্ঘ না করা সুন্নত।'[৫৭]

এ থেকে বোঝা যায়, সালাম দীর্ঘ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল না। আজকাল অনেক ইমামকে السلام ও الله শব্দ দুটি অনেক লম্বা করতে শোনা যায়, যা সংশোধনযোগ্য।

৪১. নামায সমাপ্ত হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুআ ও যিকির নিজেও পড়তেন এবং পড়ার নির্দেশও দিতেন এবং বলতেন, রাতের শেষ প্রহরে ও ফরয নামাযের পরে দুআ অধিক কবূল হয়ে থাকে।[৫৮]

ফরয নামাযের পর কখনো কখনো হাত উঠিয়ে দুআ করেছেন।[৫৯]

৫৪-সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৩৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৬৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৭৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৯৫১

৫৫-সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৩৪

৫৬-বুখারী, হাদীস ৮৩২

৫৭-জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯৭ =

কিছু কথা :

১. উপরোক্ত আলোচনায় নামাযের নববী পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো উপস্থাপিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় এতে আসেনি। এ জন্য হাদীস ও সীরাতের দীর্ঘ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির সাহায্য নিতে হবে।

২. এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় শুধু নামাযের পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ফিক্হী আঙ্গিকে কোন কাজের শরয়ী মান কী (ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি) উল্লেখ করা হয়নি। এর জন্য ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য।

৩. নামাযের পদ্ধতির যেসব অংশে নববী পন্থা নির্ধারণ বা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে 'খাইরুল কুরূন' থেকে মতপার্থক্য চলে আসছে সেসব বিষয়ে ইঙ্গিতে দুই একটি কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ও বিশ্লেষণ ফিক্হের ইমামগণ করে গেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য 'ইলমু মুখতালিফিল হাদীস', 'ইলমু মুশকিলিল হাদীস', 'ফিকহুল খিলাফিয়াত', 'আলফিকহুল মুকারান' এবং হাদীসের প্রাচীন, বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ- সমূহের সাহায্য নিতে হবে। এতে এইসব শাখাগত মতানৈক্যের মান ও পর্যায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ, সমালোচনা ও কটূক্তি বা হাদীস অমান্য করার অভিযোগ দায়ের করা মারাত্মক ভুল এবং শরীয়তের রুচি ও মেযাজের পরিপন্থী।

ইদানীং এই বিষয়টিকে এতই সহজ মনে করা হয় যে, দু'চারটি হাদীসের কিতাব বা তার অনুবাদ পড়ে যা মনে আসে তাই লিখে 'নামাযের নববী পদ্ধতি' বলে পেশ করে দেওয়া হয় এবং পাঠকবৃন্দকে এই ধারণা দেওয়া হয় যে, আজ পর্যন্ত ইসলামী মনীষীগণ তোমাদেরকে যে নামায শিক্ষা দিয়েছেন তা নববী নামায নয়। তা –নাউযুবিল্লাহ– অন্য কোন নামায বা ফিক্হের নামায; হাদীসের নামায নয়। অথচ ফিক্হে ইসলামী হচ্ছে কুরআন হাদীসেরই ভাষ্যকার এবং কুরআন হাদীসের বিধান ও নির্দেশনা এবং এর প্রায়োগিক রূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ উপস্থাপনকারী; তা কখনো কুরআন হাদীসের বিপরীত বা কুরআন হাদীস থেকে

= ৫৮–জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৯৯

৫৯–আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, সালাসু রাসাইল ফী ইসতিহ্বাবিদ দুআয়ি বাদাস সালাওয়াতিল মাকতূবাহ, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব; শামসুদ্দীন নূর, আততুহ্ফাতুল মাতলূবাহ ফিস্তিহ্বাবি রাফয়িল য়াদাইন ফিদ দুআ বাদাল মাকতূবাহ, মাকতাবা নূর, করাচী, পাকিস্তান

বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়।

৪- নামাযে কিছু কাজ এমন আছে, যাতে একাধিক পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটি কয়েক ধরনের। যথা :

ক. উভয় পদ্ধতি মাসনূন।

খ. একটি মাসনূন, অন্যটি বৈধতা বোঝানোর জন্য হয়েছে।

গ. একটি পন্থা প্রথমে ছিল, পরবর্তী সময়ে তা সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গেছে কিংবা সুন্নত হওয়া রহিত হয়ে শুধু বৈধতা বাকি রয়েছে।

ঘ. একটি পন্থা মাসনূন, অপরটি ছিল ওযরবশত।

ঙ. একটি পন্থাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, অপরটি যে বর্ণনায় আছে তার সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ সহীহ বলেন, কেউ সহীহ বলেন না।

কখনো এমনও হয় যে, উভয় পন্থার হাদীসসমূহেই ইমামগণের মতভেদ থাকে। কেউ একে সহীহ মনে করেন, আবার কেউ একে যয়ীফ মনে করেন।

এখন পন্থার বিভিন্নতা কোথায় কোন ধরনের–এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ফিক্‌হের ইমামগণের কাজ। এ জন্য হাদীসের কিছু গ্রন্থ বা তার অনুবাদ পাঠ করা মোটেও যথেষ্ট নয় এবং এ ক্ষেত্রে এই জিগির তোলারও কোন সুযোগ নেই যে, অমুক অমুক ফিক্‌হের সংকলিত নামায-পদ্ধতি কিয়াস বা যয়ীফ হাদীসনির্ভর।[৬০]

৫. কিছু কাজ এমনও আছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাক্রমে শুধু বৈধতা বোঝানোর জন্য করেছেন; নামাযের মাসনূন বা মুস্তাহাব কাজ হিসাবে করেননি। তাই কোন হাদীসে এ ধরনের একটি কাজ দেখে তা সুন্নত মনে করা মোটেও ঠিক নয়। যেমন জুতোপরা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা এবং নামায আদায় করা। কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতো পরে নামায আদায় করেছেন। কেউ কেউ এটা দেখে মনে করেন, জুতো পরে নামায পড়া সুন্নত, আর আজ পর্যন্ত মৌলভীরা আমাদেরকে এই সুন্নত থেকে বঞ্চিত রেখেছে! এখন তাদেরকে কে বোঝাবে যে, উপরোক্ত

৬০–ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল উলফাহ বাইনাল মুসলিমীন, রাফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আলাম; ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৬৬ (কুনূতের আলোচনায়) ২৪২-২৪৪; (আখেরী বৈঠকের আলোচনার পূর্বে।) ওলীউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ৩/৪৩৬-৪৩৭, মাকতাবা হিজায, দেওবন্দ, ভারত; ইউসুফ লুধিয়ানভী, ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম, ২য় খণ্ড, মাকতাবা লুধিয়ানভী, করাচী, পাকিস্তান; আব্দুল্লাহ বিন যাইফুল্লাহ আর-রুহাইলী, দাওয়াতুন ইলাস সুন্নাহ ফী তাতবীকিস

হাদীসে বিশেষ শর্তসাপেক্ষে জুতো পরে নামায পড়ার শুধু বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে। শর্ত হল জুতো পাক হতে হবে এবং এমন সাদাসিধে হতে হবে যে, তা পরিধান করে অতি সহজেই সেজদা করা যায় এবং অঙ্গুলিসমূহ জমির সাথে মিলিয়ে রাখা যায়; যেমন চামড়ার মোজার মধ্যে সম্ভব। কিন্তু উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সর্বাবস্থায় ও সব পরিবেশে সব ধরনের জুতো পায়ে দিয়ে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণ করা বা জুতো পরে নামায পড়াকে নবীজীর সুন্নত তরীকা মনে করা নিতান্তই ভুল এবং উসূলে ফিক্‌হের ব্যাপারে অজ্ঞতার পরিচায়ক। [৬১]

৬. এ প্রবন্ধে উল্লিখিত নামায আদায়ের পদ্ধতি পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। হাদীস, আসারে সাহাবা, আমলে মুতাওয়ারাস এবং 'খাইরুল কুরূন'এর ঐকমত্যে এ বিষয়টি প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে মুহাক্কিক আলেমগণ একাধিক গ্রন্থও রচনা করেছেন; যাতে এ বিষয়ের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। আমি নিজেও এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছি, যা নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে 'মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা' থেকে রচিত গ্রন্থের অংশ হিসেবে অচিরেই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

والحمد لله رب العالمين.

[মে '০৫ঈ.]

সুন্নাতি মানহাজাও ওয়া উসলূবা, দারুল কলম, দামেস্ক, আদ-দারুশ শামিয়া, বৈরুত; মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, আসারুল হাদীসিশ শারীফ ফিখতিলাফিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা, আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসায়িলিল ইলমি ওয়াদ-দীন, দারুল কিবলাহ লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দাহ, সৌদী আরব

৬১–আলমাক্কারী, ফাতহুল মুতাআল ফী মাদ্‌হি খাইরিন নিআল (গায়াতুল মাকাল-এর উদ্ধৃতিতে); আলউব্বী, শারহু সহীহি মুসলিম ২/৪৫৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; আসসানুসী, শারহু সহীহি মুসলিম ২/৪৫৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; আব্দুল হাই লাখনোভী, গায়াতুল মাকাল ফী মাইয়াতাআল্লাকু বিন নিআল, ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান; কাশ্মীরী, ফয়যুল বারী ২/২৬, রাব্বানী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত; বানূরী, মাআরিফুস সুনান ৪/১-১৭, আলমাকতাবাতুল বানুরিয়া, করাচী, পাকিস্তান; কাউসারী, মাকালাতুল কাউসারী ১৭০-১৮৭, এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, করাচী, পাকিস্তান

মেরাজ : কিছু তত্ত্ব, কিছু শিক্ষা কিছু ভুল ধারণার সংশোধন

মেরাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক বড় একটি মুজেযা; তাঁর প্রতি রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় একটি পুরস্কার এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটি অনুগ্রহ। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস, তাফসীর, সীরাত ও তারীখের কিতাবে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু কুরআনের কিছু আয়াত উল্লেখ করব এবং প্রাসঙ্গিক দুচারটি কথা আরয করব।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"পবিত্র ওই সত্তা (আল্লাহ) যিনি তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রাতারাতি মসজিদে হারাম (কাবা শরীফ) থেকে মসজিদে আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চার পাশে (সিরিয়াদেশ ব্যাপী) আমি অনেক প্রকার বরকত দিয়ে রেখেছি, উদ্দেশ্য যাতে আমি তাঁকে আমার কুদরতের বিস্ময়কর কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" –সূরা বনী ইসরাঈল ১

অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرٰى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى، اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى،

لَقَدْ رَأٰى مِنْ آيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

"আর তিনি তাকে (সেই ফেরেশতাকে) আরো একবার দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহার কাছে, তার নিকটেই রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া; যখন সিদরাতুল মুনতাহাকে আবৃত করছিল যা আবৃত করছিল। দৃষ্টি টলেওনি এবং অগ্রসরও হয়নি। তিনি নিজ রবের বিরাট বিরাট আশ্চর্য নিদর্শন দর্শন করেছেন।" –সূরা নাজম ১৩-১৮

এই আয়াতসমূহ থেকে যেমন মেরাজের উদ্দেশ্য জানা গেল তেমনি ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এর তত্ত্ব ও শিক্ষার প্রতিও কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল। পাশাপাশি এ বিষয়টি এক রকম স্পষ্টই করে দেওয়া হল যে, মেরাজের পুরো অবস্থা শব্দ ও বাক্যের গাঁথুনিতে প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। এ জন্যই একে إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى 'যখন সেই সিদরাতুল মুনতাহাকে আবৃত করছিল যা আবৃত করছিল'এর অস্পষ্টতার মধ্যেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

কিছু তত্ত্ব ও কিছু রহস্য

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.)এর ভাষায়–

"মেরাজের ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা নয়, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলার বড় বড় নিদর্শন দেখানো হয়েছে এবং যেখানে আসমান ও জমিনের মহারাজত্ব তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। নবুওয়তের এই গায়বী ও আসমানী সফরে আরো অনেক সূক্ষ্ম ও গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এবং অনেক সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত রয়েছে।"

মাওলানা বলেন, "এই সূরা দুটি–ইসরা ও নাজ্ম যা মেরাজের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে–এ ঘোষণা দিচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা উভয় কিবলার নবী, মাশরিক-মাগরিব উভয় প্রান্তের ইমাম এবং গোটা মানবজাতির দিশারী। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মেরাজ সফরে মক্কা ও বাইতুল মুকাদ্দাস এবং মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা এক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। তাঁর ইমামতে সকল নবী-রাসূল নামায পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল তাঁর পয়গাম ও দাওয়াতের সর্বজনীনতা, তাঁর নবুওয়ত ও রিসালাতের সর্বকালীনতা এবং মানবজাতির সকল শ্রেণীর জন্য তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনার উপযোগিতার দলীল।

এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বের সঠিক

পরিচয়, তাঁর নেতৃত্বের প্রকৃত ধরন, তাঁর উম্মতের প্রকৃত মর্যাদা এবং সেই পয়গাম ও কর্মের উপরে আলোকপাত করে, যা তাঁর উম্মতকে এই বিস্তৃতজগৎ এবং এই বিচিত্র মানব-সমাজে আঞ্জাম দিতে হবে।

মেরাজের ঘটনা সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে সমাজ ও ভূখণ্ডকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা আর নবুওয়তের সর্বকালীনতা ও সর্বজনীনতার মাঝে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোন জনপদ বা জনগোষ্ঠীর শুধু একজন নেতা কিংবা কোন দেশ বা জাতির আধ্যাত্মিক রাহবর অথবা কোন নতুন সভ্যতা ও শক্তির প্রতিষ্ঠাতা মাত্র হতেন তা হলে তাঁর আসমানী মেরাজের প্রয়োজন হত না। আসমানের রাজত্বের ভ্রমণ ও পরিদর্শন এবং ধুলির ধরার সাথে আকাশের যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ারও প্রয়োজন হত না। তাঁর নিজের জন্মভূমি এবং চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতিই এর জন্য যথেষ্ট হত। নিজের ভূখণ্ড ছেড়ে অন্য ভূখণ্ডে যাওয়ারও প্রয়োজন হত না। প্রয়োজন হত না সুদূর আকাশজগৎ ও সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছার কিংবা মসজিদে আকসায় তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার, যা ছিল তাঁর নিজ জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে খৃষ্টান রোমকদের শাসন কর্তৃত্বের অধীন।

মেরাজের ঘটনা ঘোষণা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইসব গোত্রীয় বা রাজনৈতিক নেতাদের সারির লোক ছিলেন না, যাদের মেধা ও কর্ম নিবেদিত থাকে শুধু তাদের দেশ ও জাতির জন্য এবং যাদের সাধনার সুফল ও প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে দেশ ও জাতির সীমিত পরিসরে। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী এবং রাসূলগণের জামাআতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা আসমানের পয়গাম জমিনবাসীর কাছে এবং স্রষ্টার পয়গাম সৃষ্টির কাছে পৌছিয়ে থাকেন, যাঁদের মাধ্যমে বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে গোটা মানবজাতি কল্যাণ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁদের ভাগ্যের দুয়ার খোলে।" –নবীয়ে রহমত ১৯৬-১৯৮

আজ মেরাজকে উপলক্ষ করে জস্‌নে জুলুস করার অনেক লোক আছে, কিন্তু মেরাজের হাকীকত পদদলিত হলে অশ্রু বিসর্জনকারী কেউ নেই। যে মসজিদে আকসাকে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ আর ইহুদীদের 'খাবাছাত' থেকে পবিত্র করার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন এবং যে মসজিদে আকসায় তিনি নবী-রাসূলগণের ইমামত করেছিলেন সেই মসজিদের পবিত্রতা খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ আর ইহুদীদের কুফরিয়াত দ্বারা নষ্ট হচ্ছে অথচ আমাদের যেন এ বিষয়ে দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই।

মেরাজ থেকে আখেরী নবীর নবুওয়ত ও রিসালাতের সর্বজনীনতা ও

সর্বকালীনতার যে সবক দেওয়া হয়েছিল, যা ইসলামের মৌলিক আকীদা, ঈমানের অপরিহার্য শর্ত এবং যা কুরআন হাদীসের অনেক অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তা আজ নবুওয়তে মুহাম্মাদীর সাথে বিদ্রোহকারী কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছে, যারা নবুওয়তে মুহাম্মাদীর বিপরীতে স্বতন্ত্র নবুওয়ত ও শরীয়ত আবিষ্কার করে তা আল্লাহ তাআলার উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং মুনাফেকির চূড়ান্ত স্তরে নিজেদেরকে মুসলমান নামে পেশ করছে, মুসলমানদের কালেমা চুরি করে বিভিন্ন জায়গায় তা ব্যবহার করছে। অপরদিকে মুসলমানরা হয়েছে আত্মমর্যাদাহীন আর উদাসীন, তাদের অনেকের একথাটিও জানা নেই যে, কাদিয়ানীরা যখন لا إله إلا الله محمد رسول الله বলে محمد দ্বারা খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নয় গোলাম আহমদকেই উদ্দেশ্য করে।

ইহুদী-নাসারা তো কাদিয়ানীদের বঞ্চনা ও নির্যাতনের সাজানো নাটক দেখে আকুল হয়ে কাঁদছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের বরং প্রতিশোধ গ্রহণের ছুতোয় মুসলিম দেশগুলোর উপর নির্যাতনের সূত্রপাত ঘটানোর জন্য একদম মুখিয়ে আছে, কিন্তু মুসলিম জাতি কাদিয়ানীদের ধোঁকা ও প্রতারণা, চক্রান্ত ও কুটকৌশল এবং ওদের বাস্তব অন্যায়-অবিচারের শুধু মৌখিক প্রতিবাদের জন্যও এক সারিতে এসে দাঁড়াতে পারছে না।!!

কিছু শিক্ষা কিছু নির্দেশনা

মেরাজে স্পষ্টভাবে যেসব শিক্ষা ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায অন্যতম। নামায মুমিনের জন্য পরোক্ষ মেরাজ, যা সহীহ হাদীস থেকেও বোঝা যায় এবং এ রাতে তা ফরয হওয়ার মধ্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

'আস্‌সালাতু মিরাজুল মুমিনীন।' হুবহু এই শব্দ যদিও হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় না, কিন্তু তা এমন এক উক্তি যার মর্ম একাধিক সহীহ হাদীস থেকেই আহরণ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, বান্দা যতক্ষণ নামাযে থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনে মশগুল থাকে। এমন নামাযই মেরাজ হতে পারে যা জামাআতের সাথে আদায় করা হয়, যার সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। তাজবীদ ও চিন্তাভাবনার সাথে তেলাওয়াত করা হয় এবং খুশূ-খুযূ ও ইহসানের অনুভূতি নিয়ে নামায আদায় করা হয়।

ইহসানের বিবরণ হাদীস শরীফে এভাবে দেওয়া হয়েছে, 'তুমি এমনভাবে

আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ; অনন্তর তুমি যদি তাকে না দেখ তিনি তো তোমাকে দেখছেন।'

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন নামাযের মধ্যে মুসলমানদের মেরাজের অবস্থা হবে তখন নামাযের বাইরেও তাদের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু বর্তমানের উন্নতিকামীরা নামাযের হাকীকত সম্পর্কেই উদাসীন। ইবাদতের স্বাধ-মিষ্টতার সাথে তাদের কোন পরিচয় নেই। তারা ইবাদতকে হুকুমতের সিঁড়ি ভাবতেই ভালবাসেন।

সহীহ মুসলিম-এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত–

لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهٖ إِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، فَأُعْطِيَ ثَلَاثًا، أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَّا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مِّنْ أُمَّتِهِ الْمُقْحَمَاتِ.

"ইসরার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হল। এরপর তাঁকে তিনটি জিনিস দান করা হয়–পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ এবং এই সুসংবাদ যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরকে লিপ্ত হয়নি তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়েছে।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৯

মেরাজের এই বিশেষ উপহারসমূহের মর্যাদা দিতে হলে করণীয় হচ্ছে–

১. সব ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকা। আজ কালেমা পাঠকারী কত মুসলমান অজ্ঞতার কারণে শিরকে জলী তথা প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত। আর শিরকে খফী তথা প্রচ্ছন্ন শিরক তো একটি প্রচ্ছন্ন বিষয়। এ থেকে মুক্ত থাকার জন্য তো মজবুত ঈমান চাই, পাক্কা তাওহীদ আর চূড়ান্ত পর্যায়ের ইখলাস চাই।

২. সূরা বাকারার শেষ আয়াত (আয়াত ২৮৫) মোতাবেক ঈমান-আকীদা দুরুস্ত করে নিতে হবে।

৩. কুরআনের নির্দেশনাসমূহ জানতে হবে এবং যথাযথভাবে তা অনুসরণ করতে হবে।

৪. দুআ ও ইস্তেগফারের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

হাদীস শরীফে রাতে সূরা বাকারার এই শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং অনেক বড় সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

শিশু-কিশোরদেরকে এই আয়াতসমূহ শিখানোর কথাও হাদীস শরীফে এসেছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার আরশের নিচের বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এই উপহার দেওয়া হয়েছে। আর এটা এমনই উপহার যা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (হাদীসসমূহের জন্য দেখুন, তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৩৬৫-৩৬৬; তাফসীরে আদ্দুররুল মানসূর ১/৩৭৮)

মেরাজের শিক্ষার অনেক বড় একটি দিক হল আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের ওইসব দৃশ্য, যা এই রাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয়েছে। যেসব নেক আমলের পুরস্কার এবং যেসব গুনাহের শাস্তির দৃশ্য নবীজীকে দেখানো হয়েছে তা নির্বাচনের তাৎপর্য হয়ত এই যে, আখলাক ও কর্মের দুরুস্তি এবং সমাজ ও পরিবেশের সংশোধনের বিষয়টি এসব নেক আমলের প্রচার-প্রসার এবং ওই সব গুনাহ বিলুপ্ত হওয়ার উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। হাদীসের কিতাবসমূহে মেরাজের বিবরণ পড়ার সময় এ বিষয়টিও আমাদের স্মরণে থাকা উচিত।

কিছু ভ্রান্তি

মেরাজের ঘটনাটি বোঝা, বর্ণনা করা এবং এর তত্ত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করার ব্যাপারে যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে তার তালিকা বেশ দীর্ঘ। আজকের আলোচনায় আমি শুধু তিনটি কথা বলতে চাই-

১. যেহেতু কোন কোন অবিশ্বাসী মেরাজের ঘটনাকে অসম্ভব মনে করে তাই অনেকে তাদেরকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবতারণা করেন এবং এর ভিত্তিতে মেরাজের ঘটনার সম্ভাব্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। আসলে এই কাজের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, ইসরা ও মেরাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের কাজ ছিল না। অর্থাৎ তিনি নিজের শক্তিতে আসমান ও জমিনের এই অতি আশ্চর্য ভ্রমণ সম্পন্ন করেননি। তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে এবং করিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং সকল ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে চির-পবিত্র। এ জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি যার ঈমান আছে, কুরআন হাদীসের বিবরণের উপর তার আপত্তি তো দূরের কথা, সামান্যতম সংশয়ও থাকতে পারে না।

তবে অবিশ্বাসীদের মুখ বন্ধ করার জন্য বা অন্য কোন ভাল উদ্দেশ্যে এই পন্থা অবলম্বন করা হলে তাতে বিশেষ কোন ক্ষতিও নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে

হবে যে, বিজ্ঞান বিষয়ে সামান্য জেনে এমন কোন কথা বলা যাবে না যা খোদ বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের নিকটেই স্বীকৃত নয়। কিংবা বিজ্ঞানের এমন কোন সূত্রকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না, যার দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আরো জটিল হয়ে যায়। যেমন এক ওয়ায়েজকে বলতে শোনা গেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতে আলোর গতিতে ভ্রমণ করেছেন! অথচ আলোর গতি সম্পর্কে যারা জানেন তাদের কাছে এই ব্যাখ্যা একটি হাস্যকর কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোর গতিতেই যদি মেরাজ হত তাহলে হয়ত আজও মেরাজ সমাপ্ত হত না।

২. মেরাজের ঘটনা শোনানোর সময় রেওয়ায়াতের শুদ্ধাশুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখাও একটি ব্যাপক ভুল। একশ্রেণীর মানুষের অভ্যাস হল, কোন চটি পুস্তিকায় কিছু পেলে বা কোন কেচ্ছা-কাহিনীকারের কাছে কিছু শুনলে তাই বিশ্বাস করে বসে। এরপর তা এত আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করতে থাকে যেন সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমের কোন হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এমন কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয।

মেরাজের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। তাঁরও উপরে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে। তাই এই ঘটনার বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হাদীস, সীরাত ও তাফসীরের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি থেকে মেরাজের ঘটনা পড়তে হবে। যেকোন মানুষের মৌখিক বর্ণনা কিংবা ফুটপাতের বই-পত্রের উপর নির্ভর করার তো প্রশ্নই আসে না। ভাল হয়, যদি এ বিষয়ে অধ্যয়নযোগ্য কিতাবাদি নির্বাচন এবং রেওয়ায়াতসমূহের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য কোন বিজ্ঞ আলেমের সাহায্য নেওয়া যায়।

৩. কোন কোন জাহেল ব্যক্তি মেরাজের ঘটনাকে এমনভাবে বর্ণনা করে, যেন আরশ আল্লাহ তাআলার থাকার জায়গা এবং তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের ঘরে দাওয়াত করেছেন! নাউযুবিল্লাহ!

মনে রাখতে হবে, এই ধারণা এবং এ ধরনের উপস্থাপনা খুবই মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, আরশ তাঁর মাখলুক, স্থান ও কাল সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সত্তা স্থান-কালের সকল বাঁধা-বন্ধনের উর্ধ্বে। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা।

মেরাজের ঘটনা ঠিক সেভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে সূরা ইসরা ও সূরা

নাজমের উপরোক্ত আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে কিংবা এই সব আয়াতের তাফসীর বিষয়ক হাদীসসমূহে যেভাবে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানহীন কেচ্ছা-কাহিনীকারদের মত জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের আশ্রয় নেওয়া একটি মারাত্মক ভুল। #

[আগস্ট '০৫]

ইসরা ও মেরাজ বিষয়ে একটি উত্তম ও প্রাচীন রচনা

আলকাউসার রজব ১৪২৬ হি. সংখ্যায় 'মেরাজ : কিছু তত্ত্ব, কিছু শিক্ষা, কিছু ভুল ধারণার সংশোধন' শিরোনামে আমার একটি প্রবন্ধ এবং 'মাহে রজব : করণীয় ও বর্জনীয়' শিরোনামে মাওলানা মুতীউর রহমানের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর রজব ১৪২৭ হি. সংখ্যায় 'রজব, মেরাজ ও শবে মেরাজ : কিছু কথা' শিরোনামে আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গত বছর ১৪২৮ হিজরীর রজব সংখ্যায় মাওলানা দানিশ ইবনে দানিশের কলমে 'সহীহ হাদীসের আলোকে মেরাজুন নবী-এর ঘটনা' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ বছরও এ প্রসঙ্গে কিছু লেখার ছিল, ঘটনাক্রমে কিছু দিন আগে কায়রো থেকে এক বন্ধু আল্লামা আবুল খাত্তাব উমর ইবনে দিহ্ইয়া (৫৪২হি-৬৩৩হি.) রচিত 'আলইব্‌তিহাজ ফী আহাদীসিল মিরাজ' নামক কিতাবটি আমার জন্য পাঠিয়েছেন। রচনাটি ইসরা ও মেরাজ সম্পর্কে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এজন্য ইচ্ছা করেছি, আলকাউসারের এ সংখ্যায় এ কিতাবের পরিচিতি এবং তা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরি।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রচনার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে রচয়িতা সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোকপাত করছি।

গ্রন্থকার সপ্তম হিজরী শতাব্দীর ইলমে শরীয়তের মাহের আলেমদের মধ্যে গণ্য। বিশেষত ইলমে হাদীসের সকল শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল, যেন এটা তাঁর বিশেষ শাস্ত্র। আরবী ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। 'ইলমে উসূলুদ্দীন' ও 'ইলমুল কালাম' বিষয়েও যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল।

মাতুল সূত্রে হুসায়নী। নাম উমর ইবনুল হাসান। উপনাম আবুল খাত্তাব ইবনে দিহ্য়া। আদি নিবাস আন্দালুসে। ইলম অর্জনের জন্য মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। শেষে মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মিসরের তৎকালীন শাসক আলমালিকুল কামিল (মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব) তাঁর জন্য দারুল হাদীস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁকে সেই প্রতিষ্ঠানের শাইখুল হাদীস পদে বরণ করেছিলেন।

প্রায় নব্বই বছর বয়সে ৬৩৩ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল। জন্ম ৫৪২ হিজরীতে।

তাঁর রচনাবলির তালিকা দীর্ঘ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সঙ্গে যেসব মুজেযা সম্পৃক্ত ছিল, সে সম্পর্কে তাঁর রচনা 'আলআয়াতুল বাইয়িনাত ফী যিক্‌রি মা ফী আ'যাই রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল মু'জিযাত' ১৪২০ হিজরীতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাকতাবা উমারাইন থেকে শাইখ জামাল আয-যাওনের তাহকীক-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

রজব মাসকে কেন্দ্র করে যেসব ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজ এবং মওযূ ও জাল রেওয়ায়াত তাঁর যুগে প্রচলিত হয়েছিল; বরং এখনও কোন কোন মহলে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করে তিনি রচনা করেন– 'আদাউ মা ওয়াজাব মিন বায়ানি ওয়াযয়িল ওয়াযযাঈনা ফী রাজাব'। এটি একটি শানদার কিতাব, যা ১৪২১ হিজরীতে মুআসসাসাতুর রায়্যান, বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত শাইখ জামাল আযযাওন এ গ্রন্থেরও মুহাক্কিক-সম্পাদক।

তাঁর অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দুটি–

(১) 'আততানবীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত বিষয়ে এটি অত্যন্ত শানদার ও জানদার কিতাব। বিলাদত (জন্ম) থেকে ওফাত পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ সীরাতের বিবরণের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বহু আলোচনাও এতে এসেছে। এ কিতাবের নামের সাথে 'মাওলিদ' শব্দ থাকায় কিছু মানুষ এই ভুল ধারণায় পড়ে গেছেন যে, নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ প্রচলিত মীলাদ সম্পর্কে রচিত।

এই কিতাবের মাখতূতা (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি) হালাবের 'আলমাকতাবাতুল আহমদিয়া'তে সংরক্ষিত রয়েছে।

(২) 'আল'আলামুল মাশহুর ফী ফাযাইলিল আয়্যামি ওয়াশ শুহূর'।

বিভিন্ন ফযীলতপূর্ণ দিবস-রজনী ও ফযীলতপূর্ণ মাস সম্পর্কে বিশদ ও সমৃদ্ধ এবং মৌলিক ও দালীলিক গ্রন্থ। ইয়ামানের ছানআ শহরের আলজামিউল কাবীর-এর গ্রন্থাগার 'আলমাকতাবাতুল গারবিয়্যা'তে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

আশা করা যায়, খুব শিগগিরই এ দুটি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে। আরও আগেই তা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন ছিল, বিশেষত শেযোক্ত বিষয়ে যেহেতু ইবনে রজব (রহ.)এর 'লাতাইফুল মাআরিফ ফী মা লিমাওয়াছিমিল 'আম মিনাল ওযায়িফ' ছাড়া বিশদ, প্রামাণিক ও মানোত্তীর্ণ কোন গ্রন্থ এ যাবৎ মুদ্রিত ছিল না।

এ দুটি গ্রন্থ ছাড়া আরো কিছু গ্রন্থ যেমন:

(৩) আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে তাঁর রচনা– 'দলীলুল মুতাহায়্যিরীন'-এর আলোচনা তিনি আলইবতিহাজ ফী আহাদীসিল ইসরা ওয়াল মিরাজ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৯৬) করেছেন। এ গ্রন্থটি কোথাও সংরক্ষিত আছে, না বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তা জানা সম্ভব হয়নি।

(৪) 'নিহায়াতুস সূল ফী খাসায়িসির রাসূল' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তিনি 'আলইবতিহাজ' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৪২) উল্লেখ করেছেন। যিরিক্‌লী (রহ.) 'আলআ'লাম' গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ গ্রন্থ এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

'রিওয়ায়াত'-এর বাছাই ও সতর্কতার ক্ষেত্রে ইবনে দিহ্‌য়া (রহ.)এর যে সাধারণ রীতি, তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ কিতাব মুদ্রিত হলে খুবই ভাল হত। তাহলে এটা হত 'আলখাসায়িসুল কুবরা' গ্রন্থ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) থেকে প্রকাশিত ব্যাপক ত্রুটি ও শিথিলতার উত্তম প্রতিষেধক।

(৫) তাঁর 'আ'লামুন নাসরিল মুবীন ফিল মুফাযালাতি বাইনা আহলিস সিফফীন' নামক রচনাটিও বিষয়বস্তুর বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনের মাকতাবাতুল ইছকোরিয়াল-এ (নং ১৬৯৩) এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। কায়রোর দারুস সালাম থেকে প্রকাশিত 'তাহকীকু মাওয়াকিফিস সাহাবা ফিল ফিতনা' কিতাবে উপরোক্ত গ্রন্থের কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। দারুস সালাম থেকে প্রকাশিত কিতাবটির দ্বিতীয় সংস্করণ আমার সামনে রয়েছে, যার মুদ্রণকাল ১৪২৮ হিজরী।

(৬) ইবনে দিহ্‌য়ার মুদ্রিত কিতাবগুলোর মধ্যে একটি হল 'আননিবরাছ ফী তারীখি খুলাফাই বনীল আব্বাস'। তবে তা দেখার সুযোগ আমার হয়নি।

তাঁর রচনার তালিকা অনেক দীর্ঘ। এখানে যে নামগুলো উল্লেখ করা হল তা থেকেই আহলে ইলম অনুমান করতে পারেন যে, ইবনে দিহ্য়া কত উঁচু পর্যায়ের মুহাক্কিক ও রুচিশীল আলেম ছিলেন।

ইবনে দিহয়া (রহ.)এর জীবন ও কর্মের ওপর শাইখ জামাল আযযাওন একটি বিশদ গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'আদাউ মা ওয়াজাব'-এর ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে, গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা আমার কাছে নেই। না হয় পাঠকদের খেদমতে আরো কিছু তথ্য পেশ করতে পারতাম। ওয়াল আমরু বিয়াদিল্লাহ।

আলইবতিহাজ ফী আহাদীছিল ইসরা ওয়াল মিরাজ-এর পরিচিতি

ইবনে দিহ্য়ার এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি আমার জানা মতে সর্বপ্রথম কায়রোর মাকতাবাতুল খান্জী থেকে ১৪১৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৬ ঈসাব্দে ড. রিফআত ফাওযী আব্দুল মুত্তালিব-এর তাহকীক-সম্পাদনায়, যিনি জামেয়া কাহেরায় কুল্লিয়াতুশ শরীয়ার উস্তাদ, প্রকাশিত হয়। 'মুকাদ্দিমাতুত তাহকীক' ও 'ফাহারিস'সহ পূর্ণ কিতাবের পৃষ্ঠাসংখ্যা এক শ চুরাশি।

কিতাবের নাম থেকে মনে হতে পারে যে, ইসরা ও মেরাজ বিষয়ক অধিকাংশ হাদীস এতে সংকলিত হয়েছে এবং সেগুলোর 'সনদ' ও 'মতন' সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা রয়েছে; কিন্তু তা নয়। হাদীসের কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে কিছু প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোর আলোকে ইসরা ও মেরাজের তাৎপর্য, ইঙ্গিত ও ফলাফল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ কিতাব রচনার মূল উদ্দেশ্য বলে অনুমিত হয়। তবে উল্লেখিত হাদীসসমূহের কঠিন শব্দগুলোর বিশ্লেষণ গুরুত্বের সাথে করেছেন এবং জটিলতাপূর্ণ স্থানগুলোও প্রয়োজনীয় আলোচনা থেকে শূন্য থাকেনি।

তবে আমার মতে কিতাবের বিশিষ্টতা এই যে, এতে মেরাজ সংক্রান্ত ইসলামী আকীদা পরিষ্কারভাবে দলীলপ্রমাণসহ তুলে ধরা হয়েছে এবং চিন্তা ও জ্ঞানের গভীরতা যাদের নেই তারা যেসব ভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে এবং যে সবের আলোচনা বেশি হয় না, এমন কিছু বিষয়ও তাতে সংশোধন করা হয়েছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কোনো 'মওযূ' রেওয়ায়াত তো দূরের কথা, কোন 'মুনকার' বর্ণনাও তিনি এ কিতাবে উল্লেখ করেননি। এ প্রসঙ্গে তাঁর পরিষ্কার কথা—

وإنما تكلمنا على ما صح وأسقطنا الموضوع والمنكر، لأنه خزي

في الدنيا ويوم القيامة يصلى صاحبه العذاب الأكبر.

এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকলেও, আগেই বলেছি, ইসরা ও মেরাজ বিষয়ে হাদীস শরীফের বিশদ কোন সংকলন এটি নয়। এজন্য হাদীস ও সীরাতের দীর্ঘ গ্রন্থসমূহের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন থাকছে।

এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-সম্পাদক ড. রিফআত ফাওযী 'আহাদীসুল ইসরা ওয়াল মিরাজ দিরাসাতান তাওছীকিয়্যা' নামে একটি সংকলন তৈরি করেছেন, যা ইবনে দিহ্‌য়ার আলোচিত কিতাবের পূর্বে মাকতাবাতুল খানজী কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এক আশ্চর্য মিল এই যে, এক বছর আগে আমি মারকাযুদ দাওয়ার উলূমুল হাদীস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মৌলবী ত্বহা হুসাইনকে সাধ্যমত ইসরা ও মেরাজ বিষয়ক হাদীস ও আছার একত্র করে সেগুলোর 'সনদ' ও 'মতন'-এর ওপর আলোচনা করার কাজ দিয়েছিলাম। একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় পর্যন্ত সে তা সম্পন্নও করেছিল। রচনাধীন কিতাবটির নামও আমি 'আলইবতিহাজ' নির্বাচন করেছিলাম। অথচ সে সময় ইবনে দিহ্‌য়ার এ গ্রন্থের নাম আমার স্মৃতিতে ছিল না।

কিছু বিষয় আলোচিত কিতাব থেকে

(১) ইসরা ও মেরাজ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মুজেযা। অন্য কোন নবীকে এই মুজেযা প্রদানের কথা কোন 'নছ' (কুরআন হাদীসের বক্তব্য) দ্বারা প্রমাণিত নয়। (পৃ. ১০৯)

(২) ইসরা ও মেরাজ (কোন রাতের একাংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এরপর সেখান থেকে সাত আসমান, সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং উর্ধ্ব জগতের অন্যান্য বড় বড় নিদর্শন দর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁর সফর) জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে হয়েছে। না এটা নিছক একটি স্বপ্ন, নাউযুবিল্লাহ! আর না শুধু রূহানী ভ্রমণ। এমন বলা হলে, যেমন কতক বেদআতী বলেছে, সেটা হবে পরোক্ষভাবে এ মুজেযাকে অস্বীকার করা। (পৃ. ৫, ১৭-২০, ৬০-৭৩, ৫৯)

(৩) দ্বিতীয় নম্বরে যে আকীদা উদ্ধৃত হল তা স্পষ্টভাবে কুরআন মজীদে (সূরা ইসরা ১, ও সূরা নাজম ১২-১৮) এবং মুতাওয়াতির হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আকীদা।

এ বিষয়ে বেদআতীদের অপব্যাখ্যা যে কতটা হাস্যকর তা বোঝানোর জন্য অন্যান্য মুহাক্কিকের মত তিনিও বলেছেন যে, যদি এই ঘটনা একটি স্বপ্নমাত্র হত তাহলে তা কোন মুজেযা হত না এবং কুরাইশের কাফেরদের ঠাট্টা ও অবিশ্বাসেরও কোন কারণ থাকত না। তেমনি বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে কাফেরদের জিজ্ঞাসাবাদেরও কোন অর্থ থাকে না। কেউ যদি স্বপ্নে বায়তুল মুকাদ্দাস দেখার কথা বলে, তবে তা অবিশ্বাস করার কি আছে আর পরীক্ষা নেওয়ারই বা কি আছে? (পৃ. ১৯)

(৪) তেমনি এই ঘটনা শুধু রূহের সফর বলে 'ব্যাখ্যা' করাটাও হাস্যকর। ইবনে দিহয়া এ 'ব্যাখ্যা' সম্পর্কে উপহাস করে বলেন, 'বোরাক আত্মার বাহন নয়, রক্ত-মাংসের শরীরের বাহন। অসংখ্য হাদীসে এ তথ্য এসেছে যে, ইসরা বোরাকের ওপর হয়েছিল, বাতাসে ভেসে নয়!' (পৃ. ১৭)

(৫) ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বা ভুল ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)এর সঙ্গে একথা যুক্ত করেছে যে, মেরাজের ঘটনা রূহানী বিষয় ছিল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারক অন্য সময়ের মতই গৃহে অবস্থান করছিল।

এই বর্ণনার ভিত্তিহীনতার উপর ইবনে দিহ্য়া সূত্র ও বক্তব্য দুই দিক থেকেই পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, এটা আম্মাজানের প্রতি মিথ্যারোপ। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ–এর এ মন্তব্যও উল্লেখ করেছেন–

هذا حديث لا يصح، وإنما وضع ردا للحديث الصحيح

"এই বর্ণনা সহীহ নয়। এটা তৈরি করা হয়েছে সহীহ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য।"

(৬) ৫৯ পৃষ্ঠায় তিনি মেরাজের হাদীসসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করেছেন। এই তালিকা যদিও পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু যে পরিমাণ বর্ণনা তিনি উল্লেখ করেছেন তাতেই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মেরাজের হাদীস মুতাওয়াতির অর্থাৎ এত অধিক সনদে এবং এত বিপুল সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত যে, ভুলক্রমেও তাদের ভুল হওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের বর্ণনা অকাট্য ও বিশ্বস্ততার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উত্তীর্ণ। আর তার বক্তব্য দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত, যা অস্বীকার করা বা কোন 'ব্যাখ্যা'য় অবতীর্ণ হওয়া মানুষকে ঈমান থেকে খারেজ করে দেয়। ইবনে দিহয়ার ভাষায়–

فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، واعترض فيه الزنادقة الملحدون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.

(৭) ইবনে দিহয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের এই আকীদার ওপর বিশদ আলোচনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা স্থান ও দিকের আবদ্ধতা থেকে পবিত্র। তিনিই স্থান-কালের সৃষ্টিকর্তা। স্থান ও কালের গণ্ডির তিনি উর্ধ্বে। মেরাজের বিষয়কে এভাবে কল্পনা করা, যেমন কোন কোন জাহেল লোক মনে করে থাকে যে, মেরাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ ঘরে দাওয়াত করেছেন। নাউযুবিল্লাহ! ইবনে দিহ্য়া তা অত্যন্ত শক্তিশালী আলোচনার মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন। (পৃ. ৯৩-১০১, ৯১)

এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি আলোচনা (পৃ. ৫০-৫১) তালেবে ইলমদের মনে রাখা আবশ্যক–

ولا يلزم من موضع السؤال أن يكون المسؤول فيه أو يكون حائزا له لتعالى الله جل وعلا وتنزيهه عن الجهة والمكان فرجوع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رجوع إلى السؤال فيه لشرف ذلك الموضع على غيره كما كان الطور موضع سؤال موسى في الأرض ومكة موضع حج الناس وعرفة موضع وقوف الناس للسؤال، فمكان سؤاله صلى الله عليه وسلم غير مكان موسى عليه وسلم، فهو رجوع من مكان موسى إلى مكان السؤال لاستحالة المكان على من انفرد بالعظمة والجلال.

(৮) প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান বহু বিষয় এ গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার দীদারের আকীদা অন্যতম। (পৃ.৭৭-৯২)

(৯) এছাড়া মেরাজের তত্ত্ব ও তাৎপর্যবিষয়ক আলোচনা এ কিতাবের বিশেষ প্রসঙ্গ। পৃষ্ঠা ৯৩ থেকে শেষ পর্যন্ত এ বিষয়েরই আলোচনা। বিষয়টি পাঠকের পাঠ-অনুরাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

(১০) মেরাজের ঘটনায় উর্ধ্বজগতে অনেক নবীর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁরা তাঁকে 'আল-আখুস সালিহ ওয়ান্নাবিয়্যুস সালিহ' এবং 'আল-ইবনুস সালিহ ওয়ান্নাবিয়্যুস সালিহ' বলে সম্ভাষণ

করেছেন। 'আসসালিহ' শব্দের তরজমা সাধারণত 'নেককার' করা হয়ে থাকে; কিন্তু ইবনে দিহয়া লিখেছেন–

فالرجل الصالح في اللغة هو المقيم لما يلزمه من حقوق الله سبحانه وحقوق الناس وهي كلمة جامعة لمعاني الخير كله.

আরবী ভাষায় 'আররাজুলুস সালিহ' তাকেই বলা হয়, যে তার সকল অপরিহার্য কর্তব্য– আল্লাহর হক ও বান্দার হক– পূর্ণরূপে আদায় করে। এ শব্দটি সকল ভাল কাজে যত্নশীলতার অর্থকে ধারণ করে। (পৃ.৫১)

এই পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক অর্থেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সালাহ'এর অনুপম দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর আদর্শ অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন।#

[জুলাই '০৮ঈ.]

নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় নববী শিক্ষার মহান অবদান

নতুন পুরাতন সকল জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা এবং জাহেলিয়াতের ঝাণ্ডাবাহি সকল জাতি নারীর প্রতি যে অন্যায় অবিচার বিধিবদ্ধ করেছে, সমাজের অন্য কোন শ্রেণীর প্রতি তা করা হয়নি। বিভিন্ন জাতি মানব সমাজের এই দুর্বল শ্রেণীর লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, যে ভয়াবহ ও অমানবিক জুলুম এই জাতির প্রতি পাশ্চাত্য-সভ্যতা করেছে, অন্য কোন জাতি বা সভ্যতার ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যায় না। এ নিপীড়ন এই দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বেশি মর্মন্তুদ যে, খোদ নারী জাতিও এই জুলুম ও অবিচারের অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভাবছে আমাদের প্রতি ইনসাফ করা হচ্ছে। নারী স্বাধীনতার প্রতারণাপূর্ণ শ্লোগান শুনিয়ে তাদের নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আমাদের অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে এবং আমাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী যা পেয়েছে তা হল, তাদেরকে সম্মানজনক নিরাপদ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে জীবন-যাত্রা নির্বাহের দুর্বহ বোঝা তাদের অশক্ত কাঁধেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাইরের পৃথিবীর যত নিম্নমানের কাজ আছে তা তাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে। উপরন্তু এই সম্মান দেওয়া হয়েছে যে, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ব্যবসা চমকানোর জন্য 'সেল্‌সগার্ল' ও 'মডেলগার্ল' হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং পণ্যের গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে বাজারে, মার্কেটে, প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। ফলে নারীজাতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'শো পিস' এবং পুরুষের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার একটি উপাদেয় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। নিজের নারিত্ব, সতীত্ব, মর্যাদা ও পবিত্রতা এবং অন্যান্য অধিকারসমূহ বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে পাওয়া অমানবিক অবিচার এবং মর্মান্তিক লাঞ্ছনাকেই আমাদের মুসলমান নারীরা নিজেদের সম্মান মনে করছে। পাশ্চাত্যের প্রতারণার ইতিহাস যাদের জানা নেই

তাদের জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর 'হামারে আয়েলী মাসায়েল' ৬৭-৭৪ এবং 'ইসলাহী খুতুবাত' ১/১২৭-১৬১ পড়া উচিত।

এই মুহূর্তে কোন দীর্ঘ বা তুলনামূলক আলোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং এখানে এর প্রয়োজনও নেই। এখানে আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, নারী জাতির অধিকারসমূহ নিরূপণ এবং তাদের যথাযথ মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনারই মহৎ অবদান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও তাঁর পবিত্র জীবন-চরিতের আলোকে নারী জাতির মান ও মর্যাদা কী, তাঁদের দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ কী কী, শরীয়তে মুহাম্মাদিয়ার বদৌলতে নারী জাতি কী কী সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছে এবং নববী আদর্শ অবলম্বন করে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ কীভাবে নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত সুসজ্জিত করেছেন– এসব বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় ছোটবড় অনেক কিতাব রচিত হয়েছে।

এখানে আমি শুধু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু অমূল্য বাণী উল্লেখ করব। এতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত হবে।

১. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

'নিঃসন্দেহে নারীগণ পুরুষদেরই মত।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৩

এই হাদীসে শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মান-সম্মান, গৌরব-মর্যাদা, দায়িত্ব ও অধিকার ইত্যাদি সকল বিষয়েই নারীজাতি পুরুষের সাথে শরীক। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শরীয়তের বিধি-বিধান উভয় শ্রেণীর জন্য একই। যেসব বিধানে তারতম্য রয়েছে তা উভয় শ্রেণীর খালেক ও মালেক মহান রাব্বুল আলামীনের আদেশ অনুসারেই হয়েছে। যার অসংখ্য হেকমতের মধ্যে একটি হল, নারীর সৃষ্টি রহস্য, স্বভাব ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, সতীত্ব ও পবিত্রতা এবং সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে পূর্ণ সচেতনতা এবং এর হেফাযত। অন্যথায় আদম সন্তান হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং সমাজের অংশ হওয়ার দিক থেকে সব ধরনের অধিকারে মহিলাদের শরীক রাখা হয়েছে। শুধু নারী হওয়ার কারণে তাকে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। আর তা কীভাবেই বা সম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে নাউযুবিল্লাহ নারী জন্ম কোন অপরাধ নয় বরং নারী আল্লাহ তাআলার কাছে তেমনই

মর্যাদাবান যেমন পুরুষ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেযগার সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্ভ্রান্ত।" –সূরা হুজুরাত ১৩

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে–

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

"আমি তোমাদের মধ্যেকার কোন আমলকারীর আমল– সে পুরুষ হোক বা নারী, বিফল করি না।" –সূরা আলে ইমরান ১৯৫

হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন, "জাহেলী যুগে আমরা নারীকে কোন বস্তু বলেই গণ্য করতাম না। কিন্তু যখন ইসলাম এসেছে এবং আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে মহিলাদের আলোচনা করেছেন তখন বুঝতে পেরেছি, আমাদের উপর মহিলাদের তেমনই অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের উপর আমাদের।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৪৩

২. অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

"ঈমানের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গতম মুমিন সেই যার ব্যবহার ও চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর এবং তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যাদের ব্যবহার তাদের স্ত্রীদের প্রতি সর্বোত্তম।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৬২

আরো ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই যে তার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৮৯৫

৩. অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন–

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

"কোন মুমিন যেন কোন মুমিন নারীর ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ না করে। তার একটি অভ্যাস পছন্দ না হলে অপর আরেকটি অভ্যাস পছন্দ হবে।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৬৯/৬৩

এই হাদীসে স্বামীকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীর কোন আচরণ বা কোন অভ্যাস পছন্দ না হলে তার ব্যাপারে মন খারাপ করবে না; বরং এ কথা স্মরণ করবে যে, তার মধ্যে কোন না কোন ভাল গুণ তো অবশ্যই আছে। সুতরাং সেই সব গুণের প্রতি লক্ষ করে ধৈর্যধারণ করা উচিত এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত।

৪. এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন- مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ "আমাদের উপর স্ত্রীদের কী হক রয়েছে? জবাবে ইরশাদ করলেন-

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.

অর্থাৎ তুমি যেমন খাও, পান কর তাকেও তেমন খাওয়াবে ও পান করাবে। তার মুখে চড় মারবে না, তাকে মন্দ বলবে না এবং শাস্তিমূলকভাবে তাকে ঘর থেকে বহিষ্কার করবে না।" -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২১৪২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৯৫০৯

৫. বিদায় হজ্জে বিশেষভাবে মহিলাদের অধিকার আদায়ের তাকীদ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন-

وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللّٰهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ.

"তোমরা নারীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর (তাদের ব্যাপারে আমার নির্দেশ গ্রহণ কর; তারা তোমাদের অধীনে রয়েছে।) তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারে তাদেরকে নিজেদের সাহচর্যে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বিধান অনুসারেই তারা তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে। (অতএব আল্লাহর অঙ্গীকার এবং তাঁর বিধানের প্রতি লক্ষ রেখে তাদেরকে আপন অধিকারসমূহ প্রদান কর।)" -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২১৮/১৪৭

৬. অপর হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةَ.

"যার তিনটি কন্যা বা তিনজন বোন আছে অথবা দুইটি কন্যা বা দুইজন বোন

আছে এবং সে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, সে জান্নাত লাভ করবে।" –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০৯৯১; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪৪৬

আরো ইরশাদ করেছেন–

مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে কন্যা সন্তান দান করেছেন সে যদি তাদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে সবর ও ধৈর্যধারণ করে তবে তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৩

৭. মায়ের হকসমূহের প্রতি যত্মবান হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এও বলা হয়েছে যে,

اَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا.

"তার সাথে থাক (এবং খেদমত কর।) কেননা জান্নাত তার পদতলে রয়েছে।" –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫১১০; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩১০৪

মোটকথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতির প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যাপারে আলাদা আলাদাভাবে পুরুষদের সাবধান করেছেন এবং প্রত্যেকের হকসমূহ সুস্পষ্ট করে তা আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান থাকার তাকীদপূর্ণ আদেশ করেছেন। পাশাপাশি নারীদেরকেও আদেশ করেছেন, তারা যেন তাদের দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে।

পাশ্চাত্যের অনেক অমুসলিম পণ্ডিত চিন্তাবিদও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অবদান এবং তাঁর নির্দেশনাসমূহের এই প্রভাবের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। তাদের সবার বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। আমি শুধু তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ

১. বিশিষ্ট স্কলার মশিয়েঁ রিফিল ইসলামের পর্দার বিধানের প্রশংসা করে তাঁর এক দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখেন, "যদি আমরা ইসলামের পয়গম্বরের যুগে ফিরে যাই তবে দেখব, নারীর জন্য যে উপকারী বিধানসমূহ ইসলামের পয়গম্বর জারি করেছেন তা আর কেউ করেননি। নারীর প্রতি তাঁর অনেক অবদান আছে। কুরআনে নারীর অধিকারের ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আয়াত রয়েছে। কোন কোন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, নারীকে কোন ধরনের ভোগ্য কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

কোন কোন আয়াতে বিস্তারিত বলা হয়েছে, কী ধরনের সম্মান ও মর্যাদপূর্ণভাবে তাদের সাথে আচরণ করা উচিত। –মাকালাতে শিব্‌লী ১/১৫২-১৫৩

২. মিস্টার হেয়ার কর্পেট্‌স বলেন, "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নারীর অধিকার রক্ষা করেছেন, আর কেউ তা করেননি। তিনি তার আইনী সত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার দরুন সে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পেয়েছে এবং বোরকা পরিহিতা মুসলিম নারী জীবনের প্রত্যেক শাখায় এত অধিকার লাভ করেছে যে, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে একজন উচ্চশিক্ষিত খৃস্টান রমণীও তা থেকে বঞ্চিত।" –ফারান, সীরাত সংখ্যা, জানুয়ারি

৩. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি যে বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে স্যার জন বেগ্‌ট তার পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীজাতির প্রতি যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা নীতি-নৈতিকতামূলক, তাতে তুচ্ছতা, কঠোরতা বা নির্দয়তার কোন দিক নেই। এর বিপরীতে তিনি সর্বদা নারীদের সাথে উত্তম আচরণের আদেশ করেছেন এবং তাদের বিষয়গুলো মানুষের সামনে যথাযথ তুলে ধরার জন্য তাদের ওকালতি করেছেন।"

অপর এক স্থানে জন বেগ্‌ট বলেন, "বাস্তব সত্য হল, তিনি নারীর প্রতি যে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তাতে কঠোরতা নেই বরং তাতে নারী জাতির জন্য অনেক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।" –মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৩১-৩৩২, ৪১৫ অনুবাদ The life and times of Muhammad, খাওয়াতীন কি ইসলামী যিন্দেগী কে সাইনসী হাকায়েক, হাকীম মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ চুগতাঈ

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন; মুসলিম নারীদেরকে তাদের মান ও মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা নসীব করুন এবং পুরুষদেরকে তাদের হকসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করার এবং তা যথাযথভাবে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[এপ্রিল '০৫ঈ. পৃ.৪৩]

মওলুদখানী : হক আদায়ের না-হক পন্থা
ইতিহাস ও বর্ণনার সঠিক পর্যালোচনা

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌলিক হকসমূহ :

উম্মতের প্রতি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হক রয়েছে। যথা-(ক) সবচেয়ে বড় হক হল তাঁর প্রতি ঈমান আনা। এই হক আদায়ের মাধ্যমে মানুষ তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১]

তাঁর প্রতি সেভাবে ঈমান আনতে হবে যেভাবে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন। যেমন তিনি আল্লাহর নবী-এই বিশ্বাসের সাথে এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন-তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। তাঁর পর নবুওয়ত, রিসালাত ও ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

(খ) তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবই হল হেদায়াতের সর্বশেষ কিতাব এবং তাঁর আনীত শরীয়তই হল সর্বশেষ শরীয়ত। এরপর আসবে না কোন কিতাব, আসবে না নতুন কোন শরীয়ত। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও আসমানী শরীয়তগুলো অবিকৃতরূপে বিদ্যমানও নেই, আর সেগুলোর বিধিবিধান এখন আর অনুসরণীয়ও নয়। এখন হেদায়াত লাভের এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ হল কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং শরীয়তে মুহাম্মাদীর অনুগত হওয়া।

(গ) আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন দাওয়াত, তাবলীগ, তালীম,

১-যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির প্রতি, সেহেতু সমগ্র মানব জাতি হল তাঁর উম্মত; এটাকে বলে উম্মতে দাওয়াত। পক্ষান্তরে যারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছে এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তারা হল উম্মতে ইজাবাত।

তাযকিয়া ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব দিয়ে এবং তিনি তা পূর্ণরূপে পালনও করেছেন। সৃষ্টির কল্যাণকামিতার চেষ্টায় তিনি কোন ত্রুটি করেননি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন–

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

“তো এমন যেন না হয় যে, যদি তারা এই বাণীর প্রতি ঈমান না আনে তাহলে আপনি (মনের) কষ্টে তাদের পেছনে নিজের জান দিয়ে দিলেন।” –সূরা কাহাফ ৬

(ঘ) তিনি সম্পূর্ণ মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন। এ জন্য আল্লাহ তাআলা উম্মতকে তাঁর শর্তহীন আনুগত্যের আদেশ করেছেন এবং তাঁর পবিত্র জীবনকে উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ সাব্যস্ত করেছেন।

(ঙ) কুরআন হাদীসে তাঁর যত গুণ ও বৈশিষ্ট্য এসেছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সেগুলো বিশ্বাস করা এবং স্বীকার করে নেওয়া। অন্যদিকে ওইসব অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন থেকেও দূরে থাকা, যা খৃস্টান ও অন্যান্য জাতি তাদের প্রধান ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রে করেছে।

(২) মোটকথা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনা হল তাঁর প্রথম হক এবং তাঁর প্রতি যথাযোগ্য তাজীম ও মহব্বত পোষণ করা হল দ্বিতীয় হক। এই তাজীম ও মহব্বত ছাড়া তো কারো মু-মিন হওয়াই প্রমাণিত হয় না। হাদীস শরীফে এসেছে–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্য সকল মানুষ থেকে প্রিয় না হব।” –সহীহ বুখ-ারী, হাদীস ১৫

(৩) তৃতীয় হক হল জান-মাল কোরবান করে তাঁর নুসরত করা এবং শরীয়তে মুহাম্মাদীর প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা।[১]

(৪) চতুর্থ হক হল জীবনের ভেতর-বাইর সকল দিক সুন্নতের ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

(৫) পঞ্চম হক হল তাঁর পথ ছাড়া নতুন-পুরাতন সকল পথ, যাকে পরিভাষায়

১–তবে মনে রাখতে হবে যে, দ্বীনের খেদমত ও প্রচার-প্রসারের মেহনত সবই হতে হবে সম্পূর্ণরূপে শরীয়তসম্মত পন্থায়।

বেদআত বলে এবং যা বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে, সেগুলোকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা। বিশ্বাস ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে এগুলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা এবং প্রচলিত বেদআতসমূহ নির্মূল করে মানুষকে সুন্নতের অনুসারী বানানোর চেষ্টা করা।

(৬) তাঁর পবিত্র জীবন, গুণ ও চরিত্র সম্পর্কে বেশি বেশি আলোচনা করা। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ওয়াজ-নসীহত, কথা ও কাজ তথা দ্বীন প্রচারের সকল বৈধ পন্থায় তা ব্যাপকভাবে চর্চা করা।

(৭) হাদীস শরীফ, যা সুন্নাহর সবচেয়ে বড় উৎস, এর প্রচার-প্রসার ও পঠন-পাঠনের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা। হাদীস শরীফ যথাযথ সংরক্ষিত আছে এবং তা দ্বীনের উৎস ও শরীয়তের দলিল, এ কথার বিশ্বাস রাখা।

(৮) তাঁর প্রতি, তাঁর শরীয়ত ও সুন্নাহর প্রতি কিংবা শরীয়তের কোন নির্দেশ বা নিদর্শনের প্রতি কটাক্ষকারীকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা, মুখে প্রতিবাদ করা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের অসার বক্তব্য খণ্ডন করা।

(৯) তাঁর আসহাব ও আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি মহব্বত পোষণ করা। তাঁদের হকসমূহ আদায় করা এবং শরীয়ত তাদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে তা রক্ষা করা।

(১০) তাঁর জন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে দুআ করা। এর যে পন্থা কুরআন হাদীসে নির্দেশিত হয়েছে তা হল দরূদ পাঠ। তাই মুমিনের কর্তব্য নিয়মিত ওযীফার মাধ্যমে মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(১১) তাঁর উম্মতের জন্য দরদী হওয়া এবং উম্মতের যাবতীয় হক আদায় করা।

এগুলো হল উম্মতের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু মৌলিক হক। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবগুলোই ফরযে আইন। কিছু হক যা শুধু বিজ্ঞ আলেমগণের দায়িত্ব, তা ফরযে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় হক সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হওয়া এবং অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর উম্মতকে এ সম্পর্কে সচেতন করা, যাতে তারা নবীর হক আদায়ে আগ্রহী ও তৎপর হয়—এটাও আমাদের দায়িত্ব।

সীরাতের দু'টি অংশ এবং সীরাত-চর্চার কয়েকটি পন্থা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতে পাকের দুটি অংশ রয়েছে—এক, জন্ম থেকে নবুওয়ত লাভের আগ পর্যন্ত। দুই, নবুওয়ত লাভ থেকে

রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত। 'সীরাতুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরোনামটি ব্যাপক অর্থবোধক। নবী-জীবনের উভয় অংশ এই শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে 'মীলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরোনামটি অর্থের দিক থেকে সংকুচিত ও খণ্ডিত। কেননা, তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অংশ, যাকে কুরআনে কারীম উম্মতের জন্য 'উসওয়াতুন হাসানা' বলেছে, তা এই শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

সীরাতের প্রথম অংশের অনেক ঘটনা হাদীস ও সীরাতের বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ, যা শরীয়তের ভিত্তি ও সুন্নতের উৎস এবং প্রত্যেক মু-মিনের জন্য উসওয়াতুন হাসানা, তার সম্পূর্ণ বিবরণ হাদীস ও সীরাতগ্রন্থে সুসংরক্ষিত এবং এমন সহীহ, নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহাতীত যে, মনে হয় যেন সমগ্র নবী-জীবন তার সকল সৌন্দর্য ও পবিত্রতা নিয়ে আমাদের সামনে জীবন্ত।

নিঃসন্দেহে এটা ইসলামের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এবং মুসলিম উম্মাহর অতুলনীয় সৌভাগ্য যে, তাদের নিকট তাদের প্রিয়তম নবীর পবিত্র জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ও বিবরণ অবিকল বিদ্যমান রয়েছে; অথচ পৃথিবীর অন্য কোন জাতি বা ধর্মের হাদী ও রাহবারের তেমন কোন জীবনবৃত্তান্ত সংরক্ষিত নেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত চর্চার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে :

এক, নিজের কথা ও কাজ, চরিত্র ও আচরণ, জীবন ও কর্ম মোটকথা জীবনের প্রতিটি অংশকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে গড়ে তোলা এবং চিন্তা ও অনুভূতিকে তাঁর সুন্নতের আলোকে আলোকিত করা।

দুই, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার-প্রসারের প্রতি মনোযোগী হওয়া। এর একটি পদ্ধতি হল কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার করা এবং কুরআন সুন্নাহর আদেশ-নিষেধ, বিধিবিধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে যেসব দ্বীনী কিতাবপত্র রচিত ও সংকলিত হয়েছে তা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, দাওয়াত-তাবলীগ, ওয়াজ-নসীহত এবং এ ধরনের অন্যান্য পন্থায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা।

তিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং জীবন ও চরিত্র অধিক পরিমাণে আলোচনা করা। তা হতে পারে ব্যক্তি পর্যায়ে, ঘরোয়া পর্যায়ে এবং সামাজিক পর্যায়ে। মোটকথা নিজের ও অন্যের অন্তরে তাঁর স্মৃতি ও আদর্শকে জাগরূক করে তোলার জন্য তাঁর আলোচনার বারবার পুনরাবৃত্তি জরুরি।

সীরাতচর্চার এই সবগুলো পন্থাই অনুসরণীয়। সালাফে সালেহীন–সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আইম্মায়ে হুদা এবং পরবর্তী যুগের আকাবির ও মাশায়েখ সবাই উপরোক্ত সকল পন্থা অবলম্বন করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতিটি মজলিস ও মাহফিল ছিল কোন না কোন পর্বে নবী-জীবনের নূরানী আলোচনায় নূরান্বিত এবং তাঁদের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ ছিল সীরাতের জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

সময়ের বিবর্তন ও সীরাত চর্চার নবরূপ

নবী-যুগ থেকে সময়ের দূরত্ব যতই দীর্ঘ হতে লাগল এবং ঈমানী দুর্বলতা যতই বেড়ে যেতে লাগল, সীরাতের আলোচনা, সীরাতের পঠন-পাঠন এবং সীরাতকে জীবনাদর্শরূপে গ্রহণের প্রেরণা ততই শিথিল হতে লাগল। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকসমূহের মধ্যে যে দু'টি বিষয় সবচেয়ে সহজ ছিল অর্থাৎ সীরাতচর্চা ও দরূদ পাঠ–এই দু'টি বিষয়েও আনুষ্ঠানিকতার অনুপ্রবেশ ঘটল। মীলাদ পড়া ও পড়ানোকে দরূদ শরীফের বিকল্প ধরে নেওয়া হল, আর তাও হতে লাগল কোন না কোন দুনিয়াবী গরজে এবং বিশেষ বিশেষ দিন ও অনুষ্ঠান কেন্দ্র করে। তেমনি প্রচলিত জলসা-জুলুস, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ঈদে মীলাদুন্নবী', তাকেই সীরাত আলোচনার স্থলবর্তী করা হল। একটু হিম্মতওয়ালা যারা, তারা এই মাহফিলকে শুধু ১২ রবিউল আউয়ালে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রায় মাসের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করল। কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে বছরের অন্য কোন মাসেও সীরাতুন্নবী নামে সভা-সেমিনার কিংবা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। মোটামুটি এই হল প্রচলিত মীলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবীর হালহাকীকত। এভাবে দরূদ পাঠ ও সীরাত চর্চার বিষয়টি নিছক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

এ মুহূর্তে এই পদ্ধতির সমস্যা ও প্রচলিত মীলাদুন্নবীর প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, শুধু এটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, নবীর জন্মদিবসের নামে অনুষ্ঠান করা নবীর সুন্নত নয়; বরং সুন্নতের বিরুদ্ধাচারণ, যা খৃস্টানদের ক্রিসমাস ডে-এর অনুকরণে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে।

এটা শুরু হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। প্রচলিত মীলাদের সমর্থকরাও স্বীকার করে যে, ইরবিল অঞ্চলের শাসক আবু সাঈদ মুযাফফারুদ্দীন (৫৪৯-৬৩০ হি.) হচ্ছে মীলাদের প্রবর্তক। এ জন্য হুঁশ-জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিমাত্রই মীলাদের পক্ষে লিখতে গিয়ে প্রথমেই তা বেদআত হওয়া স্বীকার করে নেয়। এরপর একে

বেদআতে হাসানা বলে জান বাঁচানোর চেষ্টা করে। মোটকথা বিষয়টি বেদআত ও নব-উদ্ভাবিত হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

মীলাদের প্রচলনকালে এর সমর্থকরা এমন একটি কথা চালু করেছিল, যার দ্বারা এর হাকীকত একদম স্পষ্ট হয়ে যায়। কথাটি হল, "যখন ক্রুশধারীরা অর্থাৎ খৃস্টান জাতি তাদের নবীর জন্ম-রজনীকে বড় ঈদ সাব্যস্ত করেছে তখন মুসলিম জাতি তো তাদের নবীর সম্মানের অধিক হকদার।" –আততিবরুল মাসবুক, সাখাভী পৃ. ১৪; আননি'মাতুল কুবরা (মাখতূত)

হিন্দুস্তানের মশহুর মৌলভী আব্দুছ ছামী রামপুরী 'আনওয়ারে ছাতিআ' নামক 'কেতাবের' ১৭০ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন যে, ভারত উপমহাদেশে খৃস্টান ইংরেজরাই ১২ই রবিউল আউয়ালকে মীলাদুন্নবী নির্ধারণ করেছিল এবং ওই দিনে তারা ছুটি ঘোষণা করেছিল।

মীলাদ অনুষ্ঠানের ইতিহাস প্রসঙ্গে উপরোক্ত দু'টি স্বীকারোক্তির পর এ বিষয়ে আর কী বলার থাকে? তবু জেনে রাখা দরকার যে, মীলাদপন্থীদের সমর্থিত অনুষ্ঠানের আদিরূপ ছিল এই–

১. মীলাদের তারিখে একস্থানে সমবেত হওয়া।

২. কুরআন কারীম থেকে তেলাওয়াত করা।

৩. বিশুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে নবীর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা।

৪. তবারক ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। –আলহাভী লিল্ফাতাওয়া ১/২৫১

বলাবাহুল্য যে, এখানে প্রথমটিকে বাদ দিলে, অন্য তিনটাতে আপত্তির কিছু ছিল না; কিন্তু বর্তমানে তা বাড়াবাড়ির এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। এ অবস্থায় এটি অবশ্যবর্জনীয় হওয়ার ব্যাপারে মীলাদ প্রেমিকদের পক্ষেও দ্বিমত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কিছু ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা

আলোচনা অন্যদিকে চলে গেল। মীলাদ ও তার বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে সপ্তম হিজরীর উদ্ভাবন; কিন্তু আমাদের সমাজের পরিভাষায় যাকে মীলাদ পড়া বা মীলাদ পড়ানো বলা হয় এবং যা কোন মকসুদ হাসিলের জন্য, খায়ের-বরকত লাভের জন্য, কোন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিংব মৃত ব্যক্তির ঈসালে সওয়াবের জন্য বিভিন্ন সময়ে এবং বিশেষ ফযীলতের দিনে-রাতে হয়ে থাকে, তা আরো পরের প্রচলন। মীলাদের সাথে 'পড়া' শব্দটির সংযুক্তি থেকেও তা বোঝা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত তো বলার

বিষয়, পড়ার বিষয় নয়। তবে এমন হতে পারে যে, এ বিষয়ের উপর কোন কিতাব থেকে কেউ পড়বে আর অন্যরা শুনবে। মীলাদের 'শৈশবে' এমন প্রচলনও কোথাও কোথাও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একেও কঠিন মনে করার কারণে কতিপয় বে-ইলম মৌলভী কিছু 'মীলাদনামা' তৈরি করল, যা লোকেরা মুখস্থ আওড়াত এবং আগে-পিছে সালাত-সালাম এবং আয়াত-কালাম যোগ করে নিত। এর নাম হল মওলুদখানী বা মীলাদ পড়া। আমাদের দেশের অনেক অঞ্চলে ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران–এই মীলাদনামাটি প্রচলিত রয়েছে।

এটি বা এ জাতীয় আরো যেসব মীলাদনামা মওলুদখানীর মজলিসগুলোতে পড়া হয় এগুলো হাদীস ও সীরাতের কিতাবাদি তো দূরের কথা, খাইরুল কুরূনও বহুদূর, পরবর্তী শত বছরেও এসবের নাম-নিশানাও ছিল না।

এই ইতিহাসটি স্মরণ রাখুন, এরপর দিল্লুর রহমানের মাসিক 'আলবাইয়িনাত' যার উদ্দেশ্যই হল হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক বলে প্রচার করা, তার জুন ২০০০ঈ. সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রলাপগুলো 'লা হাওলা' সহযোগে পড়ুন।

"১. আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মওলুদখানীর জন্য একটি দেরহাম খরচ করবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে!

২. উসমান (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মওলুদখানীর জন্য একটি দেরহাম খরচ করবে, সে যেন বদর ও হুনাইন যুদ্ধে অংশ নিল!

৩. হাসান বসরী (রহ.) বলেন, হায়! আমার যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি তা মওলুদখানীর জন্য খরচ করতাম!

৪. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি মওলুদখানীর জন্য তার বন্ধুবর্গকে একত্র করে, খাবারের আয়োজন করে, একটি স্থান শূন্য রাখে, ইহসানের সাথে আমল করে এবং এই মওলুদখানীর ব্যবস্থা করে, তাকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন সিদ্দীকীন, শুহাদা ও ছালেহীনের সঙ্গে হাশর করাবেন এবং তাকে জান্নাতুন নায়ীমে অবস্থান করাবেন।

৫. জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর রচিত 'আলওয়াসাইল ফী শরহিশ শামাইল' গ্রন্থে লেখেন, "যে গৃহ, মসজিদ বা মহল্লায় মওলুদখানী হয়, সেই গৃহ, মসজিদ ও মহল্লাকে ফেরেশতাগণ ঘিরে ফেলে এবং তাদের জন্য দুআ করে, আর আল্লাহ তাআলা তাদের মাফ করে দেন। আর যারা নূর দ্বারা পরিবেষ্টিত অর্থাৎ জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আজরাঈল, তাঁরা ওইসব মওলুদখানীর ব্যবস্থাকারীদের জন্য দুআ করতে থাকেন।"

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যাদের নামে এই সব কথা চালানো হয়েছে তাদের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। এগুলোর ভিত্তিহীনতা তো একেবারেই স্পষ্ট। কারণ, যদি এগুলোর কোন ভিত্তি থাকত, তাহলে তো মীলাদকে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত বেদআত বলে স্বীকার করার প্রয়োজন হত না; বরং সহজেই মীলাদকে সাহাবীদের আমল বলে প্রমাণ করা যেত। প্রকৃত বিষয় এই যে, মওলুদখানীর প্রচলনের পরে কোন মূর্খ এগুলোকে তৈরি করেছে।

রাজারবাগীরা এই সব জাল বর্ণনার সমর্থনে 'আননি'মাতুল কুবরা আলাল আলম'-এর উদ্ধৃতি দিয়েছে, অথচ তাতে এগুলোর চিহ্নমাত্র নেই। এই কিতাবটির মাখতূতাহ (পাণ্ডুলিপি) দারুল কুতুবিল মিছরিয়্যা কায়রোতে (ইতিহাস ২৫০৮/১৯২১) সংরক্ষিত রয়েছে এবং আমাদের কাছে তার ফটোকপি রয়েছে। আমরা তা আদ্যোপান্ত পড়েছি।

এর বিপরীতে আন্‌নি'মাতুল কুবরা কিতাবে ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) মীলাদকে ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীর অনেক পরের উদ্ভাবিত বিষয় বলেছেন এবং মীলাদের তথাকথিত বর্ণনাগুলো খণ্ডন করে বলেছেন যে, মানুষকে এগুলো থেকে দূরে রাখা ওয়াজিব। –আননি'মাতুল কুবরা ২-৩ (পাণ্ডুলিপি)

রাজারবাগীরা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটি নকল আননি'মাতুল কুবরা'এর হাওলা দিয়েছে, যা ইস্তাম্বুলের মাকতাবাতুল হাকীকাহ (দারুশ শাফকাহ ফাতিহ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক)-এর ছাপা। তুরস্কের এই প্রকাশনীটি কট্টর বেদআতপন্থীদের। এরা বিভিন্ন প্রচলিত শিরক ও বেদআতের সমর্থনে কিতাবপত্র প্রকাশ করে থাকে। এমনকি কখনো কখনো কোন বেদআতপন্থী লেখকের বাজে কিতাব হাজির করে বা লেখকের নাম পরিবর্তন করে পূর্ববর্তী কোন স্বীকৃত আলেমের নামে তা চালিয়ে দেয়। এরপর কিতাবটির এমন একটি নাম নির্বাচন করে, যে নামে উক্ত মনীষীর কোন কিতাব ছিল; কিন্তু বর্তমানে তা মুদ্রিত নেই। এখানেও মাকতাবাতুল হাকীকাহ ওয়ালারা এ কারসাজিই করেছে। ইবনে হাজার মক্কী (রহ.)-এর নাম ও তাঁর কিতাব আননি'মাতুল কুবরার নাম এমন একটি কিতাবের উপর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা কোন বে-দ্বীন ও নির্বোধ বেদআতীর রচনা, যে জাল বর্ণনা তৈরির ক্ষেত্রে সামান্য বুদ্ধিরও পরিচয় দিতে সক্ষম নয়; যাতে কিছু সময়ের জন্য হলেও কিংবা কিছু মানুষের কাছে হলেও তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে! বেচারা তো এতই কাঁচা মিথ্যা বলে যে, শোনামাত্র ধরা পড়ে যায়। সে এটুকু চিন্তা করেনি যে, আট-নয়শ বছর পরের উদ্ভাবিত মওলুদখানীর ফযীলত যদি হযরত আবু বকর (রা.) ও উসমান (রা.)এর নামে চালানো হয়, তবে কে তা

বিশ্বাস করবে? তেমনি হাসান বসরী (২১-১১১ হি.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ. ১৫০-২০৪হি.)-এর নামে এমন প্রলাপ চালু করা হলে তা কি বাজারে চলবে? সেএটাও চিন্তা করেনি যে, জালালুদ্দীন সুয়ূতী তো আমাদের নিকটবর্তী সময়ের ব্যক্তি। তাঁর নামে কোন কিছু বানানো হলে তা কি গোপন থাকবে? অথচ সে তা-ই করেছে এবং সুয়ূতী (রহ.)এর নামে এমন কিতাব জুড়ে দিয়েছে, যে নামে তার কোন রচনাই নেই! সুয়ূতী (রহ.) নিজে তাঁর রচনাবলির তালিকা লিখে গেছেন এবং তাঁর পরের আলেমগণও তাঁর রচনাগুলো গণনা করেছেন, যা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু 'আলওয়াসাইল ফী শরহিশ শামাইল' নামে তাতে কিছু নেই। দেখুন ড. আব্দুল হালীম চিশতী কৃত তাযকিরায়ে জালালুদ্দীন সুয়ূতী ১১৭-৩৮০

তদুপরি সুয়ূতী (রহ.) নিজে তাঁর কিতাব আলহাভী (১/২৫১-২৫২)তে মীলাদ অনুষ্ঠানকে নব-উদ্ভাবিত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে তিনি কীভাবে উক্ত 'ফযীলত' বয়ান করতে পারেন?

ওই মিথ্যুক যেমন মিথ্যা বলতে বুদ্ধি খরচ করেনি, তেমনি ইস্তাম্বুলের 'মাকতাবাতুল হাকীকা'-এর লোকরাও তার কিতাবে ইবনে হাজার মক্কী রচিত 'আননি'মাতুল কুবরা'-এর নাম ব্যবহারের প্রতারণা কুশলীভাবে করতে পারেনি। তাদের ভাবা উচিত ছিল যে, ইবনে হাজার মক্কী (মৃত্যু ৯৭৪ হি.) একজন প্রসিদ্ধ আলেম এবং তাঁর কিতাব আননি'মাতুল কুবরাও একটি প্রসিদ্ধ কিতাব, যার পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সেসব পাণ্ডুলিপির সাথে এই প্রকাশিত কিতাবটি মিলিয়ে দেখলেই তাদের প্রতারণা ফাঁস হয়ে যাবে; বরং বিজ্ঞ আলেমগণ এই কিতাব পড়ামাত্রই বলে দেবেন যে, তা ইবনে হাজার মক্কী (রহ.)এর রচনা হতেই পারে না। একে তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

রাজারবাগীরা যদি এই সব ইতিহাস জানা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এসব জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনার উপর 'আননি'মাতুল কুবরা'র উদ্ধৃতি ব্যবহার করে থাকে, তাহলে এটি হবে তাদের পক্ষ থেকে অন্যকে বিপথগামী করার একটি নতুন দৃষ্টান্ত। অবশ্য এমন নজির তাদের আরও আছে। আর যদি অজ্ঞতাবশত তারা এরূপ করে থাকে–এই সম্ভাবনা অবশ্য খুবই ক্ষীণ, তাহলে বাস্তব বিষয়টি জানার পর এখন তাদের তওবা করা এবং সাধারণ মানুষকে প্রকৃত বিষয়ে অবগত করার জন্য সংশোধনী প্রকাশ করা জরুরি। আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়াত দান করুন। আমীন। #

[মার্চ '০৭ঈ.]

আলবায়্যিনাত-এ প্রকাশিত মওযূ রেওয়ায়াত আরও তথ্য ও পর্যালোচনা

আলহামদু লিল্লাহ, গত সংখ্যায় 'মওলুদখানী: হক আদায়ের না-হক পন্থা: ইতিহাস ও বর্ণনার সঠিক পর্যালোচনা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করেছিলাম। সে প্রবন্ধে রাজারবাগীদের আলবায়্যিনাত পত্রিকার একটি প্রতারণাও উন্মোচন করা হয়েছিল যে, তারা কীভাবে মওলুদখানীর ফযীলত প্রসঙ্গে বিভিন্ন মওযূ রেওয়ায়াতকে ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) ও তাঁর কিতাব আননি'মাতুল কুবরা-এর নামে চালিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। আমি গত সংখ্যায় তাদের উদ্ধৃতিতে যে চার-পাঁচটি জাল ও মওযূ রেওয়ায়াত উল্লেখ করে তা ভিত্তিহীন ও মওযূ প্রমাণ করেছি, সেগুলো ছাড়া আরো জাল রেওয়ায়াত সে প্রবন্ধে রয়েছে।

হযরত উমার (রা. ২৩ হি.) হযরত আলী (রা. ৪০ হি.) শাইখ জুনাইদ বাগদাদী (রহ. ২৯৭ হি.) শাইখ মারূফ কারাখী (রহ. ২০০ হি.) শাইখ সাররী সাকাতী (রহ. ২৫৩ হি.) এবং ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ. ৫৪৩-৬০৬ হি.)-এর নামে জালকৃত আরো কিছু রেওয়ায়াত সে প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে। এই ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতগুলোর মাধ্যমে তারা মওলুদখানী ও তার ফযীলতের বৈধতা প্রমাণ করতে চেয়েছে। এই রেওয়ায়াতগুলোর সাথেও সংযুক্ত আছে সেই নকল আননি'মাতুল কুবরা-এর উদ্ধৃতি।

রেওয়ায়াতগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। কেননা যেকোন সচেতন পাঠক নিম্নোক্ত কিছু বিষয়ে সামান্য চিন্তা করলেই সে রেওয়ায়াতগুলোর ভিত্তিহীনতা বুঝতে সক্ষম হবেন।

এক, ওই বর্ণনাগুলোর সাথে কোন সনদ বা নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস ও সীরাতগ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখিত হয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতিও নেই। আর আগেই প্রমাণ করা হয়েছে যে, আননি'মাতুল কুবরার যে উদ্ধৃতি

বর্ণনাগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে তা ওই নামে জালকৃত একটি পুস্তিকার উদ্ধৃতি। আসল আননি'মাতুল কুবরা-তে ওই রেওয়ায়াতগুলোর কোন নামনিশানাও নেই। অতএব এই উদ্ধৃতি যোগ করা একটি নির্জলা প্রতারণা।

দুই, যাঁদের নামে মওলুদখানীর এসকল মনগড়া ফযীলত চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা মওলুদখানী উদ্ভাবিত হওয়ার অনেক আগের মানুষ। কেননা তাঁরা মওলুদখানীর প্রাচীন বা মূল সংস্করণ 'মীলাদ মাহফিল' উদ্ভাবিত হওয়ার কয়েকশ বছর আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাহলে তাঁরা কি কবর থেকে উঠে এসে মওলুদখানীর ফযীলত বয়ান করে গেলেন?

যাঁদের নামে এই কথাগুলো চালানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) ৬০৬ হিজরীতে অর্থাৎ মীলাদ মাহফিলের শৈশবকালে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, সে সময় হিরাত অঞ্চলে এই রেওয়াজ পৌঁছেছিল। এ অঞ্চলেই ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) শেষ বয়সে অবস্থান করেছিলেন। আর মওলুদখানী তো সেসময় পর্যন্ত অস্তিত্বই লাভ করেনি। ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.)এর তাফসীরে কাবীর এবং আরো অনেক কিতাব মুদ্রিত আছে। কিছু কিতাব পাণ্ডুলিপি আকারেও আছে। আলবায়্যিনাতওয়ালারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে তাঁর নামে বলা কথাগুলো তাঁর নিজস্ব রচনাবলি থেকে কিংবা বিশুদ্ধ উদ্ধৃতিতে কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে বের করে দেখানো।

তিন, আলবাইয়্যিনাতওয়ালারা 'আননি'মাতুল কুবরা'-নামে জালকৃত পুস্তিকার অনেকগুলো ফটোকপি তাদের দফতরে রেখেছে। তাদেরকে ওই রেওয়ায়াতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কিংবা এ বিষয়ে কোন কিতাব তালাশ করলে তার এক কপি হাতে ধরিয়ে দেয় এবং এ সাইজের একটি পুস্তিকার সাধারণ মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য আদায় করে। একটি কপি আমার কাছেও রয়েছে। এটা সেই জালকৃত আননি'মাতুল কুবরা, যার আলোচনা বিগত সংখ্যায় করেছি। তবে এই কপিতে مكتبة ايشيق شارع دار الشفقة এই ঠিকানা লেখা আছে।

এই প্রকাশনীটিও 'মাকতাবাতুল হাকীকাহ' প্রকাশনীর সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং উভয়টিই ইস্তাম্বুলের 'ফাতিহ' অঞ্চলে অবস্থিত। এই বাঁধাইকৃত কপিটিতে আরো দুটি জিনিস সংযুক্ত রয়েছে। একটি হল মীলাদ মাহফিলের বিধান প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর একটি পুস্তিকা। এ পুস্তিকার একটি হস্তলিখিত কপির ফটোকপি সেখানে সংযুক্ত আছে; অথচ তা মুদ্রিত আকারে সুয়ূতী (রহ.)-এর

কিতাব 'আলহাভী'-এর প্রথম খণ্ডে حسن المقصد في عمل المولد নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মুদ্রিত কপির পরিবর্তে একটি হস্তলিখিত কপি থেকে কেন ফটোকপি নেওয়া হল, তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। হস্তলিখিত কপিটিতে জনৈক 'মুহাম্মাদ জুনাইদ ছীলানী'এর নাম এবং ১/১১/১৯৭৬ তারিখ লেখা আছে।

যে কথা পাঠকদের সামনে আরয করতে চাই তা এই যে, আলবাইয়্যিনাত -ওয়ালারা তাদের আননি'মাতুল কু বরা পুস্তিকার উদ্ধৃতিতে সুয়ূতী (রহ.)এর নামে যে কথাগুলো চালানোর চেষ্টা করেছে, তার নিজের পুস্তিকার কোথাও সেগুলোর অস্তিত্ব নেই। ওই পুস্তিকায় বরং পরিষ্কার লেখা আছে যে, প্রচলিত মীলাদ মাহফিল বেদআত। আরো লেখা আছে যে, সর্বপ্রথম বাদশা মুজাফফরুদ্দীন (মৃত্যু ৬৩০ হি.) এটা উদ্ভাবন করেন। -আলহাভী ১/২৫১-২৫২; আলবাইয়্যিনাতওয়ালাদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কপির ৭৫-৭৬, ৮০, ৮৮ পৃষ্ঠা

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই নবউদ্ভাবিত মীলাদ মাহফিল যদি সব ধরনের গর্হিত ও আপত্তিকর কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকে তবে ইমাম সুয়ূতী একে বেদআতে হাসানা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ মত কতদূর সঠিক তা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

মীলাদ মাহফিল বা মওলুদখানী বেদআতে সায়্যিআহ কি বেদআতে হাসানা এবং শরয়ী পরিভাষায় কোন বেদআতকে 'হাসানা' নামে আখ্যায়িত করা সঠিক কি না? এ মুহূর্তে আমার আলোচ্যবিষয় নয়। এখানে যা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য তা এই যে, এই কাজ নবউদ্ভাবিত হওয়া এবং সপ্তম শতাব্দীর বেদআত হওয়ার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

পাঠক আশ্চর্যবোধ করবেন যে, এরা একদিকে খুলাফায়ে রাশেদীন, কয়েকজন বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর সুফিয়ায়ে কেরামের নামে মওলুদখানীর কিছু মনগড়া ফযীলত একটি নকল পুস্তিকার উদ্ধৃতিতে বয়ান করছে, অন্যদিকে এ পুস্তিকার সাথে সুয়ূতী (রহ.)এর ওই রিসালাটি সংযুক্ত করছে, যে রিসালায় তিনি মীলাদ অনুষ্ঠানকে সপ্তম শতাব্দীর বেদআত বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে কি তারা এটাই স্বীকার করে নিচ্ছে না যে, উল্লেখিত ব্যক্তিদের নামে মওলুদখানীর ফযীলতবিষয়ক যে রেওয়ায়াতগুলো তারা উল্লেখ করেছে তা সব সপ্তম শতাব্দীর পরের তৈরি অর্থাৎ মওযূ?

সুয়ূতী (রহ.)-এর উক্ত পুস্তিকায় একথাও বারবার উল্লেখিত হয়েছে যে, মীলাদ মাহফিলের বৈধতার জন্য তা সব ধরনের গর্হিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকা

অপরিহার্য। আজকালের মাহফিলগুলোতে কি এ শর্ত রক্ষা করা হয়? অপব্যয়, পর্দাহীনতা, ছবি ও গানবাজনা ইত্যাদি থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মীলাদ ও সীরাত সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও মওযূ রেওয়ায়াত বর্ণনা এবং নানা শিরকী কবিতা আবৃত্তি পর্যন্ত কোন্ কাজটি রয়েছে যা এসব মাহফিলে করা হয় না? এরপর এসবের সাথে 'ঈদ' শব্দ যুক্ত করে মুসলিম সমাজে দুই ঈদের সাথে তৃতীয় ঈদের উদ্ভাবন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও শিক্ষার প্রকাশ্য বিরোধিতা নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্পষ্টভাবেই বলেছেন, মুসলমানদের ঈদ দুইটি–ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। (উদ্ধৃতিসমূহের জন্য দেখুন– আলকাউসার অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যা, '০৬ঈ. পৃ. ১৩-১৪)

হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্মদিন সোমবারে রোযা রাখতেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২/১৯৭-১৯৮) তাহলে রোযা আর ঈদ একত্র হয় কীভাবে?

এতো গেল একটি পুস্তিকার কথা। সেই বাঁধাইকৃত বইটিতে অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় জিনিসটি হল মিসরের ইউসুফ নাবহানী (রহ.) কৃত 'জাওয়াহিরুল বিহার'এর তৃতীয় খণ্ডের কয়েকটি পৃষ্ঠার ফটোকপি। আল্লাহর কি শান! এই পৃষ্ঠাগুলোতেও (পৃ. ৯২) পরিষ্কার লেখা রয়েছে– أول من أحدثه الملك المظفر صاحب إربل অর্থাৎ সর্বপ্রথম এ বিষয়টি তথা মীলাদ-অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করেন ইরবিল অঞ্চলের শাসক বাদশাহ মুজাফফরুদ্দীন। এই সংযুক্তির মাধ্যমেও আলবাইয়্যিনাত-ওয়ালারা নিজেরাই তাদের সেই পুস্তিকার রেওয়ায়াতগুলো জাল ও ভিত্তিহীন হওয়ার ঘোষণা দিল। কেননা, এই রেওয়ায়াতগুলো সহীহ হলে মীলাদ মাহফিল ও মওলুদখানী সপ্তম শতাব্দীর বেদআত না হয়ে সাহাবী-তাবেয়ী যুগের সুন্নত হত; কিন্তু যখন তা নয়, বরং উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে এবং খোদ আলবাইয়্যিনাতওয়ালাদের স্বীকারোক্তি অনুসারেও মীলাদ-অনুষ্ঠান ও মওলুদখানী পরবর্তী যুগের উদ্ভাবিত বেদআত, তাহলে এতে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, উল্লেখিত বর্ণনাগুলো মওযূ তথা জাল। বস্তুত নিজেদের মিথ্যাচারের জালে যারা নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে, তাদের মিথ্যাচার প্রমাণের জন্য আর কোন দলীলের প্রয়োজন পড়ে না।

চার, সর্বশেষ কথা এই যে, তারা ওই মনগড়া রেওয়ায়াতগুলোর সাথে শুধু নকল আননি'মাতুল কুবরার উদ্ধৃতি যুক্ত করেছে অথচ প্রবন্ধের শেষে উৎসগ্রন্থ শিরোনামে চারটি গ্রন্থের নাম দিয়েছে– (১) আননি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম, ইবনে হাজার মক্কী (২) জামউল ওয়াসাইল (৩) সুবুলূল হুদা ফী মাওলিদিল মুস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও (৪) সুবুলূল হুদা ওয়ার রাশাদ।[১]

প্রথম কিতাব আননি'মাতুল কুবরা সম্পর্কে তো আমি বিস্তারিত লিখেছি যে, এটি প্রকৃত আননি'মাতুল কুবরা নয়; বরং এ নামের একটি জাল কিতাব। ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী কৃত প্রকৃত আননি'মাতুল কুবরা-র পাণ্ডুলিপি দারুল কুতুবিল মিছরিয়্যাহ, কায়রোতে সংরক্ষিত রয়েছে, যার ফটোকপি আমাদের কাছেও রয়েছে। সেই গ্রন্থে ওইসব রেওয়ায়াতের নাম-নিশানাও নেই।

জামউল ওয়াসাইল নামে যে গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ তা হল মোল্লা আলী কারী (রহ.) কৃত শামায়েলের ভাষ্য। এই গ্রন্থটি মিসর থেকে (১৩১৮ হি.) দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর পাকিস্তান থেকেও মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিও আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি। এতেও সেসব রেওয়ায়াতের চিহ্নমাত্র নেই।

তৃতীয় নামটি হচ্ছে সুবুলুল হুদা ফী মাওলিদিল মুস্তফা। এটি কী কিতাব এবং কে এর রচয়িতা তা আমাদের জানা নেই। হতে পারে এটিও প্রথমটির মত আরেকটি জাল পুস্তিকা কিংবা জাল রেওয়ায়াতে পরিপূর্ণ কোন অখ্যাত কেতাব। আলবাইয়্যিনাতওয়ালাদেরকে এ পুস্তিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলেও তারা কিছু বলতে প্রস্তুত হয়নি। অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা বলে পাশ কাটিয়ে গেছে। অনেক পীড়াপীড়ির পর তাদের একজন বলেছে যে, এটি সুয়ূতী (রহ.)-এর কিতাব; অথচ সুবুলুল হুদা নামে সুয়ূতী (রহ.)-এর যে কিতাব রয়েছে তা 'সিয়ার' বিষয়ে, (কাশফুয যুনূন ২/৯৭৮) মীলাদ বিষয়ে নয়। আর সুয়ূতী (রহ.) নিজেই যখন 'হুসনুল মাকসিদ' পুস্তিকায় মীলাদকে সপ্তম শতাব্দীর আবিষ্কার বলেছেন, তখন জালকৃত আননি'মাতুল কুবরা-এর উদ্ধৃতিতে যে বর্ণনাগুলো সুয়ূতী (রহ.)-এর নামে যুক্ত করা হয়েছে তা-যে তাঁর কোন কিতাবে থাকতে পারে না–এতো বলাই বাহুল্য।

যাহোক যখন অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা এবং তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই উল্লেখিত রেওয়ায়াতগুলো মওযূ বলে প্রমাণিত, তখন সেগুলো সুবুলুল হুদা ফী মাওলিদিল মুস্তফা নামক কোন পুস্তিকায় রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হলেও কী আসে যায়? মওযূ রেওয়াতগুলো তো কোন না কোন ভাষায় অথবা কোন না কোন কাগজে লিখিত থাকেই। তাতে কি এগুলো সহীহ হয়ে যায়? কোন বর্ণনা

১–উল্লেখ্য, এ কিতাবের নামের মধ্যে الرشاد। শব্দটি আলবাইয়্যিনাতে الرشد। রূপে লিখেছে। এটি কি মুদ্রণজনিত ভুল, না আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত প্রয়াস তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

সহীহ হওয়ার প্রথম শর্ত রেওয়ায়াতটির মতন (বক্তব্য) বাতিল না হওয়া, দ্বিতীয় শর্ত কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে গ্রহণযোগ্য সনদে উল্লেখিত হওয়া। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত রেওয়াতগুলোতে এর কোনো কিছুই বিদ্যমান নেই।

চতুর্থ গ্রন্থটি অর্থাৎ সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ হল সীরাত বিষয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালেহী শামী (রহ. মৃত্যু ৯৪২ হি.)এর রচনা। এর প্রথম খণ্ড ৩৬২ থেকে ৩৭৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মীলাদ মাহফিলের আলোচনা রয়েছে। এখানেও স্পষ্ট বলা আছে যে, সর্বপ্রথম ইরবিল-শাসক বাদশা মুজাফফরুদ্দীন (মৃ. ৬৩০ হি.) তা উদ্ভাবন করেন। আলবাইয়্যিনাতওয়ালাদের উল্লেখিত রেওয়ায়াতগুলোর কোন নাম-নিশানাও সেখানে নেই।

যে পত্রিকার একটি প্রবন্ধে একনিঃশ্বাসে এতগুলো মিথ্যা একত্র হতে পারে এবং হাদীস ও সীরাতের মত নাযুক বিষয়ে এত নির্জলা মিথ্যা বলা যেতে পারে, সেই পত্রিকা এবং পত্রিকাওয়ালাদের হাশর যে কার সাথে হবে, তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। #

[এপ্রিল '০৭ঈ.]

হাদীস ও আছারের সুপ্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ সংকলন
মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা
নতুন তাহকীক ও তালীক এবং গবেষণার নতুন দিগন্ত

'মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা' 'হাদীস' ও 'আছারে'র সুবৃহৎ সংকলন, যা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থের সংকলক ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা আলকূফী (১৫৯ হি.-২৩৫ হি.) ছিলেন ইলমে হাদীসের অনেক বড় ইমাম। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও তাঁদের সমসাময়িক হাদীসের ইমামগণ তাঁর শীষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ইলমে হাদীসে অনেক কিতাব তিনি রেখে গেছেন। সেগুলোর মধ্যে 'মুসান্নাফ' গ্রন্থটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সহজলভ্য। এটি প্রথমে হিন্দুস্তানে, পরে পাকিস্তান ও বৈরুতে কয়েকবার মুদ্রিত হলেও পূর্ণ গ্রন্থের যথাযথ তাহকীককৃত কোন সংস্করণ এ যাবৎ প্রকাশিত হয়নি। আল্লাহ তাআলার শোকর, বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ, উলূমুল হাদীস ও উলূমুল ফিকহ বিষয়ে গভীর পারদর্শিতার অধিকারী শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামা হালাবী (৭১) মুকীম মদীনা মুনাওয়ারা, তাঁর তিন পুত্রের সহযোগিতায়, যাঁরা প্রত্যেকে যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম, দীর্ঘ ষোল বছরে পূর্ণ গ্রন্থের তাহকীক, তাখরীজ ও তালীক সম্পন্ন করেছেন এবং আধুনিক মুদ্রণের মাধ্যমে বৈরুত থেকে প্রকাশ করেছেন।

মোট ২৬ খণ্ডে এই সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পাঁচ খণ্ডে বিভিন্ন ধরনের সূচি ও নির্ঘণ্ট। অবশিষ্ট ২১ খণ্ডে পূর্ণ কিতাব উন্নত সম্পাদনা ও দৃষ্টিনন্দন সজ্জায়নের সাথে পেশ করা হয়েছে। টীকায় প্রায় সকল রেওয়ায়াতের 'তাখরীজ' অর্থাৎ এ রেওয়ায়েত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে কোথায় কোথায় রয়েছে তার স্থান-নির্দেশ, রেওয়ায়াতের সনদগত মান, তুলনামূলক কম প্রচলিত শব্দের সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ইত্যাদি এসেছে। এছাড়া অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ

আলোচনা তো রয়েছেই।

পাঠক-গবেষকদের অধিকতর সুবিধার জন্য মুহাক্কিক (পাণ্ডুলিপি-সম্পাদক) গ্রন্থটির সিডিও প্রস্তুত করিয়েছেন, যা প্রত্যেক নুসখার সাথে পাওয়া যাবে।

এই এডিশনে সর্বমোট রেওয়ায়েত-সংখ্যা উনচল্লিশ হাজার আটানব্বই (৩৯০৯৮)। 'মারফু' হাদীসের পাশাপাশি 'আছারে সাহাবা', তাবেয়ী ইমামগণের বাণী ও ফত্ওয়া এবং কিছু সংখ্যক তাবে-তাবেয়ী ইমামগণেরও বাণী সংকলিত হয়েছে। এছাড়া অনেক ইতিহাসের বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক বর্ণনা সনদসহ উল্লেখিত হয়েছে আর টীকায় সনদগুলোর শাস্ত্রীয় মান চিহ্নিত করা হয়েছে।

রেওয়ায়াতের উপরোক্ত সংখ্যা থেকেই এ গ্রন্থের কলেবর ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। কিতাবের শুরুতে শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামা লিখিত ১৯৮ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ ভূমিকা রয়েছে, যা উলূমুল হাদীসের মূল্যবান তথ্য ও আলোচনায় সুসমৃদ্ধ। এ ভূমিকায় তিনি ওই পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন, যেগুলোর সাহায্যে এই এডিশন প্রস্তুত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিগুলোর কিছু নমুনার হুবহু ফটোও সংযুক্ত হয়েছে। তাহকীক, তাখরীজ ও তালীক (পাণ্ডুলিপি পাঠ ও সম্পাদনা, বর্ণনাসমূহের সূত্র-নির্দেশ ও টীকা-সংযুক্তি)-এই সকল বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, নিখুঁত ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ভূমিকা থেকেই হয়ে যায়। এরপর কিতাবের অধ্যয়নের সাথে সাথে তা আরো পরিষ্কার হতে থাকবে।

আলোচিত এডিশন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে আলেমদের মাঝে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে এবং প্রায় সকল ঘরানার আলেম-ওলামা শাইখের এই অবদানকে অত্যন্ত মূল্যায়ন করেছেন।

কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করার বিষয় এই যে, আরবের কিছু বিত্তশালী ব্যক্তি কিতাবটির এই পূর্ণাঙ্গ এডিশন ব্যাপক আকারে প্রচার করার জন্য বাংলা-পাক-ভারত অঞ্চলের মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিতরণ করার নিয়ত করেন। সে হিসাবে ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২০০৬ ঈসাব্দে বিতরণের উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত তাহকীককৃত এডিশনের একটি ফটো এডিশন শাইখের অনুমতিতে পাকিস্তান থেকে ছাপানো হয়, যা মূল এডিশনের কয়েক মাস পরই মুদ্রিত হয়। এই এডিশনের শুরুতে শাইখের আরেকটি ভূমিকা সংযুক্ত হয়েছে, যা চার পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র কলেবরে হলেও জরুরি কিছু আলোচনা তাতে স্থান পেয়েছে। এ ক্ষুদ্র ভূমিকাও উলামা-তলাবার অধ্যয়নে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের দাওরায়ে হাদীস মাদরাসায় বিতরণ করার জন্য তিনশ নুসখা পাঠানো হয়েছিল। বিতরণের যিম্মাদারী শাইখের পক্ষ থেকে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর উপর অর্পিত হয়। মাশাআল্লাহ, তাখাসসুস-এর প্রতিষ্ঠান এবং মিশকাত-জালালাইন মাদরাসাগুলো ছাড়াই আমাদের দেশে শুধু দাওরায়ে হাদীস মাদরাসাই তিন শতাধিক। যেহেতু মাত্র তিনশ নুসখা, এজন্য আবার শাইখকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি বণ্টনের জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করে দেন। সেই নীতি অনুযায়ী মারকাযুদ দাওয়ার দায়িত্বশীলরা কিতাব বিতরণের দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ তাআলা এই সামান্য খেদমত কবুল করুন এবং মুহাক্কিক, প্রকাশক এবং এ কিতাব বিতরণে যে বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ অংশ নিয়েছেন তাঁদের সবাইকে এই বিশাল খেদমতের যথাযোগ্য প্রতিদান দান করুন। আমীন।

হাদীস ও সুন্নাহর এই সুবিশাল সংকলনের এতগুলো নুসখা সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে এবং দেশের প্রায় সকল বড় মাদরাসায় এ কিতাবের এক নুসখা পৌঁছে গিয়েছে–এরই পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে এ কিতাব থেকে সর্বোচ্চ ফায়েদা অর্জন করা যায়–এ বিষয়ে লেখার জন্য বন্ধুরা আদেশ করেছেন। বর্তমান নিবন্ধটি তাঁদের আদেশ পালন ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনীয় ও উপকারী কিছু কথা পেশ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাদরাসার দায়িত্বশীলদের কাছে আবেদন

এ প্রসঙ্গে সকল মাদরাসার দায়িত্বশীলদের খেদমতে অত্যন্ত বিনীত ও করজোর নিবেদন এই যে, প্রত্যেক মাদরাসায় স্বতন্ত্র 'দারুল মুতালাআহ' থাকা উচিত এবং সকাল থেকে রাত সাড়ে নয়টা-দশটা পর্যন্ত তা খোলা রাখা উচিত। যাতে দরসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে তালেবে ইলমরা সেখানে কাজ করতে পারে এবং খালি ঘণ্টায় আসাতেযায়ে কেরাম মুতালাআ করতে পারেন। স্বতন্ত্র দারুল মুতালাআর ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে কুতুবখানাই সারাদিন খোলা রাখা উচিত এবং রাতেরও একটি উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত সেখানে কাজ করার সুযোগ থাকা উচিত।

শুরূহে হাদীস, ইলমু আসমাইর রিজাল, ইলমে উসূলে হাদীস এবং আরবী লুগাতের পাঁচ-দশটি বুনিয়াদি গ্রন্থ দাওরায়ে হাদীসের দরসগাহেই রাখা দরকার চাই। হেদায়া-জালালাইনের দরসগাহের জন্যও তাফসীর, ফিকহ ও ফতওয়ার কিছু বুনিয়াদি কিতাবের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত, যাতে তালেবে ইলমরা সালাফের ইলমী মীরাছের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের মধ্যে অধ্যয়নের

অভ্যাস তৈরি হতে পারে আর ধীরে ধীরে অধ্যয়নের মান উন্নত হতে থাকে। এই ব্যবস্থা ওই সব অধ্যয়ন-পিপাসু তালেবে ইলমের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে, যারা দুর্লভ ও দুষ্পাপ্য গ্রন্থাদি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে সক্ষম নয়।

এমন ব্যবস্থা আমাদের দেশে কোথাও নেই-এ কথা বলছি না, আলহামদুলিল্লাহ কোন কোন মাদরাসায় কুতুবখানা খোলা রাখারও নিয়ম আছে এবং কোথাও কোথাও দাওরায়ে হাদীসের দরসগাহে মাদরাসার পক্ষ থেকে কিছু ব্যাখ্যা-গ্রন্থেরও ব্যবস্থা থাকে। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে আমি একজন তালেবে ইলমের মুখে, যে হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেবের শাগরিদ, এক আলোচনা প্রসঙ্গে শুনেছিলাম যে, তিনি দাওরায়ে হাদীসের বছর 'মাআরিফুস সুনান' অধ্যয়ন করেছেন এবং ওই নুসখা থেকেই অধ্যয়ন করেছেন, যা মাদরাসা থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল। অন্যদিকে এ-ও শুনেছি যে, ঢাকারই এক বড় মাদরাসার তালেবে ইলম শশমাহী ইমতেহান হয়ে যাওয়ার পরও 'তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থটিরও নাম শোনেনি!

এ মুহূর্তে বিষয়টি আলোচনা করার এক উদ্দেশ্য এই যে, 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা'র যে নুসখাগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছেন তা যেন আমরা সংরক্ষিত কুতুবখানায় না রাখি, যা শুধু বছরের সূচনা ও সমাপ্তিতে খোলা হয়ে থাকে বা সাময়িক প্রয়োজনে হঠাৎ কখনো খোলার সুযোগ আসে; বরং এমন কোথাও রাখা উচিত, যা দরস ও মুতালাআর অধিকাংশ সময়ই উন্মুক্ত থাকে। কিতাব হেফাযতের ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত, কুতুবখানা ও দারুল মুতালাআর নেগরানও থাকা চাই, অন্য কোন কামরায় কোন আলমিরাতে কিতাব রাখতে হলে সেখানে তালা-চাবিরও ব্যবস্থা থাকা দরকার, তবে সংরক্ষণের নামে এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় যে, মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণও সহজে তা ব্যবহার করতে পারেন না। এমন হলে তা হবে খুবই দুঃখজনক এবং কিতাব ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আমাদের এ অঞ্চলে অধিকাংশ মাদরাসা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত। কমিটির সদস্যরা যদি মাদরাসার আলাদা কুতুবখানা ও দারুল মুতালাআ স্থাপনে মনোযোগী হন তাহলে খুব ভাল হত। কিতাবসংগ্রহের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ থাকা উচিত এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে কিতাব সংগ্রহ করা উচিত। তারা নিজেরা বা তাদের বন্ধুবান্ধবরা যখন হজ্ব-ওমরায় যান তখন মাদরাসার জন্য কিতাব সংগ্রহ করতে পারেন। এরপর সংগৃহীত কিতাবের সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এবং সর্বোচ্চ সময় কুতুবখানা খোলা রাখার জন্য একাধিক দায়িত্বশীল

নিযুক্ত করতে পারেন, যারা পালাক্রমে সেখানে দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির মূল কাজ মাদরাসার উন্নতি-অগ্রগতির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আর মাদরাসার পড়াশোনা ও শিক্ষক নিয়োগ-বরখাস্ত সংক্রান্ত বিষয়গুলো উলামায়ে কেরামের দায়িত্বে অর্পণ করা উচিত।

'মুসান্নাফ' থেকে আমরা কী কী ফায়েদা গ্রহণ করতে পারি

(১) এ গ্রন্থের সংকলক হলেন ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা। মূল নাম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ। ১৫৯ হিজরীতে জন্ম এবং ২৩৫ হিজরীতে মৃত্যু। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন-এর মত ইলমে হাদীসের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও জরহ-তাদীলের ইমামগণের তিনি সমসাময়িক এবং তাঁদের সমপর্যায়ের ইমাম।

আর উপরোক্ত মনীষীগণ ছিলেন 'কুতুবে সিত্তা' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ)এর সংকলকদের উস্তাদ কিংবা দাদা উস্তাদ ।

ওই সময়ের ইমামগণের এবং তাঁদেরও পূর্বসূরি ইমামগণের সংকলিত অনেক হাদীসগ্রন্থ আমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) যিনি বুখারী ও আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন, তাঁর সংকলিত সুবৃহৎ হাদীসগ্রন্থ 'আলমুসনাদ'-এর ১৩১৩ হি. থেকে এ পর্যন্ত অনেকগুলো এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। অল্প কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে এ গ্রন্থের সবচেয়ে নিখুঁত ও সুসম্পাদিত এডিশন। বৈরুতের মুআসসাতুর রিসালা থেকে ৫২ খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়েছে। শাইখ শোয়াইব আরনাউত-এর তত্ত্বাবধানে আলেমদের একটি জামাত এর তাহকীক ও তাখরীজ করেছেন।

ইমাম আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম আসসানআনী ইমাম ইবনে আবী শাইবা (২৩৫ হি.) এরও আগের মনীষী। ১২৬ হিজরীতে জন্ম ও ২১১ হিজরীতে মৃত্যু। তিনিও হাদীস ও আছারের অনেক বড় সংকলন 'আলমুসান্নাফ' নামে তৈরি করেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.) ইমাম ইবনে জুরাইজ (৮০-১৫০ হি.) ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) ইমাম মা'মার ইবনে রাশেদ (৯৫-১৫৪ হি.) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) এবং এঁদের সমসাময়িক তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের শাগরিদ ছিলেন। আর ইমাম আহমদ, ইবনুল মাদীনী ও ইবনে মায়ীন ছিলেন তাঁর শাগরিদ।

ইমাম আবদুর রাযযাক সানআনী সংকলিত হাদীসগ্রন্থটি ১৩৯০ হি. মোতাবেক ১৯৭০ ঈসাব্দে সর্বপ্রথম বৈরুত থেকে এগারো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর তাহকীক ও তাসহীহ, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন এ উপমহাদেশেরই বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.) যিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপন করেছিলেন এবং হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। ১৪১২ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকে সর্বমোট রেওয়ায়াত সংখ্যা একুশ হাজার তেত্রিশ।

ইমাম আবদুর রাযযাক (২১১ হি.) ও তাঁর পূর্বসূরি ইমামদের সংকলিত বহু হাদীস-গ্রন্থও আলহামদুলিল্লাহ বহু আগেই মুদ্রিত হয়েছে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ পাঠক-গবেষকদের মাঝে সমাদৃত। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ. ১১৩-১৮২ হি.) যিনি ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরিদ এবং দ্বিতীয় হিজরী শতকে গোটা ইসলামী বিশ্বের 'কাযিউল কুযাত' ছিলেন, ফিকহ ও হাদীস বিষয়ে তাঁর অন্যতম রচনা 'কিতাবুল খারাজ' বহুদিন যাবৎ মুদ্রিত। ইমাম মালেক (রহ. ৯৩-১৭৯ হি.)-এর 'মুয়াত্তা' এরও আগে সংকলিত ও মুদ্রিত।

ইমাম মালেক (রহ.) প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি তাবেয়ী ছিলেন না। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর আগে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং একাধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য লাভ করেন। এজন্য তিনি তাবেয়ী ছিলেন। তাঁর সংকলিত হাদীস-গ্রন্থ 'কিতাবুল আছার'ও আজ থেকে প্রায় আড়াই শত বছর আগে মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রিত নুসখাটি ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর বিন্যাসকৃত ও রেওয়ায়াতকৃত।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.)-এর শাগরিদ হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ, যিনি ৪০ হিজরী সনের কাছাকাছি কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর হাদীস-সংকলন 'সহীফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ' নামে প্রসিদ্ধ। ১৩৭৫ হি. মোতাবেক ১৯৫৬ ঈসাব্দে ড. হামীদুল্লাহর তাহকীক ও মুকাদ্দিমাসহ প্রকাশিত হয়।

এ নিবন্ধে আলোচ্যগ্রন্থ 'মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা' থেকে 'সহীফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ' পর্যন্ত এই হাদীস-সংকলনগুলো এবং এ ধরনের আরো বহু হাদীস-গ্রন্থ, যা এ নিবন্ধে উল্লেখিত হয়নি, সবগুলোই হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের আগের সংকলন। হাদীস ও সুন্নাহ এবং আছারে ছাহাবা ও তাবেয়ীদের এই প্রাচীন গ্রন্থগুলো হাদীস অস্বীকারকারী ফেরকা ও ওদের অনুসারীদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডার বাস্তব জবাব। আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের দেশেও এদের

অবাধ বিচরণ রয়েছে। ওদের প্রচারণা এই যে, হিজরী তৃতীয় শতকের আগে হাদীস সংকলিত হয়নি।

যদি ওই সময় পর্যন্ত হাদীস শরীফ সংকলিত না-ও হত তবুও এতে সংশয়ের কিছু ছিল না। কেননা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়া হাদীস সংরক্ষিত থাকার একটিমাত্র মাধ্যম। আর আল্লাহ তাআলা হাদীস ও সুন্নাহকে এক মাধ্যমে নয়, একাধিক মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখবেন। তবে বাস্তবতা এই যে, হাদীস শরীফ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, এরপর খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও বিপুল আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গোটা সাহাবী-যুগ ও তাবেয়ী-যুগব্যাপী হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ করার ধারা অব্যাহত ছিল। ওই সময়ের বহু সংকলনের মধ্যে বেশ কিছু সংকলন মুদ্রিতও হয়েছে। আর এর পরবর্তী যুগের হাদীস-গ্রন্থগুলোর একটি বিশাল অংশ এখনও পর্যন্ত সহজলভ্য।

এই হাদীস অস্বীকারকারীদের জানা আছে যে, একটি বর্ণনা তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে গণ্য হয় যখন তার (সনদ)সূত্র বিদ্যমান থাকে এবং সে সনদের সকল রাবী সত্যবাদী, আস্থাভাজন, তাকওয়া-পরহেজগারীসম্পন্ন এবং স্মৃতি ও মেধার দিক থেকে নির্ভরযোগ্য ও চৌকস হওয়ার পাশাপাশি বর্ণনার সূত্র ও বক্তব্য সংক্রান্ত অন্য সকল শর্তও বিদ্যমান থাকে। বলাবাহুল্য, এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এটি কি প্রথম শতাব্দীর কোন কিতাবে সংকলিত হল কি দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন কিতাবে, এতে কিছুই যায় আসে না। অথচ তারপরও বুঝেশুনে এরা এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণায় মগ্ন থাকে। বস্তুত জ্ঞানপাপীদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

তো মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা থেকে যে বিষয়গুলো অর্জন করা সম্ভব তার মধ্যে প্রথম বিষয় আমার মতে এই যে, এই কিতাব এবং তার আগের সংকলিত কিতাবসমূহ হাদীস অস্বীকারকারী এবং ওদের অনুসারীদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডার বাস্তব জবাব এবং ওদের পক্ষে চপেটাঘাত তুল্য।

(২) সেক্যুলার মানসিকতার লোকদের দাবি এই যে, দ্বীনের সম্পর্ক (ওদের ভাষায়, ধর্মের সম্পর্ক) একান্তই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই বা দ্বীন সেখানে অনধিকার প্রবেশ করে না। ভাল কাজ করা এবং নৈতিক মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করাই হল দ্বীনের দাওয়াত এবং এ পর্যন্তই ...!! নাউযুবিল্লাহ!

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, মুয়াত্তা, কিতাবুল

আছার বলুন কি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব বা এ ধরনের যে কিতাবগুলোতে হাদীস ও আছার বিষয়ভিত্তিক শিরোনামে সংকলিত হয়েছে-এগুলোর শুধু সূচিপত্রে একবার নজর বুলালেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপরোক্ত দাবি সত্য নয়।

এই কিতাবগুলোতে যেমন আখেরাতবিষয়ক অধ্যায় রয়েছে, তেমনি দুনিয়ার জীবনসংশ্লিষ্ট অধ্যায়ও রয়েছে। আকীদা, ইবাদত, আখলাক-চরিত্র বিষয়ক শিরোনাম যেমন আছে, যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, তেমনি পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ও রয়েছে। শান্তি ও সন্ধিবিষয়ক শিরোনামের পাশাপাশি 'আমর বিল মা'রূফ, নাহি আনিল মুনকার' ও জিহাদবিষয়ক শিরোনামও রয়েছে। মসজিদবিষয়ক শিরোনামের মত রাষ্ট্র-পরিচালনা, খেলাফত ওয়া-ইমারত, আইন ও বিচারসংক্রান্ত শিরোনামও রয়েছে। নামায-রোযা, দুআ-দরূদ বিষয়ক শিরোনামের সাথে সভ্যতা-সংস্কৃতি, লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ক শিরোনামও রয়েছে, যা প্রায় সকল হাদীসগ্রন্থেই 'কিতাবুল আদব' নামে বিদ্যমান। যাকাত, সদকা, দান ও ঋণের শিরোনামগুলোর পাশাপাশি সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়, সম্পদ বণ্টন, ইজারা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি শিরোনামও রয়েছে।

ব্যক্তিগত সংশোধনের সাথে সন্তানের তরবিয়ত ও গোটা সমাজের তালীম-তরবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়টিও রয়েছে। দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যা অর্জনেরও কথা রয়েছে। সমাজের শুধু একটি শ্রেণী নয় সকল শ্রেণীর সাথে সংশ্লিষ্ট শিরোনাম রয়েছে। চিকিৎসা ও এ সংক্রান্ত বিধান ও নির্দেশনা বিষয়ক শিরোনাম রয়েছে। উপদেশ-নসীহতের সাথে শাস্তি ও তিরস্কার এমনকি হদ, কিসাস ও তাযীর বিষয়ক শিরোনামও রয়েছে। আল্লাহর হকের সাথে বান্দার হক এমনকি সৃষ্টিজগতের হকসমূহও শিরোনাম আকারে এসেছে। মানুষের ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগ থেকে নিয়ে মৃত্যুর পরের অবস্থাগুলোও সূচিবদ্ধ হয়েছে, 'মীরাছ' ও 'ফারায়েয' তার একটি দৃষ্টান্ত।

মোটকথা, দ্বীন ও দুনিয়ার এমন কোন বিষয় নেই, যে সম্পর্কে কিতাব ও সুন্নাহয় মৌলিক ও ব্যাপক বা বিশেষ ও স্পষ্ট কোন নির্দেশনা বিদ্যমান নেই। এ জন্য হাদীস ও সুন্নাহর কিতাবসমূহকে বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করা হলে এতে জীবন ও জগতের সকল অঙ্গন অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কোন কারণ নেই।

বর্তমানে যে সমস্যাগুলো আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে বিবেচিত এবং সমাধান পেশ করার দাবিতে সকল মতবাদ উচ্চকণ্ঠ অথচ বাস্তবতা এই যে, তাদের কেউই

এই সমস্যাগুলোর বিশুদ্ধ ও ইনসাফভিত্তিক সমাধান পেশ করতে সক্ষম হয়নি, যদি এ সব লোক নিজেদের নির্ধারিত পরিভাষা থেকে চিন্তাকে মুক্ত করে মূল বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং এগুলোর সমাধান নবী-শিক্ষায় অন্বেষণ করার জন্য সীরাত ও হাদীসের গ্রন্থসমূহ মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন, পাশাপাশি সীরাত ও হাদীসেরই ব্যাখ্যা ও সারনির্যাস ফিকহে ইসলামী থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন তাহলে তারা অনুভব করতে সক্ষম হবেন যে, ইসলামী শরীয়ত বহু আগেই এই বিষয়গুলোর বিশুদ্ধ ও ইনসাফভিত্তিক সমাধান পেশ করেছে, যার চেয়ে উত্তম সমাধান পৃথিবীর কোন মতবাদ কেয়ামত পর্যন্ত পেশ করতে সক্ষম হবে না।

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি আরয করছিলাম যে, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার মত বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের শুধু সূচিপত্রগুলোও ওই কুফরী মতবাদকে খণ্ডন করে, যে মতবাদে বলা হয়, ওহীর শিক্ষায় মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা নেই। অন্যভাষায়, ইসলাম মানুষের কাছে শুধু নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হওয়ার দাবি জানায়; এর বাইরে অন্য কোন বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। নাউযুবিল্লাহ!

উপরোক্ত ধর্মবিরোধী মুলহিদ শ্রেণীর প্রচার-প্রচারণায় যেসব দুর্বল ঈমান, স্বল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট মুসলমান প্রভাবিত হয় তাদের জন্যও এই সূচিপত্রে নজর বুলানো প্রতিষেধকের কাজ করতে পারে।

(৩) আলোচিত গ্রন্থে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কর্ম ও নির্দেশনা অর্থাৎ মারফূ হাদীস যেমন রয়েছে, তেমনি প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের মধ্যে যাঁরা ফকীহ ছিলেন, তাঁদের ফত্ওয়া এবং তাঁদের পরবর্তী ফকীহদেরও অনেকের ফত্ওয়া। আর এই হাদীস, আছার ও ফত্ওয়ায়ে ফুকাহা সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে সনদের সাথে।

যে সব সাহাবীর ফত্ওয়া এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তাঁদের সংখ্যা দেড়শরও বেশি। পরবর্তী যুগের লোকদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ করার বিষয় এই যে, ফতওয়া দানকারীগণ সকলেই যদিও দ্বীনী ইলমে পারদর্শী ও কুরআন-সুন্নাহর ফকীহ ছিলেন, কিন্তু কাযী বা বিচারক অল্পসংখ্যকই ছিলেন। যাঁরা কাযী ছিলেন তাঁদেরও বিচারিক সিদ্ধান্ত উল্লেখিত হয়েছে কম, ফত্ওয়াই উল্লেখিত হয়েছে বেশি। এ জন্য এ কিতাবে শুধু একবার নজর বুলিয়ে গেলেও এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা সামনে এসে যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ফতওয়ার প্রচলন ছিল আর যিনি ইলমে দ্বীনে পারদর্শী ও কুরআন ও সুন্নাহর ফকীহ তিনিই ফত্ওয়া প্রদানের উপযুক্ত, তিনি সরকারিভাবে নিযুক্ত হোন বা নাই হোন।

যারা বলে থাকে, 'দ্বীনী ইলমে পারদর্শী ব্যক্তির ফত্ওয়া ফত্ওয়া নয়; বরং আইন ও বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রায়ই হল ফত্ওয়া এবং সরকারিভাবে অনুমোদিত নয়–এমন কারো ফত্ওয়া প্রদানের অধিকার নেই'–এরা প্রকৃতপক্ষে বেদ্বীন ও ইসলামী শরীয়ত অস্বীকারকারী। যদি এরা মুসলমান হত এবং মূর্খতার কারণে এসব বলত তাহলে ওদের সামনে 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা' খুলে রেখে দেওয়া যথেষ্ট হত। এ কিতাবে নজর বুলালেই ওরা অনুধাবন করতে সক্ষম হত যে, ইসলামের প্রথমদিন থেকেই ফত্ওয়ার এই ধারাটি পূর্ণ স্বীকৃতি ও ব্যাপকতার সাথে বিদ্যমান ছিল। শরীয়তের বিধান যার জানা নেই সে জ্ঞানী ও পারদর্শী ব্যক্তির কাছ থেকে তা জেনে নিত। আর ফত্ওয়াদানের দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন যিনি দ্বীনী ইলমে পারদর্শী। কাযী যদি দ্বীনী ইলমে পারদর্শী না হত তবে তাকেও 'মুফতী'র শরণাপন্ন হয়ে শরীয়ত মোতাবেক বিচারকার্য সম্পন্ন করতে হত। এককথায় ফত্ওয়া বিচারকে নিয়ন্ত্রণ করত, বিচার ফত্ওয়াকে নয়। এই পদ্ধতিই ইসলামের প্রথমদিন থেকে প্রচলিত এবং কেয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

তবে যদি এমন কেউ 'ফত্ওয়া' দেওয়া শুরু করে, যে দ্বীনী বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে অযোগ্য বা অনাস্থাভাজন, তাহলে তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই অযোগ্যকে উপরোক্ত কাজ থেকে বিরত রাখা প্রশাসনের দায়িত্ব।

(৪) সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের এই বিপুল সংখ্যক ফত্ওয়া, যা উপরোক্ত কিতাবে এবং এ ধরনের অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তার ধরন এই যে, প্রশ্নকারী আলেম হোক বা না হোক, মুফতী অর্থাৎ উত্তরদাতা উত্তর দেওয়ার সময় সাধারণত দলীল উল্লেখ করেন না। তিনি দলীলের ভিত্তিতে উত্তর দিয়ে থাকেন, তবে সে দলীল প্রশ্নকারীকেও বলে দেওয়া অপরিহার্য মনে করেন না। এভাবে জবাব দেওয়ার রীতি আলেমদের মধ্যে এখনো প্রচলিত রয়েছে।

যারা মনে করে, দলীল উল্লেখ করা ছাড়া মাসআলা বলা জায়েয নয় এবং ফত্ওয়াপ্রার্থীর জন্য দলীলের উল্লেখবিহীন মুফতী (ইলমে দ্বীনের পারদর্শী)র ফত্ওয়া অনুসরণ করা জায়েয নয়, তারা সাহাবী-যুগ থেকে বিদ্যমান সর্বস্বীকৃত ও ইজমায়ী একটি বিষয় থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। যদি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা গ্রন্থটি তারা এই দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করেন তাহলে আশা করা যায়, এই বিভ্রান্তি সম্পর্কে তারা সচেতন হতে পারবেন।

তারা আরও জানতে পারবেন যে, ফিকহের বিভিন্ন মাযহাব খায়রুল কুরূনেই (সাহাবী-তাবেয়ী যুগে) ছিল এবং কোন ধরনের দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই সেই

মাযহাবগুলো অনুসৃত হয়েছে।

ওই মাযহাবগুলো যেভাবে দলীলসহ সংকলিত হয়েছে, তেমনি দলীল উল্লেখ ছাড়াও ভিন্নভাবে সংকলিত হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থসমূহকে 'ফিকহে মুদাল্লাল' ও 'ফিকহে মুকারান' বলা হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলোকে বলা হয় 'ফিকহে মুজাররাদ' ।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে ফিকহ-সংকলনের এই শেষোক্ত পদ্ধতির সূত্র ও বিশুদ্ধতা কত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত! যারা এই পদ্ধতিকে বেদআত আখ্যা দেয় তারা প্রকৃতপক্ষে সালাফের রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত নয়।

তারা আরও জানতে পারবেন যে, আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ যে চার মাযহাবের তাকলীদ ও অনুসরণ করে আসছে তা মূলত সালাফেরই ওই মাযহাবগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আর ফিকহী মাযহাব বলাই হয় কিতাব ও সুন্নাহর বিধিবিধানের বিশ্লেষিত, বিন্যস্ত ও সংকলিত রূপকে।

পাঠকদের মধ্যে যারা আলকাউসারে প্রকাশিত আমার দু'টি প্রবন্ধ 'সালাফের বক্তব্যে তাকলীদ ও মাযহাব শব্দের ব্যবহার' (মুহাররম '২৮ = ফেব্রুয়ারি '০৭) ও 'ফিকহে হানাফীর সনদ' (জুমাদাল উলা '২৮ = জুন '০৭; জুমাদাল উখরা '২৮ = জুলাই '০৭) পড়েছেন তাদের পক্ষে উপরোক্ত কথাগুলো খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নেওয়া সম্ভব হবে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের প্রতি আরেকবার প্রবন্ধ দু'টিতে নজর বুলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।

(৫) 'মুসান্নাফ' থেকে অর্জন করার মত একটি বিষয় হল ইখতেলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি, যার পারিভাষিক নাম 'আদাবুল ইখতিলাফ।'

আপনি এ কিতাবেই দেখতে পাবেন যে, এক দুই মাসআলায় নয়, অসংখ্য মাসআলায় সাহাবী-তাবেয়ী যুগে ফকীহগণের মধ্যে এবং পরবর্তী যুগের ফকীহদের মধ্যেও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হল, এই মতপার্থক্য কেন দেখা দিল অথচ তাঁদের প্রত্যেকেরই ঈমান রয়েছে আল্লাহর উপর এবং কুরআন মজীদের উপর; খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবারই নবী, হাদীস ও সুন্নাহকেই সবাই দ্বীন ও শরীয়তের দলীল মনে করেন। আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও সবাই একতাবদ্ধ, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদাই সকলের আকীদা; দ্বীন ও শরীয়তের ইজমায়ী ও সর্বস্বীকৃত বিষয়াদিতে

এবং সর্বজনস্বীকৃত নীতিমালাতেও সবাই একমত। এরপরও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য কীভাবে সৃষ্টি হল?

বস্তুত মতপার্থক্য দু ধরনের- এক হল হঠকারিতাপ্রসূত মতপার্থক্য। অর্থাৎ একপক্ষ দলীল মানতে প্রস্তুত, অপরপক্ষ হঠকারিতাবশত তা মানতে প্রস্তুত নয়; কিন্তু তার এই অবস্থান গোপন রাখার জন্য সে দলীলের অপব্যাখ্যা করে। এ শ্রেণীর মতপার্থক্য সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, পূর্বোক্ত মনীষীগণ, যাঁরা ইতোপূর্বে উল্লেখিত মৌলিক বিষয়গুলোতে একমত, তাঁদের মধ্যে এ ধরনের মতপার্থক্য হতেই পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার মতপার্থক্য হল, দলীলভিত্তিক মতপার্থক্য। অর্থাৎ বিভিন্ন মত পোষণকারী প্রত্যেকেই দলীল মানতে প্রস্তুত এবং দলীলের অনুসরণ করতে গিয়েই বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে এই মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, খোদ শরীয়তের দলীলের মধ্যেই কোন কাজের দুটি পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে আর উভয়টিই মুবাহ ও স্বীকৃত। তো কেউ এক পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করলেন, অন্যজন অন্য পদ্ধতি অনুযায়ী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হজ্ব তিন প্রকার-কিরান, ইফরাদ, তামাত্তু; ইকামতের দুই পদ্ধতি-তাকবীরের মত অন্য বাক্যগুলোও দুবার করে বলা বা একবার করে বলা ইত্যাদি এই মতপার্থক্যকে পরিভাষায় 'ইখতিলাফুত তানাউ' ও 'ইখতিলাফে মুবাহ' বলা হয়।

কখনো মতভেদ এজন্য হয় যে, আলোচিত দলীলে ভাষার রীতি ও ব্যাকরণ এবং দলীল-ব্যাখ্যার কায়েদা-কানুনের আলোকেই একাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তো কারো দৃষ্টিতে এক ব্যাখ্যা শক্তিশালী মনে হয়েছে, অন্যজনের দৃষ্টিতে অপর ব্যাখ্যা।

এ ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যা এ বিষয়ক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার উপরোক্ত এডিশনের সাথেও এ বিষয়ের দুটি স্বতন্ত্রগ্রন্থ সংযুক্ত হয়েছে : (১) আছারুল হাদীসিশ শরীফ ফী ইখতিলাফিল আইম্মাতিল ফুকাহা (২) আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসায়িলিল ইলমি ওয়াদ দ্বীন।

প্রথম কিতাবে ওই বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলোর কারণে হাদীসের প্রত্যেক ইমাম সর্বান্তকরণে হাদীস-অনুসরণে সমর্পিত হওয়ার পরও তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। আর দ্বিতীয় কিতাবে এ ধরনের মতভেদের ক্ষেত্রে, যা আহলে হক ইমামদের মধ্যে যৌক্তিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে এবং খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই যার সূচনা হয়েছে, সঠিক কর্ম-পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে। আলকাউসারের উদ্বোধনী সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'ফকীহগণের মতভেদ : একটি মূল্যায়ন' থেকে পাঠকবৃন্দ এ বিষয়ে কিছু ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

বর্তমানে আমাদের সমাজে দুধরনের প্রান্তিকতা লক্ষ করা যায়। একশ্রেণীর লোক, যাদের পক্ষে দ্বীন ও ঈমানের প্রাথমিক বিষয়গুলোও জানা বা মানার সৌভাগ্য হয় না, তারা 'উদারতা' শব্দের অপপ্রয়োগ করে থাকেন। তারা যেন বলতে চান, সত্য ও বাস্তবতার অস্বীকার বলতে পৃথিবীতে কিছু নেই। কেউ যদি সত্যকে অস্বীকার করে, বাস্তবতার বিরোধিতা করে তবে এগুলোও তাদের দৃষ্টিতে 'মতের ভিন্নতা' মাত্র। এ কারণেই কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের মত দ্বীনের একটি স্বতঃসিদ্ধ আকীদা–'খতমে নবুওত' অস্বীকার করাও 'ভিন্ন মতে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়! নাউযুবিল্লাহ! তেমনি বেশরা সূফীদের ও সেক্যুলার মানসিকতার লোকদের শরীয়ত-অস্বীকারের মত কুফরীও 'ভিন্ন মত' হিসাবে গণ্য। নাউযুবিল্লাহ! তো এই শ্রেণীর লোকেরা সত্য ও বাস্তবতার বিরোধিতাকেও 'ভিন্নমত' নামে আখ্যায়িত করে এবং যৌক্তিক ও স্বীকৃত মতভিন্নতার মত এগুলোকেও সহনশীলতার সাথে গ্রহণ করার কথা বলে থাকে।

আসলে 'ভিন্ন মতে'র প্রতি মর্যাদা প্রদান এদের একটি শিরোনামমাত্র। আর এই শিরোনামের অপব্যবহারের পেছনে সত্য ও বাস্তবতার প্রতি তাদের বিদ্বেষী মনোভাবই প্রধানত দায়ী।

এর বিপরীতে অন্য এক শ্রেণী, যাদের মধ্যে দ্বীনের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুপস্থিত, তারা ওই ইখতিলাফ সম্পর্কেও অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, যার পেছনে যৌক্তিক ও স্বীকৃত কারণ বিদ্যমান রয়েছে এবং যে ইখতিলাফ সম্পর্কে খোদ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সহনশীল হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। যেহেতু শরীয়তের দলীল-প্রমাণের অনুসরণের প্রেরণা থেকেই এই ইখতিলাফ উৎসারিত, তাই কখনো একে নির্মূল করা সম্ভব হবে না। যেভাবে তা ইসলামের প্রথম যুগে চলমান ছিল, কেয়ামত পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে। অথচ এই স্বীকৃত মতপার্থক্যও এই শ্রেণীর লোকেরা মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তারা সাধারণ মানুষের সাথে এ নিয়ে বিতর্ক করতে থাকেন যে, তোমরা কেন আমীন আস্তে বল, উচ্চস্বরে কেন বল না? রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় কেন 'রাফয়ে ইয়াদাইন' কর না? ইমামের পেছনে ফাতেহা কেন পড় না? ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর কেন দাও, বারো তাকবীর কেন দাও না? তোমাদের নামায হয় না। অন্তত সুন্নত মোতাবেক হয় না!!

মোটকথা, এ ধরনের কিছু মাসআলাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত ঘটানো হচ্ছে এবং নিশ্চিন্তে ইবাদত-বন্দেগী করার স্থান-মসজিদগুলোকে তর্ক-বিতর্ক ও শোরগোলের আখড়া বানানো হচ্ছে। অথচ উভয় দিকেই দলীল-প্রমাণ রয়েছে এবং সাহাবী-তাবেয়ী যুগ থেকেই এই মতপার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। আপনি যদি 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা'য় এ বিষয়গুলো অধ্যয়ন করেন এবং সালাফের যে ফকীহগণের মধ্যে এসব বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কও তুলনা করেন তাহলে দেখবেন, তাঁরা সর্বদা তাঁদের মতপার্থক্যকে ওই বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এর কারণে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাদ-বিসংবাদের সূচনা করেননি। তাঁদের মতপার্থক্য উম্মাহর ঐক্যে বিন্দুমাত্র চিড় ধরায়নি। এসব শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে একে অপরকে গোমরাহ, বেদআতী বা ফাসেক আখ্যা দেওয়ার প্রশ্নই সে আমলে ছিল না।

অথচ আজকাল কিছু মানুষ এগুলোরই ভিত্তিতে এমনকি কাফের পর্যন্তও বলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। অন্যদিকে প্রথমোক্ত ধরনের মতভেদ, যা প্রকৃতপক্ষে 'মতভিন্নতা'ই নয়, সত্য ও বাস্তবতার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, এ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কোন নমনীয়তা ছিল না। এ কথা ঠিক যে, ইসলামে কট্টর কাফেরেরও নির্ধারিত হক্ক ও অধিকার রয়েছে এবং চরম বেদআতীরও হক ও অধিকার রয়েছে। আল্লাহর মাখলুক হিসাবে এবং মানবজাতির সদস্য হিসাবে ইসলামে যার যে হক ও অধিকার প্রাপ্য তা স্বস্থানে স্বীকৃত এবং এ হকগুলো তাঁরা আদায়ও করতেন; কিন্তু উদারতার নামে কখনো তারা শিথিলতা অবলম্বন করতেন না।

আকীদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত বিষয়াদিতে অবিচলতা তাঁদের নিদর্শন ছিল। এসব বিষয়ে যারা বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং সাধারণ মানুষকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে ওদের সম্পর্কে তাঁরা প্রকাশ্য-প্রতিবাদ করতেন। বেদআতকে বেদআত, বাতিলকে বাতিল এবং কুফরকে স্পষ্টভাবে কুফরই বলতেন। এ বিষয়ে কোন ধরনের শৈথিল্যের প্রবণতা তাঁদের মধ্যে ছিল না।

সালাফের এই নীতি পুনরুজ্জীবিত করাই হল সময়ের দাবি। স্বীকৃত মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা আর অস্বীকৃত মতানৈক্যগুলোর উপর দ্বিধাহীনভাবে প্রতিবাদ জানানো আমাদের সকলের কর্তব্য।

(৬) 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে একবার নজর বুলিয়ে গেলেও যে সুফল আমাদের উপরোক্ত বন্ধুরা (যারা শাখাগত দলীলসমৃদ্ধ ও সাহাবী-তাবেয়ীযুগ থেকে বিদ্যমান মত-ভিন্নতাকে সহ্য করতে পারেন না) লাভ করতে পারবেন তা এই যে, তাদের

একটি ভুল ধারণা দূর হবে। তারা মনে করে থাকেন, সকল সহীহ হাদীসই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসে গেছে। এর বাইরে হয় কোন সহীহ হাদীসই নেই বা থাকলেও সেগুলো এই দুই গ্রন্থের হাদীসের মোকাবেলায় কিছুই নয়। নাউযুবিল্লাহ!

যদি আমাদের এই বন্ধুরা মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে হিব্বান, শরহু মুশকিলিল আছার প্রভৃতি কিতাব অধ্যয়ন করেন তাহলে দেখবেন যে, শত শত নয়, হাজার হাজার হাদীস ও আছার এই কিতাবগুলোতে রয়েছে, যা রেওয়ায়াতের বিচারে একদম সহীহ এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেরই রেওয়ায়াতের সমপর্যায়ের এবং একই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। উপরোক্ত কিতাবগুলোর মধ্যে শেষোক্ত তিন কিতাবের টীকায় ওই হাদীসগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে এবং লেখা হয়েছে—

صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط الشيخين.

'মুসান্নাফ' অধ্যয়নকালে ওই বন্ধুরা দেখতে পাবেন যে, মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোতে যেমন উভয় দিকেই হাদীস রয়েছে, তেমনি ওই হাদীসগুলোর উপর আমলকারীদের মধ্যে উভয় দিকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং হাদীস ও ফিকহের বড় বড় ইমামও রয়েছেন। এ অবস্থায় আপনি কোন একটি মত অবলম্বন করতে পারেন; কিন্তু অন্য মতকে বাতিল ও ভ্রান্ত আখ্যা কি দিতে পারেন? তেমনি কোন এক মত অনুযায়ী যারা আমল করছেন তারা তো সালাফ থেকে অনুসৃত হাদীস মোতাবেকই আমল করছেন এবং সুন্নাহ মোতাবেকই চলছেন, তাহলে তাদের মধ্যে অপর মত প্রচার করার কী অর্থ? সালাফ কি এমন করেছেন?[১]

١- وتأمل جيدا، أن هناك حديثين أحدهما في رفع اليدين في الركوع، وآخر في ترك رفع اليدين في غير الافتتاح، عمل بأحدهما عبد الله بن عمر وجماعة، وعمل بالآخر أبوه عمر بن الخطاب وجماعة، ثم لما ألف البخاري صحيحه أدخل فيه الحديث الأول، ولم يدخل فيه الحديث الثاني، فهل تقول أن حديث ترك الرفع ضعيف، أم مرجوح، أم أن ترك الرفع خلاف السنة؟ إذا جهلت عمر ومن معه، ولا بأس عليك أن ترجح الرفع، ولكن إذا رجحته لأن حديثه دخل في صحيح البخاري، فقد أعلنت أن الرفع كان مرجوحا قبل ذلك، فالاختلاف القديم لا ينبغي أن تذكر فيها وجوه الترجيح الحادثة، سواء ذكرت في الأرجحية أم في المرجوحية.

(৭) ফিকহে হানাফী পাঠকারী এবং এই ফিকহের নির্দেশনা অনুযায়ী কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহর উপর আমলকারী তালেবে ইলমরা 'মুসান্নাফ' অধ্যয়ন করে নিজেদের ফিকহ সম্পর্কে আরো অধিক আস্থা ও প্রশান্তি অর্জন করতে পারেন। রদ্দুল মুহতার ও আলমগীরীর শত শত মাসআলার দলীল তারা শুধু এই এক কিতাব থেকে আহরণ করতে পারবেন এবং স্বচক্ষে দেখতে পারবেন যে, ফিকহে হানাফী ফিকহুস সালাফের কত নিকটবর্তী!

'মুসান্নাফে'র বিংশ খণ্ডে যদি 'কিতাবুর রাদ্দি আলা আবী হানীফা' নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তারা নিজেরাই এই 'মুসান্নাফ' গ্রন্থের সাহায্যে ওই অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশের পর্যালোচনাও করতে পারবেন। পাশাপাশি ফিকহে হানাফীর বুনিয়াদ সম্পর্কেও তাদের আস্থা আরো শক্তিশালী হবে। এরই সাথে তারা যদি আল্লামা মুহাম্মদ যাহেদ কাওছারী (রহ. ১৩৭১ হি.) প্রণীত 'আননুকাতুত তরীফা ফিত্ তাহাদ্দুছি আন রুদূদি ইবনে আবী শাইবা আলা আবী হানীফা' এবং ড. আবদুল মজীদ মাহমূদ শাফেয়ী প্রণীত 'আলইত্তেজাহাতুল ফিকহিয়্যা ইনদা আসহাবিল হাদীছ ফিল কারনিছ ছালিছ' থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন, তবে তো নুরুন 'আলা নূর-একদম সোনায় সোহাগা। এ বিষয়ে বিংশ খণ্ডের সূচনায় মুহাক্কিকের ভূমিকাও অত্যন্ত সারগর্ভ ও চমৎকার।

(৮) 'মুসান্নাফে' যেমন 'ফিকহে মুজাররাদ'-এর স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি 'ফিকহে মুকারান'-এরও মৌলিক সূত্র বিদ্যমান রয়েছে। 'ফিকহে মুকারান' বলতে ফিকহের ওই সব প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি বোঝায় যেগুলোতে প্রত্যেক মাসআলা সকল মাযহাব ও দলীলপ্রমাণসহ আলোচিত হয় এবং বিভিন্ন মতামতের দলীল সম্পর্কেও পর্যালোচনা করা হয়। শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেছেন, 'ফিকহে মুকারান'-এর প্রাচীন নাম 'ফিকহুল খিলাফিল 'আলী' ছিল এবং 'মুসান্নাফ' হাদীস ও সুন্নাহর কিতাব হওয়ার পাশাপাশি একটি পর্যায় পর্যন্ত এই শাস্ত্রেরও কিতাব।

বর্তমানে 'ফিকহে মুকারান' শব্দের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে 'ফিকহে মুতাওয়ারাছ' (স্বীকৃত ও অনুসৃত ফিকহ) অস্বীকার করার ফেতনা শুরু হয়েছে, 'আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ' নামধারী একটি শ্রেণী এ ফেতনার ধারক ও বাহক। শরীয়ত অস্বীকারকারী লোকেরা সেখান থেকে প্রচুর সহযোগিতা পেয়ে থাকে। এজন্য এরা তাদেরই উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

ফিকহে মুকারানের নামে দ্বিতীয় ফেতনা 'তাওহীদুল মাযাহিব' (এক মাযহাব প্রণয়ন)-এর প্রবক্তারা শুরু করেছে, যা প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম মাযহাব প্রতিষ্ঠার

সমার্থক। বলাবাহুল্য, ইসলামের সর্বোত্তম যুগে ইমামদের মাধ্যমে সংকলিত এবং প্রতি যুগে মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক অনুসৃত মাযহাবগুলোর তুলনায় এর কোনই মূল্য নেই। এরপরও এ বিষয়ে অনমনীয়তা প্রদর্শন করা এবং এমনভাবে এগুলোর দিকে দাওয়াত দেওয়া যেন লোকদেরকে গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী হতে পারে?

প্রায় তিন বছর আগে সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী (রহ. ১৩০২ হি.-১৩৭৩ হি.)-এর পুত্র মাওলানা সালমান নাদভী (মাওলানা সালমান হুসায়নী নাদভী নন) আগমন করেছিলেন। মাদরাসা শরফুদ্দীন আবু তাওআমা সোনারগাঁও-এ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি নিজের কথা শোনালেন যে, "আমি জওয়ান বয়সে ড. হামীদুল্লাহ ছাহেবের সামনে অত্যন্ত জোশের সাথে এই প্রস্তাব পেশ করি যে, প্রত্যেক মাযহাব থেকে বিশুদ্ধতম মত চয়ন করে নতুন ফিকহ সংকলন করা কি উচিত নয়? এর মাধ্যমে সকল মতভেদ দূর হতে পারে?" এর উত্তরে তিনি শুধু একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন– 'পঞ্চম মাযহাবের সূত্রপাত ঘটবে।'

যৌক্তিক কথা ছিল। শোনার সাথে সাথে বুঝে এসেছে। আমি বললাম, 'বুঝতে পেরেছি। আর বলার প্রয়োজন নেই।'

মূল বিষয় এই যে, বিশুদ্ধতম মত নির্বাচন করার অধিকার আপনার যেমন রয়েছে তেমনি অন্যেরও রয়েছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, স্বীকৃত ও সুপ্রাচীন মতভেদগুলোর মধ্যে (আহলে হকের ফিকহের মাঝে বিদ্যমান মতভেদগুলো এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।) তুলনাকারীদের মধ্যেও অগ্রগণ্য মত নির্ধারণে মতভেদ হয়ে যায়। অতএব এ ধরনের প্রয়াস অর্থহীন। এখানে করণীয় হল, ইমাম ইবনে আবী শাইবা ও তাঁরও অগ্রজ ইমামদের আদর্শ গ্রহণ করে দ্বন্দ্ব-বিভেদ দূর করার ক্ষেত্রে কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা। সালাফের মধ্যে ইখতেলাফ ছিল, কিন্তু ঐক্যও ছিল। তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ ছিল না। শাখাগত বিষয়ে মতভিন্নতা থাকলেও নিজেদের ঐক্য ও হৃদ্যতা তাঁরা সংরক্ষণ করতেন। ঐক্যের মধ্যে কোন রকম ফাটল সৃষ্টি হতে দিতেন না। শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে একে অপরকে গোমরাহ, বেদআতী আখ্যা দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, হিংসা-বিদ্বেষ থেকেও তাঁরা নিজেদের দূরে রাখতেন। আজ এ ধারাই পুনরায় জীবিত করা প্রয়োজন, 'ফিকহে মুকারান'-এর নাম ব্যবহার করে স্বীকৃত মতভিন্নতা দূর করার প্রয়াস অর্থহীন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 'ফিকহে মুতাওয়ারাছ'কে অর্থাৎ যে ফিকহ উম্মাহর মাঝে স্বীকৃত ও অনুসৃত, তাকে সংরক্ষণ করার জন্য 'স্বেচ্ছাচারিতা' ও

'অপ্রয়োজনীয় আবদ্ধতা' উভয় ব্যাধি থেকেই একে মুক্ত রাখতে হবে। 'ফিকহে মুকারান' অর্থাৎ দলীলভিত্তিক ও তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের কাজ অব্যাহত থাকবে, তবে তা ফলদায়ক তখনই হবে যদি এই কাজ উসূল মোতাবেক হয়। আর এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় উসূল এই যে, 'ফিকহে মুকারান'কে গবেষণার বিষয় হিসাবে গ্রহণকারীকে 'উসূলে ফিকহ', কাওয়ায়েদে ফিকহ', মাকাসিদে শরীয়ত, আসবাবুল ইখতিলাফ ও আদাবুল ইখতিলাফ বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। পাশাপাশি উলূমুল হাদীসের বুনিয়াদি চার বিষয়েও পারদর্শিতা থাকতে হবে। এ ছাড়া তাকওয়া-পরহেযগারী, বুদ্ধিমত্তা ও সহনশীলতা এবং স্বভাবগত প্রতিভার অপরিহার্যতা তো রয়েছেই।

'ফিকহে মুকারান'-শব্দটি যারা আজকাল ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে যেসব বড় বড় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে তুলনামূলক ক্ষুদ্র বিষয়টি হল (যদিও তা স্বস্থানে অনেক বড় ত্রুটি) তারা মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্তগুলো তুলনা করে থাকে। অথচ এই তুলনার অধিকাংশ তথ্য ও উপকরণে এরা সম্পূর্ণভাবে অন্যের মুকাল্লিদ-অনুসারী। আর এই ধারকৃত ইলমকেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা আত্মস্থ করতেও তারা সক্ষম হয়ে ওঠেন না) ইজতিহাদী ইলমের চেয়েও উঁচু ও তর্কাতীত মনে করেন বলে অনুমিত হয়।

এই ইলমের চর্চা ব্যাপক হওয়া দরকার, তবে অবশ্যই উসূল ও আদাব, নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী। মনে রাখতে হবে যে, 'আবদ্ধতা' যদি নিন্দার বিষয় হয়, তবে 'স্বেচ্ছাচারিতা' হল গর্হিত।

উঁচু শ্রেণীর তালেবে ইলমের মনে রাখা উচিত যে, ফিকহে ইসলামী সম্পর্কে শরীয়তবিরোধী ও মুসলমানদের মধ্যে সংশয় বিস্তারকারী লোকদের প্রোপাগান্ডা থেকে ফিকহে ইসলামীকে রক্ষা করার প্রয়োজনেও বিশুদ্ধ পন্থায় 'ফিকহে মুকারান' চর্চা করার প্রয়োজন রয়েছে। আর এজন্য প্রথমে, আমাদের পূর্বসূরি আকাবিরের বক্তব্য অনুযায়ী, উচ্চমার্গীয় ইলম ও ফন আত্মস্থ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এরপর ইমাম আবদুর রাযযাক ও ইবনে আবী শাইবার দুই 'মুসান্নাফ', ইবনে আবদিল বার (রহ.)-এর 'আততামহীদ' ও 'আলইসতিযকার', তহাবী-এর 'শরহু মাআনিল আছার' ও 'শরহু মুশকিলিল আছার', বায়হাকী (রহ.)-এর 'আসসুনানুল কুবরা', ইবনে কুদামা (রহ.)-এর 'আলমুগনী', শাহ ছাহেব (রহ.) -এর রচনাবলি, বিশেষত 'ফয়যুল বারী' ও বিন্নুরী (রহ.)-এর 'মাআরিফুস সুনান' ইত্যাদি এমন একজন ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে নিখুঁতভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, যিনি একই সাথে উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীস ও উলূমুল ফিকহে প্রাজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞতার অধিকারী।

এ অধ্যয়নের সূচনা ইবনে রুশদের 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' দ্বারা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তালেবে ইলমদের সামনে শাহ ছাহেব (রহ.)-এর এই নসীহত বিদ্যমান থাকা উচিত–

يجب على الفقيه أن يشتغل بالقرآن والحديث، ليكونا بمرأي عينيه، ومن لم يشتغل بالحديث فإنه لا يحصل له علم بكثير من المسائل التي تتعرض لها الأحاديث، ولم يتعرض لها الفقهاء، وذلك لعدم كونها من موضوع فنهم. وقد مر مني التنبيه أن التقليد لا يكون مستحكما إلا بعد النظر في الحديث، وكذا الحديث لا يستقر مرادُه إلا بعد النظر في أقوال السلف، فمن أراد أن يحصل له علم السلف فليجمع بين الأمرين.
(من فيض الباري ج٢ص ٤٥١)

আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দান করেন তাহলে একটি বিস্তারিত নিবন্ধে শাহ ছাহেবের এই নসীহতের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

তাহকীকের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাহকীকে মগ্ন না হয়ে কোন বড় মুহাক্কিকের তাকলীদ করতে দোষের কিছু নেই। মুসান্নাফে ইবনে শাইবা এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, সালাফের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। এরপরও কিছু লোক এর নিন্দা করে থাকে। প্রশ্ন এই যে, বিভিন্ন অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনকারী লোকেরা এই অসম্পূর্ণ ইলমের ভিত্তিতেই যদি 'ফিকহে মুকারান' চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং তাহকীক-গবেষণায় নেমে পড়ে, তবে কি তা খুব উত্তম বিষয় হবে? তখন কি وتكلم الرويبضة এর বাস্তব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হবে না? অথচ এ বিষয়ে তাদেরকে আপত্তি করতে দেখা যায় না।

আরবের এক আলেম আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ড. ইউসুফ কারযাভী সাহেবের ব্যাপারে তোমার মত কী? আমি বলেছিলাম, তাঁর ইলমী মকাম তো তার রচিত কিতাবাদি থেকেই বোঝা যায়, তবে জ্ঞান-গবেষণার বিষয়ে সর্বদা তিনি 'আবদ্ধতা'র নিন্দা করে থাকেন এবং এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে তার মধ্যে একটু বেশি পরিমাণে 'উত্তাপ' সৃষ্টি হয়ে যায়; কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার যে ফেতনা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে, এ বিষয়ে তাঁকে আজ পর্যন্ত কিছুই লিখতে দেখিনি; যেন এটা কোন ফেতনাই নয়। অথচ এটা আবদ্ধতার চেয়েও অধিক মারাত্মক ফেতনা।

পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন আলকাউসারের সূচনা-সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ 'গবেষণা : অধিকার ও নীতিমালা' অবশ্যই মুতালাআ করেন।

(৯) 'মুসান্নাফ শুধু হাদীস ও আছার-এর গ্রন্থই নয়, এতে সীরাতে নববী এবং ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসেরও প্রচুর তথ্য সংকলিত হয়েছে।

(১০) ইতোপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ গ্রন্থটি হাদীসগ্রন্থ হওয়ার পাশাপাশি ফিকহুস সালাফেরও উত্তম সংকলন। কেউ যদি দৃষ্টির সাথে অন্তর্দৃষ্টি যোগ করে এ কিতাব অধ্যয়ন করে তাহলে এখান থেকে ব্যাপক অর্থেই ফিকহুস সালাফের অনেক বড় সংগ্রহ হাসিল করতে পারবে। এ গ্রন্থে ফত্ওয়া বিভাগের তালেবে ইলমগণ ফকীহ হওয়া ও ফকীহ বানানো, ফত্ওয়া প্রার্থনা ও ফত্ওয়া প্রদান, রেওয়ায়াত ও দেরায়াত, মাসায়েল আহরণ ও উদঘাটন–এসব বিষয়ে সালাফে সালেহীনের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

উলূমুল হাদীসের তালেবে ইলমগণ এ গ্রন্থ থেকে হাদীস গ্রহণের আদব-কায়েদা, হাদীস বর্ণনাকারীর নীতি ও চরিত্র এবং রেওয়ায়াতের পরীক্ষা ও পর্যালোচনা, হাদীস শরীফের সঠিক মর্ম অনুধাবন ও ইলমু আসমাইর রিজাল বিষয়ক অনেক মৌলিক নীতি ও প্রয়োজনীয় বিষয় আহরণ করতে পারবেন।

আর সব ধরনের তালেবে ইলম এ গ্রন্থ থেকে আদাবুল মুআশারা, আখলাকে জাহেরা ও আখলাকে বাতেনা অর্থাৎ সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনের ইসলামী পদ্ধতি, উত্তম আচার-ব্যবহার এবং অন্তর্জগতের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি সম্পর্কে সালাফের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অনেক দৃষ্টান্ত আহরণ করতে পারেন, যা আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে একান্ত সম্পর্কযুক্ত।

এই বিষয়গুলোর প্রয়োজন ইলমে দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদেরই সবচেয়ে বেশি, অথচ তাঁদের মধ্যেই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

(১১) সীরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সীরাতে খুলাফায়ে রাশেদীন, আছারে সাহাবা এবং নবী ও সাহাবা-যুগের কর্মধারা, যা এই কিতাবে সংকলিত হয়েছে, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে দ্বীনের প্রকৃত চিন্তাধারা এবং দ্বীনের স্বভাব ও প্রকৃতি। দ্বীনের সঠিক প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য এগুলো অনুধাবন করা অপরিহার্য। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে এ সব বিষয়ে ধারণা অর্জন করা তুলনামূলক সহজ।

(১২) তালেবে ইলমগণ এ গ্রন্থের মুহাক্কিক শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ-এর

টীকা ও ভূমিকাগুলো থেকে অনেক কিছু অর্জন করতে পারেন। বিশেষত উলূমুল হাদীসের তালেবে ইলমগণ তাঁর টীকাগুলো থেকে 'ইলমুত তাখরীজ', 'ইলমুল জারহি ওয়াত তাদীল', 'ইলমু ইলালিল হাদীস', 'ইলমুল ইসনাদ' প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শাণিতকারী বহু তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ করতে পারেন।

উপরের শ্রেণীর তালেবে ইলমগণ এই টীকাগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে তাহকীক-গবেষণার রুচি তৈরি করতে পারেন।

তাছাড়া কিছু 'শায' বক্তব্য এবং 'যয়ীফ' বা 'মুনকার' রেওয়ায়াত, যা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, সেগুলোও যেহেতু টীকায় চিহ্নিত করা হয়েছে, তাই এ বিষয়ে সবাই এ টীকাগুলোর সহযোগিতা পেতে পারেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হিম্মতওয়ালা তালেবে ইলমরা এই কিতাবের তাহকীক-তালীক থেকে অর্জন করতে পারেন, যদি তারা ইচ্ছা করেন, তা হল 'তাহকীকুত তুরাছ' শাস্ত্র। আলকাউসার রজব'২৮ = আগস্ট'০৭ সংখ্যায় 'তাহকীকুত তুরাছ' বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। এই শাস্ত্রের সাথে যাদের পূর্বপরিচিতি নেই তারা ওই আলোচনা থেকে এ বিষয়ের গুরুত্ব ও নাযুকতা এবং এর সুকঠিনতা অনুমান করতে পারেন।

'মুসান্নাফে'র উপর শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ-এর এই কাজ তাহকীকুত তুরাছের উন্নত, উত্তম ও মনোরম দৃষ্টান্ত। যদি কেউ একে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে তবে এ শাস্ত্রে প্রজ্ঞা হাসিল করা তার পক্ষে সম্ভব হবে।

পাঠকদের কাছে দুআর দরখাস্ত যে, মারকাযুদ দাওয়াহ-এর 'তাহকীকুত তুরাছ' বিভাগের জন্য আল্লাহ তাআলা যেন প্রশস্ত জায়গা দান করেন এবং জরুরি ব্যয় ও উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন; যাতে এ বিভাগের কাজ গতিশীল করা সম্ভব হয়।

তালেবে ইলমদের কাছে আবেদন

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ. ১৩৩৬ হি.-১৪১৭ হি.) বলতেন-

الكتاب إذا لم تقرأه كله لم يعطك سره

"কোন গ্রন্থ যে পর্যন্ত আদ্যোপান্ত না পড়বে সে তোমাকে তার মনের কথা বলবে না।"

আজকাল আদ্যোপান্ত অধ্যয়নের রীতি প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছে। হযরত

মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী (রহ. ১৩৩৩ হি.-১৪২০ হি.)কে দেখেছি, তিনি অনেক বড় বড় গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন এবং তথ্য নোট করতেন। অন্তত প্রয়োজনীয় তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করে ফেলতেন। আরবের কোন কোন নওজোয়ানকে পঞ্চাশ-ষাট খণ্ডের সুবৃহৎ গ্রন্থও আদ্যোপান্ত পাঠ করতে দেখেছি।

যদি প্রয়োজনীয় সকল গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাঠ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হয় তবে কি অধিক গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ-দশটি গ্রন্থ এভাবে পাঠ করা সম্ভব নয়? কত ভাল হত যদি আমাদের সকল তালেবে ইলম, অন্তত কিছু সাহসী তালেবে ইলম, এই হিম্মত করত যে, প্রতিদিন অল্প অল্প অধ্যয়নের মাধ্যমে একুশ খণ্ডের এই 'মুসান্নাফ' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলবে। নিঃসন্দেহে এটা হত তাদের ইলমী জীবনের অনেক বড় পাথেয়, নিজের অজান্তেই চিন্তাগত, চরিত্রগত ও কর্মগত এত উন্নতি তাদের হত যা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। আর কেউ কি আছে হিম্মতকারী?!

কিছু ফায়েদা

সবশেষে কিতাব থেকে কিছু দুআ ও জ্ঞানগর্ভ বাণী উল্লেখ করে দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ مِمَّا أُحِبُّ وَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ، وَمَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ. (ج١٥ ص ٣٠٢)

বান্দার জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয় এই যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে তার পছন্দনীয় বস্তু লাভ করবে, কিন্তু তা ব্যবহার করবে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে বা পছন্দের বিষয়টি লাভ করল না বলে এত পেরেশান হয়ে যাবে যে, জরুরি ইবাদত ও কাজকর্মেও বিঘ্ন ঘটতে থাকবে।

উপরোক্ত দুআয় উল্লেখিত দুই বিষয় থেকেই নিরাপদ থাকার উপাদান রয়েছে। এই দুআয় প্রার্থনা করা হয়েছে, ইয়া আল্লাহ, আমাকে আমার পছন্দনীয় বস্তু দান করুন, তবে এর মাধ্যমে আপনার পছন্দনীয় কাজ করার শক্তি দান করুন। আর যদি আমার পছন্দের কোন বিষয় আপনি আমাকে দান না করেন, তাহলে এটা আমার জন্য নিশ্চিন্ততার কারণ বানিয়ে দিন। যাতে আমি একাগ্রতার সাথে আপনার ইবাদত করতে পারি।

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيْرٍ، وَّارْزُقْنِيْ سَهَرًا فِيْ طَاعَتِكَ (ج١٥ ص٣٠٣)

"ইয়া আল্লাহ, সামান্য ঘুম দ্বারাই আমার প্রয়োজন পূরণ করুন এবং আপনার আদেশ পালনে রাতজাগরণের তাওফীক দিন।"

সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা রক্ষা করার জন্য ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। তবে আল্লাহ যদি চান তাহলে তিন চার ঘণ্টার ঘুমেও আট ঘণ্টার সুফল দান করতে পারেন। যাতে তাহাজ্জুদ ও তেলাওয়াত এবং অধিক মুতালাআর সুযোগ পাওয়া যায়। বুযুর্গ তাবেয়ী হাম্মাম ইবনুল হারিছ ও মিযাদ এই দুআ করতেন এবং নামকে ওয়াস্তে সামান্য ঘুমিয়ে রাতভর তাহাজ্জুদ পড়তেন।

عن هلال بن يساف قال: لَيْسَ بِأَسَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ وَحْدَهُ.

"মুমিননের জন্য নির্জনতার চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় আর নেই।"

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার আলোচনায় বারবার মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক-এর কথা এসেছে। ইচ্ছা হচ্ছে ওখান থেকেও একটি কথা উল্লেখ করি।

عن صالح بن كيسان، قال: اجتمعت أنا وابن شهاب (الزهري) ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: نكتب أيضا ما جاء عن أصحابه، فقلت: لا، فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت.

"ছালেহ ইবনে কায়সান বলেন, 'ইলম অন্বেষণে আমি ও ইবনে শিহাব (যুহরী) একত্র হলাম। আমরা 'সুনান' লিপিবদ্ধ করতে একমত হলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্ম, যা কিছু শ্রবণ করার সুযোগ হল, লিপিবদ্ধ করলাম। এরপর আলোচনা হল যে, সাহাবীদের বাণী ও কর্ম লিপিবদ্ধ করব কি না। আমি বললাম, 'না, এটা সুন্নাহ নয়।' আর তিনি বললেন 'কেন নয়, এগুলোও সুন্নাহ।' তো তিনি লিখলেন, আমি লিখলাম না। ফলে তিনি সফল হলেন আর আমি বঞ্চিত রইলাম।" –মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ১১/২৫৮; শরহুস সুন্নাহ, বগভী ১/২৯৬; আছারুল হাদীস, ড. খালিদ মাহমূদ ১/১০৯

ছালেহ ইবনে কায়সান যে চিন্তার কারণে পরে দুঃখ করেছেন, সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে আজ জামেয়াসমূহের বহু ফাযেল এই একই চিন্তাধারায় প্রভাবিত। অথচ খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহকে সুন্নাহ বলা হাদীস থেকেই প্রমাণিত।

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে সংকলিত অধিকাংশ হাদীসগ্রন্থে; বরং পরবর্তী

যুগেরও বহু সংকলনে হাদীস শরীফের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সাহাবায়ে কেরামের বাণী, ফত্ওয়া, আমল ও তাবেয়ীগণের ফত্ওয়া সংকলিত হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত কারণও এটাই।

উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.) তাঁর তাজদীদী কিতাব– 'ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস' (পৃষ্ঠা ৪৬)এ লেখেন, "এ কিতাবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এ কিতাবে হাদীসে নববীর পাশাপাশি সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বাণী ও ফত্ওয়া সংকলিত হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় সুফল এই যে, প্রত্যেক হাদীসের সাথে এটাও জানা হয়ে যায় যে, সালাফের কাছে এই বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা কীরূপ ছিল এবং সাহাবী-যুগ থেকে এই রেওয়ায়াত মোতাবেক আমল হয়েছে কি না। এটা এই গ্রন্থের এমন এক বৈশিষ্ট্য, যে বৈশিষ্ট্যে (এরূপ বিশদ ও বিস্তৃত আকারে) তার কোন নযীর নেই। (মুসান্নাফে বাকী ইবনে মাখলাদ-এর বিষয় ভিন্ন; কেননা বর্তমানে তা নিখোঁজ পাণ্ডুলিপির তালিকাভুক্ত) আর এ জন্যই এ গ্রন্থ ফকীহ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সর্বদা সমাদৃত ছিল। হাদীস ও ফিকহের যেসব ব্যাখ্যাগ্রন্থে বিধানবিষয়ক হাদীস সম্পর্কে আলোচনা থাকে, সেগুলোর মধ্যে এমন গ্রন্থ পাওয়া দুষ্কর হবে, যাতে এই কিতাবের উদ্ধৃতি এবং এ কিতাবের হাদীস সম্পর্কে আলোচনা নেই।"

এ কিতাবের প্রথম যে বৈশিষ্ট্যের কথা হযরত উল্লেখ করেছেন তা তালেবে ইলমগণ তাঁর কিতাব 'ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস' পৃষ্ঠা ৪৬-এ পড়ে নিতে পারেন। #

سبحن ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

[জুন '০৮ঈ.]

তিনটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মুদ্রণ

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)এর মাসানীদ ও মানাকিবের কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বর্তমান সংখ্যায় ইচ্ছা ছিল সালাতুল বিতর বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধটির উপর আলোচনা করব, কিন্তু এবার হজ্বের সফরে আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে যে নেয়ামত দান করেছেন সাথীদের নিবেদন, আলকাউসারের পাঠকদেরকেও তাতে শরীক করা হোক। তাই বর্তমান সংখ্যায় এ বিষয়েই কিছু আরয করি।

এই লেখার যে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে তার উপর ইনশাআল্লাহ মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর দারুত তাসনীফের কোন সাথী লিখবেন। আমি কয়েকটি বিক্ষিপ্ত কথা আরয করেই শেষ করব- (১) হজ্বের মূল ফায়েদা তো তাওহীদ ও ইত্তেহাদের জযবা নতুন করে আহরণ করা তাওহীদের ইমাম সাইয়েদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ও সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ দর্শন করে এবং তাঁদের সম্মানিত আ'ল-আসহাব ও আল্লাহর নেক বান্দাদের ইখলাস ও কুরবানীর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ঈমানী কুওয়ত ও হিম্মত এবং কলবের পাকিযগী ও তহারাত হাসিল করা। শাআইরুল্লাহ ও মাশাইরে মুকাদ্দাসা তথা আল্লাহর ইবাদতের নিদর্শনাবলি ও পবিত্র স্থানসমূহের সম্মান ও তাজীমের বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের মধ্যে নূর ও নূরানিয়াত এবং তাকওয়া ও খাশিয়াত পয়দা করা। সর্বোপরি বারবার লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের অযীফা পাঠের মাধ্যমে ইহসান ও ইহতিসাব পয়দা করা; কিন্তু এই সব ফায়েদা ছাড়াও প্রত্যেক শ্রেণীর যিয়ারতকারীর উপযোগী আরো বহু ধরনের ফায়েদা হজ্বের দ্বারা হাসিল হয় বা হাসিল করা যায়। এই সকল কিছুই আল্লাহ তাআলার বাণী-ليشهدوا منافع لهم এর উমূম-ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। তালেবানে ইলমের উপযোগী একটি ফায়েদা হল, কোন আহলে ফিক্হ আলেম বা

ছাহেবে দিল বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া, কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে কোন ইলমী বিষয় জানতে পারা কিংবা কোন ভালো রিসালা বা কিতাবের সন্ধান পাওয়া ইত্যাদি।

সালাফের যুগে উলামা-তালাবার হজ্ব ও যিয়ারতের সফর, যেমন ইবাদতের সফর ছিল, তেমনি দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহসীলে ইলম, তালীম ও তারবিয়াতের সফর ছিল। এটি হজ্বের তারীখ, ইলমের ইতিহাস এবং আসমাউর রিজালের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ সংক্রান্ত বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলি যদি একত্র করা যায় তাহলে কয়েক খণ্ডের দীর্ঘ গ্রন্থ প্রস্তুত হতে পারে।

হজ্বের মুসাফিরদের মধ্যে যারা আহলে দিল মানুষ, তারা তো সর্বক্ষণ মূল ফায়েদার দিকেই দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখেন, এরপর অন্যান্য বিষয় আপসে আপ যতটুকু হাসিল হয় তাতেই আল্লাহর শোকর গোযারী করেন। কিন্তু আল্লাহ মাফ করুন, হজ্ব ও যিয়ারতের সফরে, যা শুধু আল্লাহর ফযল ও করমেই হয়েছে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইলমী ফায়েদা হাসিলও ছিল আমার একটি আলাদা কাজ। এবার তো অনেকটা পোখতা ইরাদাই ছিল যে, কোন কুতুবখানার ধারে কাছেও যাব না, কিন্তু এরপর ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে কয়েকটি কুতুবখানার যিয়ারত হয়েছে। পরে মনে হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলারই রহমতই আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ইয়া আল্লাহ! আমাদের যা কিছু দ্বীনী কাজ তা যেন নিছক স্বভাবের প্রেরণা থেকে না হয়; বরং দ্বীনী চেতনা থেকে শুধু তোমার রেযামন্দির জন্য হয়।

اللهم لا تجعلنا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم.

২. জামেয়া উম্মুল কুরা (আযীযিয়া শিমালিয়া)এর দিকে যেতে রাস্তার দুই পার্শ্বে আলমাকতাবাতুল মাক্কিয়াহ, মাকতাবা ইসমাঈল, মাকতাবাতুল ইমদাদিল ইলমী, মাকতাবাতুল আসাদী প্রভৃতি কুতুবখানা রয়েছে। রাস্তা থেকে জামেয়ার মাদখালের দিকে এলে ডান দিকে আলমাকতাবাতুল মাক্কিয়া এবং উল্টো দিকে অন্যান্য কুতুবখানা পড়বে। ফেরার সময় মাকতাবাতুল আসাদীকে ডানে রেখে রাস্তায় পৌছার পর ডান দিকে কিছু দূর গেলে মাকতাবাতুল আসাদীর বড় 'মা'রিয' পাওয়া যাবে। এগুলো ছাড়াও জামেয়া উম্মুল কুরার নিকটে আলমুছতাশফাত তিউনিসীর আশেপাশে দুটি বড় কুতুবখানা আছে–একটি মাকতাবাতুর রুশদ, যা একটি বড় তিজারতি কুতুবখানা। এর প্রধান কেন্দ্র সম্ভবত রিয়াদে, সৌদি আরবের বিভিন্ন জায়গায় এর অনেকগুলো শাখা আছে। দ্বিতীয় কুতুবখানাটি হচ্ছে মাকতাবাতুল

হারামিল মাক্কী। এটি একটি প্রাচীন ইলমী ও মারজিয়ী কুতুবখানা। আগে মিনায় ছিল, এখন জামেয়া উম্মুল কুরার কাছে অবস্থিত। এতে অনেক দুর্লভ পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

আগে মসজিদে হারামের কাছে কয়েকটি বড় বড় কুতুবখানা ছিল। যেমন বাবুল উমরার সামনে আলমাকতাবাতুল ইমদাদিয়া, বাবুল ফাতহের অদূরে আলমাকতাবাতুল মাক্কিয়ার একটি শাখাসহ আরো কয়েকটি কুতুবখানা। আরেকটু সামনে গেলে দারুল মিনহাজ, মাকতাবা মুস্তফা আলবায, এরপর আরো বড় বড় কুতুবখানা ছিল। এখন হরমের তৃতীয় সম্প্রসারণের কারণে এই এলাকায় বেশ রদ-বদল হচ্ছে। এজন্য এসব কুতুবখানা বা তার অধিকাংশই আর এখানে নেই। মুস্তফা নাযযারের কুতুবখানা এখন শারিয়ে মানসুরের ব্রিজের নিকট এবং আব্বাস আলবায-এর কুতুবখানা সুলাইমানিয়াতে অবস্থিত।

আলমাকতাবাতুল ইমদাদিয়া এখন মিসফালার শেষ প্রান্তে চলে গেছে। হরম থেকে শারিয়ে ইবরাহীম খলীল ধরে চললে যেখানে 'মাওয়াকিফে কুদাই'র ইশারা রয়েছে সেখান থেকে বামে মোড় নিলে এবং আলবেনকুল আরাবীকে ডানে রেখে কিছু দূর এগোলে ডান দিকে আলমাকতাবাতুল মাক্কিয়ার মিসফালা-শাখা এবং আরো কিছু দূর এগিয়ে ডানে গেলে মসজিদের সাথে আলমাকতাবাতুল ইমদাদিয়া অবস্থিত।

তবে নাদের ও দুষ্প্রাপ্য কিংবা সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের জন্য এবং শুধু গবেষকদের প্রয়োজন হয় এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক বিষয়ের উপর লিখিত বইপত্রের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা, জিদ্দা ও রিয়াদের বড় বড় কুতুবখানায় খুঁজতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈরুত ও কায়রোর কুতুবখানাগুলির সাথে যোগাযোগ করতে হয়। আর আনদারুন নাওয়াদির বা অতি দুর্লভ শ্রেণীর কিতাবপত্র তো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গ্রন্থমেলাতেও পাওয়া যায় না। সেসব কিতাবের জন্য এককথায় পুরো হিম্মত কুরবান করতে হয়, যদি মহব্বত ও খাঁটি তলব থাকে তাহলে অবশ্যই আল্লাহর নুসরত হয়ে থাকে। নাদের-দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের বিষয়টিও আমাদের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। যার উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ রচিত হতে পারে।

যাহোক, বিভিন্ন কুতুবখানা ও তার অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা এ নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল কত সহজে কত বড় নেয়ামত আল্লাহ তাআলা দান করেছেন তা বোঝানো। আমরা কয়েক সাথী আলমাকতাবাতুল মক্কিয়ায় দাখিল হলাম। সম্ভবত রিদওয়ান ছাহেব বললেন যে, এই যে দেখুন, 'ফাযায়েলু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী'। কিছুক্ষণ পর আরেক সাথী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ইবনে

খসরূ সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আ'যম-এর দিকে। আমি বললাম, ভাই! আর কিছু না, এই কিতাবগুলির জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এদিকে এনেছেন। ফিরে এসে 'ফাযায়েলু আবী হানীফা' কিতাবটির 'বাইনা ইয়াদাইল কিতাব' পড়ে জানতে পারলাম যে, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হারিছী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আ'যম'ও প্রকাশিত হয়েছে। এই দুটি কিতাবের প্রকাশক আলমাকতাবাতুল ইমদাদিয়ায় ফোন করলে জানানো হল, মিসফালাহতেই তৃতীয় কিতাবটিও পাওয়া যাবে, এর জন্য উম্মুল কুরায় সামনের মাকতাবাতুল ইমাদাদিল ইলমীতে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। ইশার পর দুই সাথী আলমাকতাবাতুল ইমদাদিয়া মিসফালায় পৌঁছলেন। আল্লাহর শোকর, তৃতীয় কিতাবটিও সেখানে পাওয়া গেল।

এই কিতাবগুলি পেয়ে আমার মনে পড়ে গেল হযরাতুল উস্তায আলহুজ্জাতুল কুদওয়াহ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী (রহ. ১৩৩৩হি.-১৪২০হি.) এবং লাজনাতুল ইহয়াইল মাআরিফিন নুমানিয়া হায়দারাবাদের আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী (রহ., ১৩১৩হি.-১৩৯৫হি.)-এর ইলমী যওকের কথা এবং আমাদের সংগৃহীত কিতাবগুলোর জন্য তাঁদের তড়প ও অস্থিরতার কথা। এমন এক হালত পয়দা হল যে, আর থাকতে পারলাম না। সাথীদের কাছে আরয করলাম, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)এর সীরাত, ফাযায়েল এবং জীবন ও বৈশিষ্ট্যের উপর লিখিত প্রাচীন কিতাবসমূহের মাঝে আবুল কাসেম হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ ও চতুর্থ শতকের প্রথম দিকের ব্যক্তিত্ব। তিনি ইমাম নাসাঈ (২১৫হি.-৩০৩হি.) আবু বিশ্‌র দুলাবী (২২৪হি.-৩১০হি.) ইমাম তহাবী (২৩৯হি.-৩২১হি.) প্রমুখ বিখ্যাত ইমামগণের শাগরিদ।

মানাকেব-ফাযায়েল বিষয়ে লেখক-সংকলকদের মাঝে তাসাহুল-শিথিলতার রেওয়াজ আছে, কিন্তু মুহাদ্দিস আবুল কাসেম সতর্ক ও মুহতাত এবং মুতকিন ও নিষ্ঠাবান মুহাদ্দিসগণের মতো সকল রেওয়ায়াত সনদসহ বর্ণনা করেছেন এবং মাশাআল্লাহ তাঁর সনদের অধিকাংশ রাবী মশহুর ও সুপরিচিত।

মোল্লা আবদুল কাদের আফগানী নামে একজন আলেম, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)এর নেগরানীতে কয়েকটি মাখতূতা থেকে এই কিতাবটি পরিষ্কার করে নকল করেছিলেন, যার একটি ফটোকপি হযরত নুমানী (রহ.)এর সংগ্রহে ছিল। হযরতের কাছেই প্রথম এই কিতাবটি দেখি। হযরতের ইজাযতে তার কয়েকটি ফটোকপিও করেছিলাম এবং একটি কপি দারুল উলূম করাচির কুতুবখানায়ও হাদিয়া দিয়েছিলাম। পরে শায়খ (রহ.)এর কাছে মূল নুসখা দেখার সৌভাগ্য হয়। শায়খ আমাকে বলেছিলেন, মোল্লা আবদুল কাদের একজন নেক

মানুষ। তার শ্রবণশক্তি মাযুর ছিল, তাই কানে শুনতেন না। কয়েকজন শায়খের সাথে যোগাযোগ করেছেন, কেউ তার খেদমত করেননি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি তাঁর খেদমতের চেষ্টা করেছি। যা কিছু বলার দরকার হত কাগজে লিখে দিতাম (অথচ শায়খের দৃষ্টিশক্তিও এত দুর্বল ছিল যে, লেখার জন্য তাঁকে মেশিনের সহায়তা নিতে হত।)

হামিলীনে ইলমের মাঝে যারা বিভিন্ন বিশিষ্টতার অধিকারী ছিলেন, আইম্মায়ে হাদীস, হুফফাযে হাদীস ও মুহাদ্দিসগণ তাঁদের বর্ণিত হাদীসগুলোকে, অন্য ভাষায় বললে তাঁদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহকে আলাদা কিতাবে সনদসহ সংকলন করেছেন। এই ধরনের সংকলনসমূহের একটি শিরোনাম হল 'মুসনাদ।' অবশ্য ওই সব কিতাবকেও মুসনাদ বলে, যেগুলোতে শুধু মারফূ হাদীস সাহাবীদের নামের ক্রম-অনুসারে সংকলন করা হয়েছে। যেমন মুসনাদে তয়ালিসী, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদসহ শত শত কিতাব। কিন্তু মুসনাদ শব্দটি প্রথমোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

যাহোক, ইমাম আবু হানীফা (রহ. ৮০হি.-১৫০হি.) ওইসব খোশ কিসমত ব্যক্তিদের অন্যতম, যাঁদের রেওয়ায়াতকৃত হাদীস ও আছারের অনেক মুসনাদ তৈরি হয়েছে। ওই মুসনাদ সংকলকদের মাঝে বড় বড় ইমাম ও হাফিযুল হাদীসও রয়েছেন।

দেড় দশকেরও আগে ইমাম আবু নুয়াইম আসপাহানী (৩৩০হি.) সংকলিত 'মুসনাদু আবী হানীফা' নযর আলফারাবী নামক একজন নওজোয়ান আলেমের তাহকীক-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এরপর আমাদের হযরতুল উসতাযের ছাহেবযাদা ড. আবদুশ শহীদ নুমানী –হাফিযাহুমাল্লাহু ওয়া রাআহুমা-এর তাহকীক-সম্পাদনায় দীর্ঘ ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনীসহ প্রকাশিত হয়েছে।

আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী (রহ.) 'তুরকিয়া'-এর প্রাচীন কুতুবখানাসমূহ থেকে কয়েকটি 'মুসনাদ'এর ফটোকপি বা নকল সংগ্রহ করেছিলেন; পরে হযরত নুমানী (রহ.)ও সম্ভবত তিনটি মুসনাদের কপি সংগ্রহ করেছিলেন। দুজনই এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলোর উপর কাজ করতে চেয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ কাজ তাঁদের উত্তরসূরী শায়খ লতীফুর রহমান আলবাহরাইজির মাধ্যমে করিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রথমে মুহাদ্দিস ইবনে খসরূ (৫২২হি.) সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম' দুই জিলদে, এরপর মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হারিছী (৩৪০হি.) সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম' দুই জিলদে, এরপর আবুল কাসেম ইবনে আবিল আওয়াম' এক জিলদে প্রকাশিত হয়। যার একটি বড়

অধ্যায়ে 'মুসনাদে আবী হানীফা' এবং বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে ইমাম ছাহেব (রহ.)এর বিভিন্ন সঙ্গীদের আলোচনাও রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা সম্পাদক, প্রকাশক এবং এ কাজের প্রেরণাদাতা শায়খ মালিক আব্দুল হাফীয মক্কী–হাফিযাহুল্লাহু ওয়া রাআহু– কে গোটা উম্মতের পক্ষ থেকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হারিছী সম্পর্কে হাফেয যাহাবী (রহ.)এর হওয়ালায় বলেছিলাম যে, তিনি এই 'মুসনাদ' অত্যন্ত পরিশ্রম করে সংকলন করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে তাঁর আরো দুটি কিতাব আছে–

(১) কাশফুল আছারিশ শারীফাহ ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা। এই কিতাবটিও অচিরেই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

ইতিহাসে আছে, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হারিছী যখন এই কিতাব 'ইমলা' করাতেন তখন হাজিরীনের সংখ্যা এত অধিক হত যে, চারশ 'মুস্তামলী'র প্রয়োজন হত– ولما أملي مناقب أبي حنيفة كان يستملي عليه أربع مئة مستمل
–আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, আব্দুল কাদের কুরাশী ২/৩৪৫

মুস্তামলীর কাজ অনেকটা নামাযের মুকাব্বিরের মতো। সে সময় যেহেতু লাউডস্পিকার ছিল না, তাই বড় মাজমায় শায়খের কথা সবার নিকটে পৌঁছানোর জন্য মুস্তামলীর প্রয়োজন হত।

২. ওয়াহামুত তবাকাতিয যালামাতি আবা হানীফা, শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ. ৭৪৮হি.) 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' কিতাবে আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হারিছীর আলোচনায় এই কিতাবের কথা বলেছেন।

শায়খ লতীফুর রহমানের তাহকীক ও সম্পাদনায় যে তিনটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত আকারে হাতে পেয়েছি তা নিঃসন্দেহে মোবারকবাদ ও শোকর গোযারীর হকদার। যদিও সম্পাদনার মান আরো উন্নত হতে পারত এবং বিভিন্ন দিক থেকে আরো কিছু কাজ হতে পারত, তবুও এখন মূল কিতাব সকল পাঠকের সামনে এসে গেছে এবং এর উপর আরো কাজ করা সহজ হয়ে গেছে।

'ফাযায়েলু আবী হানীফা' কিতাবটির উপর মারকাযুদ দাওয়ার দারুত তাসনীফেও কাজ হয়েছে। প্রথমে রেওয়ায়াতসমূহের মুফাসসাল তাখরীজ, অতপর রিজালের তারাজিম-পরিচিতির উপর কাজ হয়েছে। দারুত তাসনীফের নেগরানদের নযরে ছানী ও তাদকীকের পর তা প্রকাশ করা হত। হযরত মাওলানা

আবু তাহের মিসবাহ ছাহেব বিষয়টি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, ইনশাআল্লাহ এই কিতাবের প্রকাশনায় আমিও হিস্যা নেব। আলহামদুলিল্লাহ, কিতাবটি প্রকাশিত হয়ে গেছে। তবে এর উপর কাজ করার কোন প্রয়োজন নেই, এমন নয়। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয়বার পাঠকবৃন্দের কাছে মারকাযুদ দাওয়ার জন্য, বিশেষত এর দারুত তাসনীফের জন্য (যার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তাহকীকুত তুরাছ তথা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা বিভাগটিও অত্যন্ত জরুরি) দুআর আবেদন করছি। আল্লাহ তাআলা যেন জাহেরী ও বাতেনী সকল আসবাবের ব্যবস্থা করে দেন এবং দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের এমন কিছু মনোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ কাজের তাওফীক দান করেন, যা তাঁর দরবারে মকবুল হয়, তাঁর খাস বান্দাদের কাছে পছন্দনীয় হয় এবং গোটা উম্মতের জন্য মুফীদ ও উপকারী হয়। আমীন।

ভূমিকা হিসাবে কয়েকটি কথা আরয করলাম। প্রবন্ধের যে শিরোনাম আমি উল্লেখ করেছি ইনশাআল্লাহ দারুত তাসনীফের কোন সাথী ওই শিরোনামের হক আদায় করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করবেন ইনশাআল্লাহ।

দারুত তাসনীফ
[২৩-১২-১৪৩১হি. = ২৯-১১-২০১০ঈ.
সোমবার দিবাগত রাত ১টা ৩০মিনিট]

[ডিসেম্বর '১০ঈ.]

তারাবীর গুরুত্ব, ফযীলত ও রাকাআত-সংখ্যা

হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে পছন্দনীয় পন্থা হল ফরয ইবাদত ও ফরয দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। এরপরে সুন্নত ও নফলের স্থান। কিন্তু সুন্নত ও নফল দ্বারাও যে পর্যায়ের নৈকট্য লাভের কথা হাদীস শরীফে এসেছে তা-ও অন্তরকে জাগ্রত করার জন্য এবং মানবাত্মাকে ব্যকুল করার জন্য যথেষ্ট। যার সারাংশ হল, ইখলাসের সাথে সুন্নত ও নফলসমূহের প্রতি মনোযোগী হলে এর মাধ্যমে বান্দার রুচি ও স্বভাব দুরস্ত হয়। ফলে সর্বদা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়, তার প্রতিটি কাজকর্ম আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টির অনুগামী হয় এবং আল্লাহ তাকে এতটাই মহব্বত করতে থাকেন যে, তার ব্যাপারে ঘোষণা করে দেওয়া হয়–

مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

"কেউ যদি আমার কোন বন্ধুর সাথে দুশমনি করে তো আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি।" –সহীহ বুখারী ১১/৩৪০-৩৪১ (ফতহুল বারী) আলামুল হাদীস, খাত্তাবী ১/৭০১-৭০৩ মাজমূউল ফাতাওয়া ১৮/১২৯-১৩১

আর বাস্তব কথা হল, স্বভাব-রুচি দুরস্ত হওয়া এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ হওয়ার চেয়ে বান্দার জন্য বড় কোন কামিয়াবি হতে পারে না। কেননা এই জিনিস দুনিয়া-আখেরাতের সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

রমযানুল মুবারক খায়ের ও বরকতের বসন্তকাল; বরং এর বাস্তব অবস্থা শব্দ ও বাক্যের গাঁথুনিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। রমযানের দিনে আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে নির্দেশ জারি করে রোযা ফরয করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে রাতের 'কিয়াম' যাকে কিয়ামে রমযান বা তারাবীহ বলে, সুন্নত বানিয়েছেন। বিভিন্ন হেকমতের কারণে তারাবীর নামাযকে সুন্নতে

মুয়াক্কাদাই রাখা হয়েছে, ফরয করা হয়নি; কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, রমযানের খায়ের ও বরকত পূর্ণরূপে হাসিল করতে হলে তারাবীর বিষয়ে অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। এজন্য মুমিন বান্দা রমযান ও কুরআনের হক আদায় করার জন্য, রোযার উদ্দেশ্য– তাকওয়া হাসিলে সাহায্য পাওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত ও মাগফেরাতে সিক্ত হওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার মহব্বতের হক আদায় করার জন্য, সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তারাবীর পাগল হয়ে থাকে। বিনয় ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রাতসমূহে কিয়াম ও সেজদার মধ্যে কাটাতে থাকে এবং আল্লাহর সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতার মাধ্যমে মহব্বতের পিপাসা নিবারণ করে।

তারাবীর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সুন্নত ও নফলের সাধারণ নিয়মের বাইরে এতে ফরয নামাযের মত জামাআত বিধিবদ্ধ হয়েছে। তবে স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতের ব্যবস্থা এজন্যই করেননি যেন, তা উম্মতের উপর ফরয হয়ে না যায়। এ থেকে বোঝা যায়, তারাবীর গুরুত্ব সাধারণ নফল নামায থেকে অনেক বেশি।

মোটকথা, অনেক দলীলের ভিত্তিতে ফকীহগণ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, তারাবীর নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আজকাল কতিপয় মানুষ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করছে যে, তারাবীহ অন্যসব নফলের মতই। এটা না পড়লেও কোন গুনাহ নেই। এ ধরনের মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। রমযানের রাতগুলোকে মহাসুযোগ মনে করে গুরুত্বের সাথে তারাবীর নামাযে যত্নবান থাকুন এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে– যা সারা বছরের নামায– যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করুন।

তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা

এই ভূখণ্ডে ইংরেজের অশুভ অনুপ্রবেশের আগে এ বিষয়ে কিছু বলার বা লিখার প্রয়োজন হত না। কেননা গোটা ইসলামী দুনিয়ায়, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত, সাহাবা-তাবেয়ীনের স্বর্ণযুগ থেকে চলে আসা নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মসজিদে বিশ রাকাআত তারাবীহ ও বিতরের নামায পড়া হত।

কোন কোন মসজিদে কোন সময় বিশ রাকাআতের অধিকও পড়া হত; কিন্তু বিশ রাকাআতের কম তারাবীর নামায কোন মসজিদে হত এর কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না।

ইংরেজের অশুভ অনুপ্রবেশের পর থেকেই কিছু কিছু 'আত্মার রোগী' বা স্বল্পজ্ঞানী ও স্বল্প বুঝের ব্যক্তি সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে ইংরেজের খুঁটি মজবুত করার কাজ করে যাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে সর্বশীর্ষে ছিলেন আমাদের ওই সব বন্ধু যাদের মিশনের মৌলিক দুটি বিষয় এই ছিল–

১. ইসলামের স্বর্ণযুগ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনের যুগ থেকে যে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা ও ইজমায়ে উম্মত বিদ্যমান রয়েছে তার বিপরীতে অতীতের কিছু 'শায', 'মুনকার'(ভ্রান্ত ও পরিত্যক্ত) মত পুনরায় উস্‌কে দিয়ে কিংবা প্রয়োজনে এ ধরনের ভ্রান্ত মত সৃষ্টি করে সাধারণ মুসলমানকে পেরেশান করা এবং তাদের একতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিকে চুরমার করা। আর সেসব মতগুলোকে 'হাদীস-অনুসরণ' নামে চালিয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শায ও মুনকার রেওয়ায়াত খুঁজে খুঁজে বের করে সেগুলোকে বিশুদ্ধ ও বাস্তবক্ষেত্রে অনুসৃত সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা এবং কিছু সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে সেসবের পক্ষে প্রমাণ যোগানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

২. এমন কিছু শাখাগত মাসায়েলকে বিবাদ-বিসংবাদ এবং পরস্পরকে ফাসেক ও কাফের আখ্যা দেওয়ার উপায় বানানো যেগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই একাধিক মত বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক মত হাদীস ও সুন্নতে নববী দ্বারা সমর্থিত। আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে এসব মাসআলায় মতভেদ ছিল; কিন্তু এটা তাদের একতাকে বিনষ্ট করেনি। পরস্পরকে ফাসেক ও গোমরাহ আখ্যা দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিতেও কোন ফাটল ধরেনি। কেননা তাঁরা বুঝতেন, শরীয়তসম্মত ও দলীলভিত্তিক ইখতেলাফ যেখানে হয় সেখানে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের উপর স্থির থাকাটাই শরীয়তে কাম্য। শাখাগত বিভিন্ন মাসআলার ব্যাপারে সালাফের (পূর্বসূরিদের) এই সম্মিলিত কর্ম-পদ্ধতিকে পরিহার করে মসজিদগুলো কে বিবাদ-বিসংবাদের আখড়ায় পরিণত করা সে সব বন্ধুদের মিশনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল।

আমাদের আলোচ্যবিষয় অর্থাৎ তারাবীর প্রসঙ্গটি তাদের মিশনের প্রথম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তারাবীর বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্ম-ধারার বিপরীতে ইংরেজশাসিত ভারত উপমহাদেশে যে আওয়াজ উঠেছিল তা এক লা-মাযহাবী আলেমের পক্ষ থেকেই উঠেছিল, যে ইংরেজদের নিকট থেকে নিজ সম্প্রদায়ের নাম আহলে হাদীস মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার খাস রহমত, ওই ঘরানারই এক আলেম মাওলানা গোলাম রাসূল ১২৯০ হিজরীতেই এই মত খণ্ডন করে একটি পুস্তিকা

লিখেছিলেন, যাতে ২০ রাকাআত তারাবীর সপক্ষে অন্যান্য দলীলের পাশাপাশি উম্মতের এই সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্মধারাও উল্লেখ রয়েছে। 'রেসালায়ে তারাবীহ' নামে প্রকাশিত পুস্তিকাটির কপি আমাদের কাছেও রয়েছে।

আরব জাহানে কবে থেকে এই বেদআতের সূচনা তা সুনির্দিষ্টভাবে আমার জানা না থাকলেও এটুকু নিশ্চিত যে, সেসব অঞ্চলে এর সূচনা ভারতবর্ষের পরে হয়েছে। আমার জানা মতে যিনি সর্বপ্রথম এই বেদআত দলীল দ্বারা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তিনি শায়খ নাসীব রেফায়ী। তখন আলেমগণ তার মতামত ও আলোচনা খণ্ডন করেন। তবে শায়খ আলবানী মরহুমের সেটা সহ্য হয়নি। তিনি রেফায়ী সাহেবের সমর্থনে ১৩৭৭ হিজরীতে 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামে একটি বই লিখে দিলেন। বইটি তার ভ্রান্তি-বিচ্যুতি এবং মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম উম্মাহর ইমামগণের প্রতি বিদ্রোহ-বিদ্বেষের একটি খোলা দলীল এবং ইলমে উসূলে হাদীস ও জারহ-তাদীল বিষয়ে তার অপরিপক্কতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ছাড়া ইলমে উসূলে ফিকহ বিষয়েও তার দৈন্য এ বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে। যা সত্যিই মর্মান্তিক। এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের লা-মাযহাবী বন্ধুরা তারাবীর বিষয়ে শায়খ আলবানীর বইটিকেই শিরোধার্য করে রেখেছেন।

এখানে যে বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা এই যে, শায়খ নাসীব রেফায়ীর খণ্ডনে লিখিত الإصابة في الانتصار للخلفاء الراشدين والصحابة. নামক কিতাবের ৬১ নং পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লেখা হয়েছে যে–

ولم يشذ أحد منهم بمنعها غير هذه الشرذمة التي ظهرت في زماننا كالشيخ ناصر وإخوانه.

"বর্তমান যুগে আত্মপ্রকাশকারী শায়খ নাসির (আলবানী) ও তাঁর সমমনা ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র একটি দল ছাড়া, আর কেউ-ই একে অস্বীকার করে ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে নিপতিত হয়নি।"

অথচ আপনি আশ্চর্য হবেন যে, তখন এর জবাবে শায়খ আলবানীর পক্ষে কোন সাহাবী, কোন তাবেয়ী, কোন ফকীহ ইমাম বা কোন মুহাদ্দিস ইমামের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, তিনি বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তদ্রূপ কোন মসজিদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি যে, অমুক ঐতিহাসিক মসজিদে তারাবীর নামায বিশ রাকাআত নয়, আট রাকাআত হত! তবে ইলমের আমানতদারি ক্ষুণ্ন করে তিনি ইমাম মালেক (রহ.) সম্পর্কে বললেন যে, তিনি বিশ রাকাআত তারাবীর নামায পড়তে নিষেধ করতেন! ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্না

ইলাইহি রাজিঊন! অথচ ইমাম মালেক (রহ.)এর মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থ 'আলমুদাওওনা' যা ইমাম মালেক (রহ.)এর ছাত্রদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়েছে তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তারাবীর নামায বিতরের তিন রাকাআতসহ সর্বমোট ৩৯ রাকাআত এবং তৎকালীন মদীনার আমীর তারাবীর রাকাআত সংখ্যা কমাতে চাইলে মালেক (রহ.) তাকে নিষেধ করেন। –আলমুদাওওনাতুল কুবরা ১/১৯৩; আরো দেখুন, মালেকী মাযহাবের কিতাব আলইসতিযকার ৫/১৫৭; বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/২৪৬; আল-মুনতাকা ১/২০৮-২১০

অথচ শায়খ আলবানী মরহুম ইমাম মালেক (রহ.) সম্পর্কে বলে দিলেন যে, তিনি বিশ রাকাআত তারাবীহ থেকে নিষেধ করতেন। দলীল কী?! দলীল হল জুরী নামক জনৈক শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ইমাম মালেক (রহ.) সম্পর্কে এই কথা বলেছেন। অথচ শায়খ আলবানী খুব ভালভাবেই জানেন যে, জুরী নামক এই ব্যক্তির পরিচয় কী সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে বিভিন্ন তথ্য ও আলামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ব্যক্তি ইমাম মালেক (রহ.)এর অনেক পরের লোক। অথচ ইমাম মালেক (রহ.) পর্যন্ত না কোন সনদ উল্লেখ করা হয়েছে, না মধ্যবর্তী কারো উদ্ধৃতি!

প্রশ্ন এই যে, মালেকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য হাদীস-ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ, ফিক্হ ও ফত্ওয়ার মৌলিক কিতাবসমূহ এড়িয়ে গিয়ে, বরং এসব গ্রন্থে যে পরিষ্কার বিবরণ আছে তার বিপরীতে এক অজ্ঞাত পরিচয় লোকের বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম মালেক (রহ.)কে নিজের অনুসরণীয় ব্যক্তি সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা উপরন্তু (নাউযুবিল্লাহ) বিশ রাকাআত তারাবীহ সম্পর্কে আপত্তি করার এই বেদআতের ব্যাপারে, এটা কোন্ ধরনের দিয়ানতদারি আর কী ধরনের আমানতদারি! অথচ ইমাম মালেক (রহ.)এর যুগ কেন তাঁর পরে শতশত বছর পর্যন্ত এই বেদআতের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

মোটকথা, এই বিশৃঙ্খল-পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু আট রাকাআত তারাবীর কোথাও কোন অস্তিত্ব ছিল না। সাহাবা-যুগ, তাবেয়ী-যুগ, তাবেতাবেয়ী-যুগ এবং এরপরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস বা ফিকহের কোন ইমামকে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, যিনি বলেছেন, তারাবীর নামায আট রাকাআত পড়াই যথেষ্ট, বিশ রাকাআত পড়ার প্রয়োজন নেই, অথবা নাউযুবিল্লাহ, আট রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়া বেদআত, যা বর্তমানের কিছু সালাফী ও অধিকাংশ লা-মাযহাবীর বক্তব্য।

বর্তমান শতাব্দীতে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.) 'রাকাআতে তারাবীহ' –তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা নামে

একটি গবেষণাধর্মী কিতাব লিখেছেন, যা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৭ হিজরীতে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, তারাবীর নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ রাখা এবং বিশ রাকাআতের উপর আপত্তি করার মতবাদ বিগত শতাব্দীগুলোতে ছিল না। এটা লা-মাযহাবীদের আবিষ্কার। তিনি সাহাবা-যুগ থেকে নিয়ে লা-মাযহাবীদের এই ইজমা-বিরোধী মতের উদ্ভাবনের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে বারোশ বছরের আমলে মুতাওয়ারাস–উম্মাহর সম্মিলিত অবিচ্ছিন্ন কর্ম-ধারা একএক শতাব্দী করে দেখিয়েছেন যে, তারাবীর নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ রাখা এবং বিশ রাকাআতের উপর আপত্তি করার এই মতবাদ পেছনের শতাব্দীগুলোতে ছিল না। এটা লা-মাযহাবীদের আবিষ্কার। আজমী (রহ.)এর কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় অর্ধ-শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন লা-মাযহাবীর পক্ষে এই বাস্তবতাকে খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি। বলাবাহুল্য যে, তা সম্ভবও নয়।

তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হওয়ার দলীল

ভূমিকা : (১) শরীয়তের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় দলীল হল কুরআন কারীম। এরপর সুন্নাহর স্থান। কিন্তু সুন্নাহ সম্পর্কে কিছু মানুষের এই ধারণা আছে যে, যেসব হাদীস সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বা কাজ হিসাবে সহীহ বর্ণনা-পরম্পরায় এসেছে শুধু তাই সুন্নাহ। এই ধারণা ঠিক নয়। সুন্নাহ হল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনাবলির নাম। এটা আমাদের কাছে সাধারণত মৌখিক বর্ণনা-ধারার মাধ্যমেই পৌঁছে থাকে এবং সাধারণ পরিভাষায় এইসব মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত রেওয়ায়াতকেই 'হাদীস' বলা হয়। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা আমাদের কাছে মৌখিক বর্ণনার স্থলে কর্মের ধারাবাহিকতায় পৌঁছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নবীজী থেকে কর্মের মাধ্যমে তা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ এবং তাঁদের নিকট থেকে তাবে-তাবেয়ীগণ গ্রহণ করেছেন। এভাবে প্রত্যেক উত্তরসূরি তার পূর্বসূরি থেকে কর্মের মধ্য দিয়ে নবীজীর সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেন। নবী-শিক্ষার এই প্রকারটিকে পরিভাষায় 'আমলে মুতাওয়ারাস' বা সুন্নতে মুতাওয়ারাসা বলে।

নবী-শিক্ষা ও নবী-নির্দেশনার অনেক বিষয় এই পথেই পরবর্তীদের নিকটে পৌঁছেছে। এগুলো যদি মৌখিক বর্ণনাসমূহের মধ্যেও তালাশ করা হয় তাহলে অনেক সময় এমন হয় যে, হয়ত এ বিষয়ে কোন মৌখিক বর্ণনা পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও তা হয় সনদের দিক থেকে যয়ীফ। এখানেই স্বল্প-জ্ঞান

কিংবা স্বল্প-বুঝের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়। তারা যখন বিশুদ্ধ মৌখিক বর্ণনাসূত্রে বিষয়টি খুঁজে পায় না তো নবীজীর এই শিক্ষাটিকেই অস্বীকার করে বসে। অথচ মৌখিক সাধারণ বর্ণনা-ধারার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী তাওয়ারুস তথা ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারার মাধ্যমে বিষয়টি সংরক্ষিত।

২. তদ্রূপ নবী-শিক্ষার একটি অংশ আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা-নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত আছে। বিষয়টি একটু খোলাসা করে বলি। সাহাবায়ে কেরামের অনেক নির্দেশনা এমন আছে যার ভিত্তি শরীয়তসম্মত কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর। এগুলো শরীয়তের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। আবার তাঁদের কিছু নির্দেশনা ও কিছু ফত্ওয়া এমন আছে যা তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা বা কাজ থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্যকে শিখানোর সময় উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। কেননা প্রেক্ষাপট থেকে এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, তাঁরা নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তিতেই এ বিষয়টি শিক্ষা দিচ্ছেন। এজন্য ইমামগণের সর্বসম্মত নীতি হল, সাহাবায়ে কেরামের যে ফত্ওয়া বা নির্দেশনার ব্যাপারে এটা সুনিশ্চিত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা-নির্দেশনা থেকেই তা গৃহীত, এতে সাহাবীর ইজতিহাদ বা কিয়াসের কোন প্রভাব নেই তা মারফূ হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত। কোন মাসআলায় এর মাধ্যমে প্রমাণ দেওয়া মারফূ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়ার শামিল। পরিভাষায় একে মারফূ হুক্মী বলা হয়। নিঃসন্দেহে এর ভিত্তি কোন মারফূ হাকীকী বা স্পষ্ট মারফূর উপর। তবে অপরিহার্য নয় যে, হাদীসের কিতাবে সেই স্পষ্ট মারফূ হাদীসটি সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকবে। যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অভাব রয়েছে তারা এখানেও পদস্খলনের শিকার হয় এবং নবীজীর এই শিক্ষাকেই অস্বীকার করে বসে এবং বলতে থাকে যে, এর কোন ভিত্তি পাওয়া গেল না, অথচ মারফূ হুকমীর সূত্রে প্রমাণিত হওয়াও দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

৩. সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সুন্নাহর পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে অনুসরণ করার এবং তাকে মজবুতভাবে অবলম্বন করার আদেশ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ....، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"মনে রেখো! আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে তারা বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহকে আঁকড়ে রাখবে। একে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে প্রাণপণে কামড়ে রাখবে ... এবং তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ের) নবআবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রতিটি নবআবিষ্কৃত বিষয় বেদআত। আর প্রতিটি বেদআত হল গোমরাহী।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৭; জামে তিরমিযী ৫/৪৩; হাদীস ২৬৭৬; মুসনাদে আহমদ ৪/১২৬, হাদীস ১৬৬৯২; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ৪২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫

জামে তিরমিযীর ২২২৬নং হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে খেলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং নবীজীই করে গেছেন। সে হিসেবে নবী-পরিভাষায় খুলাফায়ে রাশেদীন চারজন– ১. আবু বকর (রা.) ২. উমর (রা.) ৩. উসমান (রা.) ৪. আলী (রা.)। আলী (রা.)এর শাহাদত ৪০হিজরীর রমযানে হয়েছে।

যেহেতু খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জেনেছিলেন যে, তাঁদের জারিকৃত সুন্নাহ নবী-শিক্ষার ভিত্তিতেই হবে, তাঁদের সুন্নাহও নবীর সুন্নাহর অনুগামী হবে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবেক হবে এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ব্যাপক ঘোষণা দিয়ে যান যে, তোমরা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে রাখবে। সুতরাং যখন কোন বিষয়ে প্রমাণ হবে যে, এটি চার খলীফার কোন একজনের সুন্নাহ তখন তার অনুসরণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত নির্দেশই যথেষ্ট। এরপর আর এই চিন্তার প্রয়োজন থাকে না যে, তাঁদের এই সুন্নাহর ভিত্তি কী এবং তাঁরা এই সুন্নাহ কোন নবী-শিক্ষা থেকে গ্রহণ করেছেন। এখানেও স্বল্প-জ্ঞান ও স্বল্প-বুঝের লোকদের অভ্যাস হল, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহর ভিত্তি হাদীসের কিতাবসমূহে খুঁজতে থাকেন। এরপর সহীহ সনদে নবীজীর স্পষ্ট কোন বাণী এ বিষয়ে না পেলে তাকে অস্বীকার করে বসে। একে বেদআত আখ্যা দিয়ে দেয়। অথচ নিন্দিত ইখতিলাফ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ হল, আমার সুন্নাহ ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে মজবুতভাবে অবলম্বন কর। এরপর বলেছেন, 'বেদআত থেকে বেঁচে থাক। কেননা প্রত্যেক বেদআত গোমরাহী।' একটু চিন্তা করুন, যদি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ বেদআতই হত তাহলে নবীজীর এই ইরশাদের কোন অর্থ থাকে কি?

৪. 'সুন্নাহ'র পরে শরীয়তের তৃতীয় বুনিয়াদি দলীল হল ইজমা। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বউন্নত হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাজির-আনসার এবং অন্যান্য সাহাবীর ইজমা। এই ইজমা যদি ব্যাপকভাবে এবং অবিচ্ছিন্ন ও সম্মিলিতরূপে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে তবে তা শরীয়তের অনেক বড় অকাট্য দলীল। এটা থাকা অবস্থায় অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। আর ইজমাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এই অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন নেই যে, এই ইজমা কীসের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে। কেননা শরীয়ত নিজেই ইজমাকে দলীল সাব্যস্ত করেছে এবং যাঁদের মাধ্যমে ইজমা সম্পন্ন হয় তাঁদের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছে যে, এঁরা কখনো গোমরাহীর ব্যাপারে একমত হতে পারে না। কুরআন কারীমে তো স্পষ্টভাবে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের অনুসরণের আদেশ করা হয়েছে এবং সাবীলুল মুমিনীন (মুমিনদের অনুসৃত পথ) থেকে বিমুখ হওয়াকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘোষণা করেছে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মত, পথ ও রুচির সাথে যারা একমত পোষণ করে না তাদের অভ্যাস হল কোন মাসআলায় শুধু উম্মাহর ফকীহবৃন্দের নয়, এমন কি সাহাবায়ে কেরামের বিশেষত মুহাজির ও আনসারের ঐকমত্য বিদ্যমান থাকলেও ভিন্ন দলীল তালাশ করে থাকে। অথচ শরীয়ত এই ইজমাকে দলীল সাব্যস্ত করার পরও তারা এর সমর্থনে অন্য কোন সহীহ সনদওয়ালা স্পষ্ট হাদীস না পেলে এই মাসআলাটি অস্বীকার করে দেয়। কেউ তো আরো এক ধাপ বেড়ে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে শরীয়তের দলীল ইজমাকেই অস্বীকার করে বসে!

মনে রাখবেন, এ সব অত্যন্ত স্পষ্ট মূর্খতা আর তা শরীয়তের প্রতি অনাস্থা প্রকাশের সমার্থক। যদিও তা অসচেতনভাবেই হোক না কেন। অর্থাৎ শরীয়ত যে বিষয়কে দলীল সাব্যস্ত করেছে তারা তাকে মেনে নিতে পারছেন না।

তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা বিষয়ক মাসআলাটি উপরোক্ত সকল দলীল দ্বারাই প্রমাণিত। অর্থাৎ 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ', 'মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজমা', 'মারফূ হুকমী', 'সুন্নতে মুতাওয়ারাসা' এবং 'ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা'। প্রত্যেকটি দলীল প্রমাণ করে যে, তারাবীর নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ মনে করা এবং বিশ রাকাআত মাসনূন হওয়াকে অস্বীকার করা একটি মারাত্মক ভুল। উপরন্তু এ বিষয়ে একটি স্পষ্ট মারফূ হাদীসও আছে, যা উপরোক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে যেহেতু অধিক আলোচনা করা সম্ভব নয়, তারাবীহ সংক্রান্ত স্বতন্ত্র কোন কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। তাই এখানে সংক্ষেপে উপরোক্ত দলীলসমূহের প্রতি অনেকটা ইঙ্গিত করেই চলে যাব।

প্রথম দলীল : খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ

সহীহ বুখারী (হাদীস ২০১০, কিতাবু সালাতিত তারাবীহ) এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো তারাবীর নামায জামাআতে পড়িয়েছেন। আবার কখনো কয়েক রাকাআত জামাআতের সাথে পড়ে হুজরায় চলে গেছেন এবং একাকী নামাযে রত থেকেছেন। –মুসলিম, হাদীস ১১০৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত তারাবীহ পড়াননি; বরং অধিকাংশ সময় একাকীই পড়তেন। তিনি নিজে কেন জামাআতের নিয়ম করেননি তা উম্মতকে বলে গেছেন যে, (যেহেতু উম্মতের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির সময়টি ওহী অবতীর্ণ হওয়া এবং শরীয়তের বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় ছিল, তাই) জামাআতের সাথে নিয়মিত নামায পড়লে এ নামাযটিও উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তাঁর পরে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)এর খেলাফতকালে ও উমর (রা.)এর খেলাফতের শুরুতে এই অবস্থাই ছিল। অর্থাৎ এক ইমামের পেছনে ফরয নামাযের মত তারাবীর নামায জামাআতের সাথে আদায় করার ইহতেমাম ছিল না।

রমযানের কোন এক রাতে উমর (রা.) মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে দেখতে পান যে, মসজিদের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট জামাআত হচ্ছে। তিনি চিন্তা করলেন সকল নামাযীকে এক ইমামের পেছনে একত্র করে দেওয়া উচিত। তখন তিনি এই আদেশ জারি করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে ইমাম বানিয়ে দিলেন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১০

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ., মৃত্যু ৪৬৩ হি.) মুয়াত্তা মালেকের অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত্‌তামহীদ'এ বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নতুন কিছু করেননি। তিনি তা-ই করেছেন যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন; কিন্তু শুধু এই আশংকায় তা জারি করেননি যে, নিয়মিত জামাআতের কারণে তারাবীর নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে। উমর (রা.) তা জানতেন। তিনি দেখলেন, নবীজীর ইন্তেকালের পর এই ভয় নেই। (কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শরীয়ত-নির্ধারণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে গেছে।) তখন তিনি নবী-পছন্দের অনুসরণ করে ১৪ হিজরীতে জামাআতের ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহ তাআলা এই মর্যাদা তাঁর জন্যই নির্ধারিত রেখেছিলেন। আবু

বকর সিদ্দীক (রা.)এর মনে এই চিন্তা আসেনি। যদিও সামগ্রিকভাবে তিনিই উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন।" –আত্‌তামহীদ ৮/১০৮-১০৯

এতদিন পর্যন্ত তারাবীহ ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ের আমল। জামাআত হলেও প্রত্যেকে পুরো তারাবীহ্ জামাআতেই পড়বেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাই তারাবীর রাকাআত-সংখ্যার ব্যাপারে বিশেষ আলোচনার পরিবেশই সেটা ছিল না। কিন্তু যখন মসজিদে নববীতে প্রতি রাতে পুরো তারাবীহ একই ইমামের পেছনে আদায় হতে থাকল এবং শত শত মানুষের উপস্থিতিতে হতে থাকল তখন তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা কোন গোপন বিষয় থাকল না। সবাই প্রকাশ্যেই দেখতে পেলেন, তারাবীর নামায কত রাকাআত এবং এতদিন পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম কত রাকাআত পড়তেন। তাই দেখার বিষয় এই যে, সে সময় মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায কত রাকাআত পড়া হত।

প্রিয় পাঠক, সহীহ্ হাদীসের নির্ভযোগ্য কিতাবসমূহের পাতা ওল্টাতে থাকুন, সহীহ ও মুতাওয়াতির– অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত– বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়াত আপনি পেয়ে যাবেন, যেখানে দেখা যাবে যে, আশারায়ে মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছাড়া। কেননা তিনি তখন জীবিত ছিলেন না), মুহাজির ও আনসারী সাহাবী এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের জীবদ্দশায় তারাবীর নামায বিশ রাকাআত পড়া হত এবং সবশেষে তিন রাকাআত বিতর পড়া হত। কয়েকটি রেওয়ায়াত দেখুন।

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ফারূক (রা.)এর যুগ

১. ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা (রহ.)এর বিবরণ

ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা (রহ.) বলেন, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) বলেছেন–

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً. قَالَ: وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ، وَكَانُوا يَتَوَكَّؤُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

"তাঁরা (সাহাবা ও তাবেয়ীন) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)এর যুগে রমযান মাসে বিশ রাকাআত পড়তেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁরা নামাযে শতাধিক আয়াত

বিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং উসমান ইবনে আফফান (রা.)এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে তাঁদের (কেউ কেউ) লাঠিতে ভর দিতেন।" –আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬

২. সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)এর আরেকটি বিবরণ

كُنَّا نَقُوْمُ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَّالْوِتْرِ.

"আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)এর যুগে বিশ রাকাআত এবং বিতর পড়তাম।" –আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭-২৬৮; মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, বায়হাকী–নাসবুর রায়াহ ২/১৫৪

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)এর এই হাদীসটির সনদ সহীহ। অনেক হাদীসের ইমাম ও ফিক্‌হের ইমাম এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন এবং কয়েকজন হাফেযুল হাদীস তা সুস্পষ্ট ভাষায় সহীহ বলেছেন। যেমন ইমাম নববী, তকীউদ্দীন সুব্‌কী, ওলিউদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আইনী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ। দেখুন আলমাজমূ শারহুল মুহাযযাব ৩/৫২৭; নাসবুর রায়াহ ২/১৫৪; উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী ৭/১৭৮; ইরশাদুস সারী শারহু সহীহিল বুখারী ৪/৫৭৮; আলমাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ–আলহাভী ২/৭৪ ইত্যাদি

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)এর উপরোক্ত হাদীসটিকে আরবের গায়রে মুকাল্লেদ আলেম শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী মারহুম এবং হিন্দুস্তানের গায়রে মুকাল্লেদ আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর আগে কোন হাদীসের ইমাম, ফিক্‌হের ইমাম বা কোন মুহাদ্দিস মুহাক্কিক আলেম, আমাদের জানা মতে যয়ীফ বলেননি। পূর্ববর্তীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে এই দুই ব্যক্তি কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া এই (মুতাওয়াতিরে মা'নাবী) হাদীসকে যয়ীফ বলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ আলবানী মরহুমের খেয়ানত ও অসাধুতার কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতির অনেকগুলো চিহ্নিত করেছেন সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সাবেক গবেষক মুহাদ্দিস ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ আনসারী 'তাসহীহু সালাতিত তারাবীহ ইশ্‌রীনা রাকাআতান ওয়ার্‌রাদ্দু আলাল আলবানী ফী তাযয়ীফিহী' কিতাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে। আর মাওলানা মুবারকপুরীর কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন মুহাদ্দিসুল হিন্দ হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.) তাঁর 'রাকাআতে তারাবীহ' কিতাবে। আলেমগণ এই দুটি কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন তাহলে এই কিতাব দুটির বাংলা অনুবাদ আমরা বাংলা পাঠক ভাই-বোনদের হাতে তুলে দেব।

৩. তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে রূমান (রহ.)এর বিবরণ

كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)এর যুগে মানুষ (সাহাবা ও তাবেয়ীন) রমযান মাসে ২৩ রাকাআত পড়তেন।" –মুয়াত্তা মালেক ৪০; আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬

৪. তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই (রহ.)এর বিবরণ

كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَّيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

"উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমযান মাসে মদীনায় লোকদের নিয়ে বিশ রাকআত তারাবীহ এবং তিন রাকাআত বিত্‌র পড়তেন।" –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫/২২৪

৫. তাবেয়ী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (রহ.)এর বিবরণ

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُّصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়েন।" –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫/২৮৫

এ ধরনের আরো অনেক রেওয়ায়াত আছে, যেগুলোর মূল বক্তব্য মুতাওয়াতির। ফলে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না। এরপরও কিছু গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুর অভিযোগ হল, এই বর্ণনাগুলো 'মুরসাল' আর 'মুরসাল' হল যয়ীফ, অতএব ...।

অথচ দলীলের আলোকে প্রমাণিত তাবেয়ী ইমামগণের 'মুরসাল' বর্ণনা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। পূর্বসূরি ইমামগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন। আর এক বিষয়ে একাধিক 'মুরসাল' রেওয়ায়াত বিদ্যমান থাকলে কিংবা 'মুরসাল' বর্ণনার সমর্থনে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন ও সম্মিলিত কর্মধারা বিদ্যমান থাকলে তার প্রামাণিকতার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যারা 'মুরসাল'কে যয়ীফ বলেছেন তারাও এক্ষেত্রে 'মুরসাল'কে সহীহ বা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে। কিন্তু আমি এখানে শুধু শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)এর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি, যাকে আমাদের ওই

বন্ধুরাও অনুসরণীয় এবং 'আপন মানুষ' মনে করেন। তিনি বলেন–

المرسل الذي له ما يوافقه أو الذي عمل به السلف حجة باتفاق الفقهاء.

"যে 'মুরসালের' অনুকূলে অন্য কোন কিছু পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসূরিগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।" –ইকামাতুদ দলীল আলা বুতলানিত তাহ্‌লীল, আলফাতাওয়াল কুবরা ৪/১৭৯

আরো দেখুন, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/২৭১; মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ৪/১১৭

মোটকথা, উপরোক্ত পাঁচ রেওয়ায়াত এবং এধরনের অন্যান্য সহীহ রেওয়ায়াত, তদুপরি সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগ থেকে চলে আসা সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্মের ভিত্তিতে আলেমগণের সর্ববাদীসম্মত বক্তব্য এই যে, হযরত উমর (রা.)এর যুগে মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত তারাবীহ হত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন–

إنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث.

"এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমযানের তারাবীতে মুসল্লীদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়তেন এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন।" –মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/১১২-১১৩

বিশ রাকাআত তারাবীহ সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন–

ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.

"খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ এবং মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত কর্ম দ্বারা এটি প্রমাণিত।" –মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/১১৩

খলীফায়ে রাশেদ উসমান যিন-নূরাইন (রা.)এর যুগ

হিজরী ১৪ সাল থেকে ফারূকে আযম (রা.)এর শাহাদত পর্যন্ত সর্বমোট ১০ বছর হযরত উসমান যিননূরাইন (রা.)এর উপস্থিতিতে বিশ রাকাআত তারাবীহ হয়েছে। তিনি এর উপর কোন আপত্তি করেননি। এছাড়া আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকীর উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত প্রথম হাদীসটিতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত আছে যে, উসমান (রা.)এর যুগে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হত। উপরন্তু তিনি যদি নতুন কোন ফরমান জারি করতেন তাহলে অবশ্যই ইতিহাসে তা সংরক্ষিত থাকত।

খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবনে আবি তালেব (রা.)এর যুগ

৬. বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রহ.)এর বিবরণ

عَنْ عَلِيٍّ، دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُوْتِرُ بِهِمْ.

"আলী (রা.) রমযানে কারীগণকে ডাকলেন এবং তাঁদের একজনকে আদেশ করলেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়েন এবং আলী (রা.) তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়তেন।" –আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬-৪৯৭

৭. তাবেয়ী আবুল হাসনা (রহ.)এর বিবরণ

إِنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِهِمْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"আলী (রা.) এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়েন।" –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫/২২৩

উপরোক্ত রেওয়ায়াত দুটির সনদ গ্রহণযোগ্য। পারিভাষিক শব্দে প্রথমটির সনদ حسن لذاته على القول بأن المستور من طبقة এবং দ্বিতীয়টির সনদ حسن لغيره التابعين حجة. দেখুন, আলজাওহারুন নাকী, ইবনুত তুরকুমানী ২/৪৯৫-৪৯৭;রাকাআতে তারাবীহ, মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী ৭৭-৯০

উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠ রেওয়ায়াতটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) 'মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ' (২/২২৪) গ্রন্থে এবং ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) 'আলমুন্‌তাকা' (৫৪২) গ্রন্থে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আলী (রা.) তারাবীর জামাআত, রাকাআত-সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা ফারূকে আজম (রা.)এর রীতির উপরই ছিলেন।

হযরত আলী (রা.)এর বিশ রাকাআত তারাবীহ শিক্ষা দেওয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের আমলও এরূপ ছিল। যেমন, শুতাইর ইবনে শাকাল, আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাক্‌রা, সায়ীদ ইবনে আবিল হাসান, সুয়াইদ ইবনে গাফালা এবং আলী ইবনে রাবীআহ। তাঁরা প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থানে অনেক বড় ইমাম এবং সবাই তাবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের সবার সম্পর্কে হাদীসের কিতাবে সহীহ সনদে আছে যে, তাঁরা বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন। দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫/২২৩; আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬; কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ ইবনে নাস্‌র আলমারওয়াযী ২০০-২০২

সারকথা এই যে, বিশ রাকাআত তারাবীহ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত উমর, হযরত আলী (রা.)এর যুগে তাদের আদেশক্রমে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হত। হযরত উসমান রা. উমর ফারূক (রা.)এর যুগে এবং নিজ খেলাফত আমলে এমনটিই করেছেন। এটাই সুনির্ধারিত। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বিশ রাকআতের বিরুদ্ধে একটি অক্ষরও কোথাও নেই।

কোন একটি বিষয় খুলাফায়ে রাশেদীনের কোন একজনের সুন্নাহ হিসেবে প্রমাণিত হলে তা মুসলিম উম্মাহর জন্য অবশ্য অনুসরণীয়। তাহলে যে বিষয় তিনজন খলীফা থেকে প্রমাণিত তার ব্যাপারে উম্মাহর করণীয় কী হবে তা সহজেই বোধগম্য! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ওসিয়ত পুনরায় স্মরণ করুন, "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা আমার পরে আমার সুন্নাহ এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে রেখো। একে অবলম্বন করো এবং মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে রেখো। তোমরা (ধর্মীয় ক্ষেত্রে) সকল নবআবিষ্কৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, সকল নতুন জিনিস বেদআত। আর সকল বেদআত গোমরাহী।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল : মুহাজির ও আনসারীগণের ইজমা এবং অন্য সকল সাহাবীর ইজমা

কুরআন কারীমের ঘোষণা অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম হলেন হেদায়াতপ্রাপ্ত ও অনুসরণীয়। তাঁদের মধ্যে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) 'ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন' কিতাবে কুরআন কারীমের আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে উঁচু পর্যায়ের আলোচনা করেছেন, যা দেখার মত ও পড়ার মত। –ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন ৪/৯৪-১১৯; শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফাত আওর সিরাতে মুসতাকীম, মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী ৩২৬-৩৫১

যাহোক কোন বিষয়ে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ একমত হলে তা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তারাবীহ বিশ রাকাআত মাসনূন হওয়ার ব্যাপারে শুধু মুহাজির ও আনসারী নয়, সকল সাহাবী একমত।

মসজিদে নববীতে ১৪ হিজরী থেকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)এর ইমামতিতে প্রকাশ্যে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হত। সে সময় মুসল্লী ও মুক্তাদী

কারা ছিলেন? বলাবাহুল্য, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণই ছিলেন সেই মুবারক জামাআতের মুসল্লী ও মুক্তাদী। শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম– যাঁদের নিকট থেকে অন্যান্য সাহাবী দ্বীন শিখতেন, যাঁরা কুরআনের শিক্ষা, হাদীস-বর্ণনা ও ফিক্হ-ফত্ওয়ার স্তম্ভ ছিলেন তাঁদের– অধিকাংশই তখন মদীনায় ছিলেন। দু একজন যাঁরা মদীনার বাইরে ছিলেন তাঁরাও মক্কা-মদীনার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং খলীফায়ে রাশেদের কর্ম ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতেন; তাঁদের একজনও কি বিশ রাকাআত তারাবীর বিষয়ে কখনো কোন আপত্তি করেছেন? বরং তাঁদের কর্মও কি খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে অভিন্ন ছিল না? তাঁদের জীবদ্দশায়ও এবং তাঁদের ইন্তেকালের পরেও? বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ মক্কী (রহ. ২৭-১১৪হি.) বলেন–

أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ثَلَاثًا وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.

"আমি লোকদেরকে (সাহাবা ও প্রথম সারির তাবেয়ীনকে) দেখেছি, তাঁরা বিতরসহ তেইশ রাকাআত পড়তেন।" –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫/২২৪

আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) নিজেই বলেছেন, আমি দুইশ সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। –তাহযীবুল কামাল ১৩/৪৯

অন্যান্য তাবেয়ী থেকেও এরূপ বিবরণ আছে। এই বাস্তবতাকেই ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) 'আলইস্তিযকার' গ্রন্থে নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন–

وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة.

"এটিই উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত এবং এতে সাহাবীগণের কোন ভিন্নমত নেই।" –আলইস্তিয্কার ৫/১৫৭

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)এর ভাষায়–

إنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة. لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر.

এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমযানের তারাবীতে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়তেন এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। তাই বহু আলেমের সিদ্ধান্ত এই যে, এটিই সুন্নত। কেননা, উবাই ইবনে কা'ব (রা.)

মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই বিশ রাকাআত পড়িয়েছেন এবং এতে কেউ আপত্তি করেননি।" –মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৩/১১২-১১৩

তারাবীর নামায কি বিশ রাকাআত, না বিশ রাকাআতের অধিক, যা 'হাররা'-ঘটনার পূর্ব থেকে মদীনাবাসীর আমল ছিল– এর আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম আবু বকর কাসানী (রহ.) বলেন–

والصحيح قول عامة العلماء، لما روي أن عمر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبي بن كعب، فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكر عليه أحد. فيكون إجماعا منهم على ذلك.

"অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। কেননা হযরত উমর (রা.) রমযান মাসে সাহাবায়ে কেরামকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)এর ইমামতিতে এক জামাআতে একত্র করেছিলেন এবং উবাই ইবনে কা'ব তাঁদেরকে নিয়ে প্রতিরাতে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন। তাঁদের কেউ এ বিষয়ে আপত্তি করেননি। সুতরাং এটা তাঁদের সকলের ইজমাকেই প্রমাণ করে।" –বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৪৪

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদেসী (রহ.) বলেন–

ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع.

"উমর (রা.) যা করেছেন এবং তাঁর খেলাফত আমলে অন্যান্য সাহাবী যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, তা-ই অনুসরণের অধিক উপযুক্ত।" –আলমুগনী ২/৬০৪

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যযুগে তারাবীর ব্যাপারে 'সাবীলুল মুমিনীন'– মুমিনদের পথ এই ছিল যে, তাঁরা বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন এবং কেউ তাতে আপত্তি করতেন না। কেউ একে নাজায়েযও বলতেন না কিংবা বেদআত বা হাদীস ও সুন্নাহর খেলাফও আখ্যা দিতেন না। এজন্য যারা বিশ রাকাআত তারাবীর উপর আপত্তি করে এবং একে সুন্নাহ বা হাদীসের খেলাফ বলে তারা সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুত হওয়াই পছন্দ করছেন।

কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত তাদের স্মরণে রাখা উচিত–

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

"যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সকল মুমিনের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" –সূরা নিসা ১১৫

চতুর্থ দলীল : মারফূ হুক্মী

মারফূ হুক্মী হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই হাদীস বা শিক্ষা, যা বর্ণনার সাধারণ রীতি অনুসারে হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়নি, কিন্তু বাস্তবে তা নবীজীর হাদীস। উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হের সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী মারফূ হুক্মী মারফূ হাদীসের (নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার)ই একটি প্রকার।

আমরা ইতিপূর্বে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ঐকমত্য এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজ্‌মা উল্লেখ করেছি, যার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দলীল; কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে এগুলো পরোক্ষভাবে মারফূ হাদীস (তথা নবীজীর শিক্ষা।) কেননা নামাযের রাকাআত-সংখ্যা কী হবে তা শুধু কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। তাই শরীয়ত প্রতি নামাযের রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছে। একথা ঠিক যে, নফল নামাযের রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারিত নয়। হাদীস শরীফের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ দুই রাকাআত করে যত রাকাআত ইচ্ছা পড়তে পারে; কিন্তু তারাবীর নামায যেহেতু সুন্নতে মুয়াক্কাদা, তাই এর ব্যাপারে নফল নামাযের নিয়ম প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরও যদি সাধারণ নফল নামাযের নীতি এই সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাযের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় তাহলে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায় যে, যার যত রাকাআত ইচ্ছা সে তত রাকাআত পড়বে। তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হবে তা তো এই নীতির আলোকে বলা যায় না।

সুনির্দিষ্টভাবে রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারিত হতে হলে শরীয়তের পক্ষ থেকেই হতে হবে। শুধু কিয়াস বা যুক্তির মাধ্যমে এটি সম্ভব নয়। সুতরাং বলতেই হবে সাহাবায়ে কেরাম তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা নবীজী থেকেই গ্রহণ করেছেন। উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হের নীতি হল কোন সাহাবীর এমন কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা, যা কিয়াস বা ইজ্‌তিহাদের ভিত্তিতে হতে পারে না– যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দিতে পারেন না– তাই তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই প্রাপ্ত বলে গণ্য করা হয়

এবং তা মারফূ হুক্‌মী সাব্যস্ত হয়।

আমাদের আলোচ্য মাসআলা তো এক দুজন সাহাবীর নয়, সকল সাহাবীর সম্মিলিত কর্ম ও সিদ্ধান্তের এবং বিশেষভাবে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা ও মুহাজির-আনসারী সাহাবীগণের শিক্ষা ও নির্দেশনার বিষয়। তো এধরনের বিষয়ে যা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় সাহাবায়ে কেরামের এই শিক্ষা মারফূ হুক্‌মী ছাড়া আর কী হতে পারে!

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর শাগরিদ 'কাযিল কুযাত' ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)কে লক্ষ করে বলেছিলেন। ফিক্‌হে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাব আলইখতিয়ার লি-তালীলিল মুখতার'এর বরাতে পূর্ণ কথাটি উল্লেখ করছি–

روى أسد بن عمرو، عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله، عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه، فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون، منهم عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابنه، وطلحة، والزبير، ومعاذ، وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم أجمعين، وما رد عليه واحد منهم، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك.

"আসাদ ইবনে আমর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি আবু হানীফা (রহ.)কে তারাবীহ এবং এ বিষয়ে উমর (রা.)এর কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, তারাবীহ হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। উমর (রা.) নিজের অনুমান থেকে কোন কিছু নির্ধারণ করেননি এবং এ বিষয়ে নতুন কিছু আবিষ্কারও করেননি। তিনি যে আদেশ করেছেন তা দলীল ও নবী-নির্দেশনার ভিত্তিতেই করেছেন। আর উমর (রা.) যখন এই নিয়ম চালু করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা.)এর ইমামতিতে সকল মানুষকে একত্র করে দিলেন তখন সবাই এই নামায জামাআতের সাথে আদায় করতে থাকেন। তখন অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, তলহা, যুবায়ের, মুআজ ও উবাই (রা.) প্রমুখ বড় বড় মুহাজির ও আনসারী সাহাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কেউ তা প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং সমর্থন

করেছেন এবং তাঁর সাথে একমত হয়েছেন এবং অন্যদেরকে এই আদেশই করেছেন।" -আলইখতিয়ার লি-তালীলিল মুখতার, ইমাম আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আলমাওসিলী ১/৭৪

পঞ্চম দলীল : সুন্নতে মুতাওয়ারাসা

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) উপরোক্ত বক্তব্যে বাস্তবতার যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তাঁর সঙ্গে যেকোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি ও প্রজ্ঞাবান আলেম একাত্ম হবেন। আর এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারাবীহ নামায বিশ রাকাআত হওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই শিক্ষা দ্বারা প্রমাণিত, যা সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে সর্বযুগে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ব্যাপক ও সম্মিলিতভাবে অনুসৃত। নবী-শিক্ষার এই প্রকারটিকে 'সুন্নতে মুতাওয়ারাসা' (ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে অনুসৃত সুন্নাহ) বলা হয়; যা শুধু মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই নীতিটি সম্পর্কে আরো জানতে হলে শ্রদ্ধেয় আলেমগণ নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতে পারেন-

(١) الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص ١١٧ (٢) ترتيب المدارك، قاضي عياض ١: ٦٦ (٣) الكفاية في علم الرواية، خطيب البغدادي ص ٣٢-٣٣، ٤٧٢ (٤) أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء للشيخ محمد عوامة ص ٨٢-٩٥

এই সুন্নতে মুতাওয়ারাসা তারাবীর রাকাআত বিষয়ক মাসআলার মূল বুনিয়াদ। আমাদের আগের আলোচনা থেকেও তা প্রমাণিত হয়েছে। আরো স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি লক্ষ করুন।

তাবেয়ী আবুল আলিয়া (রহ.) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন-

إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَصُومُونَ النَّهَارَ وَلَا يُحْسِنُونَ أَنْ يَقْرَؤُوْا، فَلَوْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ، وَلٰكِنَّهُ حَسَنٌ، فَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"হযরত উমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে রমযান মাসে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার আদেশ করলেন এবং বললেন, লোকেরা দিনে রোযা রাখে, কিন্তু

রাতে উত্তমরূপে কুরআন পড়তে পারে না। আপনি যদি রাতে তাঁদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। হযরত উবাই (রা.) উত্তরে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, এটা তো ইতিপূর্বে ছিল না। উত্তরে তিনি বললেন, তা আমি জানি; কিন্তু এটা ভাল। তখন হযরত উবাই (রা.) তাদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত নামায পড়লেন।" –আলআহাদীসুল মুখতারাহ, ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদেসী ১/৩৮৪; তাসদীদুল ইসাবা ৮০; মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানী–কানযুল উম্মাল ৮/৪০৮, হাদীস ২৩৪৭১

মুসনাদে আহমদ ইবনে মানী-এর সনদ এই মুহূর্তে আমাদের সামনে নেই; কিন্তু আলআহাদীসুল মুখতারাহ', যা সহীহ হাদীসের একটি উত্তম সংকলন–এর সনদ খোদ শায়খ আলবানী মরহুম তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং একে যয়ীফ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কথা এই যে, সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের এবং হাদীসটির বক্তব্য বিভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে সহীহ।

এই হাদীসে লক্ষ করার বিষয় এই যে, কয়েকটি ছোট ছোট জামাআতকে একত্র করে এক ইমামের পেছনে একটি বড় জামাআত বানিয়ে দেওয়া একটি ব্যবস্থাপনাগত বিষয়। শরীয়তে তা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল নেই; বরং তা শরীয়তের রুচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তথাপি উবাই ইবনে কা'ব (রা.) সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং বলে দিয়েছেন– هذا شيء لم يكن 'এভাবে এক জামাআতে তারাবীহ পড়ার ব্যবস্থা তো আগে ছিল না।' এরপর হযরত উমর (রা.) তাঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলে তিনি সম্মত হয়েছেন। কিন্তু তারাবীর রাকাআত-সংখ্যার ব্যাপারে তাঁকে কিছু বলতে হয়নি। তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়িয়েছেন। এটা কীভাবে সম্ভব হল? যদি বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে তাঁর কাছে নবী-আদর্শ বিদ্যমান না থাকত তাহলে তো তিনি আরো শক্তভাবে বলতেন– إن هذا شيء لم يكن 'এই বিষয়টি তো আগে ছিল না।' তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা তো কোন ব্যবস্থাপনাগত বিষয় নয়, শরীয়তের বিষয় এবং শরীয়তের একটি বিধান। যদি প্রথম থেকে অন্য কোন রীতি থাকত যেমন আট রাকাআত ইত্যাদি তাহলে যিনি একটি ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে বলেন, এ বিষয়টি ইতিপূর্বে ছিল না, শরীয়তের বিধান সম্পর্কে তাঁর অবস্থান কী হবে? কিন্তু না উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেছেন, না আশারায়ে মুবাশশারার কেউ, না কোন মুহাজির বা আনসারী সাহাবী আর না অন্য কোন সাহাবী। যদি তাঁদের নিকটে বিশ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে কোন নববী-শিক্ষা না থাকত; বরং এর বিপরীতে আট রাকাআতের শিক্ষাই থাকত তাহলে তাঁরা সবাই নিশ্চুপ থাকেন কীভাবে? আর কীভাবে নিজেরাও বিশ

রাকাআত পড়তে থাকেন? আর কীভাবেই বা মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত হওয়ার উপর সম্মত থাকেন?

প্রথমত এ বিষয়টি কিয়াস বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার মত নয়; তাছাড়া কোন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে হযরত উমর (রা.) তারাবীর রাকাআত-সংখ্যার ব্যাপারে মুহাজির বা আনসারীদের সাথে পরামর্শ করেছেন; অথচ শরীয়ত ও ব্যবস্থাপনা উভয় ধরনের বিষয়াদিতে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করাই তাঁর সাধারণ নীতি ছিল। তাহলে কোন পরামর্শ ও আলোচনা ছাড়া কীভাবে সবাই বিশ রাকাআতের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেন? কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁদের এই ঐকমত্যের পেছনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনাই কার্যকর ছিল। যদি তারাবীর বিষয়ে তাঁদের কাছে নববী-শিক্ষা এই থাকত যে, তারাবীহ কেবল আট রাকাআতই হতে হবে, তাহলে না হযরত উবাই (রা.) বিশ রাকাআত পড়াতেন, না মুহাজির-আনসার ও অন্যান্য সাহাবী এসম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতেন।

দ্বীন সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সংবেদনশীলতা যারা জানেন তারা এ বিষয়টি খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এই অবনতির যুগেও কোন বেদআতের সূচনা ঘটলে উলামায়ে কেরাম তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন; তো একটু চিন্তা করুন, সেই পুণ্যযুগ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী হওয়া উচিত?

সেই আদর্শ সমাজের ব্যাপারে এই কল্পনাও কি করা সম্ভব যে, সেখানে নববী-শিক্ষা ও নির্দেশনার পরিপন্থী একটি নতুন মতের উদ্ভব ঘটবে আর সবাই তা শরীয়ত হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন? নাউযুবিল্লাহ।

সারকথা হল, বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে মুহাজির ও আনসারের ঐকমত্য, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহর মূলে রয়েছে তারাবীহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ফরমান বা আমল– যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্নভাবে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। একেই সুন্নতে মুতাওয়ারাসা বলে– যা হাদীস ও সুন্নাহর একটি শক্তিশালী প্রকার এবং যার অনুসরণ করার আদেশ মুমিনদেরকে করা হয়েছে।

ষষ্ঠ দলীল : মারফূ হাদীস

এখন প্রশ্ন হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ফরমান বা আমলের বিবরণ কোথায়? এর উত্তর আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, যে নববী-শিক্ষা সাহাবা

যুগ থেকে ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্ন কর্ম-ধারার মাধ্যমে, মারফূ হুক্মীর মাধ্যমে, ইজমায়ে সাহাবা বা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহর ভিত্তিরূপে পরবর্তীদের নিকট পৌঁছেছে, তার নিকট মৌখিক বর্ণনাসূত্রে আসার প্রয়োজন থাকে না। এসব ক্ষেত্রে কখনো মৌখিক বিবরণ সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকে, কখনো যয়ীফ সনদে। কখনো একেবারেই থাকে না। –ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী ৬/১২৪

কিন্তু যেহেতু মৌখিক বর্ণনাসূত্রের চেয়ে উপরোক্ত সূত্রগুলো প্রামাণিকতার বিচারে অধিক শক্তিশালী, তাই শুধু মৌখিক বর্ণনা-সূত্রে বর্ণিত না হওয়ার কারণে উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয়কে অস্বীকার করার কোন সুযোগ শরীয়তে নেই। যুক্তির বিচারেও এটা অত্যন্ত হাস্যকর যে, দুএকজন বর্ণনাকারী থেকে প্রাপ্ত বিবরণকে শুধু এজন্য গ্রহণ করা হবে যে তা মৌখিক বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত। পক্ষান্তরে নবীজীর যে শিক্ষা সুন্নতে মুতাওয়ারাসা ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহর মাধ্যমে সংরক্ষিত তা অস্বীকার করা হবে। যদিও তা হাদীসে মুতাওয়াতিরের (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর বিবরণের) মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত।

বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে উপরোক্ত শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ ছাড়াও নববী-আমলের একটি মৌখিক বিবরণও হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা (রহ., ১৫৯-২৩৫ হি.) তাঁর মূল্যবান হাদীস-সংকলন 'আলমুসান্নাফ'-এ বলেন–

حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَّالْوِتْرَ.

"আমাকে ইয়াযীদ ইবনে হারুন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে ইবরাহীম ইবনে উসমান বলেছেন, তিনি হাকাম থেকে, তিনি মিকসাম থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকাআত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।" –আলমুসান্নাফ ৫/২২৫

এই হাদীসটি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবেও রয়েছে। দেখুন, আলমুনতাখাব মিন মুসনাদি আব্দ ইবনে হুমাইদ ২১৮, হাদীস ৬৫৩; আস্সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী ১১/৩১১, হাদীস ১২১০২; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী ১/৪৪৪, হাদীস ৮০২; আত্তামহীদ, ইবনে আব্দুল বার ৮/১১৫; আলইস্তিয্কার ৫/১৫৬

এই হাদীস সম্পর্কে গায়রে মুকাল্লেদদের দাবি হল, এটি মওযূ। কিন্তু যখন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল যে, কোন হাদীসের ইমাম কিংবা অন্তত নির্ভরযোগ্য কোন মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতিতে উপরোক্ত মওযূ হওয়া প্রমাণ করুন, শুধু মৌখিক দাবিতে কাজ হবে না, তখন তারা এর কোন উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম হয়নি।

হাঁ, এটা ঠিক যে, কতিপয় মুহাদ্দিস এর সনদকে যয়ীফ বলেছেন। কেননা সনদে ইবরাহীম ইবনে উসমান নামক একজন রাবী আছেন, যিনি যয়ীফ। মনে রাখতে হবে যে, অগ্রগণ্য মতানুসারে ইবরাহীম ইবনে উসমানকে চরম যয়ীফ বা মাতরূক-পরিত্যাজ্য বলা ঠিক নয়। দেখুন আলকামিল, ইবনে আদী ১/৩৮৯-৩৯২; তাহযীবুত তাহযীব ১/১৪৪; ইলাউস সুনান ৭/৮২-৮৪; রাকাআতে তারাবীহ, মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী ৬৩-৬৯; রিসালায়ে তারাবীহ, মাওলানা গোলাম রাসূল (আহ্‌লে হাদীস আলেম) ২৪-২৫

মওযূ ও যয়ীফের মাঝে আসমান-যমিন পার্থক্য। মওযূ তো হাদীসই নয়, মিথ্যুকরা একে হাদীস নামে চালিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র। আর যয়ীফ অর্থ হল বিবরণটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। বলাবাহুল্য, এর কারণে বিবরণটিকে ভিত্তিহীন বলে দেওয়া যায় না। উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি এই যে, যয়ীফ দুই প্রকার–এক : 'যয়ীফ' সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াতটির বক্তব্যও শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর। অর্থাৎ এই বক্তব্যের অনুকূলে শরীয়তের কোন দলীল তো নেই-ই; বরং বিপরীতে দলীল রয়েছে। এই যয়ীফ কোন অবস্থাতেই আমলযোগ্য নয়। দুই : রেওয়ায়াতটি 'যয়ীফ' সনদে বর্ণিত; কিন্তু তার বক্তব্যের সমর্থনে শরীয়তের অন্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হল এধরনের রেওয়ায়াতকে 'যয়ীফ' বলা হলে তা হবে শুধু 'সনদ'এর বিবেচনায় এবং নিছক নিয়মপালন। অন্যথায় বক্তব্য ও মর্মের বিচারে এই বর্ণনা সহীহ।

বিশ রাকাআত তারাবীহ সম্পর্কে যে রেওয়ায়াত সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে তার বিষয়টিও এমন। অর্থাৎ শুধু সনদের বিচারে দুর্বল; কিন্তু বক্তব্য ইতিপূর্বে উল্লিখিত পাঁচ ধরনের শক্তিশালী দলীল দ্বারা সমর্থিত। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এধরনের যয়ীফকে الضعيف المتلقى بالقبول 'এমন হাদীস যার সনদ যয়ীফ, কিন্তু বক্তব্য সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে গোটা উম্মতের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত।' উসূলে হাদীসের সিদ্ধান্ত হল, তা সহীহ এবং দুএক সূত্রে বর্ণিত সাধারণ সহীহ হাদীসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

উসূলে হাদীসের এই নীতির ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রের অনেক ইমামের এবং উসূলে হাদীসের বহু কিতাবের উদ্ধৃতি আমাদের কাছে রয়েছে। এখানে শুধু তিনটি

উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

১. ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ.) উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য ও দলীলভিত্তিক কিতাব 'আননুকাত'এ লেখেন–

إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح، حتى ينزل منزلة المتواتر.

"যয়ীফ হাদীস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর (মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের) নিকট সমাদৃত হয় তখন তার উপর আমল করা হবে– এটাই বিশুদ্ধ মত। এমনকি তখন তা মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত) হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।" –আন্‌নুকাত আলা-মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ ১/৩৯০

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) 'আন্‌নুকাত আলা-কিতাবি ইবনিস সালাহ' ১/৪৯৪-এ লেখেন–

ومن جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل بمدلول الحديث، فإنه يقبل حتى يجب العمل به، وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول.

"হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হল, ইমামগণ তার বক্তব্যের উপর আমল করতে একমত হওয়া। এ ক্ষেত্রে হাদীসটি গ্রহণ করা হবে এবং এর উপর আমল অপরিহার্য হবে। উসূলের অনেক ইমাম তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।"

এই সর্বস্বীকৃত নীতির আলোকে উপরোক্ত হাদীসটির সনদ এবং মতন (বা বক্তব্য অর্থাৎ তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হওয়ার) বিষয়ে চিন্তা করুন। এর সনদ যয়ীফ কিন্তু বক্তব্য সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে প্রতি যুগের সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে সংরক্ষিত। এজন্য উপরোক্ত নীতির আলোকে সনদের দুর্বলতা এখানে কোন প্রভাব ফেলবে না; হাদীসের বক্তব্য অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীসের মতই অবশ্য অনুসরণীয় হবে।

এজন্য অনেক আলেম বিশ রাকাআত তারাবীর আলোচনায় এই হাদীসটিও উল্লেখ করেন। যেহেতু এই হাদীস দ্বারা তাঁদের প্রমাণ গ্রহণ উসূলে হাদীস এবং উসূলে ফিক্‌হের একটি সর্বস্বীকৃত নীতির উপরই ভিত্তিশীল তাই এ বিষয়ে গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুদের আশ্চর্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এই হাদীস সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে ইলাউস সুনান ৭/৮২-৮৪; মুহাদ্দিসে কাবীর হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.)এর কিতাব

'রাকাআতে তারাবীহ' ৬৩-৬৯ এবং মাওলানা আমীন সফদর (রহ.)এর কিতাব 'তাহ্কীকে মাসআলায়ে তারাবীহ' ১/২০৫-২১৩ (মাজমূআয়ে রাসায়েল) দেখা যেতে পারে।

এই হাদীসকে গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা যদি হাদীসের ইমামগণের অনুসরণ করে 'যয়ীফ' বলে থাকেন তাহলে এই আশা করা কি অযৌক্তিক হবে যে, তারা একে হাদীসের ইমামগণেরই নীতি অনুসারে অবশ্য আমলযোগ্য বলে স্বীকার করে নেবেন।

যাহোক, উপরোক্ত পাঁচ ধরনের অকাট্য দলীল এবং উল্লেখিত মারফূ হাদীসের ভিত্তিতে– যা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্হের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশ্য আমলযোগ্য– তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা বিশ। অন্যান্য ফকীহর মত হানাফী মায্হাবের ফকীহগণের ফত্ওয়া তা-ই। মালেকী মাযহাবে যদিও কিছুটা মতপার্থক্য আছে কিন্তু তা তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা হ্রাস করার বিষয়ে নয়; তাদের নিকট বিতরসহ তারাবীর সর্বমোট রাকাআত-সংখ্যা ৩৯। –আলমুদাওওনাতুল কুবরা ১/১৯৩

তবে মালেকী মাযহাবের কোন কোন মুহাদ্দিস যেমন ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) প্রমুখ তারাবীর নামায ৩৬ রাকাআতের স্থলে ২০ রাকাআত পড়াকেই উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে করেন।

গায়রে মুকাল্লেদদের দলীল সম্পর্কে কিছু কথা

উপরোক্ত দলীলসমূহের বিরোধিতার মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মাহর অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের যে বন্ধুরা এই নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছেন (অর্থাৎ শুধু আট রাকাআত পড়া এবং বিশ রাকাআতকে বেদআত বা নাজায়েয আখ্যা দেওয়া) তাদের কর্তব্য ছিল এই গর্হিত কর্মের কারণে অনুতপ্ত হওয়া অথচ তারা গোটা মুসলিম উম্মাহকেই হাদীস ও সুন্নাহ বিরোধী আখ্যায়িত করতে আরম্ভ করেছেন আর নিজেদের ব্যাপারে হাদীস অনুসরণকারী বলে দাবি করতে শুরু করেছেন! কিন্তু তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, আপনাদের কাছে তারাবীহ আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং বিশ রাকাআত নাজায়েয হওয়ার পক্ষে কী দলীল রয়েছে? তখন সর্ব-সাকুল্যে সঞ্চয় যা বের হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. তারা তাহাজ্জুদবিষয়ক একটি সহীহ হাদীসের ভুলব্যাখ্যা করে তা তারাবীর ব্যাপারে প্রয়োগ করেন। বলেন, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নামাযেরই দুই নাম। যে নামায এগারো মাস তাহাজ্জুদ থাকে তাই রমযানে তারাবীহ হয়ে যায়। তাদেরকে যখন চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল যে, তারাবীহ-তাহাজ্জুদ একই নামায, এটা

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন এবং আরো প্রমাণ করুন, তাহাজ্জুদ নামায আট রাকাআতের বেশি পড়া যায় না। তখন তাদের পক্ষে কোন কথাই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। আর না কখনো সম্ভব হবে। মজার কথা এই যে, যখন তাদেরকে বলা হল যে, তারাবীহ-তাহাজ্জুদ এক নামায– এ কথাটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন, তখন তারা সহীহ হাদীসের পরিবর্তে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)এর একটি বক্তব্য পেশ করলেন! তাদের নীতি যেন এই, যেখানে মানব না সেখানে খুলাফায়ে রাশেদীনকেও মানব না, আর বিশেষ উদ্দেশ্যে মানতে হলে আজকের যুগের কাশ্মীরীকেও মানতে আপত্তি নেই!

আল্লাহর এই বান্দারা কাশ্মীরী (রহ.)এর দলীলবিহীন কথা তো মেনে নিয়েছে, কিন্তু তাঁর উস্তাদগণের উস্তাদ ফকীহুন নফ্স হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে অনেক দলীলপ্রমাণ দ্বারা দেখিয়েছেন যে, তারাবীহ-তাহাজ্জুদ ভিন্ন ভিন্ন নামায– এটা তাদের নজরে পড়েনি। দেখুন, তালীফাতে রশীদিয়া ৩০৬-৩২৩

তাদের নীতির আরেকটি আশ্চর্যজনক দিক এই যে, তারা একদিকে বলছেন তারাবীহ-তাহাজ্জুদ এক নামায, অন্যদিকে বলছেন তারাবীহ আট রাকাআতের বেশি পড়া নাজায়েয বা বেদআত। অথচ তাহাজ্জুদের ব্যাপারে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এর রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারিত নয়। দুই রাকাআত করে যত রাকাআত ইচ্ছা পড়তে থাকুন এবং যখন সুব্হে সাদেকের সময় নিকটবর্তী হওয়ার আশংকা হয় তখন বিতর পড়ে নিন। দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৯

অন্য হাদীসে এসেছে–

أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدٰى عَشَرَةَ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

"তোমরা (তাহাজ্জুদ ও) বিত্র পাঁচ রাকাআত পড়, সাত রাকাআত পড়, নয় রাকাআত পড়, এগারো রাকাআত পড় কিংবা তার চেয়ে বেশি পড়।" –সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৪২৯; মুস্তাদ্রাকে হাকেম, হাদীস ১১৭৮

ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহ.) প্রমুখ বলেছেন যে, হাদীসটি সহীহ। –নাইলুল আওতার, শাওকানী ৩/৪৩; আত্তালখীসুল হাবীর, ইবনে হাজার আসকালানী ২/১৪

তাহাজ্জুদের যে হাদীস গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা তারাবীর ব্যাপারে প্রয়োগ করেন তা সহীহ বুখারী ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রমযান মাসে এবং রমযানের বাইরে অন্যান্য মাসে চার রাকাআত করে আট রাকাআত এবং তিন রাকাআত বিতর– এই এগারো রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়তেন না।

অথচ এটাও তাঁর সবসময়ের আমল ছিল না। কেননা স্বয়ং আম্মাজান আয়েশা (রা.)এর বর্ণনাতেই আছে যে, তাহাজ্জুদের নামায ফজরের সুন্নত ছাড়া তেরো রাকাআত।–সহীহ বুখারী (১১৬৪) ফাতহুল বারী ৩/২৬, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১০

অন্যান্য সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায ইশার দুই রাকাআত সুন্নত ও বিতর ছাড়া কখনো কখনো সর্বমোট চৌদ্দ রাকাআত বা ষোল রাকাআত হত; বরং কোন কোন বর্ণনা থেকে আঠারো রাকাআত হওয়াও বোঝা যায়। –নাইলুল আওতার, শাওকানী ৩/২১-২২, হাদীস ৮৯৭; আত্‌তারাবীহু আক্‌সারা মিন আলফি 'আম ফিল-মাস্‌জিদিন নাবাবী, আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালেম, সৌদি আরব ২১-২৩

এসব সত্ত্বেও তারা একদিকে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে এক নামায সাব্যস্ত করছেন, অন্যদিকে তারাবীর নামায আট রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়াকে নাজায়েয বা বেদআত বলছেন; অথচ তাহাজ্জুদ নামায সহীহ হাদীস অনুসারে আট রাকাআতের বেশি পড়াও জায়েয। প্রশ্ন এই যে, তাদের এই অবস্থান সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা নয় কি?

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)এর হাদীস ব্যাপারে তাদের প্রতি সর্বশেষ কথা এই যে, এই হাদীস যদি তারাবীর ব্যাপারে হত এবং তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারণ করাই এর উদ্দেশ্য হত তাহলে উম্মুল মুমিনীন নিজেই মসজিদে নববীর বিশ রাকাআত তারাবীর উপর আপত্তি করতেন। ১৪ হিজরী থেকে উম্মুল মুমিনীনের মৃত্যুসন ৫৭ হিজরী পর্যন্ত চল্লিশ বছর অবিরাম তাঁর হুজ্‌রা সংলগ্ন মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত তারাবীহ হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন কি কখনো এতে আপত্তি করেছেন? তাঁর কাছে তারাবীর রাকাআত সংখ্যার ব্যাপারে একটি অকাট্য হাদীস রয়েছে আর তাঁর সামনে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই হাদীসের বিরোধিতা হচ্ছে, তারপরও তিনি চুপ থাকবেন? কোন আপত্তি করবেন না? এটাও কি সম্ভব?

বাস্তব কথা এই যে, সাহাবায়ে কেরামের মাকাম সম্পর্কে যারা অবহিত নয় তাদের পক্ষে এর চেয়ে অবাস্তব কথাও মেনে নেওয়া সম্ভব। নতুবা এ তো অতি স্পষ্ট যে, যেহেতু হাদীসটির বিষয়বস্তু তারাবীর রাকাআত-সংখ্যার নয়, তাই তিনি কখনো একে বিশ রাকাআতের বিপরীতে পেশ করেননি।

২. আমাদের এই বন্ধুদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় দলীল হল ঈসা ইবনে জারিয়ার

একটি বর্ণনা– যা তিনি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। বর্ণানাটি এই–

صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَّخْرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِيْهِ حَتّٰى أَصْبَحْنَا. قَالَ: إِنِّيْ كَرِهْتُ أَوْ خَشِيْتُ أَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ.

"রমযানের এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে আট রাকাআত নামায এবং বিতর পড়লেন। পরদিন আমরা মসজিদে একত্র হলাম এবং আশা করছিলাম, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন। সকাল পর্যন্ত আমরা এই অবস্থায়ই থাকলাম। নবীজী বললেন, আমি আশংকা করেছি যে, তোমাদের উপর বিতর ফরয করে দেওয়া হবে।"

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের প্রচেষ্টা এজন্য ঠিক নয় যে, ঈসা ইবনে জারিয়া একজন যয়ীফ রাবী। কতিপয় ইমাম তাকে মাতরূক (পরিত্যাজ্য, যার বর্ণনা দলীল বা সমর্থক দলীল কোন হিসাবেই গ্রহণযোগ্য নয়) এবং মুনকারুল হাদীস (ভুল ও আপত্তিকর কথাকে হাদীস হিসেবে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ণনাকারী) পর্যন্ত বলেছেন।

ইমাম ইবনে আদী (রহ.) তার উপরোক্ত বর্ণনাকে 'গায়রে মাহফূয' সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আদী (রহ.)এর পরিভাষায় 'গায়রে মাহফূয' শব্দটি মুন্‌কার বা বাতিল রেওয়ায়াতের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। 'মুনকার' হচ্ছে যয়ীফ হাদীসের একটি নিম্নমানের প্রকার যা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ বৈধ নয়। দেখুন, তাহযীবুল কামাল ১৪/৫৩৩-৫৩৪; আলকামিল ইবনে আদী ৬/৪৩৬; আয্‌যুয়াফাউল কাবীর, উকাইলী ৩/৩৮৩; ইত্‌হাফুল মাহারাহ বিআত্‌রাফিল আশারাহ, ইবনে হাজার ৩/৩০৯

এছাড়া এই রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, এটি রমযানের এক রাতের ঘটনা। যেহেতু সে সময় তারাবীর নামায জামাআতের সাথে পড়ার প্রচলন ছিল না, তাই এ রেওয়ায়াতটিকে সহীহ ধরে নিলেও এই সম্ভাবনা থাকে যে অবশিষ্ট রাকাআতগুলো জামাআত ছাড়া একাকী পড়ে নেওয়া হয়েছে। আর এটা নিছক অনুমানের কথা নয়, সহীহ মুসলিমে এ ধরনের এক ঘটনায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, فصلى صلاة لم يصلها عندنا. 'এরপর কিছু নামায পড়েছেন, যা আমাদের কাছে পড়েননি।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১০৪

মোটকথা এমন একটি মুনকার এবং অতিদুর্বল রেওয়ায়াত দ্বারা (উপরন্তু যা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং আসল বিষয়ে অস্পষ্ট) উপরোক্ত অকাট্য দলীলসমূহের বিরোধিতা করা একদম ভুল। ভাবার বিষয় হল, যদি এই হাদীস সহীহ হত এবং এর দ্বারা তারাবীহ আট রাকাআত হওয়া প্রমাণিত হত তাহলে হযরত জাবের (রা.)ই সর্বপ্রথম বিশ রাকাআতের বিপক্ষে এই হাদীসটি পেশ করতেন।

৩. তৃতীয় যে 'বস্তু' তাদের কাছে আছে তা-ও এই ঈসা ইবনে জারিয়ার বিকৃত বিবরণ যা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সনদেও সেই ঈসা ইবনে জারিয়া, যে রাবী হিসাবে নিতান্ত দুর্বল। আবার ঘটনাটি যে তারাবীর ব্যাপারে তারও কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবত ঘটনাটি তাহাজ্জুদের ব্যাপারে ঘটেছিল। আর তা রমযানে হয়েছিল কিনা তাও সন্দেহপূর্ণ।

এসব বিষয় আরো বিস্তারিতভাবে জানতে হলে মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.)এর 'রাকাআতে তারাবীহ' (৪০-৪৩) অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

এখানেও মনে রাখা উচিত যে, এই হাদীসটি যদি সহীহ হত এবং এতে তারাবীর রাকআত-সংখ্যাই উল্লেখিত হত তাহলে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) আট রাকাআতই পড়াতেন, বিশ রাকাআত পড়াতেন না। এসব বিষয় এবং অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত বর্ণনা দুটি যয়ীফ রাবী ঈসা ইবনে জারিয়ার স্মরণ শক্তিজনিত দুর্বলতা থেকে সৃষ্ট এবং এই রেওয়ায়াত দুটি তার ওই সব ভুল বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর কারণে হাদীসবিশারদ ইমামগণ তাকে 'মুনকারুল হাদীস' বা মাতরূক সাব্যস্ত করেছেন।

আফসোসের বিষয় এই যে, গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা যয়ীফ সূত্রে বর্ণিত এমন একটি হাদীস পরিত্যাগ করলেন– যার বক্তব্য সঠিক এবং যা অন্যান্য অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে সহীহ হিসেবে প্রমাণিত– আর এমন যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করে নেন– যার সনদ 'অতি যয়ীফ' হওয়ার পাশাপাশি তার বক্তব্যও দলীলের ভিত্তিতে 'মুনকার' বা ভুল হওয়া প্রমাণিত।

৪. চতুর্থ এবং সর্বশেষ যে বস্তু তাদের কাছে রয়েছে তাও একটি ভুল বিবরণ। এক বর্ণনাকারী হযরত উমর (রা.)এর যুগের নামাযের বিবরণ দিচ্ছিল। সে ভুলক্রমে বিশের স্থলে এগারো রাকাআতের কথা বলল। ব্যাস, আমাদের গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা একেই দলীল বানিয়ে নিলেন। অথচ হযরত উমর (রা.)এর যুগে তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হত তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।। অনেক সহীহ রেওয়ায়াত, ইজমা ও ব্যাপক কর্মের মাধ্যমে তা প্রমাণিত। ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) এবং অন্যান্য মুহাক্কিক আলেম বলেছেন যে, বিশের স্থলে

এগারো বলা বর্ণনাকারীর ভুল। দেখুন, আলইসতিযকার ৫/১৫৬

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজমা, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং অন্য সব অকাট্য দলীলের বিপরীতে তাদের কাছে এই চার 'বস্তু' রয়েছে। যার একটি হল তাহাজ্জুদের হাদীস যা জোরপূর্বক তারাবীর ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়। দুটি মুনকার ও অতিদুর্বল রেওয়ায়াত যা বর্ণনাগত দিক থেকে ভুল হওয়ার পাশাপাশি মূল বিষয়েই অস্পষ্ট। আর সবশেষে একজন রাবীর ভুল বিবরণ, যে বিশের স্থলে এগারো উল্লেখ করেছে।

একটি সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা এবং তিনটি মুনকার ও ভুল বর্ণনা নিয়ে তারা গোটা উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নেমে পড়েছেন এবং বিশ রাকাআতকে নাজায়েয, বেদআত এবং সহীহ হাদীস বিরোধী ঘোষণা করছেন!

কত ভাল হত, যদি তারা এই ভুল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দ্বিতীয়বার চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং মৃত্যুর আগেই তা সংশোধন করে মুসলিম উম্মাহর বিরোধিতা ও সিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুতির দায়ভার থেকে মুক্ত হতেন!

বিশেষ জ্ঞাতব্য

তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা-বিষয়ক এই আলোচনার পর– যা বর্তমান-প্রেক্ষিতে কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে– আমরা মুসল্লী ভাইদেরকে একটি বিশেষ নসীহত পেশ করতে চাই। তা এই যে, আমরা যেন সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অমনোযোগিতা থেকে বেঁচে থাকি যা অনেক মসজিদেই দেখা যায়। যেমন, নামায তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য রুকূ, কওমা, জল্‌সা, সেজ্‌দা ইত্যাদিতে তাড়াহুড়া করা। কেননা নামায ফরয হোক বা নফল, তার মধ্যে রুকূ, সেজদা, কওমা, জলসা ইত্যাদি ইতেদালের সাথে শান্তভাবে আদায় করা ওয়াজিব। এছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না।

তদ্রূপ তারাবীতে এত তাড়াতাড়ি কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, যে কারণে শব্দাবলিও ঠিকমত বোঝা যায় না। বলাবাহুল্য, এতদ্রুত পড়ে খতম করার চেয়ে খতমের চিন্তা না করে শান্তভাবে অল্প অল্প করে পড়াই উত্তম।

এধরনের আরো কিছু ত্রুটি আছে যা সংশোধন করে সহীহ পদ্ধতিতে নামায এবং কুরআন তেলাওয়াতের আমলটি করা জরুরি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দিন, আমীন।

[অক্টোবর-নভেম্বর '০৫]

নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) রচিত 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা' বাংলা সংস্করণ : একটি পর্যালোচনা

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) গত শতাব্দীর একজন ব্যাপক আলোচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সংকলিত বিশাল গ্রন্থ 'সিলসিলাতুয যয়ীফা' হাদীস বিশারদদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। স্বভাবতই এ নিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরও আগ্রহ কম নয়। ফত্ওয়া বিভাগগুলোতে এ বিষয়ে মানুষের বহু প্রশ্ন এসে থাকে। এমনি একটি প্রশ্ন এবং বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এর জবাব পেশ করা হল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলোচ্য বিষয়টি মূলত গবেষণামূলক ইলমী আলোচনা হওয়ায় প্রয়োজনের খাতিরেই লেখাটিতে ব্যাপকভাবে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ।

–সম্পাদক

প্রশ্ন : বরাবর, ফত্ওয়া বিভাগ
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
৭৯/১এ, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

বিষয় : 'যয়ীফ ও জাল হাদীস সিরিজ' কিতাব ও কিতাবের মূল লেখক সম্পর্কে ফত্ওয়া বিভাগের মন্তব্য লিখিতভাবে জানার প্রসঙ্গে।

জনাব, প্রথমে আমার সালাম গ্রহণ করবেন। ফত্ওয়া বিভাগের মাধ্যমে আপনার নিকট উক্ত বিষয় সম্পর্কে জানার আবেদন করছি।

উল্লেখ্য, A T N বাংলা টিভির ইসলামী অনুষ্ঠানে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন

সাঈদী কিতাবটির মূল লেখক সম্পর্কে খুব ভালো মন্তব্য করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, উক্ত লেখক নাকি আরব ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন এবং ৬০এর দশকে তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান মুহাদ্দিস পদেও ছিলেন।

অতএব, মাওলানা সাঈদী সাহেবের তথ্যের ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ার কারণে আপনার নিকট কিতাব ও কিতাবের মূল লেখক সম্পর্কে সঠিক বিষয় জানার আবেদন করছি।

(সঙ্গে কিতাবটিও সংযুক্ত হল)

আবেদনকারী : মুহাম্মাদ রাইহান
১২৪, চকবাজার, ঢাকা, ৩১/০৩/২০০৪ঈ.

উত্তর : শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ, মৃত্যু ১৪২০ হি.) একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অংশ ইলমে হাদীসের খেদমতে ব্যয় করেছেন। মানুষের সামনে সহীহ হাদীস এবং যয়ীফ হাদীসের পার্থক্য নির্ণীত হোক, এ বিষয়ে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং আল্লাহ চাহে তো এজন্য তিনি আখেরাতে উত্তম প্রতিদান পাবেন। ولا نزكي على الله أحدا তথাপি তাঁর সমসাময়িক মুহাক্কিক ন্যায়নিষ্ঠ আহলে ইলমের দৃষ্টিতে তাঁর রচনা ও গবেষণা-কর্মে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়েছে তা এড়িয়ে যাওয়াও সমীচীন নয় । এ প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় এই–

১. সকল বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সত্ত্বেও শায়খ আলবানী (রহ.) সম্পর্কে এ বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত যে, উলূমুল হাদীসের জ্ঞান তিনি কোন বিশেষজ্ঞ ও মাহেরে ফনের নিকট থেকে গ্রহণ করেননি। ব্যক্তিগত অধ্যয়নই তাঁর মূল নির্ভর। অথচ একথা বলাই বাহুল্য যে, বিশেষজ্ঞ ও মাহেরে ফনের সাহচার্য ছাড়া কোন শাস্ত্রের প্রজ্ঞা ও পরিপক্কতা অর্জন করা যায় না। ব্যক্তিগত অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে পারে কিন্তু শাস্ত্রীয় পরিপক্কতা অর্জন হয় না। এটি শুধু একটি সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতিই নয়, বাস্তবতার নিরিখেও প্রমাণিত।

আমাদের জানা মতে হাদীসশাস্ত্রে আলবানী (রহ.)এর উস্তাদ মাত্র একজন। তাঁর কাছ থেকেও তিনি শুধু প্রথাগত 'ইজাযত' গ্রহণ করেছেন। তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকে শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞা ও পরিপক্কতা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। (দেখুন, মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী (মৃত্যু ১৪১২ হিজরী) 'আলআলবানী শুযূযুহু ওয়াআখতাউহু' ১/৯; শায়খ মুহাম্মাদ আওওয়ামা, 'আসারুল হাদীসিশ শরীফ ফিখ্তিলাফিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা' পৃ. ৪৭]

এজন্য কোন মাহের ও বিশেষজ্ঞের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত উলূমুল হাদীসের একজন সচেতন ছাত্রের কাছেও আলবানী সাহেবের এই দুর্বলতার প্রভাব তাঁর রচনাবলির অনেক স্থানেই প্রকটভাবে অনুভূত হয়। এ প্রসঙ্গে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারি। দীর্ঘ সময় শায়খ আলবানী (রহ.)এর রচনাবলি অধ্যয়নের সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁর রচনাবলিতে তথ্য ও উদ্ধৃতির প্রাচুর্য থাকলেও ইলমী গভীরতা কম বোধ হয়েছে। সূক্ষ্ম ও মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়াদিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর আলোচনা একটি অগভীর সিদ্ধান্তে সমাপ্ত হয়। এ জাতীয় অনেক দৃষ্টান্ত মুহাক্কিক গবেষকগণের লিখিত ইলমী সমালোচনামূলক কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সে সবের উদ্ধৃতি সম্ভব নয়; এজন্য আরবী ভাষা জানেন এমন পাঠক আমার রচনাধীন الشيخ الألباني وكتابه سلسلة الضعيفة (আশ্‌শায়খ আল-আলবানী ওয়া-কিতাবুহূ সিলসিলাতুয যয়ীফা) অধ্যয়ন করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি নমুনা পেশ করছি :

(ক) سكتوا عنه শব্দটি 'জর্‌হে মুবহাম' হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উলুমূল হাদীস ও 'জার্‌হ-তাদীল'এর সাথে জানাশোনা আছে এমন একজন ছাত্রও এ বিষয়টি বোঝে। অথচ তিনি অত্যন্ত গর্বের সাথে ঘোষণা করেছেন যে, শব্দটি 'জারহে মুফাস্‌সার' এবং এ ব্যাপারে এমন দলীল পেশ করেন যে, এতে শাস্ত্রজ্ঞদের 'ইবারত' বোঝার ব্যাপারে তার অদক্ষতা ও দুর্বলতার একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। (দেখুন সিলসিলাতুয যায়ীফা ১/৬৬২)

অথচ 'জারহে মুব্‌হাম', 'জার্‌হে মুফাস্‌সার' ও 'জার্‌হে মুবারহান'-এর মাঝে পার্থক্য করতে পারা এ শাস্ত্রের প্রাথমিক বিষয়ের একটি।

(খ) 'মুরসাল' শব্দের পারিভাষিক ব্যবহারসমূহের মাঝে পার্থক্য করতে না পারায় এমন একটি হাদীসকে মুরসাল আখ্যা দিয়ে 'যয়ীফ' সাব্যস্ত করেছেন যা 'সহীহ' ও 'মামূল বিহী' হওয়ার বিষয়ে 'খাইরুল কুরূন' তথা সাহাবা-তাবেয়ী যুগের এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র উম্মাহর ইজমা রয়েছে। এ বিষয়ে শায়খ আলবানীর মত জানার জন্য দেখুন তাঁর কিতাব 'ইরওয়াউল গালীল' ১/১৫৮ এবং হাদীসটির বিষয়ে সমগ্র উম্মাহর অবস্থান জানার জন্য দেখুন, ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.)এর কিতাব 'আলইস্তিযকার' ৮/১০।

(গ) رُوِيَ বা এ জাতীয় 'সিগায়ে মাজহুল'এর ক্ষেত্রে কেউ কেউ এই নীতি পেশ করেছেন যে, তা যয়ীফ বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। কেউ কেউ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণও করেছেন। কিন্তু শায়খ আলবানী (রহ.) এ

নীতির অর্থ এই নিয়েছেন যে, যে কোন ব্যক্তি 'সীগায়ে মাজহুল' ব্যবহার করেছেন তা 'যয়ীফ' বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করেছেন। ফলে তিনি কিছু সহীহ হাদীসকে এই বলে যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন যে, অমুক ইমাম হাদীসটি 'সীগায়ে মাজহুল' দ্বারা উল্লেখ করেছেন! বলাবাহুল্য, এটা এমনই ত্রুটি যা একজন সচেতন ছাত্রের পক্ষেও মানানসই নয়। কেননা অসংখ্য সহীহ হাদীস এমন আছে যা বর্ণনা করার সময় কোন না কোন ইমাম বা মুহাদ্দিস 'সীগায়ে মাজহুল' ব্যবহার করেছেন।

দেখুন, আলবানী (রহ.)এর কিতাব 'সালাতুত তারাবীহ'; মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.)এর 'আলআলবানী শুযূযুহু ওয়াআখতাউহু' ১/১৬-২০; শায়খ ইসমাঈল আনসারী (রহ.) রচিত 'তাসহীহু হাদীসি সালাতিত তারাবীহ' ২৩-২৪

এখানে শুধু দু একটি নমুনা পেশ করা হল। আলবানী (রহ.)এর এ জাতীয় অগভীর ও ত্রুটিপূর্ণ বক্তব্যের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি আমাদের কাছে রয়েছে, যা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

তবে এ ব্যাপারে একটি সাধারণ কথা হল, তিনি অনেক ক্ষেত্রে উসূলে হাদীসের ক্ষেত্রে شرح نخبه (শরহে নুখবা) ও الباعث الحثيث (আলবায়িসুল হাসীস) এবং 'জার্হ তাদীল'-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দানের জন্য 'তাকরীবুত তাহযীব'এর উপর নির্ভর করাকেই যথেষ্ট মনে করেন। এতে তিনি কোন ধরনের দ্বিধাবোধ করেন বলে মনে হয় না। শাস্ত্রীয় তাহকীক ও গবেষণার ক্ষেত্রে এর চেয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন নীতি আর কী হতে পারে?

এক হাদীস ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম আবু হাতেম রাযী, ইমাম তহাবী, ইমাম ইবনে হিব্বান প্রমুখ ইমামগণের মতে তা 'সহীহ'। কিন্তু তিনি হাদীসটিকে 'যয়ীফ' বলার বিষয়ে একেবারে নাছোড়বান্দা। তার যুক্তি হল হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী শরীক বিন আবদুল্লাহ আন্নাখায়ী। 'তাকরীবুত তাহযীবে' আছে, তিনি سيء الحفظ আর سيئ الحفظ রাবীর হাদীসকে 'সহীহ' বলা নিয়ম-বহির্ভূত। আলবানী (রহ.) যেন ইমাম বুখারী (রহ.)সহ হাদীস শাস্ত্রের ইমামদেরকে 'শরহে নুখবা' ও 'তাকরীবুত তাহযীব' পড়াচ্ছেন! বলা বাহুল্য হবে না যে, 'জার্হ তাদীল', উসূলে হাদীস এবং ফিকহুল হাদীসের বিষয়ে তাঁর অগভীর জ্ঞানই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের একমাত্র কারণ। দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যায়ীফা ২/৩৬২-৩৬৪

২. শায়খ আলবানী (রহ.) 'তাসহীহ-তাযয়ীফ' বিষয়ে তাঁর নীতি আলোচ্য কিতাবের শুরুতে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

ومما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة أنني لا أقلد أحدا فيما أصدره من الأحكام على تلك الأحاديث، وإنما أتبع القواعد العلمية التي وضعها أهل الحديث، وجروا عليها في إصدار أحكامهم على الأحاديث من صحة أو ضعف.

অর্থাৎ তিনি সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হাদীসবিশারদ ইমাম বা পরবর্তী হাফেযুল হাদীসগণের কারো অনুসরণ করেন না; বরং আয়িম্মায়ে হাদীস যে নীতিমালার আলোকে বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধির ফয়সালা করতেন তিনিও ওই সব নীতির অনুসরণ করবেন এবং সরাসরি ওই সব নীতির আলোকেই সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

প্রশ্ন হয় যদি হাদীসবিশারদ ইমামগণের নীতিমালা অনুসরণ করা বৈধ হয় তাহলে সেই সব নীতির আলোকে গৃহীত তাদের সিদ্ধান্তসমূহের তাকলীদ করা এমন কী দোষের বিষয় যে তা পরিহার করার ঘোষণা তাকে দিতে হল? অথচ একথা বলাই বাহুল্য যে, যারা এই সব নীতি নির্ধারণ করেছেন তারাই এর হাকীকত ও প্রয়োগ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয়ত শায়খ আলবানী (রহ.) কি হাদীস-শাস্ত্রে এই পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও পরিপক্কতার অধিকারী ছিলেন, যার ভিত্তিতে ইমামগণের সিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ করে নিজ বিচার-বিবেচনা মোতাবেক সেই সব নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারেন? শাস্ত্রের প্রাণপুরুষ ইমাম –যাঁদের বক্তব্য ও বাস্তব প্রয়োগ থেকেই শাস্ত্রের কায়দাকানুন তৈরি হয়– তাঁদের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করে তাদের 'নিয়ম' অনুসরণের ভাওতায় নিজস্ব বিচার-বিবেচনা-প্রসূত স্বেচ্ছাচারী 'তাস্‌হীহ-তাযয়ীফ'এর ফলাফল এই হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী ইমামগণের সাথে এমনকি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সাথেও মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছেন! সহীহ মুসলিমের প্রায় বিশটি বা ততোধিক হাদীসকে 'যয়ীফ' বলেছেন এবং সহীহ বুখারীরও বেশ কিছু হাদীসকে সরাসরি 'যয়ীফ' বা 'মুনকার' আখ্যা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, সহীহ বুখারীর ২১১৪ নং হাদীস ও ২৮৫৫ নং হাদীস। এ দুটি হাদীসকে 'যয়ীফুল জামিয়িস্ সাগীর' কিতাবে ক্রমিক নং ২৫৭৬ ও ৪৪৮৪ যয়ীফ বলেছেন। সহীহ মুসলিমের যেসব হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন, তার আলোচনা শায়খ মাহমূদ সাঈদ মামদূহ-এর কিতাব تنبيه المسلم إلي تعدي الألباني على صحيح مسلم (তাম্বীহুল মুসলিমি ইলা তাআদ্দিল আলবানী আলা-সহীহি মুসলিম)-এ বিদ্যমান রয়েছে। এতে শায়খ আলবানী (রহ.)এর সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি এবং তার দালীলিক আলোচনা পাওয়া যাবে।

যখন ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এবং তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব দুটির বিষয়েই তাঁর নীতি ও আচরণ এই, তখন অন্যদের ব্যাপারে তাঁর আচরিত নীতির কথা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয়ত যে বিষয়টা এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল, 'উলুমুল হাদীসের' মাঝারি মানের একজন ছাত্রও জানে যে, হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় এবং হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতার বিচারে পর্যায় নির্ধারণ, এক কথায় 'তাসহীহ-তাযয়ীফ' ও 'জারহ-তাদীল'এর বহু বিষয় এমন রয়েছে যা খোদ হাদীসবিশারদ ইমামগণের মধ্যেও মতভেদপূর্ণ। প্রশ্ন হয়, এ জাতীয় ক্ষেত্রে শায়খ আলবানী কোন্ মত বা পথ অবলম্বন করবেন? এ প্রশ্নের স্পষ্ট কোন উত্তর তাঁর বক্তব্যে পাওয়া যায় না। অথচ বিষয়টি অস্পষ্ট ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল না। তাঁর বাস্তব কর্মক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করেও কোন ন্যায়নিষ্ঠ পাঠকের পক্ষে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এ জাতীয় একাধিক মতপূর্ণ নীতিমালায় তিনি নির্দিষ্ট কোন অবস্থানে স্থির নন। কোথাও এক মত অবলম্বন করেন, অন্যত্র অপর মত। যথা 'মাসতূর'-এর হাদীস হুজ্জত হবে কি না; ইবনে হিব্বানের 'তাওসীক' গ্রহণযেগ্য কি না; হাদীসের 'তাসহীহ' দ্বারা রাবীর 'তাওসীক' হয় কি না; 'যিয়াদাতুস সিকাত' গ্রহণযোগ্য কি না ইত্যাদি বিষয়ে শায়খ আলবানী (রহ.) অনেক জায়গায় স্ববিরোধিতার জন্ম দিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শায়খ মাহমূদ সাঈদ মামদূহ রচিত التعريف بأوهام من قسم السنن إلي صحيح وضعيف (আত্‌তারীফ বিআওহামি মান কাস্‌সামাস সুনানা ইলা সহীহিউ ওয়াযয়ীফ) ১/২৫ এবং এ কিতাবের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আলোচনা।

চতুর্থত হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়গুলো জানতে হয় তার মধ্যে 'জারহ-তাদীল' তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় অন্যতম। এরই ভিত্তিতে রাবীদের স্থান ও পর্যায় নির্ণীত হয়, যা ছাড়া হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় করা কখনো সম্ভব নয়। শায়খ আলবানী (রহ.) তো হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের ব্যাপারে কারো তাকলীদ না করার ঘোষণা দিয়েছেন, প্রশ্ন হল, রাবীর জারহ-তাদীলের বিষয়ে তাঁর নীতি ও অবস্থান কী? তিনি কি এ বিষয়ে আয়িম্মায়ে হাদীসের তাকলীদ করবেন, নাকি জারহ-তাদীলের নীতিমালার আলোকে হাজার বছর আগের রাবীদের সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তি এবং এ ধরনের আরো হাজারো বিষয় সরাসরি যাচাই করবেন। এরপর রাবীদের স্থান ও পর্যায় নিরূপণ করবেন? এ প্রশ্নেরও স্পষ্ট কোন উত্তর তাঁর বক্তব্যে পাওয়া যায় না। তবে তাঁর বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ করলে দেখা যায়, 'জারহ-তাদীল'

বিষয়ে তিনি সাধারণত তাকলীদই করে থাকেন।

প্রশ্ন হয় রাবীর জার্‌হ-তাদীলের ব্যাপারে ইমামগণের তাকলীদ করা যাবে আর হাদীসের 'তাস্‌হীহ-তায্‌য়ীফ'এর ক্ষেত্রে তাঁদের তাকলীদ করা যাবে না- এই দ্বৈত নীতির যৌক্তিক কোন কারণ থাকতে পারে কি?

এছাড়া আরো আফসোসের বিষয় এই যে, শায়খ আলবানী (রহ.) রাবীদের জার্‌হ-তাদীলের বিষয়ে তাকলীদ করলেও সেটাকে যথাযথ তাকলীদ বলাও কঠিন। কেননা তিনি সাধারণত 'আসমায়ে রিজাল' ও 'জার্‌হ-তাদীল'এর সংক্ষিপ্ত কিতাবাদির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন অথবা দুএকটি মাঝারি ধরনের কিতাবের ভিত্তিতেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যান। বলাবাহুল্য, তাহকীক ও গবেষণার ক্ষেত্রে এগুলো নিতান্তই ছেলেমিপনা।

অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, তিনি শুধু 'তাকরীবুত তাহযীব', 'খুলাসা' বা 'মীযানুল ইতিদাল' ইত্যাদি কিতাবের উপর নির্ভর করেই কোন রাবীকে 'মাজহুল' বা 'যয়ীফ' আখ্যায়িত করেছেন। এরপর এরই ভিত্তিতে অনেক হাদীসকে 'যয়ীফ' সাব্যস্ত করেছেন অথচ 'জার্‌হ-তাদীল'এর বিস্তারিত ও দীর্ঘ কিতাবসমূহের সাহায্য নিলে তিনি দেখতেন যে, এসব রাবী গ্রহণযোগ্য এবং তাদের বর্ণিত ওই সকল হাদীসও সহীহ উপরন্তু তিনি বুঝতে পারতেন যে, এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ইমামগণের বক্তব্যই সঠিক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন রাবীর কথা আলোচিত হল :

১. 'আব্দুল্লাহ বিন যুগ্‌ব' সম্পর্কে মেশকাতের টীকায় (৩/১৫০০) লিখেছেন, 'তিনি 'মাজহুল' । দলীল হিসেবে বলেছেন, খুলাসায় তার ব্যাপারে জার্‌হ-তাদীলের ইমামগণের কারো মন্তব্য উল্লেখ করা হয়নি।

অথচ 'খুলাসার' মত সংক্ষিপ্ত কিতাব তো দূরের কথা, আসমায়ে রিজালের দশ বিশটি দীর্ঘ কিতাবেও যদি কোন রাবীর আলোচনা বা তার ব্যাপারে কারো সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় তবে তাকে 'মাজহুল' আখ্যা দেওয়ার অধিকার শায়খ আলবানী কেন অষ্টম শতাব্দীর হাফেজ যাহাবী (রহ.)এর মত ব্যক্তিত্বেরও নেই। (লিসানুল মীযান ৯/৭৯, তরজমা নং ৮৮৭৭ দ্রষ্টব্য) অথচ শায়খ আলবানী শুধু এই দলীলে যে, 'খুলাসা'য় আবদুল্লাহ বিন যুগ্‌বের ব্যাপারে কোন মন্তব্য বিদ্যমান নেই, তাকে মাজহুল আখ্যা দিচ্ছেন। খোদার বান্দা যদি খুলাসার সাথে আরো দুএকটি কিতাবের পাতা ওল্টানো পর্যন্তও ধৈর্য ধরতেন তবুও না হয় একটা কথা হত।

আফসোসের বিষয় এই যে, আবদুল্লাহ বিন যুগ্‌ব সাধারণ কোন রাবী নন, তিনি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। فرضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين তাঁর আলোচনা তারাজিমুস সাহাবা (সাহাবীগণের জীবন-চরিত) বিষয়ক কিতাবাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। –আলইসাবা ৪/৯৫; 'উসদুল গাবাহ ২/৬০০

শায়খ আলবানী (রহ.) যদি অন্তত 'তাহযীবুত তাহযীব' (৫/২১৮) বা তাকরীবুত তাহযীব' (৩৬০) পড়ে নিতেন তবুও এই মারাত্মক ভুল তাঁর হত না।

২. 'ইয়াহইয়া বিন মালেক আলআযদী আবু আইয়ূব আলমারাগী'। তিনি একজন তাবেয়ী। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাঁর রেওয়ায়াত রয়েছে। নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, ইজলী, ইবনে সা'দ প্রমুখ তাঁকে 'ছিকা' বলেছেন। কিন্তু শায়খ আলবানী (রহ.) মেশকাতের টীকায় (১/৪৩৮) একটি সনদের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, "ইয়াহ্ইয়া ইবনে মালেক আলআযদী ছাড়া সনদের সকল রাবী 'ছিকা'।" ইয়াহ্ইয়া ইবনে মালেক কেন 'ছিকা' নন? এর উত্তরে তিনি বলেন, "তার সম্পর্কে কিতাবুল জার্হ ওয়াত তাদীল (৪২/১৯০)এ কোন মন্তব্য উল্লেখ নেই।" ব্যাস এক কিতাবেই তাহ্কীক শেষ হয়ে গেল। অথচ তিনি যদি 'তাহযীবুত তাহযীব' ও 'তাকরীবুত তাহযীব' ইত্যাদি কিতাবেও তার আলোচনা দেখতেন তবে এই 'ছিকা' ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীকে অন্যান্য 'ছিকা রাবী' থেকে আলাদা করতেন না।

৩. শায়খ আলবানী (রহ.) إرواء الغليل (ইরওয়াউল গালীল) কিতাবে (৩/১২১) সাঈদ বিন আশওয়া সম্পর্কে বলেন, "আমি তার তরজমা বা আলোচনা পাইনি।" অথচ তাঁর আলোচনা 'তাহ্যীবুত তাহ্যীব' (৪/৬৭), 'তাকরীবুত তাহ্যীব' (২৮৫) ছাড়াও আরো বহু কিতাবে রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মত প্রসিদ্ধ কিতাব দুটিতে তার রেওয়ায়াত রয়েছে। তার পুরো নাম সাঈদ বিন আমর বিন আশওয়া।

মোটকথা এ এক লম্বা ফিরিস্তি। এক দুই কিতাবে দুচার পৃষ্ঠা উল্টিয়েই কোন 'সিকা' বা 'মারূফ' রাবীকে 'যয়ীফ' বা 'মাজ্হুল' বলে দেওয়া, তেমনি এক দুই কিতাব থেকে কোন ইমামের সিদ্ধান্ত অপূর্ণভাবে উল্লেখ করে রাবীর ব্যাপারে ভুল মন্তব্য করা কিংবা রাবীর আলোচনা যথাযথ তালাশ না করেই 'তার আলোচনা পেলাম না' বলে দেওয়া ইত্যাদির বহু দৃষ্টান্ত শায়খ আলবানীর রচনায় পাওয়া যায়।

লজ্জার বিষয় এই যে, যখন তাঁকে এসব বিষয়ে সতর্ক করা হল তখন তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের পক্ষ থেকে ওজরখাহি করে বলা হল যে, "শায়খের 'নাশাত' হয়নি।" (অর্থাৎ অনেক কিতাব থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি তাহকীক করতে তাঁর

তবীয়তে চায়নি।) এজন্য তিনি 'তাক্‌রীবুত তাহ্‌যীব'এর উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন। দেখুন, আলী আলহালাবী রচিত إحكام المباني (ইহ্‌কামুল মাবানী) ৩৬, ৪১, ৭৬

এই ওজরখাহি থেকে এছাড়া আর কী অর্থ বের হয় যে, শায়খ আলবানী (রহ.) তাহকীক করা ছাড়াই তাঁর তবীয়তসম্মত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন; যদিও তা পূর্ববর্তী ইমামগণের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। লড়াই হবে ফন ও শাস্ত্রের ইমামগণের সাথে আর হাতিয়ার হবে 'তাক্‌রীবুত তাহ্‌যীব' বা তারও পরের কোন কিতাব! কী অদ্ভূত ব্যাপার!

শায়খ আলবানীর স্ববিরোধিতা

৩. হাদীসের 'তাসহীহ-তাযয়ীফ', রাবীর 'জার্‌হ-তাদীল' এবং শাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর স্ববিরোধিতার বিষয়টিও অবহেলা করার মত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে যে, এক স্থানে একটি হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন, অন্যস্থানে একই হাদীসকে 'সহীহ' বা 'হাসান' বলে বসেছেন। কোথাও কোন রাবীকে 'ছিকা' (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন, আবার অন্যত্র তাকেই যয়ীফ বা অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। যে সব বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে সেখানে কখনো একটি মত অবলম্বন করেছেন, কখনো অন্য মত।

তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত এমন হয়ে থাকবে যাতে তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছে। কোন হাদীস বা রাবীর ব্যাপারে পূর্বে তাঁর ধারণা এক রকম ছিল; পরবর্তী সময়ে তা পরিবর্তন হয়েছে। এ জাতীয় বিষয়াদিকে শায়খ আবুল হাসান মুহাম্মাদ তাঁর تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এতে সর্বমোট ২২২টি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্র এমনও রয়েছে যেখানে তাঁর এই স্ববিরোধিতা মত পরিবর্তনের কারণে নয়; বিস্মৃতি বা অবহেলার কারণে হয়েছে। এছাড়া কিছু স্থান এমনও আছে যেখানে তাঁর বক্তব্যের পূর্বাপর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই স্ববিরোধিতার পেছনে তাঁর মতের গোঁড়ামি এবং স্বভাবের ঝোঁক ইত্যাদি কার্যকর ছিল; যদিও তিনি নিজেকে 'আসাবিয়্যাত' বা গোঁড়ামির ঘোর বিরোধী এবং প্রায়ই ন্যায়নিষ্ঠ আলেমগণের প্রতি গোঁড়ামির অপবাদ আরোপ করে থাকেন।

শায়খ হাসান সাক্কাফ রচিত تناقضات الألباني الواضحات (আলবানীর সুস্পষ্ট

স্ববিরোধিতাসমূহ) আমরা কিতাবটির অকুণ্ঠ সমর্থক নই এবং তাঁর উপস্থাপনার সাথেও একমত নই, তবে তাঁর অতিরঞ্জনগুলো বাদ দিয়ে যদি আলবানীর বাস্তব স্ববিরোধিতাগুলোও চয়ন করা হয়, যেগুলোর দিকে অন্যান্য ন্যায়নিষ্ঠ আহলে ইল্মও ইঙ্গিত করেছেন তবে তার সংখ্যাও কম হবে না, প্রচুর।

ইজতেহাদী বিষয়াদিতে অসহিষ্ণুতা

৪. হাদীসের ইমামগণের কাছে স্বীকৃত যে, হাদীস ভাণ্ডারে বিদ্যমান হাদীসসমূহ 'সহীহ' বা 'যয়ীফ' হওয়ার দিক থেকে তিন প্রকার :

এক, যেসব হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়ে সকল ইমাম একমত।

দুই, যেসব বর্ণনা যয়ীফ বা মাতরূক (পরিত্যাজ্য) হওয়ার বিষয়ে ইমামগণ একমত।

তিন, যা সহীহ বা যয়ীফ হওয়ার বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

বাস্তবেও এই তিন প্রকার হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এর প্রথম দুই প্রকার হাদীসের বিষয়টি সহজ ও পরিষ্কার। কিন্তু শায়খ আলবানী (রহ.) তাঁর 'সিলসিলাতুল আহাদীস'কে এই দুই প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি যথারীতি শেষোক্ত প্রকারের হাদীসও প্রচুর পরিমাণে উল্লেখ করেছেন।

এ তৃতীয় প্রকারের হাদীসের ব্যাপারে শাস্ত্র ও বিবেকের সিদ্ধান্ত হল, 'আহ্লে ফন' বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহকীক ও গবেষণার ভিত্তিতে যে মতকে সঠিক বা বিশুদ্ধ মনে করবেন সেই মত অবলম্বন করবেন। আর যারা এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ নন তারা কোন শাস্ত্রজ্ঞের তাকলীদ বা অনুসরণ করবেন। তবে অনুসরণের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে মতটি যেন 'বিশেষজ্ঞের পদস্খলন' না হয়।

ইমাম বাইহাকী (মৃত্যু ৪৫৮হি.) তাঁর 'দালায়েলুন নুবুওয়্যা'এর ভূমিকায় এ বিষয়টি নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন–

وأما النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته ...فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها. وبالله والتوفيق.

উম্মাহর আলেমগণের কর্মনীতিও আজ পর্যন্ত এ-ই ছিল। এ প্রকারের

হাদীসসমূহে বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য যেহেতু খুব স্বাভাবিক তাই এখানে পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া অপরিহার্য।

যার নিকট হাদীসটি সহীহ সাব্যস্ত হয় তিনি মাসআলার ভিত্তিরূপে হাদীসটিকে গ্রহণ করেন আর যার নিকট হাদীসটি সহীহ সাব্যস্ত হয় না তিনি মাসআলার ভিত্তি হিসেবে একে গ্রহণ করেন না। এ ক্ষেত্রে গ্রহণ-অগ্রহণ দুটোই হয় ইজতেহাদের ভিত্তিতে। এজন্য প্রত্যেককে অপরের মতের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল বা অন্তত সহিষ্ণু হতে হয়। আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ এমনই ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, যিনি হাদীসটি গ্রহণ করেছেন তিনি সহীহ হিসেবেই তা গ্রহণ করেছেন আর যিনি গ্রহণ করেননি তিনিও এজন্যই গ্রহণ করেননি যে, তাঁর বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ নয়। এখন কেউ যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে এই অভিযোগ দায়ের করে যে, তিনি যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করেন অথবা শেষোক্ত ব্যক্তিকে এই বলে অভিযুক্ত করে যে, তিনি সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করেন তাহলে এটা হবে এমন তার্কিকসুলভ বক্তব্য, যার উদ্দেশ্য শুধু প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। বলা বাহুল্য যে, এ জাতীয় কৌশল পরিহার করাই ইলমী শিষ্টাচারের দাবি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আলবানী (রহ.) ও তাঁর গোঁড়াভক্তদের পক্ষে তা পরিহার করা সম্ভব হয়নি।

তেমনি একথাও স্বীকৃত যে, এ জাতীয় ইজতিহাদী ক্ষেত্রে নিজের মতকে চূড়ান্ত মনে করা বা দলীলভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা বরদাশ্‌ত করতে না পারা, উপরন্তু সমালোচককে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষ বা গালিগালাজ কিংবা নিজের সিদ্ধান্তকে অন্য সকলের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা হচ্ছে অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দিত বিষয় এবং শরীয়তের রুচিপ্রকৃতি ও ইখতেলাফের রীতিনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলতে হয়, শায়খ আলবানী (রহ.) ও তাঁর বিশিষ্ট ভক্তদের পক্ষে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। নিজের সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে খোদ শায়খ আলবানী (রহ.) মাত্রাতিরিক্ত সুধারণা পোষণ করতেন। তাঁর রচনাবলি থেকে একজন সাধারণ পাঠকের মনে এ ধারণাই সৃষ্টি হয়। বিশেষত তাঁর রচনা صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها এর নামটিই লক্ষ করুন অথবা এর ভূমিকা পড়ুন কিংবা তাঁর অন্যান্য রচনা যথা عمدة المرام في تخريج الحلال والحرام এর ভূমিকা দেখুন, বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে; বরং তাঁর বক্তব্য থেকে পাঠকদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি

হয় যে, তিনি যেন তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ মেনে নিতে বাধ্য করতে চাচ্ছেন! অথচ ইজতেহাদী বিষয়ে এ অবস্থান কখনো কাম্য নয়।

সিলসিলাতুয যয়ীফা, সিলসিলাতুস সহীহা এবং তাঁর অন্যান্য রচনার ভূমিকা পড়লে একজন নিরপেক্ষ পাঠকের মনে এ ধারণাই সৃষ্টি হয় যে, তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হওয়াই একটি অমার্জনীয় অপরাধ। যার কারণে ওই ব্যক্তি তাঁর পক্ষ থেকে যেকোন ধরনের সম্বোধনের উপযুক্ত হয়ে যায়।

শায়খ ইসমাঈল আনসারী (রহ.) যিনি একজন প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম এবং রিয়াদ কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার একজন গবেষক ছিলেন তিনিও এই অপরাধে তাঁর পক্ষ থেকে 'সুন্নাহর দুশমন' খেতাব লাভ করেছেন।

অতএব উম্মাহর অন্যান্য মনীষী যাঁরা তাঁর মাসলাক ও মাশরাবের সাথেও একমত নন তাঁদের সাথে তাঁর আচরণ কেমন হবে তা তো বলাই বাহুল্য।[১]

এ পর্যায়ে এসে স্বভাবতই যে প্রশ্নের উদ্রেক হয় তা হল, যিনি নিজেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইমামের সমালোচনা-পর্যালোচনার যোগ্য মনে করেন এবং তাঁদের রচনাবলির উপর কর্তৃত্ব চালানোকে নিজের অধিকার জ্ঞান করেন তিনি অন্যের সমালোচনা বা পর্যালোচনায় ক্রুদ্ধ হবেন কেন? সমালোচকের সমালোচনা ঠাণ্ডা মাথায় অনুধাবন করে যদি তা প্রত্যাখ্যানই করতে হয় তাহলে সৌজন্য রক্ষা করে আদবের সাথেও তো প্রত্যাখ্যান করা যায়। এজন্য কটুকাটব্যের আশ্রয় নেওয়া তো কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়।

অপরদিকে এও তো বাস্তব সত্য যে, খোদ শায়খ আলবানী (রহ.)এর সমালোচনাগুলো অনেকটাই বিচারক সুলভ। এক্ষেত্রে বড় ছোটর তেমন কোন পার্থক্য তাঁর কাছে নেই।

তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)এর 'আলআদাবুল মুফরাদ' কিতাবটিকেও দুই টুকরো করেছেন। যেন ইমাম বুখারী (রহ.)কে পাঠ দান করছেন যে, 'জনাব, এ কিতাবে এই হাদীসগুলো আনা সমীচীন হয়নি।' এমনকি সহীহ বুখারীর কিছু হাদীসকেও তিনি যয়ীফ বলেছেন এবং সহীহ মুসলিমের অনেক হাদীস 'মুখতাসারু সহীহ

১- আকমাল হোসাইন সাহেব এক হিসাবে ভালই করেছেন যে, 'সিলসিলাতুয যয়ীফা'এর মুকাদ্দমা (ভূমিকা) অংশের অনুবাদ করেননি। তার এ কাজটি যদিও অনুবাদনীতির পরিপন্থী, কিন্তু এতে অন্তত শায়খ আলবানীর ওই সব জবরদস্তিগুলো সাধারণ পাঠকদের কাছ থেকে গোপন থেকেছে।

মুসলিম লিল মুনযিরী'এর টীকায় যয়ীফ বা 'মালূল' সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী এঁদের প্রত্যেকের কিতাবকে দুই টুকরো করে 'সহীহু আবী দাউদ', 'যয়ীফু আবী দাউদ', 'সহীহুত তিরমিযী', 'যয়ীফুত তিরমিযী', 'সহীহুন নাসায়ী', 'যয়ীফুন নাসায়ী' এভাবে তিন কিতাবকে ছয় কিতাবে পরিণত করেছেন।

মানগত বিচারে তাঁর এ কাজে কী কী খুঁত রয়েছে, ইলমী অঙ্গনে এর দ্বারা কী পরিমাণ ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে সর্বোপরি সালাফের রচনাবলির সাথে এ ধরনের বিচারক সুলভ আচরণের কোন বৈধতা আছে কি না–এসব বিষয়ে অন্য কোন অবসরে আলোচনা করা যাবে। এখানে শুধু এতটুকুই আরজ করতে চাই যে, উম্মাহর হাফেযুল হাদীস এবং মহান ইমামগণের ব্যাপারে এমন দুঃসাহসিকতাপূর্ণ পন্থায় সমালোচনা ও পর্যালোচনা করে যিনি অভ্যস্ত তিনি যখন অন্য পর্যালোচকদের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন তখন তা কোনক্রমেই বোধগম্য হয় না।

যয়ীফ হাদীসের বিষয়ে শায়খ আলবানীর অবস্থান

৫. শায়খ আলবানী (রহ.) 'যয়ীফ হাদীস'কে সম্পূর্ণ বেফায়েদা মনে করেন। তাঁর মতে যয়ীফের কোন প্রকার কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি যয়ীফ ও মওযূ দুটোকে একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন যে, যয়ীফ সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য। এটা না ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, না মুস্তাহাব বিষয়াদির ক্ষেত্রে, না অন্য কোথাও। –সহীহুল জামিইস সাগীর ওয়া যিয়াদাতিহী ১৫০

অথচ এ মতটি সলফ ও খলফের অবিসংবাদিত নীতিমালার সম্পূর্ণ বিরোধী। জুমহুরে সলফ ও খলফের 'ইজমা'-বিরোধী হওয়া তো সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। বাস্তব কথা হল, তা সকল সলফ ও খলফের ইজমারই পরিপন্থী। এ বিষয়ে কোন কোন মনীষী থেকে যে ভিন্নমত কোন কোন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তা নির্দিষ্ট প্রকারের যয়ীফ হাদীসের ব্যাপারে অথবা যয়ীফ হাদীস দ্বারা আহকাম বা বিধান প্রমাণ করার ব্যাপারে। যয়ীফ কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়– এই মত যা শায়খ আলবানী অবলম্বন করেছেন, সলফ-খলফের কেউ তা পোষণ করতেন না।

তাঁর এ মতটি ইমাম বুখারী (রহ.), তাঁর মাশায়েখ, সমসাময়িক ইমাম ও শিষ্যবৃন্দের এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইমামের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

পূর্ববর্তী ইমামগণের ইজমায়ী মতকে দলীলহীন বা দলীল পরিপন্থী বলা শুধু যে

অন্যায় দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন তাই নয়. তা শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অপ্রতুলতারও একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।[১]

'শুযূয' তথা ইজমায়ে উম্মত থেকে বিচ্যুতি

৬. শায়খ আলবানী (রহ.)এর কর্মের আরেকটি মৌলিক দিক হল, তাঁর আলোচনা-পর্যালোচনা শুধু হাদীসের তাসহীহ ও তাযয়ীফের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; ফিক্হ, আকায়েদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি স্বাধীন বরং এক ধরনের বিচারকসুলভ পর্যালোচনা করতে থাকেন এবং এ বিষয়ে তিনি এতটাই নিঃশঙ্কচিত্ত যে, বহু বিষয়ে 'শুযূয' (شذوذ) অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। অথচ ইজমায়ে উম্মত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে চলে আসা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা থেকে বিচ্ছিন্নকে মত পোষণ করা অথবা পূর্ববর্তী কোন মনীষীর ভ্রান্তি বা বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তকে পুনরায় জীবিত করা কোন ইলমী খেদমত নয়। ইলমী ক্ষেত্রে 'শুযূয' থেকে বিরত থাকাই একজন আলেমের আত্মমর্যাদা ও তাকওয়ার পরিচায়ক।

এ জাতীয় মত ও পথ (শুযূয) অবলম্বন করা বা কোন মনীষীর ভ্রান্তির অনুসরণ করা যে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ এ বিষয়ে শরীয়তের প্রমাণাদি, সাহাবা, তাবেয়ীন ও পরবর্তী আসলাফে উম্মাহর সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য আহলে ইলমের অজানা নয়। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্দুল বার (রহ.)এর جامع بيان العلم (২/১৩০) এবং ইবনে রজব দামেস্কী (রহ.)এর شرح علل الترمذي বিশেষভাবে অধ্যয়নযোগ্য।

যেসব ভ্রান্তি বা বিচ্ছিন্ন মতের উদ্ভাবন কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা শায়খ আলবানী (রহ.) করেছেন তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

১. তাঁর মতে মহিলাদের জন্য সোনার আংটি ও অন্যান্য স্বর্ণবলয় ব্যবহার করা

১- এ বিষয়ে যয়ীফ হাদীস সংক্রান্ত আলোচনার প্রসিদ্ধ উৎসসমূহ ছাড়াও নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে :

ثلاث رسائل في استحباب الدعوات، جمع للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص ١٠٠-١٠٤، ظفر الأماني للشيخ عبد الحي اللكنوي بحاشية واستدراكات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص ١٨١-١٠٦، والقول البديع للسخاوي بقلم الشيخ محمد عوامة ص ٣٢-٣٧، التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف للشيخ محمود سعيد ممدوح ١:٧٥-١٧٧.

হারাম অথচ মহিলাদের জন্য যেকোন ধরনের স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করা তা বলয়াকৃতিরই হোক যেমন, চুড়ি, বালা, আংটি অথবা বিছানোই হোক যেমন, গলার হার, লকেট ইত্যাদি বৈধ হওয়ার বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে এবং তা দলীল দ্বারাও প্রমাণিত। চিন্তার বিষয় এই যে, বলয়াকৃতির অলঙ্কার আর বিছানো অলঙ্কারের মধ্যে এমন কি পার্থক্য যে, একটি হালাল হবে আর অপরটি হারাম?

এ মাসআলায় শায়খ আলবানী (রহ.)এর বিচ্ছিন্ন মতটির ভ্রান্তি প্রমাণ করার জন্য শায়খ ইসমাঈল আনসারী (সাবেক গবেষক, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, রিয়াদ, সৌদি আরব) إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء একটি স্বতন্ত্র কিতাবই রচনা করেছেন।

২. আট রাকাআত তারাবীকে সুন্নত এবং বিশ রাকাআত তারাবীহকে বেদআত আখ্যা দেওয়া। অথচ বিশ রাকাআত তারাবীকে বেদআত আখ্যা দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আমার জানামতে আরবে এই ভ্রান্ত বেদআতী মতবাদের সূচনা শায়খ আলবানীর আগে আর কেউ করেননি। হিন্দুস্তানে ইংরেজ-শাসনামলে কোন লা-মাযহাবী মৌলভী এই মতবাদের সূচনা করলে বিশিষ্ট লা-মাযহাবী আলেমরাই তা খণ্ডন করেছিলেন।

শায়খ আলবানীর এই 'শায' মতটির ভ্রান্তি প্রমাণে শায়খ ইসমাঈল আনসারী (রহ.) এবং শায়খ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী (উস্তাদ, জামিয়া উম্মুল কুরা, মক্কা মুকাররমা)এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট হবে।

৩. তাঁর মতে এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়া হলে তা এক তালাক গণ্য হবে। [হিরওয়াউল গালীল ৭/১২২] অথচ এই মতটি সহীহ হাদীস ও 'খাইরুল কুরূন'এর ইজমার পরিপন্থী। এ বিষয়ে সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফ্তা থেকে প্রকাশিত কিতাব مجلة البحوث الإسلامية (المجلد الأول، العدد الثالث سنه ১৩৯৭-এ অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ حكم الطلاق الثلاث দেখা যেতে পারে। এতে উপরোক্ত বিচ্ছিন্ন মতটির বিপরীতে বহু হাদীস ও সহীহ 'আসার' উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. নামাযের যে পদ্ধতি শায়খ আলবানী (রহ.) তাঁর কিতাব صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم এ উল্লেখ করেছেন একমাত্র একেই 'নববী নামায' আর হাদীস ও আসারের সুবিশাল ভাণ্ডারে নামাযের অন্য যেসব পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে সবগুলোকেই বেদআতী নামায ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত-বিচ্যুত নামায আখ্যা দেওয়া।

এটা এতই ভয়ংকর বিচ্যুতি যে, এর নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের কাছে নেই। এই মতবাদের প্রচার-প্রসার 'ইফসাদ ফিল আরদ্' তথা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হাদীস ও আসারের সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজস্ব ইজতেহাদের ভিত্তিতে কিছু হাদীস বাছাই করা, এরপর নিজের পক্ষ থেকে তার শর্হ ও ব্যাখ্যা প্রদান করে একে অকাট্যরূপে 'নববী নামায' দাবি করা এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত নামাযের অন্যান্য পদ্ধতিকে নববী নামায থেকে বহির্ভূত আখ্যা দেওয়া এবং নিজের ইজতেহাদ ও চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে নির্বাচিত নামায-পদ্ধতিকে ওহীর মত সকল মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা যে ইলমী ময়দানে কত বড় বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং 'ইহদাছ ফিদ্দীন'এর কত জঘন্য ও ভয়ানক রূপ, তা একমাত্র মুহাক্কিক ও ন্যায়নিষ্ঠ আলেমগণই আন্দাজ করতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ও প্রামাণ্য আলোচনার প্রয়োজন হলে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে প্রকাশিতব্য নামায-পদ্ধতি বিষয়ক কিতাবটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৫. সুব্হাহ (তস্বি) যা দ্বারা গণনা করে যিকির-আযকার করা হয়, তাকে বেদআত আখ্যা দেওয়া। [সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ১/১৮৫-১৯৩] অথচ তসবি ব্যবহার জায়েয হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল নেই। তারপরও শরয়ী দলীল দ্বারা এর ব্যবহার জায়েয বলে প্রমাণিত। পূর্ববর্তীদের কেউই একে বেদআত বলেননি। বেদআতের শরয়ী অর্থ সম্পর্কে যার স্পষ্ট ধারণা নেই একমাত্র এমন ব্যক্তিই তস্বি ব্যবহার করাকে বেদআত বলতে পারে। আলবানী সাহেবের এ মতটির খণ্ডনে শায়খ মাহমূদ সাঈদ মামদূহ রচিত وصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني কিতাবটি পড়া যেতে পারে।

ফিক্হ, ইল্মে হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে শায়খ আলবানী (রহ.)এর শায মতামতের সংখ্যা প্রচুর। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হল, তার তাসহীহ-তাযয়ীফের উদ্দেশ্য শুধু হাদীসের যাচাই-বাছাই মানুষের জন্য সহজ করা নয়; বরং পর্দার অন্তরালে মানুষকে 'নাক্দুস সালাফ' ও 'ফিক্হুস সালাফ' তথা সলফের তাসহীহ-তাযয়ীফ ও ফিক্হ থেকে সরিয়ে 'নাক্দুল আলবানী' ও 'ফিক্হুল আলবানী'এর তাকলীদে নিয়োজিত করা। কথাটা তিক্ত হলেও বাস্তব সত্য। কার্যক্ষেত্রে এমনই হচ্ছে।

যদি বিষয়টি এমন না হত বরং তাসহীহ ও তাযয়ীফের বিষয়ে আলেম ও

তালেবে ইলমদেরকে তথ্য সরবরাহ করা এবং নিজের মতামত দালীলিকভাবে পেশ করে দেওয়াই উদ্দেশ্য হত তবে হাদীস ও রেওয়ায়াতের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আইম্মায়ে হাদীস ও পরবর্তী হুফ্ফাযে হাদীসের উপর আক্রমণ করার প্রয়োজন ছিল না। সমসাময়িক আলেমদের ব্যাপারে কটূক্তি করারও প্রয়োজন ছিল না। ফিক্হ ও ফকীহগণের ব্যাপারে মানুষকে আস্থাহীন করারও প্রয়োজন ছিল না অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, এসব বিষয় তাঁর রচনাবলির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সবশেষে বিচ্ছিন্ন মতামতসমূহের তরফদারি এবং নতুন নতুন মতের জন্ম দেওয়ারও কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ এসব বিষয়ই তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের দৃষ্টিতে তাঁর কিতাবের মূল আকর্ষণ। বলাবাহুল্য, একজন বিশেষ ব্যক্তির (তাঁর ব্যক্তিত্ব যত উঁচুই হোক না কেন) সিদ্ধান্ত ও পর্যালোচনাকে পূর্ববর্তী সকল ইমামের হাদীস ও ফিক্হের অবদানসমূহের উপর আরোপিত করা এবং তাদের সবার শুদ্ধাশুদ্ধির পরীক্ষার জন্য একেই একমাত্র কষ্টিপাথর মনে করা অন্ধ তাকলীদের ও অনধিকার চর্চার একটি জঘন্যতম রূপ।

শায়খ আলবানীর ভ্রান্তিসমূহের খণ্ডনে নির্ভরযোগ্য আলেমগণের কিছু কিতাব

৭. শায়খ আলবানী (রহ.)এর রচনাবলি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞ আলেমগণের লেখা সমালোচনা ও পর্যালোচনামূলক কিতাবসমূহও সামনে রাখা অবশ্য কর্তব্য। নিম্নে এ ধরনের কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল :

১. الألباني شذوذه وأخطاؤه মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আযমী (রহ.)।

২. تصحيح صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألباني في تضعيفه শায়খ ইসমাঈল আনসারী, সাবেক গবেষক, দারুল ইফ্তা, সৌদি।

৩. إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والرد على الألباني في تحريمه শায়খ ইসমাঈল আনসারী (রহ.)।

৪. الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور، وفيه الرد على كتاب الحجاب للألباني শায়খ হামুদ তুয়াইজারী, সৌদি আরব।

৫. النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء আবু মুয়াজ তারেক বিন আউযুল্লাহ, বিশেষ ছাত্র, শায়খ আলবানী (রহ.)।

৬. ويلك آمن আহমদ আব্দুল গাফুর।

৭. وصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني মাহমূদ সাঈদ মামদূহ, মিসর।

৮. تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم মাহমূদ সাঈদ মামদূহ, মিসর।

৯. التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف মাহমূদ সাঈদ মামদূহ।

১৪২১ হিজরী পর্যন্ত কিতাবটির ৬খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে যাতে 'সুনানে আরবাআ'-এর কিতাবুল মানাসিক পর্যন্ত ওই সব হাদীসের উল্লেখ আছে যেসব হাদীসের ব্যাপারে শায়খ আলবানী (রহ.) উসূলে হাদীস ও জারহ-তাদীলের নীতিমালার ভুল ব্যবহার করে ভুল সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। উল্লেখিত খণ্ডসমূহে এধরনের হাদীসের সংখ্যা ৯৯০টি। একাশিত ৬খণ্ডে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেভাবে অগ্রসর হলে সম্ভবত কিতাবটি বিশ খণ্ডে সমাপ্ত হবে।

১০. خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل التأليف والكتب كما قاله الشيخ الألباني। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) সাবেক প্রফেসর, কুল্লিয়াতুশ শরীয়া, জামিয়া মালিক সাউদ, কুল্লিয়াতু উসূলিদ্দীন, জামিয়া মুহাম্মাদ বিন সউদ আলইসলামিয়া।

আপাতত এই দশটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল। শায়খ আলবানীর রচনাবলির সমালোচনা ও পর্যালোচনায় লিখিত কিতাবের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। যে ভাইয়েরা সাধারণ বাংলা পাঠকদের জন্য আলবানী (রহ.)এর 'সিফাতুস সালাত', 'সিলসিলাতুয যয়ীফা'এর বাংলা অনুবাদ করেছেন তাদের ব্যাপারে কি আমরা এই আশা করতে পারি যে, তারা উপরোক্ত কিতাবসমূহেরও বাংলা অনুবাদ পাঠকদের সামনে পেশ করবেন? বরং এসব কিতাবের উপর যদি কোন গবেষক দলীলভিত্তিক মার্জিত কোন কিছু লিখে থাকেন তবে তাও বাংলা অনুবাদ করে দিতে পারেন। এতে আমাদের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই। যেসব বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে তার গবেষণা ও সিদ্ধান্তের জন্য যদি সাধারণ জনগণের সামনে তথ্যাবলি পরিবেশন করতেই হয় তবে একতরফা না হয়ে উভয় পক্ষের তথ্যাবলিই পেশ করা উচিত। অন্যথায় তা 'তাকলীদে শখ্সী' বা ব্যক্তি-তাকলীদই হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের ওই সব বন্ধু এ বিষয়ে এতটাই সোচ্চার যে, এমনকি শরীয়তসম্মত পন্থায়ও তা অবলম্বন করতে নারাজ।

প্রশ্নের উত্তর

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর শুনুন।

১. 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফাতি ওয়াল মাওযূআ'-এ যেহেতু তথ্য ও উদ্ধৃতি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তাই এ কিতাবটি ওই সব গবেষকদের জন্য উপকারী, যাদের মাঝে সচেতনতা ও সতর্কতা রয়েছে এবং আল্লাহ চাহেতো কিতাবের ইলমী ও শাস্ত্রীয় ভ্রান্তিসমূহে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কামুক্ত। কিন্তু শাস্ত্রীয় পারদর্শিতা নেই এমন সাধারণ আরবী জানা পাঠকের জন্য কিংবা যাকে কিতাবটি বাংলা অনুবাদের সাহায্যে পড়তে ও বুঝতে হয় তার জন্য এই কিতাব কখনো উপকারী নয়। এ ধরনের ব্যক্তি কিতাবটি পড়ে আলবানী সাহেবের অন্ধ তাকলীদে নিপতিত হওয়ার এবং বহু ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তারা অনেক সহীহ ও হাসান হাদীসকে যয়ীফ মনে করবেন। মওযূ নয় এমন হাদীসকে মওযূ ভেবে বসবেন। 'সহীহ মুখতালাফ ফী' অর্থাৎ যে হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে এমন অনেক হাদীসের বিষয়ে আলবানী সাহেবের মতামতকেই চূড়ান্ত মনে করবেন এবং পূর্ববর্তী হাদীস ও ফিক্‌হ বিশারদ ইমামগণের ব্যাপারে এই ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হবেন যে, তাঁরা সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করে যয়ীফ হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করতেন। পাশাপাশি শায়খ আলবানী (রহ.)এর বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি, 'শায' ও বিভিন্ন মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভয়ানক নিন্দনীয় তাকলীদের শিকার হবেন।

কিতাবটির বাংলা অনুবাদের মান

২. এতো গেল মূল কিতাবের অবস্থা, এবার বাংলা অনুবাদটির কথায় আসা যাক।

অত্যন্ত দুঃখনীয় বিষয় এই যে, কিতাবটির বাংলা অনুবাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। শুধু বাস্তব অবস্থা জানানোর খাতিরে পাঠকবৃন্দের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি যে, অনুবাদক মহোদয় আরবী ভাষাই ভাল জানেন না, শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞা তো অনেক দূরের কথা। কিতাবটিতে যেসব ব্যক্তিবর্গের নাম বা কিতাবের নাম এসেছে তা-ও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আরবী উপস্থাপনাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার যোগ্যতা একদমই নেই। এ অবস্থায় কিতাবটির অনুবাদের অবস্থা যে কী হবে এবং পাঠকরা এ থেকে কতটুকু কী গ্রহণ করবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যদি এখানে অনুবাদের শুধু হাস্যকর ভ্রান্তিসমূহের ফিরিস্তি দেওয়া হয় তাহলেও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা তৈরি হয়ে যাবে। নমুনাস্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হল :

পৃষ্ঠা ভুল শুদ্ধ

৬২ কাযায়ী কুযায়ী (القضاعي)

৬৩ আলকাওকাবুদ্দুরারী আলকাওকাবুদ্দারারী (الكوكب الدراري)

৬৬ আর-রাকী আররাক্কী (الرقي)

৬৯ আল-মানাবী আল-মুনাবী (المناوي)

৬৯ মাকরী মুকরী (المقري)

৬৯ আন'য়াম আন'য়ুম (أنعم)

৬৯ বুসয়রী বূসীরী (بوصيري)

৭১ রামহুরমুজী রামাহুরমুযী (رامهرمزي)

৭১ ইবনুল মুলাক্কান ইবনুল মুলাক্কিন (ابن الملقن)

৭৩ ইবনু ইরাক ইবনু আররাক (ابن عراق)

৭৯ বাস্তি বুসতী (البستي)

৮০ ইবনু দাহিয়া ইবনু দিহ্য়াহ (ابن دحية)

৮০ আবুসসিদ্দীক আবুস সাদীক (أبو الصديق)

৮০ আব্দুল হাকিম ইবনু যাকুয়ান – আব্দুল হাকাম ইবনু যাক্ওয়ান (عبد الحكم بن ذكوان)

৬২ থেকে ৮০ মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার মধ্যেই এতগুলো ভুল, তা-ও শুধু নামের উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট। কিতাবের এই খণ্ডটি থেকে শুধু উচ্চারণের ভুলগুলো একত্র করা হলেও একটি পুস্তিকা হয়ে যাবে।

উলূমুল হাদীসের শাস্ত্রীয় পরিভাষা সম্পর্কে অনুবাদকের ধারণা কেমন তা বোঝা যায় পরিভাষাসমূহের আভিধানিক অনুবাদ-প্রচেষ্টা থেকে। নিম্নে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল :

১. الجرح المبين مقدم على التعديل এর অনুবাদ করেছেন, ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ অগ্রাধিকার পাবে নির্দোষিতার উপর। পৃ. ৭১, হাদীস ১৪

অথচ এটি একটি শাস্ত্রীয় মূলনীতি। এর মর্ম হল কোন রাবীর ব্যাপারে যদি ইমামগণের মতভেদ থাকে এবং এক ইমাম তাকে 'বিশ্বস্ত' বলেন আর অপর ইমাম 'অগ্রহণযোগ্য' বলে মত দেন এবং তার এই মতের স্বপক্ষে উপযুক্ত কারণও দর্শান তাহলে (শর্তসাপেক্ষে) শেষোক্ত ইমামের মতটিই প্রাধান্য পায়।

বলাবাহুল্য, আমাদের অনুবাদক বাক্যটির যে অনুবাদ করেছেন তা থেকে এই মর্ম উদ্ধার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাছাড়া جرح শব্দের অনুবাদ 'দোষারোপ' আর تعديل শব্দের অনুবাদ 'নির্দোষিতা' এমনকি আভিধানিক দিক দিয়েও শুদ্ধ নয়।

২. فالحمل في الحديث على اليشكري أولى "তার দ্বারা দোষ বর্ণনা করাই উত্তম।" পৃ. ৭৩, হাদীস ১৭

অথচ এটি একটি পারিভাষিক ব্যবহার, যার অর্থ হল 'এই বর্ণনার বিষয়ে ইয়াশকুরিকে অভিযুক্ত করাই অধিক সমীচীন।'

৩. تصحيح الترمذي "ইমাম তিরমিযীর বিশুদ্ধকরণের।" পৃ. ৮০, হাদীস ২৪

বলাবাহুল্য, এটা পানি বিশুদ্ধকরণের মত কোন বিষয় নয়। এখানে আরবী تصحيح. শব্দটি পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল 'বর্ণনার ব্যাপারে 'সহীহ' হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া।' আর এটাও তো অতি সহজ কথা যে, কোন বিবরণকে বাস্তব বা অবাস্তব 'বানানো' যায় না, বাস্তব বা অবাস্তব হওয়ার 'ঘোষণা' দেওয়া যায় মাত্র।

৪. يخطئ على الثقات : "তিনি নির্ভরশীলদের বিপক্ষে ভুল করতেন।" পৃ. ৭৯, হাদীস ২৪

'নির্ভরশীল'দের 'পক্ষে' ভুল করাও কি গ্রহণযোগ্য? আসলে তিনি যা করতেন তা হল, 'নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে বর্ণনা করায় ভুল করতেন।' এই মন্তব্যে বোঝানো হচ্ছে যে, ভুলটি আসলে তারই হত, যিনি তাকে হাদীস শুনিয়েছেন তার নয়। কেননা তিনি তো নির্ভরযোগ্য।

ছোট্ট আরেকটি কথা, ثقة শব্দটির অর্থ কিন্তু 'নির্ভরশীল' নয়, 'নির্ভরযোগ্য।' তাঁরা নির্ভরযোগ্য আর আমরা তাঁদের প্রতি নির্ভরশীল। অনুবাদের অসংখ্য স্থানে 'নির্ভরযোগ্য' ব্যক্তিদেরকে 'নির্ভরশীল' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে!

৫. عبد الله لا يتابع على حديثه من جهة تثبت "হাদীসটি সাব্যস্ত করতে আব্দুল্লাহর অনুসরণ করা যাবে না।" পৃ. ৮৫

হাদীস সাব্যস্ত করা বা না করার ক্ষেত্রে 'আব্দুল্লাহ'এর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়- অনুবাদক কি আরবী বাক্যটির এই অর্থই বোঝাচ্ছেন? আসল মর্ম কিন্তু এমন নয়। আরবী বাক্যটির সঠিক মর্ম হল 'আব্দুল্লাহ'-এর এই হাদীসটি অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৬. وعمر هذا عامة أحاديثه لا يتابعه الثقات عليه "নির্ভরশীল বর্ণনাকারীগণ এই উমারের হাদীসগুলোর অনুসরণ করেননি।" পৃ. ১০৪

'অনুসরণ' শব্দটিই এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কেননা বিষয়টি হাদীস-অনুসরণের নয়। এখানে দুটো পর্ব রয়েছে। 'হাদীস-যাচাই' পর্ব এবং এ পর্বে উত্তীর্ণ হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে আসবে 'হাদীস-অনুসরণ'এর পর্ব। আমাদের আলোচ্য বাক্যটি প্রথম পর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট, দ্বিতীয় পর্বের সাথে নয়। বাক্যটিতে বলা হয়েছে, 'উমারের অধিকাংশ বর্ণনাই এমন যার সমর্থনে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

বোঝানো হচ্ছে, রাবীটির অধিকাংশ বর্ণনাই শাস্ত্রীয় বিচারে 'শায' বা 'মুনকার।' সুতরাং রাবী হিসেবে তিনি অগ্রহণযোগ্য।

লক্ষ করুন, এখানেও কিন্তু শব্দটি 'নির্ভরশীল!'

৭. পৃষ্ঠা ৪১২-তে اضربوا على هذا الحديث বাক্যটির এমন তরজমা করা হয়েছে যে, পাঠ করে শিহরিত হয়ে যেতে হয়! লেখা হয়েছে- "তোমরা এই হাদীসটিকে প্রহার কর।" (নাউযুবিল্লাহ!) অথচ এটি একটি পারিভাষিক ব্যবহার, যার অর্থ : তোমরা এই হাদীসের উপর চিহ্ন লাগিয়ে দাও। (কেননা রেওয়ায়াতটি 'মুনকার' বা রাবীর ভুল। অতএব তা বর্ণনা করা যাবে না।) মুহাদ্দিসগণ তাঁদের রচনা দ্বিতীয়বার দেখার সময় বা তালিবে ইলমদের সামনে পঠিত হওয়ার সময় 'মুনকার', 'শায' ও 'মাজহূল' বর্ণনাগুলোকে চিহ্নিত করতেন এবং তালিবে ইলমদেরকেও নিজ নিজ নুসখায় চিহ্নিত করার তাকিদ করতেন। তো এভাবে চিহ্নিত করার অর্থ হচ্ছে পাণ্ডুলিপি থেকে কোন রেওয়ায়াতকে বাদ দেওয়া বা মুছে ফেলা।

এখানে اضربوا শব্দের যেহেতু على আছে, তাই আভিধানিক দিক দিয়েও ওই তরজমা সঠিক নয়। তো পরিভাষা-জ্ঞানেরই যখন এই অবস্থা তখন শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞার বিষয়ে আর কী বলব! হাদীসসমূহের তরজমা কীরূপ করা হয়েছে তা অনুমান করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে-

৭৭ পৃষ্ঠায় لقنها حجتها বাক্যটির অনুবাদ করেছেন, 'তাকে উপাধি দাও তার অলংকার হিসেবে।' অর্থ হবে 'তাকে তার দলীল শিখিয়ে দাও।'

৭৬ পৃষ্ঠায় جاه বাক্যটির অর্থ করেছেন 'সত্তা'; অথচ এর অর্থ হল 'পদমর্যাদা।'

৮৭ পৃষ্ঠায় بحق السائلين عليك বাক্যটির অনুবাদ করেছেন, 'তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের সত্য জানার দ্বারা।' সঠিক অর্থ হল, 'তোমার কাছে প্রার্থনাকারীদের যে দাবি রয়েছে তার ভিত্তিতে।' দানশীল প্রভুর দানশীলতাই প্রার্থনাকারীর 'দাবি' প্রতিষ্ঠা করে। 'সত্য জানা' শব্দটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

৪৬৫ নং হাদীস إن لغة إسماعيل كانت قد درست এর অনুবাদ করেছেন, 'ইসমাঈলের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল?' অথচ এর অর্থ হল 'ইসমাঈলের ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।'

আরবী ইবারত বোঝার এবং রাবী ও মনীষীদের জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখ জানার ব্যাপারে অনুবাদকের অবস্থা যে কীরূপ অবর্ণনীয় তা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে। কিতাবটির ভূমিকায় ইমাম নববী (রহ.)এর বক্তব্য–

قال العلماء من المحدثين والفقهاء يجوز ويستحب العمل بالضعيف في فضائل الأعمال...

এর অনুবাদ করেছেন, 'মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের মধ্যে কতিপয় আলেম বলেন, ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা জায়েয এবং মুস্তাহাব ...।' অথচ বিশুদ্ধ অনুবাদ হবে, 'সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ আলেম বলেছেন, 'ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা জায়েয এবং মুস্তাহাব ...।'

অনুবাদকের কৃত অনুবাদটি তখনই শুদ্ধ হত যদি আরবী বাক্যটি এরূপ হত قال طائفة من العلماء ...

৫১-৫২ পৃষ্ঠায় ইবনে হুমামের (জন্ম ৭৯০হি. মৃত্যু ৮৬১হি.) ব্যাপারে বলেছেন, তিনি নাকি জালালুদ্দীন দাওওয়ানীর (জন্ম ৮৩০হি. মৃত্যু ৯১৮হি.) বরাতে অমুক কথাটি উদ্ধৃত করেছেন ...। এ বলে অনুবাদক ইবনুল হুমামের উপর আপত্তি উত্থাপন শুরু করেছেন। অথচ এসব কিছুর মূলে হল আলবানী সাহেবের বক্তব্য না বোঝা। সেখানে ইবনুল হুমামের বক্তব্য ভিন্ন এবং জালালুদ্দীন দাওওয়ানীর বক্তব্য ভিন্ন। ইবনুল হুমাম জালালুদ্দীন দাওওয়ানী থেকে কোন কিছুই উদ্ধৃত করেননি। কিন্তু আরবী ভাষায় আলোচনার শুরু ও শেষ ধরতে না পারায় তিনি উপরোক্ত বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন।

আফসোসের বিষয় এই যে, এ জাতীয় ভুল তিনি কুরআন কারীমের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রেও করেছেন। ৫৩ পৃষ্ঠায় সূরা নাহ্লের ৪৩ ও ৪৪ নং আয়াত- فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بالبينت والزبر এর অনুবাদ করেছেন, 'তোমরা না জানলে জ্ঞানীদেরকে প্রশ্ন করে দলীল সহকারে জেনে নাও।' অথচ بالبينت والزبر বাক্যাংশটি ৪৩ নং আয়াতের সূচনা وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم এর সাথে সংযুক্ত। আয়াত দুটির সঠিক অর্থ হচ্ছে-"আমি আপনার পূর্বে পুরুষদেরকেই রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের নিকট প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি। সুতরাং তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। তাঁদেরকে প্রেরণ করেছি নিদর্শনাবলি ও (অবতীর্ণ) গ্রন্থসহ আর আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যেন মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারা যাতে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।"

চিন্তার বিষয় এই যে, যিনি কুরআন কারীমের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন তিনি সাধারণ কোন কিতাবের অনুবাদের ব্যাপারে কী দায়িত্বের পরিচয় দেবেন?

ভুল অনুবাদের কারণে একদিকে আয়াতের 'তাহ্রীফ' ও বিকৃতি সাধন করা হয়েছে অন্যদিকে এই ভুল তরজমার ভিত্তিতে তিনি সম্ভবত প্রমাণ করতে চান যে, সাধারণ মানুষ আলেমগণের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তার দলীলও জিজ্ঞেস করবে। দলীলের উল্লেখ ছাড়া কোন আলেমের মাসআলা গ্রহণ করবে না!! নাউযুবিল্লাহ।

সাধারণ মানুষ যদি দলীল বোঝার যোগ্যই হত তবে তো আর আলেমকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল না। এও কি সম্ভব যে, কুরআন কারীম সাধারণ মানুষকেও দলীল-প্রমাণ এবং এ সংক্রান্ত হাজারো শাস্ত্রীয় জটিলতা সমেত মাসআলা জানতে বাধ্য করবে?!

আকমাল সাহেবের অনুবাদের আরেকটি বড় ত্রুটি এই যে, তিনি অনুবাদের বহু স্থানে মূল কিতাবের বহু বাক্য, কোথাও এক বা একাধিক প্যারা, আবার কোথাও একাধিক পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ আলোচনা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিয়েছেন; যার অনুবাদের ধারে কাছেও তিনি যাননি অথচ তার এই নীতির (?) কথা না তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, না সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে এ ব্যাপারে কোন নোট দিয়েছেন। এ আচরণ যে বস্তুনিষ্ঠ অনুবাদের নীতি বিরোধী, তা তো বলাই বাহুল্য।

সকল ভুল এক পর্যায়ের নয়। উপরোক্ত ভ্রান্তিগুলো এমন যে, এর যেকোন প্রকারের দুএকটি ভুলও পুরো অনুবাদের ব্যাপারে আস্থা বিনষ্ট করে দেয়।

আমার বুঝে আসে না, শায়খ আকরামুজ্জামান, এর কী সম্পাদনা করেছেন এবং ড. আসাদুল্লাহিল গালিব এই অনুবাদের উপর প্রশংসাসূচক মতামত কীভাবে দিয়ে দিলেন?

৩. সাধারণ পাঠকদের জন্য এ কিতাবে আরো যে বিষয়টি বিভ্রান্তিকর তা হল, কিতাবটিতে অনেক হাদীস এমন আছে যেগুলোর সনদ সহীহ না হলেও উক্ত বিষয়ে অন্য সহীহ হাদীস রয়েছে অথবা সেই সব হাদীসের বিষয়বস্তু অন্য শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত অথবা কথাটি যদিও হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়, কিন্তু তা একটি উপদেশমূলক কথা, মানুষের চিন্তা ও কর্মে যার ভাল প্রভাব রয়েছে। এ জাতীয় হাদীসের দুর্বলতা বর্ণনা করার সময় বা হাদীস হিসেবে অপ্রমাণিত হলে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করার সময় অন্তত সাধারণ মানুষের জন্য লিখিত বইপত্রে শাস্ত্রীয় বিচারে হাদীসটির মান বর্ণনা করার পাশাপাশি মূল বিষয়বস্তুর শরয়ী বা দালীলিক মান সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া উচিত, যাতে নির্দিষ্ট একটি হাদীসের শাস্ত্রীয় আলোচনার কারণে সাধারণ পাঠকের মনে মূল বিষয়বস্তুর ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয়।

এ কাজটি না আলবানী (রহ.) করেছেন, না তাঁর অনুবাদক টীকা-টিপ্পনীর মাধ্যমে তা আঞ্জাম দিয়েছেন। এটি এ কিতাবের (যদি তা জনসাধারণের সামনে পেশ করতে হয়) অনেক বড় একটি ক্রটি। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত :

حدتএর ব্যাপারে কিছু হাদীস উল্লেখ করে শায়খ আলবানী বলেছেন, এ ব্যাপারে যত হাদীস আছে একটি (২৬নং) ছাড়া সব মওযূ।

আমাদের অনুবাদক حدت এর অনুবাদ করেছেন 'ধর্মীয় চেতনা।' (বলাবাহুল্য, حدتএর অনুবাদ 'ধর্মীয় চেতনা' করা ভুল।)

এরপর লিখেছেন, ধর্মীয় চেতনার ব্যাপারে যত হাদীস আছে সব মওযূ একটি হাদীস ছাড়া তাও যয়ীফ।

একে তো এ কথাটিই বাস্তবসম্মত নয়; কেননা বেশ কিছু আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে ধর্মীয় চেতনার গুরুত্ব বুঝে আসে। যদি এসব আয়াত ও হাদীস নাও থাকত তবুও শরীয়তের উসূল ও কাওয়ায়েদের আলোকে এবং 'আক্লে সালীম' (সুস্থ বিবেক)এর আলোকেই তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হত।

এ অবস্থায় ধর্মীয় চেতনার গুরুত্ব বর্ণনা না করে এমনি বলে দেওয়া যে 'ধর্মীয় চেতনার ব্যাপারে যত হাদীস আছে সব মওযূ শুধু একটি হাদীস ছাড়া ...' কী

ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে? একজন সাধারণ মুসলমান এ বক্তব্য পড়ে এই সংশয়ে পড়ে যাবে যে, ধর্মীয় চেতনা এমন কি খারাপ জিনিস যে এ বিষয়ে যত হাদীস আছে সবই মওযূ।

৪. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) সম্পর্কে আপনি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এ জাতীয় ক্ষেত্রে শুধু শাস্ত্রজ্ঞ মুহাদ্দিসের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

কারো ইলমী মাকাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের লোক নন এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

শায়খ আলবানী (রহ.) সম্পর্কে কোন শাস্ত্রজ্ঞ ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি থেকে এ জাতীয় কোন সনদের কথা আমাদের জানা নেই। এ কথা সত্য যে, তিনি জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় কয়েক বছর শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু তাঁর নতুন নতুন মতামত উদ্ভাবনের ফলে তৎকালীন সৌদির ধর্মীয় নেতা শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং তাঁর জামিয়া ইসলামিয়ায় অবস্থানের সুযোগ বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি দামেস্কে অবস্থান করে তাঁর রচনাকর্ম অব্যাহত রাখেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সেখানেই স্থায়ী হয়ে যান এবং সেখানেই ২২ জুমাদাল উলা ১৪২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করুন; তাঁর ভাল কাজগুলো দ্বারা উম্মতকে উপকৃত করুন; তাঁর রচনাবলির মন্দ প্রভাব থেকে সকলকে মাহফূয রাখুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন! #

[সেপ্টেম্বর '০৫]

ফিকহে হানাফীর সনদ

ভূমিকা : আল্লাহ তাআলা কুরআনী শরীয়ত তথা ইসলামী শরীয়তের হেফাযতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এই শরীয়ত হল সর্বশেষ শরীয়ত। আল্লাহ তাআলা সে শরীয়তের হেফাযতের দায়িত্বই নিজে গ্রহণ করেছেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা মহান আল্লাহর অভিপ্রায়।

বিজ্ঞ লোকেরা জানেন, শুধু কুরআন সুন্নাহই নয়, কুরআন সুন্নাহকে বোঝা যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল, সেগুলোকেও আল্লাহ তাআলা পূর্ণরূপে হেফাযত করেছেন। তেমনি কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা ও নির্দেশনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বিন্যাস ও সংকলনের জন্য যে শাস্ত্রগুলোর সূচনা, সেগুলোকে এবং সেগুলোর বুনিয়াদী গ্রন্থগুলোকেও আল্লাহ তাআলা হেফাযত করেছেন।

আজ শত শত বছর পরও ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে ফিকহ ইত্যাদি শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থগুলো আমাদের কাছে ঠিক সেভাবেই সংরক্ষিত আছে, যেভাবে এ গ্রন্থগুলো রচিত ও সংকলিত হয়েছিল। কপিকার ও মুদ্রাকরের বেখেয়ালিতে কোন ভুলত্রুটি হয়ে গেলে তা চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের জন্যও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে, যার ভিত্তিতে ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত ও সংশোধিত হওয়ার ধারাবাহিকতা প্রতি যুগেই অব্যাহত ছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

প্রত্যেক শাস্ত্রের বুনিয়াদী গ্রন্থগুলো সে শাস্ত্রের ধারক-বাহক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পঠন-পাঠন ও আলোচনা এবং এ গ্রন্থকেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সমাদৃত ছিল এবং রচিত হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' ও 'ইস্তিফাযাহ'র মাধ্যমে চলে এসেছে। গ্রন্থগুলোর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মাখতূতাহ (হস্তলিখিত কপি) বিশেষজ্ঞদের সামনে রয়েছে। মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলনের পর থেকে গ্রন্থগুলো মুদ্রিত হয়ে পাঠকের সামনে আসছে। আজো যদি কোন প্রকাশক এ জাতীয় গ্রন্থাদির প্রকাশনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে না পারেন এবং কোন বুনিয়াদী গ্রন্থকে একাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মাখতূতাহ (হস্তলিখিত কপি)

থেকে কিংবা অন্তত এমন একটি মাখতূতাহ থেকে যা বিশেষজ্ঞদের কাছে নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ, না ছেপে থাকেন, তবে এর প্রতিবাদ করার মত এবং পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে এ গ্রন্থ পুনরায় প্রকাশ করার মত আত্মমর্যাদাশালী আলেম ও প্রকাশক এখনো বিদ্যমান রয়েছেন। মোটকথা, শুধু কুরআন সুন্নাহ নয়; বরং কুরআনী শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহের বুনিয়াদী গ্রন্থগুলোকেও আল্লাহ তাআলা হেফাযত করেছেন। আর ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, যে যুগে যে কেউ এগুলোর যথাযথরূপে সংরক্ষিত থাকার বিষয়টিকে সন্দেহযুক্ত করতে চেয়েছে আল্লাহ তাদেরকে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত করেছেন।

বেশ কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের দুশমনদের বিভিন্ন প্রচারণায় অবচেতনভাবে প্রভাবিত হয়ে কিছু গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধু একটি প্রশ্নের অবতারণা করছেন। প্রশ্নটি এই যে, ফিকহে হানাফীর সনদ কী এবং ফিকহে হানাফীর বুনিয়াদী কিতাবগুলো যাদের রচনা বলে প্রসিদ্ধ, এগুলো যে তাদেরই রচনা তার প্রমাণ কী?

এই প্রশ্ন শুনে আমার সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠেছে। কেননা, এই একই প্রশ্ন আগামীকাল কেউ ফিকহে মালেকী সম্পর্কে করবে না, ফিকহে শাফেয়ী বা ফিকহে হাম্বলী সম্পর্কে করবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? শুধু তাই নয়, এই প্রশ্ন ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর এবং অন্য সকল ইসলামী শাস্ত্র সম্পর্কেও কেউ করবে না তার নিশ্চয়তা কী? বরং ইসলামের দুশমনরা তো এ জাতীয় প্রশ্ন অনেক আগে থেকেই করে আসছে।

একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোন ইসলামী শাস্ত্রের যেকোন গ্রন্থ, যা বিশেষজ্ঞদের মাঝে সমাদৃত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্ভরযোগ্য উৎসরূপে বরিত, তার বিষয়ে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা কত বড় মূর্খতা ও গোমরাহীর পরিচায়ক! যাহোক প্রশ্ন যখন উঠেছে, তখন সেটা ভিত্তিহীন হলেও মুসলিম জনসাধারণকে এর বিভ্রান্তি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রশ্নটির স্বরূপ উদঘাটন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য আমার কিছু বন্ধুর অনুরোধে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে এ আলোচনা পত্রস্থ করা হল। প্রসঙ্গটি নিয়ে আমার কিছু সুহৃদ আমাকে আগেও প্রশ্ন করেছিলেন। তাদের প্রশ্নের উত্তরে মৌখিকভাবে যে কথাগুলো তখন পেশ করেছিলাম সেগুলো দিয়েই প্রবন্ধটি শুরু করেছি।

একটি আলোচনা

আমার সেই বন্ধুগণ বিভিন্ন সময় আমাকে বলেছেন যে, গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদেরকে আমাদের উপর প্রায়ই একটি প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়। প্রশ্নটি এই যে,

আপনারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)এর তাকলীদ করে থাকেন, কিন্তু আপনারা কি কখনো যাচাই করে দেখেছেন, আপনাদের কিতাবের মাসআলাগুলো ইমাম আবু হানীফা বলেছেন কি না? আপনারা মাসআলা সংগ্রহ করেন ফত্ওয়া শামী থেকে। এ কিতাবের লেখক ইবনে আবেদীন শামী হলেন হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর ব্যক্তি, তার মৃত্যুসন ১২৫২ হিজরী। আপনাদের মাদরাসায় ফিকহের কিতাব 'কানযুদ দাকাইক' পড়ানো হয়। এর লেখক হলেন আবুল বারাকাত নাসাফী, যার মৃত্যুসন ৭১০ হিজরী। তাহলে তাকে অষ্টম শতাব্দীর লেখক বলা যায়। এরপর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে কিতাবটি আপনাদের মাদরাসায় পড়ানো হয় তা হল 'হেদায়া'। এর রচয়িতা আবুল হাসান মারগীনানী; যিনি ৫৯২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইন্তেকাল করেছেন ১৫০ হিজরীতে। তা হলে ষষ্ঠ, অষ্টম বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন ব্যক্তি যদি সনদ ছাড়া 'আবু হানীফা বলেছেন' বলে উদ্ধৃতি দেন, তাহলে তার কথার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? যেখানে ইমাম আবু হানীফা ও উপরোক্ত গ্রন্থকারদের মাঝে শত শত বছরের ব্যবধান, সেখানে তাদের সনদবিহীন উদ্ধৃতির ভিত্তিতে কোন কথাকে কীভাবে আবু হানীফার কথা বলা যেতে পারে?

দ্বিতীয় কথা এই যে, আপনারা 'রদ্দুল মুহতার'কে ইবনে আবেদীন শামীর কিতাব বলে থাকেন, 'কানযুদ দাকাইক'কে আবুল বারাকাত নাসাফীর কিতাব এবং 'হেদায়া'কে আবুল হাসান মারগীনানীর কিতাব বলে থাকেন এবং ওই কিতাবগুলোর মাসায়েল উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে এবং তাদের সূত্রে ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে যুক্ত করে থাকেন। প্রশ্ন হল আবু হানীফা তো দূরের কথা ওই রচয়িতাদের পর্যন্ত কোন সনদও কি আপনাদের কাছে রয়েছে?

আমার সেই বন্ধুরা বলেছেন, যেহেতু অনেক গাইরে মুকাল্লিদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন আজকাল খুব প্রচারিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন লিফলেট ও পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে এ প্রশ্ন ছড়ানো হচ্ছে, তাই এ বিষয়ে একটি বিশদ প্রবন্ধ আলকাউসার-এ আসা উচিত।

আমি তাদেরকে মৌখিকভাবে এটুকু বলেছি যে, আপনারা গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদেরকে আদবের সাথে জিজ্ঞেস করবেন, আপনাদের মতে ফিকহে হানাফীর তাকলীদ অনুচিত হওয়ার কারণ কি এই যে, এখানে উল্লেখিত মাসায়েল ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে সনদের সাথে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে আপনাদের সন্দেহ রয়েছে? যদি এই সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তাহলে আপনারা ফিকহে হানাফীর তাকলীদ সঠিক বলবেন? যদি বিষয়টি এমন হয়, তাহলে আপনাদের উপরোক্ত

প্রশ্নের জবাব দেওয়া ফলদায়ক হতে পারে। যদিও আমাদের ধারণা হল, উপরোক্ত প্রশ্ন ভুল হওয়ার বিষয়টি আপনাদেরও ভালভাবেই জানা আছে। তবুও আমরা এই প্রশ্নের জবাব পেশ করতে প্রস্তুত রয়েছি। আর যদি বিষয়টি এমন না হয়; বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্যই হল একটি অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ-বিসংবাদের সূচনা করা, তাহলে এ জাতীয় প্রশ্নগুলো হাদীসের ভাষায় 'উগলূতাত'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যা থেকে বিরত থাকতে হাদীস শরীফে তাকিদ করা হয়েছে। এ জন্য অন্তত আপনাদের পক্ষে এ জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং তা সমাজে ছড়ানো কখনো শোভা পায় না।

আমি তাদেরকে একথাও বলেছি যে, আপনারা গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের কেন জিজ্ঞেস করেন না, ভাই! আমরা এবং আপনারা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ এবং আরও বহু হাদীসগ্রন্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকি। তেমনি তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে তাবারী এবং আরো অনেক তাফসীরগ্রন্থ থেকে তাফসীরসংক্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করে থাকি; কিন্তু আপনারা কি কখনো এসব ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন তুলেছেন যে, শত শত বছরের প্রাচীন এই গ্রন্থগুলোর গ্রন্থকারদের পর্যন্ত আমাদের সনদটি কী এবং তা কোন্ মানের?

তাছাড়া দেখুন, লোকেরা 'মিশকাতুল মাসাবীহ' কিতাব থেকে হাদীস উল্লেখ করে থাকে এবং সে কিতাবে উল্লেখিত উদ্ধৃতি মোতাবেক লিখে থাকে বুখারী, আবু দাউদ, বায়হাকী ইত্যাদি কিংবা আপনারা শাইখ আলবানীর কিতাব পড়ে বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে তার উল্লেখিত উদ্ধৃতি মোতাবেক লিখে থাকেন বুখারী (২৫৬ হি.) মুসলিম (২৬১ হি.) আবু দাউদ (২৭৫ হি.) তিরমিযী (২৭৯ হি.) দারাকুতনী (৩৮৫ হি.) বায়হাকী (৪৫৮ হি.) ইবনে হাযম (৪৫৬ হি.) ইবনে আবদুল বার (৪৬৩ হি.) ইত্যাদি; কিন্তু আপনারা কি কখনো ভেবেছেন যে, মিশকাত গ্রন্থকার যিনি অষ্টম শতাব্দীর একজন ব্যক্তি, ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.) প্রমুখ তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিসদের পর্যন্ত তার সনদ কী? আলবানী সাহেব, যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মানুষ, তৃতীয় শতাব্দী, চতুর্থ শতাব্দী ও পঞ্চম শতাব্দীর উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের পর্যন্ত তাঁর সনদ কী? এরপর বলুন, মিশকাতের কোন হাদীসের উপর আমল করার জন্য কিংবা আলবানী সাহেবের কোন উদ্ধৃতিকে স্বীকার করার জন্য কি তাঁদের উদ্ধৃত কিতাবসমূহ খুলে উদ্ধৃতির বিশুদ্ধতা যাচাই করা এবং নিজে সনদের মান পরীক্ষা করা অপরিহার্য? আপনারা কি মনে করেন যে, উপরোক্ত কাজ ছাড়া কোন আলেম তো দূরের কথা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেও কি তাদের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করতে পারবে না?

'মিশকাতুল মাসাবীহ'-তে সনদ উল্লেখ না থাকলেও সনদযুক্ত কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি রয়েছে, কিন্তু মাসাবীহুস্ সুন্নাহ কিতাবে তো সনদও নেই এবং সনদওয়ালা কিতাবের উদ্ধৃতিও নেই; অথচ শত শত বছর ধরে গ্রন্থটি উম্মাহর মাঝে পঠিত হচ্ছে এবং এ গ্রন্থের উল্লেখিত হাদীস মোতাবেক আমলও করা হচ্ছে। সবাই আস্থাশীলতার সাথেই কিতাবটির হাদীস বর্ণনা করছেন। চিন্তা করে দেখুন, এই কিতাবের উপর নির্ভর করে হাদীস বয়ান করার অর্থ কি এই যে, বাস্তবেও এই হাদীসগুলোর কোন সনদ নেই?

আমি আমার বন্ধুদের বলেছি, আপনারা তাদের বিবেকের কাছে এই প্রশ্নও রাখবেন যে, আজ আপনারা বিভিন্ন ভিত্তিহীন প্রশ্নের অবতারণা করে সাধারণ মুসলমানকে কিতাব-সুন্নতের ব্যবহারিক পদ্ধতি 'ফিকহে মুতাওয়ারাস' (খায়রুল কুরূন থেকে ধারাবাহিকভাবে উম্মাহর মাঝে সমাদৃত ফিকহ) সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করার চেষ্টা করছেন এবং নিজেদেরকে যেন ফিকহ অস্বীকারকারীদের কাতারে শামিল করছেন।

আপনারা কি ভেবে দেখেছেন, আমাদের সমাজে আরেকটি দল আছে, যারা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বা এ জাতীয় কোন চটকদার নামে পরিচিত করে থাকে, তারাও ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন, যা আপনারা ফিকহ সম্পর্কে করেছেন, হাদীস সম্পর্কে তুলে থাকে এবং মানুষকে হাদীস ও সুন্নত সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করার অপপ্রয়াসের মাধ্যমে নিজেদেরকে 'হাদীস অস্বীকারকারীদের' অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহর ওয়াস্তে ভাবুন, কুরআনের নাম নিয়ে হাদীস অস্বীকার করা আর হাদীসের নাম নিয়ে ফিকহ অস্বীকার করার মধ্যে নীতিগত কিংবা কৌশলগত কোন পার্থক্য আছে কি না?

এই কথাগুলো আরয করার পরও আমার বন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, এ বিষয়ের মূল কথাগুলো কিছুটা বিশদ আকারে লিখুন, যাতে এ ধরনের ভিত্তিহীন প্রশ্নের মাধ্যমে কেউ হাদীস ও তাফসীরের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি সম্পর্কেও বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে এবং ফিকহ-ফত্ওয়া বা কোন দ্বীনী ইলম ও ফনের স্বীকৃত কিতাবাদি সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে না পারে। তাদের অনুরোধে আল্লাহর উপর ভরসা করে ইচ্ছা করেছি যে, এ বিষয়ের কিছু জরুরি ও মৌলিক কথা পাঠকদের সামনে পেশ করব।

সকল শাস্ত্রের স্বীকৃত নীতি

কোন গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কি না এবং গ্রন্থটি যার লিখিত বলে

পরিচিত বাস্তবিকই তার লিখিত কি না, তা জানার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথম পদ্ধতি এই যে, সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের ধারক-বাহক ও পারদর্শীগণ যদি সেটিকে তাদের শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করেন, গ্রন্থটিকে ওই লেখকের গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দেন এবং উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, তাহলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, গ্রন্থটি (সার্বিক বিচারে) নির্ভরযোগ্য এবং সেটির গ্রন্থকার-পরিচয় নির্ভুল।

পারিভাষিক শব্দে এভাবে বলা যায় যে, আলোচ্য গ্রন্থটি ওই লেখকের হওয়ার বিষয়টি 'তাওয়াতুর' কিংবা অন্তত 'শুহরত' ও 'ইস্তেফাযাহ'-এর পর্যায়ে উন্নীত হলে এবং গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 'মুতালাক্কা বিল-কাবূল' গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হলে তার নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রন্থকার-পরিচয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে।

এ পদ্ধতিতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের যোগসূত্র প্রমাণিত হলে এ প্রশ্নের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না যে, আমাদের থেকে গ্রন্থকার পর্যন্ত কোন 'সনদ' আছে কি না, কিংবা সে 'সনদে'র মান কী? তবে একথার অর্থ এই নয় যে, দ্বীনী ইলম ও ফনের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের সনদ সংরক্ষিত নেই। আলহামদু লিল্লাহ, এ ধরনের কিতাবসমূহের সনদ এখনো সংরক্ষিত আছে এবং ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

এখানে মনে রাখার বিষয় এই যে, এ ধরনের কিতাবগুলোর ক্ষেত্রে 'সনদে'র চেয়েও শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান রয়েছে, যার পারিভাষিক নাম হল 'তাওয়াতুর' ও 'তালাক্কী বিল-কাবূল'। সুতরাং এই অকাট্য দলীল বিদ্যমান থাকতে সনদ খোঁজার প্রয়োজন থাকে না। এজন্য হাদীস বিশারদগণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, এধরনের গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে সনদ তালাশ করা মূল কাজ নয়, এখানে মূল কাজ হল গ্রন্থটির যে কপি আমাদের ব্যবহারে রয়েছে তা বিশুদ্ধ কি না যাচাই করা।

কপির বিশুদ্ধতা কীভাবে প্রমাণিত হয় তার স্বতন্ত্র নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে এবং তা আহলে ইলমদের জানা আছে। এ বিষয়ের জ্ঞান লাভের সহজ পদ্ধতি এই যে, কপিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছে সমাদৃত কি না এবং তারা সার্বিক বিচারে একে নির্ভরযোগ্য গণ্য করেন কি না তা জেনে নেওয়া।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, আমাদের যুগ পর্যন্ত কিতাবটির 'সনদে মুত্তাসিল' অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সূত্র বিদ্যমান থাকা। অর্থাৎ খোদ গ্রন্থকার থেকে তাঁর শীষ্যগণ সরাসরি পড়ে, শুনে কিংবা ইজাযত নিয়ে কিতাবটি সংগ্রহ করেছেন। এরপর এই ধারাবাহিকতা এভাবেই অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। এ

ক্ষেত্রেও কপির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করা অপরিহার্য।

এই দুই পদ্ধতির মধ্যে প্রথমোক্ত পদ্ধতিটিই অধিক শক্তিশালী এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এ জন্য হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ের ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে কোন গ্রন্থের গ্রন্থকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের পর কিংবা ওই গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হওয়ার পর গ্রন্থকার পর্যন্ত সনদ বা 'সূত্র' সন্ধান করা কিংবা সেই কিতাব থেকে কোন হাদীস, কোন মাসআলা বা কোন তথ্য বর্ণনার জন্য এ সূত্র অপরিহার্য মনে করা একেবারেই ভুল। এ কথা আহলে ইলমের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কেননা, সকল ইলম ও ফনের প্রাচীন গ্রন্থাদির ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য। তবুও আমি পাঠকদের মনের প্রশান্তির জন্য চারজন ইমামের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

১. ইমাম আবু ইসহাক ইস্‌ফিরাঈনী (৪১৮হি.)

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) লিখেছেন, "ইমাম আবু ইসহাক ইসফিরাঈনী এ বিষয়ে সকল ইমামের ইজমা উল্লেখ করেছেন যে, যে গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের আস্থা অর্জন করেছে, তা থেকে তথ্যাদি উদ্ধৃত করা বৈধ। এর জন্য গ্রন্থকার পর্যন্ত সনদভিত্তিক সংযুক্তি জরুরি নয়। হাদীস ও ফিকহ উভয় বিষয়ের গ্রন্থাদির ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।" –তাদরীবুর রাবী ১/১৫১

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) সহীহ বুখারীর সর্বোত্তম ও বিশ্বস্ততম ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র বিখ্যাত রচয়িতা। তিনি লিখেছেন– "যে গ্রন্থগুলো (শাস্ত্রজ্ঞদের মাঝে) প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত (যেমন, সুনানে নাসায়ী) তা গ্রন্থকার থেকে প্রমাণিত হওয়ার জন্য পাঠক থেকে গ্রন্থকার পর্যন্ত সনদ যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই।" –আননুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ ১/২৭১

৩. ইমাম ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দিস সালাম (৬৬০ হি.)

ইবনে আব্দিস সালাম (রহ.) ফিকহ, হাদীস ও তাফসীর ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ে ইমাম পর্যায়ের মনীষী। তিনি লিখেছেন, "ফিকহের যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কপি বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর উপর নির্ভর করা বৈধ হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ একমত। কেননা, বর্ণনাসূত্র (সনদ) দ্বারা যে নিশ্চয়তা লাভ হয় তা এই পদ্ধতিতেও লাভ হয়ে থাকে (বরং তার চেয়ে দৃঢ়ভাবে)। এ জন্যই মানুষ নাহ্‌ব, লুগাত, অন্যান্য ইলম ও ফনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করে থাকে (এবং গ্রন্থকার পর্যন্ত বর্ণনাসূত্রের সন্ধান প্রয়োজন মনে করে না) এখন

যে মনে করে যে, সকল মানুষ বিভ্রান্তিতে রয়েছে তিনি বিভ্রান্তিতে থাকা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মোটকথা যে বলে, কোন বিশুদ্ধ কপি বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করতে হলে গ্রন্থকার পর্যন্ত সনদ বা সূত্র বিদ্যমান থাকতে হবে, সে ইজমা-বিরোধী।" –তাদরীবুর রাবী ১/১৫২; আলআজবিবাতুল ফাযিলাহ, আব্দুল হাই লাখনোভী ৬০-৬৪; তাওজীহুন নযর, তাহের জাযাইরী ২/৭৬৫-৭৭২

৪. ইমাম ইবনুল হুমাম (৭৯০-৮৬১ হি.)

ইবনুল হুমাম হাদীস, ফিকহ ও উসূলের প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। তিনি তাঁর কিতাব ফাতহুল কাদীর (১/৩৬০)-এ লিখেছেন, "ইমামে মাযহাব থেকে কোন মাসআলা বর্ণনা করতে হলে তার দুটি পদ্ধতি রয়েছে–এক, ইমাম থেকে মাসআলাটি সনদসহ বর্ণনা করা। দুই, মাসআলাটি ফিকহের কোন প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক পঠিত গ্রন্থ (অর্থাৎ যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যক্তিবর্গের কাছে সমাদৃত তা) থেকে গ্রহণ করা। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর রচনাবলি এবং অন্যান্য মুজতাহিদের প্রসিদ্ধ রচনাবলি। কেননা এই গ্রন্থগুলো প্রসিদ্ধির কারণে এবং ব্যাপক ব্যবহারের কারণে 'খবরে মুতাওয়াতির' বা 'খবরে মশহুর'-এর পর্যায়ে উন্নীত। ইমাম আবু বকর রাযী জাসসাস (রহ.)ও আলফুসূল ফিল-উসূল (৩/১৯২)-এ এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। এরপর ইবনুল হুমাম (রহ.) লেখেন যে, 'মারগীনানী (৫৯২ হি.) কৃত 'হেদায়া' এবং সারাখসী (৪৮২ হি.) কৃত 'আলমাবসূত' উপরোক্ত ধরনের প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত গ্রন্থাদির অন্তর্ভুক্ত।"

উপরোক্ত স্বীকৃত নীতির আলোকে পাঠকদের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা মালিক, ত্বহাবী শরীফ, দারাকুতনী, ইবনে আব্দিল বার-এর তামহীদ ও ইস্তেযকার, মিশকাত শরীফ, মাসাবীহুস সুন্নাহ বাগাভী, বায়হাকী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাব; তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, রূহুল মাআনী, তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরের অন্যান্য কিতাব; তাহযীবুত তাহযীব, মীযানুল ইতিদাল, তাহযীবুল কামাল ও আসমাউর রিজালের অন্যান্য কিতাব; বাদায়েউস সানায়ে, শরহে বেকায়া, কানযুদ দাকাইক, আদদুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, (ফাতাওয়ায়ে শামী) ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ও ফিক্‌হ-ফত্‌ওয়ার অন্যন্য কিতাব, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছে সমাদৃত–এগুলো থেকে হাদীস, তাফসীর কিংবা কোন ফিকহী মাসআলা বর্ণনা করার জন্য এগুলোর রচয়িতা পর্যন্ত সনদ ও সনদের মান বিষয়ে খোঁজাখুজিতে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, বিশেষজ্ঞদের কাছে এই কিতাবগুলো সমাদৃত

হওয়াই সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রন্থকারের পরিচয় বিশুদ্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে। 'তাওয়াতুর' ও 'ইজমা'র মত দলীল দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হওয়ার পর ভিন্ন কোন দলীল তালাশ করার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে? উপরন্তু এমন দলীল বা সনদ, যা 'সহীহ' ও 'মুত্তাসিল' হলেও সর্বোচ্চ 'খবরে ওয়াহিদ'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আমি এ কথাটি আগেও বলেছি যে, এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির রচয়িতা পর্যন্ত 'সনদ'ও আলহামদু লিল্লাহ আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে এবং নমুনা হিসেবে একটি সনদ এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

সনদের দ্বিতীয় পর্যায়

এবার শুধু এ আলোচনাটুকু রইল যে, হেদায়া, কানয ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতার কাছে আইম্মায়ে মাযহাব–ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী প্রমুখের বয়ানকৃত মাসায়েল কোন্ সূত্রে পৌঁছেছে? উপরের আলোচনা থেকেও এ বিষয়টি অনুমান করে নেওয়া সম্ভব, তবুও এখানে কিছু কথা উল্লেখ করছি।

১. যাদের মধ্যে তাহকীকের যোগ্যতা নেই, তাদের জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট যে, যেহেতু এগুলো নির্ভরযোগ্য কিতাব, তাই এতে যে কথাগুলো আইম্মায়ে ফিকহের উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, তা নিশ্চিত হয়েই বলা হয়েছে। অতএব এই উদ্ধৃতি সঠিক।

কোথাও দুই এক মাসআলায় ইমামগণের মাসলাক বর্ণনা করতে কোন ভুল হয়ে গেলেও তা ব্যাখ্যাকার ও টীকাকারগণ যত্নের সাথে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। ফিকহের শিক্ষক ও ফত্ওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বশীলদের এ বিষয়ে সম্যক অবগতি রয়েছে। এজন্য এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত হওয়া বা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রশ্নই আসতে পারে না।

২. এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি বিষয় রয়েছে। একটি হল কোন কথার সনদ না থাকা আর অপরটি হল সনদ উল্লেখিত না হওয়া। এই দুই বিষয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এই পার্থক্যের দিকেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। তারা যখন কুদুরী, শরহে বেকায়া, কানয ইত্যাদি কিতাবে মাসায়েলের সাথে 'সনদে'র উল্লেখ দেখতে পান না, তখন বলতে শুরু করেন যে, দেখ, দেখ, এই মাসআলাগুলোর কোন সনদ নেই। এ বিষয়টি এমনই হল যেন কেউ মুহিউস সুন্নাহ বাগাভীর প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব 'মাসাবীহুস সুন্নাহ'-তে

উল্লেখিত হাদীসগুলোকে শুধু এ জন্য সনদহীন বলে দিল যে, মাসাবীহ কিতাবে হাদীসগুলোর সনদ উল্লেখিত হয়নি; অথচ যদিও মাসাবীহ কিতাবে হাদীসের সনদ উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু বাগাভী (রহ.) যে উৎস গ্রন্থগুলো থেকে মাসাবীহ কিতাবের জন্য হাদীস সংগ্রহ করেছেন, সেখানে প্রত্যেক হাদীসের সাথে সনদ উল্লেখিত হয়েছে। তা হলে কোন কিতাবে যদি সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে এবং সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে সনদ উল্লেখ করা না হয়, তবে কি তা থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, কথাটির আদৌ কোন সনদ নেই? বাস্তবে সনদ না থাকা আর কোন কারণে সনদ উল্লেখিত না হওয়া–এ দুয়ের পার্থক্য তো অবশ্যই বোঝা উচিত।

মুখতাসারুল কুদুরী, কানযুদ দাকাইক, আলবিকায়াহ এবং ফিকহে হানাফীর অন্যান্য 'মুতূন' ও 'মুখতাসারাত', যা সংক্ষিপ্ততার কারণে এবং পঠন-পাঠনের সুবিধার কারণে দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখনও আছে, এগুলোতে প্রত্যেক মাসআলার সাথে সনদ উল্লেখ করা হয়নি সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে। অন্যথায় হানাফী ইমামগণ পর্যন্ত, বিশেষত ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী পর্যন্ত প্রত্যেক মাসআলার সনদ ফিকহের উৎস গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে এবং ওইসব গ্রন্থেও রয়েছে, যা 'মুতূন' শ্রেণীর গ্রন্থাদির 'শুরূহ' আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কুদূরী, কানয ইত্যাদি 'মুতূন' বা 'মুখতাসারাত' শ্রেণীর গ্রন্থগুলো এ জন্যই তৈরি হয়েছে যে, এতে মৌলিকভাবে ওই সকল মাসআলা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত হবে, যা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী (১৩২ হি.=১৮৯ হি.)-এর প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। এই কিতাবগুলো প্রতি যুগের ফিকহ ও ফত্ওয়া বিশেষজ্ঞদের কাছে, এমনকি অন্যান্য মাযহাবের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের কাছেও ফিকহে হানাফীর 'মুতালাক্কা বিল-কাবূল' বা স্বীকৃত উৎসগ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত। সেই ছয় কিতাবের নাম এখানে উল্লেখ করা হল–

১. কিতাবুল আস্ল। এর অপর নাম আলমাবসূত। কিতাবটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুদ্রিত অবস্থায়ও রয়েছে।

২. আলজামিউস সাগীর।

৩. আলজামিউল কাবীর।

এই দু'টি কিতাব পূর্ণাঙ্গভাবে মুদ্রিত রয়েছে।

৪. আসসিয়ারুল কাবীর, এ কিতাবটি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ– 'শরহুস সিয়ারিল কাবীর সারাখসী (৪৮২ হি.)-এর সাথে একীভূতভাবে মুদ্রিত হয়েছে।

৫. আসসিয়ারুস সাগীর। এটি আমাদের জানামতে এখনও অমুদ্রিত।

৬. আযযিয়াদাত। এ কিতাবটিও ভাষ্যগ্রন্থ 'শরহুয যিয়াদাত কাযী খান (৫৯৩ হি.)-এর সাথে একীভূতভাবে মুদ্রিত রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ফিকহে হানাফীর শীর্ষস্থানীয় তিন ইমামের অন্যতম। অপর দুই ইমাম– ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন তাঁর উস্তাদ। তাঁদের ফিকহী মাযহাব তিনি সরাসরি তাঁদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের ফিকহ ও হাদীসবিষয়ক সংকলন ও গ্রন্থ সম্ভারও তাঁর কাছে ছিল। তা হলে যে মাসআলাগুলো ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর গ্রন্থাবলি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে এই প্রশ্নের কী অর্থ থাকে যে, ইমাম মুহাম্মাদ ও তাঁর দুই উস্তাদ পর্যন্ত এগুলোর সনদ কী?

আমাদের গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা 'হেদায়া' সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করে থাকেন যে, এ কিতাবের মাসায়েলের সনদ কোথায়? অথচ তারা যদি 'হেদায়া' পড়ে দেখতেন, তাহলে হয়তো এ প্রশ্ন করতেন না। হেদায়া হল হেদায়া গ্রন্থকার মারগীনানী (রহ.)-এর অন্য একটি রচনা 'বিদায়াতুল মুবতাদী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 'বিদায়াতুল মুবতাদী'তে শুধু 'মুখতাসারুল কুদূরী' ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের 'আলজামিউস সাগীর'-এর মাসায়েল উল্লেখিত হয়েছে।

'মুখতাসারুল কুদূরী' কিতাবটি তো প্রত্যেক তালেবে ইলমের কাছেই রয়েছে, আলজামিউস সাগীরও আলহামদুলিল্লাহ অনেক মাদরাসায় এসে গেছে। আজ থেকে এক শতাব্দী আগেই এই কিতাব হিন্দুস্তানে মুদ্রিত হয়েছে। আলজামিউস সাগীর খুললেই দেখা যাবে, প্রত্যেক মাসআলার শুরুতে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) সনদ উল্লেখ করেছেন। এই কিতাবের সকল মাসআলা ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে। এজন্য প্রত্যেক মাসআলার শুরুতে এ কথাটি রয়েছে–

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة

ইয়াকুব হল ইমাম আবু ইউসুফের নাম। তবে তিনি 'আবু ইউসুফ' উপনামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

এবার কুদূরীর মাসআলাগুলোর প্রসঙ্গ। আলজামিউস সাগীরের বাইরের যে মাসায়েল এ কিতাবে রয়েছে, তা ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর অপর পাঁচ কিতাব থেকেই গৃহীত। কোথাও কোন মাসআলা অন্য কোন কিতাব থেকে গৃহীত হলে তা হেদায়া বা তার ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আজ আমাদের বন্ধুগণ এই প্রশ্ন তুলছেন যে, হানাফী মাযহাবের মাসআলাগুলোর সনদ আছে কি না? অথচ তারা যদি জানতেন যে, শুধু সনদ নয়, সনদবিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও হানাফী ফকীহগণ যে কাজ সম্পন্ন করেছেন তা এই যে, ফিকহে হানাফীর মাসআলাগুলোর মধ্যে কোন্ মাসআলা আইম্মায়ে মাযহাব থেকে বর্ণিত এবং কোন্গুলো তাঁদের নির্ধারণকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে উৎসারিত, অর্থাৎ পরবর্তী যুগের ফকীহগণ (যাঁদেরকে পরিভাষায় 'মুজতাহিদীন ফিল-মাযহাব', 'আসহাবুত তাখরীজ' ও 'আসহাবুত তারজীহ' বলা হয়) গবেষণা করে বের করেছেন তা নির্ণয় করা। এরপর যে মাসআলাগুলো আইম্মায়ে মাযহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে তা কি হুবহু এভাবেই বর্ণিত হয়েছে, না মূল কথাটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছিল এবং পরবর্তী যুগের ফকীহগণ তা ব্যাখ্যা করেছেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারী কে ইত্যাদিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এরপর ইমামদের থেকে বর্ণিত মাসআলাগুলোর বর্ণনাসূত্র কোন্ পর্যায়ের? কোন্ মাসআলাগুলো 'মুতাওয়াতির' বা 'মাশহুর'-এর সূত্রে বর্ণিত এবং কোন্গুলো 'খবরে ওয়াহিদ'-এর সূত্রে–এ বিষয়টিও নির্ণিত হয়েছে।

মুস্তাখরাজ মাসায়েল অর্থাৎ ইমামগণের পরবর্তী ফকীহগণের গবেষণাকৃত মাসআলাগুলোর মধ্যে কোন্ মাসআলা কোন্ ফকীহর ইস্তেখরাজ বা গবেষণা এবং কোন্ গবেষণাগুলো গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছে আর কোন্গুলোতে আপত্তি হয়েছে–এ সকল বিষয়েও ফকীহগণ আলোচনা করেছেন। এজন্য মাসায়েলের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস এবং সেগুলোর বিভিন্ন পারিভাষিক নাম সৃষ্টি হয়েছে। যথা– 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ', 'নাদিরুর রিওয়ায়াহ', ফাতাওয়াল মাশায়েখ ইত্যাদি। ফকীহদের এই পরিশ্রম আলহামদুলিল্লাহ বিনষ্ট হয়নি। এখনো পর্যন্ত 'শুরূহ' শ্রেণীর বিশদ গ্রন্থগুলোতে এ ধরনের পর্যাপ্ত আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। এ শ্রেণীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আলমাবসূত, শামসুল আইম্মা সারাখসী (৪৮২ হি.) বাদায়েউস সানায়ে আলকাসানী (৫৮৭হি.) ফাতহুল কাদীর শরহুল হিদায়া, ইবনুল হুমাম (৮৬১ হি.) শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবী লিল জাসসাস, শরহু মুখতাসারিল কারখী লিল কুদূরী (৪২৮ হি.) আলবাহরুর রায়েক ইবনে নুজাইম (৯৭০ হি.), রদ্দুল মুহতার ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি.) শরহুল জামিইস সাগীর লিল জাসাস (৩৭০ হি.) শরহুল জামিইল কাবীর লিল জাসসাসসহ আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

প্রথমোক্ত তিনটি কিতাব মুদ্রিত হয়েছে এবং শেষোক্ত চারটি কিতাব ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন কুতুবখানায় 'মাখতূত' (হস্তলিখিত) আকারে রয়েছে। সর্বশেষ গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত কপির ফটোকপি আলহামদুলিল্লাহ মারকাযুদ দাওয়াহ

আলইসলামিয়া ঢাকা-এর গ্রন্থাগারেও বিদ্যমান রয়েছে। মূল গ্রন্থটি রয়েছে দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রোতে।

ফিকহে হানাফীর এমন কিছু রচনাও আছে, যেখানে পাঠকের সুবিধার্থে প্রত্যেক শ্রেণীর মাসায়েল আলাদা আলাদভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম রযীউদ্দীন আসসারাখসী (৫৪৪ হি.)-এর আলমুহীতুর রাযাভী হল এ ধরনের একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' শ্রেণীর মাসায়েল, এরপর 'নাদিরুর রিওয়ায়াহ' শ্রেণীর এবং সবশেষে 'ফাতাওয়াল মাশাইখ' শ্রেণীর মাসায়েল উল্লেখিত হয়েছে। এই বিষয়গুলো সামনে রেখে চিন্তা করলে গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের পক্ষ থেকে ফিকহে হানাফীর সনদ সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নের মূল্য কতটুকু তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের খামখেয়ালির মূল কারণ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ না করা, যা হাদীস শরীফে এভাবে এসেছে– 'যখন তারা জানে না তখন কেন জিজ্ঞেস করল না? না জানার সমাধান হল প্রশ্ন করা।'

তৃতীয় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়

ফিকহে হানাফীর সনদ বিষয়ে সর্বশেষ প্রসঙ্গ হল মাসআলার সনদ প্রসঙ্গ। অর্থাৎ হানাফী ইমামগণ যদি এই মাসআলাগুলো তাঁদের পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে সাহাবা ও ফুকাহায়ে তাবেয়ীন থেকে গ্রহণ করে থাকেন, তবে সেই সনদ এবং তা কোথায় উল্লেখ আছে তা আলোচনা করা। যেসব মাসআলা তাঁরা পূর্ববর্তী ফকীহদের থেকে গ্রহণ করেছেন আর যেসব মাসআলা নিজেরা বের করেছেন–এ উভয় ধরনের মাসায়েলের উৎস কী এবং শরীয়তের দলীল বিশেষত কুরআনে কারীম, সুন্নাতে নববী ও হাদীস শরীফের সাথে এই মাসায়েলের সামঞ্জস্য কতটুকু–এ বিষয়ে আলোকপাত করাই হল এ পর্যায়ের আলোচনার উদ্দেশ্য।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা গবেষণা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পারি যে, ইসলামী ফিকহের অন্য সকল স্বীকৃত সংকলনের মত ফিকহে হানাফী শীর্ষক সংকলনটিও কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য শরয়ী দলীল থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়; বরং এ সংকলনটিও কুরআন সুন্নাহরই ব্যাখ্যাতা। কুরআন সুন্নাহর বিধি-বিধান এবং কুরআন সুন্নাহর মূলনীতিসমূহের আলোকে প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহেরই বিন্যস্ত রূপ এবং আলহামদুলিল্লাহ সার্বিক বিবেচনায় ফিকহের অন্যান্য সংকলনের তুলনায় এ সংকলনটিই শরীয়তের দলীলবিষয়ক স্বীকৃত মূলনীতি–عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين-এর সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সম্ভবত এজন্যই অন্যান্য সংকলনের তুলনায় এ সংকলনটি অধিক সমাদৃত এবং সর্বযুগে সর্বাধিক অনুসৃত। গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের এত প্রচেষ্টা ও অপপ্রচারের পরও এ যুগেও এ সংকলনের গ্রহণযোগ্যতাই সবচেয়ে বেশি।

সংক্ষিপ্ততার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেল । তাই এ মৌলিক কথাটি বলেই এ সংখ্যার আলোচনা শেষ করছি। আগামী সংখ্যায় ফিকহে হানাফীর সনদের এই পর্যায়টি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ। সে আলোচনায় আমাদের থেকে নিয়ে ফিকহ-গ্রন্থাদির রচয়িতা পর্যন্ত এবং তাঁদের থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) পর্যন্ত একটি 'মুত্তাসিল সনদ' উদাহরণস্বরূপ পেশ করারও ইচ্ছা রইল। # [জুন '০৭]

আমি গত সংখ্যায় আরয করেছিলাম, ফিকহে হানাফীর সনদ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, হানাফী ইমামগণ এই ফিকহ কোত্থেকে গ্রহণ করেছেন। বলাবাহুল্য, তাঁরা এই ফিকহের স্রষ্টা কিংবা উদ্ভাবক নন; তাঁরা হলেন সংকলনকারী ও আহরণকারী। তা হলে ফিকহের যে অংশে তাঁরা সংকলক, সেখানে দেখার বিষয় এই যে, কাদের সূত্রে এই ফিকহ তাঁদের নিকট পৌঁছেছে এবং কীভাবে পৌঁছেছে। আর যে অংশে তাঁরা আহরণকারী, সেখানে দেখার বিষয় এই যে, তাঁদের আহরণের উৎস ও পদ্ধতি কী ছিল।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বোঝার জন্য ফিকহে ইসলামীর পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। উপরোক্ত বিষয়গুলোতে ভালভাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে আমার জানামতে সর্বাধিক বিস্তারিত ও 'ওজনী' গ্রন্থ হল আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আলহাজভী (রহ. ১৩৭৬ হি.) কৃত 'আলফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিক্হিল ইসলামী'। গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচিত। উর্দূ ভাষায় উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা খালিদ মাহমুদ (দা.বা.)-এর কিতাব 'আছারুত তাশরীইল ইসলামী' একটি উচ্চাঙ্গের রচনা। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দান করেন, তবে এ বিষয়ে সার গর্ভ ও বিস্তারিত প্রবন্ধ আলকাউসার-এও প্রকাশিত হবে। বর্তমান আলোচনায় আমি কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

১. মুয়াররিখে ইসলাম ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ. ৭৪৮হি.) বলেছেন, "কূফা নগরীতে যেসব সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)। তাঁদের শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আলকামা (রহ. ৬২হি.)। তাঁর

শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ইবরাহীম নাখায়ী (রহ. ৯৬ হি.) এবং ইবরাহীম নাখায়ীর শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রহ. ১২০ হি.)। হাম্মাদ (রহ.)-এর শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ আবু হানীফা (রহ. ৮০হি.-১৫০হি.) এবং আবু হানীফার শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আবু ইউসুফ (রহ. ১৮৩ হি.)। আবু ইউসুফ (রহ.)-এর শীষ্যগণ (দ্বীন ও ইলমের প্রচার-প্রসারের জন্যে) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহ. ১৮৯ হি.)। আর তাঁর শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আবু আবদুল্লাহ শাফেয়ী (অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী (রহ. ১৫০ হি.-২০৪ হি.)। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।" –সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/২৩৬ (হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান)

এখানে ইমাম যাহাবী (রহ.) একটিমাত্র সূত্র উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সারকথা এই যে, ফিকহ ও ফত্ওয়া এবং এর উৎস কুরআন সুন্নাহর ইলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর ফকীহ সাহাবীগণ গ্রহণ করেছেন। এরপর তাঁরা এক দু'জন করে কিংবা তাঁদের এক একটি জামাআত একেক ইসলামী শহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। সে অঞ্চলের মানুষ দ্বীন-ঈমান, কুরআন-সুন্নাহ এবং ফিকহ-ফত্ওয়ার ইলম তাঁদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছেন। এই শিক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ ফকীহ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। এঁদের 'ফুকাহায়ে তাবেয়ীন' বলা হয়। এঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অঞ্চলে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত হতেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের তাকলীদ করত। এই ধারাবাহিকতায় ফিকহের প্রসিদ্ধ ইমামদের যুগ এসেছে, যারা ফিকহ-সংকলকরূপে মুসলিম জাহানে সমাদৃত। তাঁদের সংকলিত ফিকহ মোতাবেক গোটা মুসলিম উম্মাহ আজ পর্যন্ত আমল করছে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) 'ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন'-এর শুরুতে ফিকহ ও ফত্ওয়ার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.)ও 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' (৮/৯১-৯২, ৯/৫২৫)-এ সংক্ষিপ্ত আকারে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (৩১০হি.) ও ইমাম তৃহাবী (৩২১হি.)-এর যুগ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করেছেন, যাঁরা তৎকালীন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ছিলেন। 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'-এর ৮ম খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠায় তার আলোচনা এভাবে শুরু হয়েছে–

'فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط ثبوت الإسناد إليهم

ثم أئمة التابعين ...

তাঁর কথার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তার তালিকায় প্রতি যুগের যে ফকীহগণ উল্লেখিত হয়েছেন স্ব-স্ব যুগে ও স্ব-স্ব অঞ্চলে তাঁদের তাকলীদ হত এবং আজও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তাঁদের তাকলীদ অব্যাহত রয়েছে।

২. ফিকহে ইসলামী (যার সবচেয়ে প্রাচীন এবং সর্বাধিক সমাদৃত সংকলন হল ফিকহে হানাফী) বিশেষ কোন যুগ কিংবা বিশেষ কোন ব্যক্তির উদ্ভাবন নয়; বরং এটা নবী-যুগ থেকে তেমনি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে, যেভাবে ফিকহের উৎস এবং গোটা দ্বীনের উৎস কুরআন সুন্নাহ বর্ণিত হয়ে এসেছে।

৩. হাফিয যাহাবী (রহ.) দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু একটি সনদ উল্লেখ করেছেন। যেখানে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)এর উস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-এর নাম উল্লেখিত হয়েছে; কিন্তু হাম্মাদ (রহ.)ই ইমাম আবূ হানীফার একমাত্র উস্তাদ নন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকহ-ফত্ওয়া এবং কুরআন সুন্নাহর ইলম অসংখ্য উস্তাদ থেকে আহরণ করেছেন, যাঁদের অধিকাংশ ছিলেন তাবেয়ী এবং বিপুল সংখ্যক তাবে-তাবেয়ী; বরং তিনি একাধিক সাহাবীর যিয়ারতও লাভ করেছিলেন। এই শত শত উস্তাদদের মধ্যে বিশিষ্ট সংখ্যক এমন ব্যক্তিত্বও ছিলেন, যাঁরা কুরআন সুন্নাহর পারদর্শী এবং ফিকহ-ফত্ওয়ার ইমাম ছিলেন। যে জন্য তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য ছিলেন।

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালেহী (৯৪২ হি., যিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী) ইমাম আবূ হানীফার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রচিত 'উকূদুল জুমান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফাতান নুমান' গ্রন্থে ইমাম আযমের অনেক উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন, যা এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৬৩ থেকে পৃষ্ঠা ৮৭তে বিদ্যমান রয়েছে।

৩. কতজন সাহাবীর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) পর্যন্ত কুরআন সুন্নাহ এবং ফিকহ-ফত্ওয়ার ইলম পৌছেছে, তা এ বিষয়টি থেকেও অনুমান করা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যে নগরীর অধিবাসী ছিলেন এবং যে নগরীতে তিনি তাঁর ইলমী জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন অর্থাৎ কূফা নগরী, সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম কাতাদা (রহ.)-এর বিবরণ এই যে, এক হাজার পঁচিশজন সাহাবী কূফা নগরীর অধিবাসী হয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে চব্বিশজন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী। -কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা, দূলাবী ১/১৭৪

ইমাম আবুল হাসান ইজলী (২৬১ হি.) যাঁকে রিজালশাস্ত্রে ইমাম আহমদ

ইবনে হাম্বল ও ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মায়ীন (রহ.)-এর সমকক্ষ গণ্য করা হয়, তিনি কূফা-অধিবাসী সাহাবীদের সংখ্যা আরও বেশি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী দেড় হাজার সাহাবী কূফায় এসে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। –ফাতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম ১/৪২

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী (রহ. ১৩৩৩ হি.-১৪২০ হি.) উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করার পর লেখেন, "কূফা নগরীর আলেমগণের এরূপ জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল যে, খোদ কূফায় এত বিপুল সংখ্যক সাহাবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অবিরাম মদীনায় সফর করতেন এবং সেখানকার বড় বড় সাহাবীদের সাহচর্য গ্রহণ করে জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেন, "আবু আব্দুর রহমান সুলামী ও কূফার অন্যান্য আলেম যেমন, আলকামা, আসওয়াদ, হারিছ ও যির ইবনে হুবাইশ (যাঁর কাছে সাতকারীর অন্যতম কারী আসিম ইবনে আবিন নাজূদ (রহ.) কুরআন মজীদ পড়েছেন)–এঁরা সবাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)এর কাছে কুরআন পড়েছেন। (অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত শিখেছেন, কুরআনের অর্থ ও মর্ম এবং এর বিধান ও নির্দেশনার জ্ঞান লাভ করেছেন।) পাশাপাশি এঁরা মদীনা তাইয়েবা গিয়ে হযরত উমর (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট থেকেও ইলম অর্জন করেছেন; এমনকি তাঁরা হযরত উমর (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) থেকে যত ইলম অর্জন করেছেন, সেই পরিমাণ হযরত আলী (রা.) থেকেও অর্জন করেননি। কূফা নগরীর কাজী শুরাইহ (রহ.) ফিকহের তালীম অর্জন করেছেন হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে ইয়ামানে।" –মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ৪/১৪২

কূফার মনীষীদের ইলমী সফরের বিষয়টি ছাড়াও 'ইলম-নগরীর দ্বার' হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.)-এর ইলম বিতরণের স্থানও ছিল কূফা। তিনি সেখানে চার বছর অবস্থান করেছেন। শাইখ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "তবে কূফার অধিবাসীরা আলী (রা.)-এর সময়ে তো বটেই, উসমান (রা.) খলীফা হওয়ার আগে থেকেই কুরআন সুন্নাহর পারদর্শী ছিলেন।" –মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৩৯

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আরো লেখেন, "কূফার অধিবাসীরা ঈমান, কুরআন, তাফসীরে কুরআন, ফিকহ ও সুন্নাহর ইলম হযরত আলী (রা.)-এর কূফা আগমনের আগেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) কূফা আগমনের আগেই কূফাবাসী হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াককাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হুযাইফা, হযরত আম্মার, হযরত আবু মূসা (রা.) প্রমুখ থেকে দ্বীন হাসিল করেছিলেন। এঁদেরকে

হযরত উমর (রা.) কূফা নগরীতে প্রেরণ করেছিলেন।" –মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৪২, ১৫৭–ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস পৃ. ৩৭

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কূফা নগরী কুরআন সুন্নাহর ইলমের এত বড় কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এখানকার ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং অন্যান্য শহরের সাহাবীদের ইলম হাসিলের জন্যও গুরুত্বের সাথে সফর করেছেন। কেননা, হতে পারে তাঁদের ইলমের কিছু অংশ কূফা নগরীতে পৌঁছয়নি। মুআররিখে ইসলাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) পরিষ্কার লেখেন–

فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة مئة وبعدها.

"ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একশ হিজরী ও তার পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে ইলমে হাদীস অন্বেষণ করেছেন।"

তিনি আরো লেখেন–

وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك

"ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হাদীস অন্বেষণে মনোযোগ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যে সফর করেছেন।" –সিয়ারু আলামীন নুবালা ৬/৩৯২-৩৯৬

তাছাড়া ১৩০ হি. থেকে ১৩৬ হি. পর্যন্ত প্রায় সাত বছর ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করেছেন, যা গোটা মুসলিম জাহানের ফিকহ ও হাদীসের ইমামগণের কেন্দ্রভূমি ছিল। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 'ইমাম' হওয়ার পরও তাঁর নীতি এই ছিল যে, কূফা নগরীতে কোন বিশিষ্ট মুহাদ্দিসের আগমন হলে তাঁর ইলম দ্বারা নিজের ইলমভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতেন। ইমাম নযর ইবনে মুহাম্মাদ মারওয়াযী, যিনি ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধ শীষ্যদের অন্যতম, বলেন যে, "আমি হাদীস বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে অধিক যত্নবান আর কাউকে দেখিনি। একবার আমাদের এখানে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ আনসারী, হিশাম ইবনে উরওয়া ও সায়ীদ ইবনে আবী আরূবা এলেন। তখন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আমাদের বললেন, দেখ তো তাঁদের কাছে এমন কিছু আছে কি না, যা আমরা-শ্রবণ করতে পারি।" –আলজাওয়াহিরুল মুযীয়া, আব্দুল কাদের কুরাশী ৩/৫৫৬

মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এ ধরনের আরও ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। মোটকথা, বিভিন্ন ইসলামী শহরের তাবেয়ীদের একটি সুবৃহৎ জামাআতের মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শীষ্যগণ সাহাবায়ে কেরামের ইলম (কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ) হাসিল করেছেন, আর সাহাবায়ে কেরাম তা হাসিল করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে; তাঁর নির্দেশনা থেকে কিংবা তাঁর

শিক্ষা ও নির্দেশনার গভীর থেকে। তাই এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শীষ্যগণের সনদ একটি নয়, অসংখ্য। তবে ইমাম যাহাবী (রহ.) যে সনদটি উল্লেখ করেছেন তার মাধ্যমেই তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের সবচেয়ে বেশি ইলম হাসিল করেছেন। এ সনদের গোড়ায় রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.)।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.)এর পর যে সাহাবীদের সূত্রে হানাফী ইমামগণের কাছে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের ইলম সবচেয়ে বেশি পৌঁছেছে কিংবা বলুন, ফিকহে হানাফীতে যাঁদের প্রভাব সর্বাধিক, তাঁদের মধ্যে খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এবং হিবরুল উম্মাহ ওয়া তারজুমানুল কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্য খলীফা আবু জাফর মনসূর (১৫৮ হি.) যখন ইমাম আবু হানীফাকে প্রশ্ন করেন যে, আপনি কাদের কাছ থেকে এবং কাদের সূত্রে ইলম হাসিল করেছেন, তখন তিনি উপরোক্ত চারজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর জবাব শোনামাত্র মনসূরের যবান থেকে যে বাক্য উৎসারিত হয়েছিল তা এই–

بخ! بخ! استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة، الطيبين الطاهرين المباركين، صلوات الله عليهم

"মারহাবা ইয়া আবু হানীফা! আপনি তো পরম নির্ভরযোগ্য পথ গ্রহণ করেছেন। এরা তো হলেন 'তায়্যিব' 'তাহির' মোবারক জামাআত। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।" –তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৪

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপরোক্ত চার সাহাবীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল সূত্র হিসাবে তাঁদের অগ্রগণ্যতা। অর্থাৎ অন্যদের তুলনায় এঁদের সূত্রেই ইমাম ছাহেবের কাছে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের ইলম বেশি পৌঁছেছে। অন্যথায় হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে ইমাম ছাহেবের সবচেয়ে ছোট রচনা 'কিতাবুল আছার' এবং তারও সবচেয়ে ছোট নুসখা, যা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, তা তেও উপরোক্ত চার সাহাবী ছাড়া আরও অনেক বড় বড় সাহাবীর হাদীস ও আছার বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মায়ীন ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর উস্তাদ, হাদীস, ফিকহ ও ইলমে বাতিনের ইমাম, আবু সায়ীদ খালাফ ইবনে আইয়ূব (২০৫ হি.) সত্যই বলেছেন, "ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছে, এরপর তা পৌঁছেছে তাঁর সাহাবীগণের কাছে, এরপর তাবেয়ীনের কাছে, এরপর আবু হানীফা ও তাঁর শীষ্যগণের কাছে। এখন যার ইচ্ছা সন্তুষ্ট থাকুন, যার ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হোক।" –তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৬; মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল-হাদীস ৩৩-৩৬

খালাফ ইবনে আইয়ূব (রহ.)এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, ইমাম ছাহেবই সর্বপ্রথম তাঁর শাগরিদদের নিয়ে ইলমে ওহীকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করেছিলেন এবং 'ফিকহে মুদাল্লাল'১-এর সাথে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে 'ফিকহে মুজাররাদ'২-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। তিনি লেখেন–

من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا، ثم تبعه مالك بن أنس في الموطأ، وسفيان الثوري في جامعه، ولم يسبق أبا حنيفة أحد.

"যে বৈশিষ্ট্যগুলোতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী তা এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম শরীয়তের ইলমকে সংকলিত করেছেন এবং বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। এরপর ইমাম মালেক 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে তাঁর অনুসরণ করছেন...।"

৭. 'ফিকহে মুতাওয়ারাছ' (ফিকহের যে অংশ নবী-যুগ থেকে চলে আসছে) সংকলিত করা এবং সাহাবা ও শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীগণের যুগ শেষ হওয়ার পর যেসব নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ইমাম ছাহেবকে কী কী কাজ করতে হয়েছিল এবং এ প্রসঙ্গে তিনি কী কী অবদান রেখেছেন, তা আলোচনা করতে হলে একটি গ্রন্থ রচনা করতে হবে। তাই আমি এখানে ইমাম ছাহেবের ভাষায় শুধু এ বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই যে, ফিকহ ও ফত্ওয়ার বিষয়ে তাঁর মৌলিক নীতিমালা কী ছিল।

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সহীহ সনদে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে যে নীতিগুলো উল্লেখিত হয়েছে তার সারকথা এই–

১. মাসআলার সমাধান কিতাবুল্লায় পেলে সেখান থেকেই গ্রহণ করি।

২. সেখানে না পেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করি, যা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সহীহ হাদীস আমাদের জন্য শিরোধার্য। একে পরিত্যাগ করে অন্য কিছুর শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

৩. এখানেও যদি না পাই তবে সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হই।

৪. কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ ও ইজমায়ে সাহাবার সামনে কিয়াস চলতে পারে না। তবে যে বিষয়ে সাহাবীগণের একাধিক মত রয়েছে সেখানে ইজতিহাদের মাধ্যমে যার মত কিতাব-সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী বলে বোধ হয় তাই গ্রহণ করি।

৫. মাসআলার সমাধান এখানেও পাওয়া না গেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছে থাকি। তবে এক্ষেত্রেও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হই না। –আলইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা, ইবনে আব্দিল বার ২৬১, ২৬৪, ২৬৭; ফাযাইলু আবী হানীফা, আবুল কাসিম ইবনু আবিল আউয়াম ২১-২৩ মাখতূত; আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, আবু আব্দুল্লাহ সাইমারী (৪৩৬ হি.) ১০-১৩; তারীখে বাগদাদ, খতীবে বাগদাদী ১৩/৩৬৮; উকূদুল জুমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালিহী ১৭২-১৭৭; মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, মুয়াফফাক আলমক্কী ১/৭৪-১০০

'ফিকহে মুতাওয়ারাছ'-এর সংকলন এবং 'ফিকহে জাদীদ' আহরণের যে নীতিমালা ইমাম ছাহেবের নিজের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সকল ইমামের সর্বসম্মত নীতি। কোন ফিকহ তখনই ইসলামী ফিকহ হয়, যখন তা উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সংকলিত ও আহরিত হয়।

ফিকহ সংকলন এবং ফিকহ আহরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণে ইমাম ছাহেব (রহ.) কতটুকু সফল হয়েছেন তা তাঁর সমসাময়িক স্বীকৃত ইমামগণের বক্তব্য থেকে জানা যেতে পারে, যাঁরা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ. ১৬১ হি.) বলেন–

كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم، ذابا عن حرم الله أن تستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات، والآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أدرك عليه علماء الكوفة.

"আবু হানীফা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ইলম অন্বেষণ করেছেন। তিনি ছিলেন (দ্বীনের প্রহরী) দ্বীনের সীমানা রক্ষাকারী, যাতে আল্লাহর হারামকৃত কোন বিষয়কে হালাল মনে করা না হয় কিংবা হালালের মতো তাতে লিপ্ত থাকা না হয়। যে হাদীসগুলো তার কাছে সহীহ সাব্যস্ত হত অর্থাৎ যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ বর্ণনা করে এসেছেন, তার উপর তিনি আমল করতেন এবং সর্ববিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমলকে গ্রহণ করতেন। কূফার আলেমগণকে যে আমল ও ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন, তিনিও তা থেকে বিচ্যুত হননি।

(কেননা, এটাই ছিল সাহাবা-যুগ থেকে চলমান আমল ও ধারা।) –আলইনতিকা, ইবনে আব্দিল বার ২৬২; ফাযাইলু আবী হানীফা, ইবনু আবিল আউয়াম ২২ (মাখতূত)

উক্ত নীতিমালায় যে ফিকহ সংকলিত হয়েছে তার মান ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায় ইমাম শাফেয়ী (রহ.)এর এই উক্তি থেকে–

الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه

"ফিকহ বিষয়ে সকল মানুষ আবু হানীফা (রহ.)-এর কাছে দায়বদ্ধ।"
–তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৪০৩; তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪৫০

তিনি আরো বলেছেন–

ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالا على أبي حنيفة

"যে কেউ ফিকহ অন্বেষণ করবে তাকে আবু হানীফার কাছে দায়বদ্ধতা স্বীকার করতেই হবে।" –ফাযাইলু আবী হানীফা, ইবনে আবিল আউয়াম ১৭

এই ফিকহের ভিত্তিই যখন হাদীস ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত তখন হাদীস সুন্নাহর সাথে এর সম্পর্ক কতখানি মজবুত হবে তা বলাই বাহুল্য। এজন্যই ইমাম ইবনুল মোবারক (রহ.) বলেছেন–

لا تقولوا: رأي أبي حنيفة، ولكن قولوا: تفسير الحديث.

"(আবু হানাফীর ফিকহকে) শুধু রায় বলো না। কেননা তা হল হাদীসের তাফসীর।" –ফাযাইলু আবী হানীফা, ইবনু আবিল আউয়াম ২৩

ইসলামের বড় বড় ইমামগণ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)এর এই খেদমতের যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ খুরাইবী তো এও বলেছেন, "মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হল নিজেদের নামাযে আবু হানীফার জন্য দুআ করা। কেননা, তিনি উম্মাহর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও ফিকহ সুরক্ষিত করে গিয়েছেন।" –তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪৪; তাহযীবুল কামাল, আবুল হাজ্জাজ মিযযী ১৯/১১০

কেউ যদি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)এর এই অবদানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে তবে তার নেপথ্য কারণ কী হতে পারে তা-ও তাঁর ভাষাতেই শুনুন–

"আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত–কিছু লোক হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে অভিযোগ করে, আর কিছু লোক রয়েছে যারা তাঁর সিদ্ধান্তগুলোর সূক্ষ্মতা ও গভীরতায় পৌঁছতে না পেরে তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ

করে। আমার কাছে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগুলোকেই তুলনামূলক ভাল মনে হয়।"
-তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৬৭

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) পর্যন্ত সূত্র-পরম্পরা

আগের ওয়াদা মোতাবেক আমাদের থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) পর্যন্ত ফিকহের অসংখ্য সনদের মধ্যে উদাহরণস্বরূপ শুধু একটি সনদ উল্লেখ করছি। সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে শুধু সনদের ব্যক্তিদের নাম ক্রমিক নম্বর দিয়ে উল্লেখ করব। যাঁর নাম আগে আসবে তিনি হলেন শিষ্য আর যাঁর নাম পরে আসবে তিনি উস্তাদ।

ইলমে ওহীর ধারক-বাহকদের নিকট থেকে ইলমের আমানত গ্রহণ করার অনেকগুলো স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলোর আলোচনা উসূলে হাদীস এবং উসূলে ফিকহের কিতাবে রয়েছে। নিম্নোক্ত সনদের প্রত্যেকে তাঁর উপরের ব্যক্তির নিকট থেকে সেই স্বীকৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক পদ্ধতিতে ফিকহের ইলম; বরং ফিকহের উৎস অর্থাৎ কুরআন হাদীসের ইলমও অর্জন করেছেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ 'ইলমুল ইসনাদ' বিষয়ক ওই কিতাবগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলোকে পরিভাষায় 'ছাবাত', 'বারনামিজ', 'ফিহরিছ', 'মুজাম' ও 'মাশীখা' ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হয়। তেমনি সনদে উল্লেখিত ব্যক্তিদের পরিচিতি এবং তাঁদের ইলমী ও আমলী জীবনের ইতিহাস আসমাউর রিজাল, তারাজিম, তবাকাত ও তারীখের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। যদি আমি শুধু একটি সনদের ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত সবকিছু লিখতে যাই, তাহলে তা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হয়ে যাবে। এজন্য আপাতত শুধু সনদটিই উল্লেখ করব। ইনশাআল্লাহ সমঝদার ও ইনসাফপ্রিয় ব্যক্তিদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে। তবে সনদের অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব যেহেতু বিভিন্ন ফিকহের গ্রন্থাবলির রচয়িতা, তাই তাঁদের নামের সাথে তাঁদের রচিত কিছু গ্রন্থের দিকেও ইঙ্গিত করব। এতে ফিকহের ওই গ্রন্থগুলো পর্যন্ত আমাদের যে সনদ রয়েছে তারও একটি নমুনা সামনে এসে যাবে।

সনদ

আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে বর্তমান সময়ের অনেক ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে বান্দার (মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ইবনে শামসুল হক কুমিল্লায়ী) ইলমে দ্বীন হাসিল করার তাওফীক হয়েছে। যাঁদের নিকট থেকে ফিকহ ও হাদীসের ইলম বেশি হাসিল হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ. ১৩৩৬হি.-

১৪১৭ হি.।) শাইখ (রহ.) জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত আছেন। আমি বরকতের জন্য তাঁর মাধ্যমেই সনদটি উল্লেখ করছি :

১. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
২. মুহাম্মাদ যাহিদ ইবনুল হাসান আলকাউসারী
৩. ইবরাহীম হাক্কী আলআকীনী
৪. আলাউদ্দীন ইবনে আবিদীন আশশামী
৫. আমীন ইবনে আবিদীন আশশামী (রদ্দুল মুহতার-এর গ্রন্থকার, যা ফাতাওয়া শামী নামে প্রসিদ্ধ)
৬. হিবাতুল্লাহ আলবা'লী
৭. সালিহ ইবনে ইবরাহীম আলজীনীনী
৮. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলমাকতাবী
৯. আব্দুল গাফ্ফার মুফতিল কুদ্স
১০. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলগাযযী (তানবীরুল আবসার-এর গ্রন্থকার)
১১. যাইন ইবনে নুজাইম (কানযুদ দাকায়েক-এর ভাষ্যগ্রন্থ আলবাহরুর রায়েক-এর গ্রন্থকার)
১২. আহমাদ ইবনে ইউনুস ইবনুশ শিলবী (শরহুল কানয-এর টীকাকার)
১৩. আব্দুল বার ইবনুশ শিহনাহ (শরহুল ওয়াহবানিয়্যাহ-এর গ্রন্থকার)
১৩.১. কাসেম ইবনে কুতলুবুগা (আততাসহীহ ওয়াত-তারজীহ আলমাওযূ আলা মুখতাসারিল কুদূরী-গ্রন্থকার)
১৪. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (ফতহুল কাদীর-এর গ্রন্থকার)
১৫. সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে আলী কারিউল হেদায়া
১৬. আকমালুদ দ্বীন মুহাম্মাদ আলবাবারতী (আলইনায়াহ-এর গ্রন্থকার)
১৭. কিওয়ামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলকাকী (মিরাজুদ্দিরায়া-র গ্রন্থকার)
১৮. আলহাসান ইবনে আলী আসসিগনাক্বী
১৯. হাফিযুদ্দীন আবুল বারাকাত আননাসাফী (কানযুদ দাকায়েক-গ্রন্থকার)
২০. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সাত্তার আলকারদারী
২১. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী আলমারগীনানী (হেদায়া-গ্রন্থকার)
২২. নাজমুদ্দীন উমর আননাসাফী
২৩. খালাফ ইবনে আহমাদ আদদারীর
২৪. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী আদ্দামাগানী
২৫. আবুল হুসাইন আলকুদূরী (মুখতাসারুল কুদূরী-গ্রন্থকার)

হেদায়া গ্রন্থকার (২১ নম্বরে উল্লেখিত) আবুল হাসান আলমারগীনানী-এর

অনেক উস্তাদের আরেকজন হলেন সাদরুশ শাহীদ উমর ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে মাজাহ। ('আলমুহীতুল বুরহানী' রচয়িতার মুহতারাম পিতা।)

তিনি তাঁর পিতা বুরহানুল আইম্মা আব্দুল আযীয ইবনে মাজাহ থেকে রেওয়ায়াত করেন। তিনি রেওয়ায়াত করেন শামসুল আইম্মা আসসারাখসী থেকে, যিনি আলমাবসূত শরহু মুখতাসারিল হাকিম-এর রচয়িতা। শামসুল আইম্মা আসসারাখসী (রহ.)এর বিশিষ্ট উস্তাদ হলেন শামসুল আইম্মা আলহালওয়ানী।

হেদায়া-গ্রন্থকারের উস্তাদ নাজমুদ্দীন উমর আননাসাফী (২২ নম্বরে উল্লেখিত)-এর উস্তাদগণের সংখ্যা হল পাঁচশ পঞ্চাশজন, যাঁদের পরিচিতি বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। সনদের সামনের অংশ তাঁর একজন উস্তাদ আবুল ইউস্‌র সদরুল ইসলাম বাযদাভী-এর মাধ্যমে উল্লেখ করছি।

২৩. আবুল ইউস্‌র সদরুল ইসলাম আলবাযদভী

২৪. ইসমাঈল ইবনে আব্দুস সাদিক আলবিয়ারী আলখতীব

২৫. আব্দুল করীম আলইয়াযদী

২৬. আবু মানছুর আলমাতুরীদী

২৭. আবু বকর আলজুযজানী

২৮. আবু সুলায়মান আলজুযজানী

২৯. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী

৩০. ইমাম আবু হানীফা

উল্লেখিত আবুল ইউস্‌র সদরুল ইসলাম বাযদভী (২৩) এবং শামসুল আইম্মা সারাখসী উভয়ের উস্তাদদের মধ্যে শামসুল আইম্মা আলহালওয়ানী অন্যতম। তাঁর মাধ্যমে আরেকটি সনদ এই–

২৪. সামসুল আইম্মা আলহালওয়ানী

২৫. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে হামদান

২৬. আবু ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইবনে সায়ীদ আলবাযদভী

২৭. আবু জাফর আততহাবী (ইমাম ত্বাহাবী)

২৮. বাক্কার ইবনে কুতাইবা আলবাসরী

২৯. হিলাল ইবনে ইয়াহইয়া আলবাসরী

৩০. আবু ইউসুফ আলকাযী ও যুফার ইবনুল হুযাইল আলবাসরী (এই দুই মনীষী ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ শিষ্য।)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যে উস্তাদগণের নিকট থেকে কুরআন হাদীসের

ইলম সবচেয়ে বেশি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহচর্য গ্রহণ করেছেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রহ.)-এর।

৩১. হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান

৩২. ইবরাহীম আননাখায়ী

৩৩. আসওয়াদ, আলকামা ও আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী প্রমুখ।

৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।

এঁরা ইলমে ওহী অর্জন করেছেন খাতামুন্নাবিয়্যীন, সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, যাঁর সম্পর্কে খোদ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى.

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি যে, রাব্বুল আলামীন যখন শুধু তাঁর ফযল ও করমে এই বরকতময় নূরানী সূত্রের সঙ্গে এবং এর মতো অন্যান্য সূত্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যাঁদের মাধ্যমে আমরা কুরআন-হাদীস-সুন্নাহ এবং তা থেকে আহরিত ইলম বর্ণনা করে থাকি, তখন এই সূত্রের মর্যাদা রক্ষারও তাওফীক তিনি আমাদের দান করুন এবং এই নূরানী কাফেলার আখলাকে নিজেদের আখলাক গঠন করার তাওফীক দিন, যা ছিল নবী-আখলাকেরই প্রতিচ্ছবি এবং শুধু নিজ ফযল ও করমে আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত 'মা আনা আলাইহি ওয়া-আসহাবী'-এর উপর অবিচল রাখুন।

বি. দ্র. উল্লেখিত সনদ এবং অন্যান্য সনদ সম্পর্কে জানার জন্য 'আছবাত' ও 'তবাকাতুল ফুকাহা' বিষয়ক গ্রন্থাদি এবং ফিকহের বিশদ গ্রন্থাবলির মুকাদ্দিমা ও খাতিমা অংশ পড়তে হবে। উল্লেখিত সনদের জন্য বিশেষভাবে 'আততাহরীরুল ওয়াজীয', 'তাকমিলাতু রাদ্দিল মুহতার' 'রদ্দুল মুহতার' 'উকূদুল লাআলী' 'আলজাওয়াহিরুল মুযীআ' এবং 'আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যা' ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া যাবে। শেষোক্ত গ্রন্থ দু'টিতে সনদে উল্লেখিত ফকীহগণের তরজমা মনোযোগের সাথে পড়া জরুরি। #

وإلا لا يتبين مواضع السقط والتحريف التي نشأت لأجل غفلة الناسخين والطابعين.

[জুলাই '০৭ঈ.]

সালাফের বক্তব্যে 'তাকলীদ' ও 'মাযহাব' শব্দের ব্যবহার

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে কেয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দেবে তার শরয়ী সমাধানের উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ (ব্যাপক অর্থে)। তৃতীয় উৎস ইজমা এবং চতুর্থ উৎস কিয়াসে শরয়ী। সরাসরি শরীয়তের উৎস ও দলিল-প্রমাণ থেকে সমস্যার সমাধান খুঁজে নেওয়া যে সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয় তা বলাই বাহুল্য। এজন্য ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এই পদ্ধতি স্বীকৃত ও প্রচলিত যে, সর্বদা মুসলিম জনপদে এমন কিছু ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবেন, যারা কুরআন সুন্নাহ ও তা থেকে উৎসারিত ইলমে পারদর্শী। সাধারণ মানুষ কুরআন হাদীসের হুকুম জানার জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হবে এবং তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে কুরআন হাদীসের নির্দেশনা জেনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। কুরআন হাকীমে সূরা তওবার ১১২ নং আয়াত এবং সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতে এই নির্দেশনাই দেওয়া হয়েছে। সহীহ বুখারীর ইলম অধ্যায়ে ১০০ নং হাদীসেও এই নির্দেশনা রয়েছে।

কিতাব ও সুন্নাহর পারদর্শীদের শরণাপন্ন হয়ে তাঁদের নিকট থেকে শরয়ী হুকুম জানা এবং তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার প্রতি আস্থাশীল হয়ে শরীয়তের যে হুকুম তারা বলেন তা মেনে নেওয়াকে পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলে। এটি ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কেননা এই ধারাটি শরীয়তের শিক্ষার প্রভাবেই অনুসৃত হয়েছে। পাশাপাশি এটি একটি স্বাভাবিক পদ্ধতিও বটে, যা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গ্রথিত রয়েছে।

দ্বীন ও দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী নন তিনি সে বিষয়ের পারদর্শী ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এটিই স্বাভাবিক পদ্ধতি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন

বহিরাগত প্রভাবে যাদের চিন্তা ও কর্মের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয়েছে তাদেরকে দুই সমস্যার কোনো একটির শিকার হতে দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের বিরোধিতা ও অযোগ্য লোকের অনুসরণ।

কিতাব ও সুন্নাহর পারদর্শী ব্যক্তিবর্গকে পরিভাষায় 'ফকীহ' ও 'মুজতাহিদ' বলা হয় এবং দ্বীনী হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে শরীয়তের সিদ্ধান্ত অনুসারেই তারা যেহেতু উম্মাহর জন্য অনুসরণীয়, তাই তাঁদেরকে 'ইমাম'ও বলা হয়। তাঁদের অনুসরণকে 'তাকলীদ' এবং অনুসারীদেরকে 'মুকাল্লিদ' বলে। আরবী 'ফকীহ' শব্দটির বহুবচন 'ফুকাহা' এবং 'মুজতাহিদ' শব্দটির বহুবচন 'মুজতাহিদীন'। ইমাম শব্দের বহুবচন 'আইম্মা' এবং 'মুকাল্লিদ' শব্দের বহুবচন 'মুকাল্লিদীন'। যে ব্যক্তি (সাধারণ মানুষ কিংবা সাধারণ আলেম) কুরআন-সুন্নাহ্ পারদর্শী নয় তার জন্য কোন পারদর্শী ব্যক্তির তাকলীদ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরি। যদি সে তা অমান্য করে কোনো মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বন করে একে হাদীস-অনুসরণ আখ্যা দেয় এবং কিতাব-সুন্নাহ ও অন্যান্য শরয়ী দলিলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করে কিংবা নিজে তা না করলেও কোনো অযোগ্য অনধিকার চর্চাকারীর তাকলীদ করে তবে তাকে 'গাইরে মুকাল্লিদ' বলা হয়। এ শব্দটি বহুবচনে 'গাইরে মুকাল্লিদীন' রূপে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ তাকলীদ পরিহারকারী; অথচ তাকলীদ স্বভাব ও শরীয়ত উভয় দিক থেকেই কাম্য এবং সাধারণ মানুষের জন্য হাদীস মোতাবেক আমল করার সর্বযুগে স্বীকৃত ও অনুসৃত মাসনূন পন্থা।

এই হচ্ছে তাকলীদের অর্থ। আর মাযহাব দ্বারা উদ্দেশ্য ফিকহী মাযহাব। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের অন্যান্য দলিল থেকে গৃহীত ও উৎসারিত বিধান ও মাসায়েলের সুবিন্যস্ত সংকলন। সংকলকগণের ভিন্নতায় এই সংকলনও বিভিন্ন ছিল। তবে সে সব সংকলনের মধ্যে বর্তমানে শুধু চারটি সংকলন সংরক্ষিত ও অনুসৃত। তার একটি হল 'আলফিকহুল হানাফী' যা হানাফী মাযহাব নামে প্রসিদ্ধ। এর প্রথম সংকলক ইমাম আবু হানীফা (রহ.)। তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে সংকলনটির এই নাম হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জন্ম ৮০ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। তিনি একাধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি নিজেও অনেক বড় ফকীহ, মুজতাহিদ ও হাফিজুল হাদীস ছিলেন এবং তাঁর পূর্বসূরী ফুকাহা তথা কিতাব ও সুন্নাহের পারদর্শী ইমামগণের ফিকহের ভাণ্ডারও তাঁর সামনে বিদ্যমান ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফ যা সকল মুমিনের সম্পদ, তার উপর আমল করার স্বীকৃত, অনুসৃত ও মাসনূন পন্থা হল কোন ফকীহ,

মুজতাহিদ বা কোন ফিকহী মাযহাবের নির্দেশনা অনুযায়ী তার উপর আমল করা, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তা থেকে বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তির অনুপ্রবেশ না ঘটা এবং এধরনের কোন লোকের তাকলীদও না করা। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে যখন গাইরে মুকাল্লিদ ও লা-মাযহাবী মতবাদ একটি স্বতন্ত্র ফেরকার রূপ পরিগ্রহ করল এবং তারা হাদীস অনুসরণের স্বীকৃত ও সর্বযুগে অনুসৃত মাসনূন পন্থা পরিহার করে হাদীস অনুসরণের নামে একটি নতুন পদ্ধতির দিকে মানুষকে আহ্বান করতে লাগল তখন এই নব-আবিষ্কৃত পন্থা সাধারণ মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তাদেরকে নানা ধরনের অসাধুতার আশ্রয় নিতে হল। উপরন্তু হাদীস অনুসরণের স্বীকৃত পন্থার ব্যাপারে মানুষকে সংশয়গ্রস্ত করে তোলার জন্য বিভিন্ন অর্থহীন প্রশ্নের অবতারণা করল, অথচ হাদীস শরীফে এসেছে–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأُغْلُوْطَاتِ

অর্থাৎ মানুষকে বিভ্রান্তকারী প্রশ্নের অবতারণা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪৮

এই চানক্যপূর্ণ প্রশ্নসমূহের মধ্যে একটি হল "তোমরা যে তাকলীদ করে থাক তা চতুর্থ শতাব্দীর বেদআত। সালাফের কেউ তাকলীদ করতেন না। তাঁদের যুগে মাযহাব-মুযহাব কিছুই ছিল না। এগুলো পরবর্তী যুগের আবিষ্কার। এমনকি সালাফের বক্তব্যে তাকলীদ ও মাযহাব শব্দেরই কোন অস্তিত্ব নেই। যদি থাকে তবে দেখাও।"

এ ধরনের প্রশ্ন সাধারণ মানুষকে পেরেশান করে যদিও, কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে অন্তঃসারশূন্য কিছু কথা। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই বিভিন্ন ফিকহী মাযহাব বিদ্যমান ছিল। কোন ধরনের আপত্তি ছাড়াই সেসব মাযহাবের তাকলীদও হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগের ফুকাহা ও বিভিন্ন মাযহাববিশিষ্ট ইমামগণের ইতিহাস নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা যাবে। সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগে এবং পরবর্তী প্রতি যুগের ফকীহ ও মুজতাহিদ কারা ছিলেন এবং কোন্ অঞ্চলে কোন্ ফকীহ ও মুজতাহিদের তাকলীদ করা হত–এই সব ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। ইনশাআল্লাহ 'ফিকহে হানাফীর সনদ' শিরোনামে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও এই ইতিহাসটির উপরও আলোকপাত করব। এই আলোচনায় শুধু সালাফের বক্তব্যে 'তাকলীদ' ও 'মাযহাব' শব্দের ব্যবহার দেখাতে চাই। আর তা দেখাতে চাই ইমাম বুখারী ও তাঁর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.)-এর কথা থেকে। আশা করি তাঁদের কথাগুলো মনোযোগের সাথে শোনার ও বোঝার চেষ্টা করা হবে।

১. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) (১৬১হি.-২৩৪হি.) ইমাম বুখারী (রহ.)এর বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা ফকীহ ছিলেন এবং যাদের শাগরিদগণ তাঁদের মত ও সিদ্ধান্তগুলো সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করেছেন এবং যাদের ফিকহী মাযহাবের উপর আমল ও ফত্ওয়া জারি ছিল; তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা. মৃত্যু ৩২ হিজরী) যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা. জন্ম ১১ হিজরতপূর্ব, মৃত্যু ৪৫ হিজরী) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা. জন্ম ৩ হিজরতপূর্ব, মৃত্যু ৬৮ হিজরী)। তাঁর আরবী বাক্য নিম্নরূপ–

ولم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فإن لكل منهم أصحابا يقومون بقوله ويفتون الناس.

এরপর আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) তাঁদের প্রত্যেকের মাযহাবের অনুসারী এবং তাঁদের মাযহাব মোতাবেক ফত্ওয়া দানকারী ফকীহ তাবেয়ীগণের নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)এর যে শাগরিদগণ তাঁর কেরাআত অনুযায়ী মানুষকে কুরআন শেখাতেন, তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষকে ফতওয়া দিতেন এবং তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন তারা হলেন নিম্নোক্ত ছয়জন মনীষী : আলকামাহ (মৃত্যু ৬২ হিজরী) আসওয়াদ (মৃত্যু ৭৫ হিজরী) মাসরূক (মৃত্যু ৬২ হিজরী) আবীদাহ (মৃত্যু ৭২ হিজরী) আমের ইবনে শারাহবীল (মৃত্যু ৬৩ হিজরী) ও হারিস ইবনে কায়েস (মৃত্যু ৩৬ হিজরী)।"

ইবনুল মাদীনী (রহ.) বলেন, "ইবরাহীম নাখায়ী (রহ. ৪৬-৯৬ হিজরী) এই ছয়জনের নাম উল্লেখ করেছেন।"

তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যের আরবী পাঠ নিম্নরূপ–

الذين يقرؤون الناس بقراءته ويفتونهم بقوله ويذهبون مذهبه...

এরপর আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) লিখেছেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)এর (ফকীহ) শাগরিদ এবং তাঁদের মাযহাবের সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন ইবরাহীম (নাখায়ী, ৪৬-৯৬ হিজরী) ও আমের ইবনে শারাহবীল শা'বী (১৯-১০৩ হিজরী)। তবে শা'বী মাসরূক (রহ.)এর মাযহাব অনুসরণ করতেন।"

আরবী পাঠ নিম্নরূপ–

وكان أعلم أهل الكوفة بأصحاب عبد الله ومذهبهم: إبراهيم، والشعبي، إلا أن الشعبي كان يذهب مذهب مسروق.

এরপর লেখেন–

وكان أصحاب زيد بن ثابت الذين يذهبون مذهبه في الفقه ويقومون بقوله هؤلاء الاثنى عشر ...

অর্থাৎ যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)এর যেসব শাগরিদ তাঁর ফিকহী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁর মত ও সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারে মগ্ন ছিলেন তারা বারোজন।

তাঁদের নাম উল্লেখ করার পর ইবনুল মাদীনী (রহ.) লেখেন, "এই বারো মনীষী ও তাঁদের মাযহাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন ইবনে শিহাব যুহরী (রহ. ৫৮-১২৪ হিজরী) ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ আনসারী (রহ. ১৪৩ হিজরী) আবুয যিনাদ (রহ. ৬৫-১৩১ হিজরী) আবু বকর ইবনে হায্ম (রহ. ১২০ হিজরী)। তাঁদের পরে ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ. ৯৩-১৭৯ হিজরী)।

এরপর ইবনুল মাদীনী (রহ.) বলেন–

وكما أن أصحاب ابن عباس ستة الذين يقومون بقوله، ويفتون به، ويذهبون مذهبه.

তদ্রূপ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)এর যেসব শাগরিদ তাঁর মত ও সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন, সে অনুযায়ী ফত্ওয়া দিতেন এবং তাঁর অনুসরণ করতেন, তারা হলেন ছয়জন। এরপর তিনি তাঁদের নাম উল্লেখ করেন।

ইমাম ইবনুল মাদীনী (রহ.)এর এই আলোচনা তাঁর 'কিতাবুল ইলাল' (পৃ. ৪৪-৪৫)এ বিদ্যমান রয়েছে এবং ইমাম বায়হাকী (রহ.)এর 'আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা' (পৃ. ১৬৪-৬৫)এও সনদসহ উল্লিখিত হয়েছে। আমি এখন বায়হাকী (রহ.)এর উক্ত কিতাব থেকেই ইমাম ইবনুল মাদীনী (রহ.)এর কথাগুলো উদ্ধৃত করেছি। এই কথাগুলো আলোচ্য বিষয়ে এতই স্পষ্ট যে, অতিরিক্ত টীকা-ভাষ্যের প্রয়োজন নেই।

২. ইমাম বুখারী (রহ.)এর 'খালকু আফ'আলিল ইবাদ' আলেমদের মাঝে বেশ প্রসিদ্ধ। এই কিতাবে ইমাম বুখারী (রহ.) আকীদা প্রসঙ্গে এক আলোচনায় বলেছেন, "অনেক মানুষ অজ্ঞতার কারণে নানা ভিত্তিহীন কথা বলে থাকে। তারা না অন্তর্দৃষ্টির (ইজতিহাদের) ভিত্তিতে কথা বলে, না বিশুদ্ধ তাকলীদের ভিত্তিতে। যা কিছু বলে সব কিছুর উৎস হল অজ্ঞতা; না কোন দলীল আর না কোন উদ্ধৃতি।"

বোঝা গেল, কোন মাসআলা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথ দুটি– এক, সরাসরি দলীল অন্বেষণ করা। এটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুজতাহিদের কাজ। দুই, কোন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত তালাশ করা। এটা হল বিশুদ্ধ তাকলীদ। এর ভিত্তিতে যদি কেউ কিছু বলে তবে তার উপর আপত্তি করা যায় না।

ইমাম বুখারীর আরবী বাক্য নিম্নরূপ–

قال أبو عبد الله : وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة أو ذكر اسناد وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك فوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

যারা আরবী ভাল বোঝেন তারা ইমাম বুখারী (রহ.)এর উপরোক্ত কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখবেন, তাতে নিম্নোক্ত কথাগুলো রয়েছে–

এক, ইমামের তাকলীদ অনুমোদিত। দুই, এমন তাকলীদ জাহালাত বা মূর্খতা নয়। তিন, এমন তাকলীদ গোমরাহী নয়। ইমাম যেহেতু দলীলের ভিত্তিতে বলেন তাই তাঁর কথা মেনে নেওয়া গাইরুল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়া নয়। চার, অযোগ্য লোকের তাকলীদ করা বৈধ নয়।

আপাতত এই উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করেই আলোচনা সমাপ্ত করছি। আরো বিস্তারিত আলোচনা অন্য কোন সুযোগে করা যাবে। উপরোক্ত আলোচনা যদি মনোযোগের সাথে পড়া হয় এবং আল্লাহ তাআলার তাওফীক নসীব হয় তবে এতে হেদায়েতের উপকরণ রয়েছে।#

[ফেব্রুয়ারি '০৭ঈ.]

জনসাধারণের কি দলীলসহ মাসআলা জানা জরুরি

কুরআনের একটি আয়াতে কতক গাইরে মুকাল্লিদ আলেমের তাহরীফ

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এ রীতি অব্যাহত রয়েছে যে, সাধারণ মানুষ আলেমদের কাছে, তালেবে ইলম উস্তাদের কাছে এবং আলেমরা তাঁদের চেয়ে বড় আলেমের কাছে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করেন। কুরআন হাদীসের নির্দেশনা ও দ্বীনী হুকুম-আহকাম জানার এটিই স্বাভাবিক পদ্ধতি, যা অতীতেও অনুসৃত হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অনুসৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

জ্ঞানার্জনের এই স্বাভাবিক পদ্ধতির কথাই ইসলাম বলেছে এবং তা অনুসরণের তাগিদ করেছে। কুরআন হাকীমে ইরশাদ হয়েছে-

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"তোমাদের জানা না থাকলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর।" -সূরা নাহ্ল ২৩

হাদীস শরীফে এসেছে-

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

"না জানার সমাধান হল প্রশ্ন করা।" -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৪০

মাসআলা জিজ্ঞাসা করার দু'টি পদ্ধতি আছে। একটি হল কোন বিষয়ে শরীয়তের হুকুম জানতে চাওয়া। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, হুকুমের সূত্র অর্থাৎ কুরআনের কোন্ আয়াত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ হাদীস বা শরীয়তের কোন্ মূলনীতি থেকে হুকুমটি পাওয়া গেছে, তা-ও জানতে চাওয়া।

উভয় পদ্ধতিই প্রথম থেকে প্রচলিত। কোন সাধারণ মুসলিম যখন আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন, তখন সাধারণত এমনই হত যে, না তারা মাসআলার দলীল জিজ্ঞাসা করতেন, না উত্তরদাতা দলীল উল্লেখ করতেন।

খাইরুল কুরূন অর্থাৎ সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগে সাধারণ মুসলিম জনগণ মাসআলার সাথে দলীলও জিজ্ঞাসা করেছেন এমন নজির বিরল। তবে তালেবে ইলম যখন উস্তাদের কাছে কিংবা আলেম তাঁর চেয়ে বড় আলেমের কাছে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতেন, তখন অনেক সময় দলীল নিয়েও আলোচনা হত, তবে তাও কোন অপরিহার্য নিয়ম ছিল না; বরং অনেক ক্ষেত্রেই দলীল উল্লেখ না করে শুধু সমাধানটি উল্লেখ করা হত।

এখানে উল্লেখ্য যে, দলীল উল্লেখ না করা আর দলীল না থাকা এক বিষয় নয়। যে মাসআলার দলীল নেই তা শরীয়তের মাসআলাই নয়। শরীয়তের মাসআলা সেটাই যা শরীয়তের দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত। মুফতী যখন মাসআলা বলেন, তখন দলীলের ভিত্তিতেই বলেন। তবে সাধারণ মানুষকে মাসআলা বলার সময় দলীল-আদিল্লা উল্লেখ করা হয় না। জগতের সকল শাস্ত্রেই এই নীতি কার্যকর।

সাহাবা-যুগে মুজতাহিদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তখন লোকেরা ব্যাপকভাবে যাঁদের শরণাপন্ন হত এবং এ কারণে তাঁদেরকে অনেক মাসআলা বয়ান করতে হত, তাঁদের সংখ্যা চল্লিশেরও কম। -ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ইবনুল কায়্যিম ১

মুজতাহিদ সাহাবা এবং তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মুজতাহিদ মুফতীদের ফত্ওয়া হাদীস ও আসারবিষয়ক গ্রন্থে সংকলিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিষয়ে মুয়াত্তা ইমাম মালেক (১৭৯ হি.) মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক (২১১ হি.) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (২৩৫ হি.) সুনানে দারিমী (২৫৫ হি.) সুনানে সায়ীদ ইবনে মানসূর (২২৭ হি.) ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক বড় বড় এগার খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে এবং মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার সর্বোত্তম সংস্করণ অল্প কিছুদিন আগে বৈরুত থেকে মোট ছাব্বিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

আলেমগণের অজানা নয় যে, এই কিতাবগুলোতে সংকলিত ফকীহ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের অসংখ্য ফত্ওয়া এমন রয়েছে, যাতে না প্রশ্নকারী দলীল জিজ্ঞাসা করেছেন, না উত্তরদাতা দলীল উল্লেখ করেছেন। সাহাবী তাবেয়ীদের অধিকাংশ ফত্ওয়াই যে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তা উপরোক্ত কিতাবসমূহ থেকে বোঝা যায়। খাইরুল কুরূনের এই 'তাআমুল' বা সম্মিলিত কর্মপন্থা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সাধারণ মানুষের জন্য দলীলসহ মাসআলা জানা জরুরি নয়। কুরআন হাদীসেও মুসলমানদেরকে কিতাব-সুন্নাহর পারদর্শী আলেমের কাছ থেকে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করার এবং সে অনুযায়ী আমল করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়নি যে, মাসআলার সমাধান জানার সাথে সাথে তার সূত্র ও দলীলও জানতে হবে। অতএব

এটা সাধারণ মানুষের কর্তব্য নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের কর্তব্য হল, কোন অযোগ্য লোকের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা না করা, কিতাব-সুন্নাহর পারদর্শী ও হেদায়াতের উপর বিদ্যমান ব্যক্তির কাছেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করা। পক্ষান্তরে আলেমের কর্তব্য হল, পূর্ণ আমানতদারী ও সতর্কতার সাথে শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে জবাব প্রদান করা। ব্যক্তিগত মত বা মানসিক ঝোঁক দ্বারা জবাবকে প্রভাবিত না করা।

প্রশ্নকারী যদি সাধ্যমত খোঁজ-খবর করে ফত্ওয়াদানের উপযুক্ত একজন দ্বীনদার আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ওই আলেম তাহকীক ছাড়া মাসআলা বলে, তাহলে হাদীস শরীফের ঘোষণা এই যে–

مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

"যথাযথ না জেনে যদি কাউকে ফত্ওয়া দেওয়া হয় তবে এর গোনাহ ফত্ওয়াদাতাকেই বহন করতে হবে।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪৯

পক্ষান্তরে আলেম যদি যথাযথ তাহকীক করেই মাসআলা বলে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সমাধানটি ভুল ছিল, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সে আলেম একটি সওয়াব লাভ করে। –সহীহ বুখারী

তাহলে এক্ষেত্রেও প্রশ্নকারী যে দায়মুক্ত, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে যে বিষয়টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা এই যে, কোন গোমরাহ লোককে ধর্মীয় গুরু বানিয়ে নেওয়া বা কোন অযোগ্য লোক থেকে সমাধান গ্রহণ করা অথবা দ্বীনী বিষয়কে গুরুত্বহীন মনে করে যে কারো কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী দায়মুক্ত হবে না; বরং করণীয় পালন না করার কারণে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

মোটকথা প্রশ্নকারীর কর্তব্য হল, যোগ্য লোককে প্রশ্ন করা, যার সম্পর্কে আস্থা আছে যে, তিনি তাহকীক করে শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতেই উত্তর দেবেন। যোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে সমাধান পাওয়ার পর তিনি তা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে বলেছেন বা এর সূত্র কী?–এসব জানতে চাওয়া প্রশ্নকারীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। শরীয়ত এটা তাদের কর্তব্য সাব্যস্ত করেনি। যুক্তির বিচারেও এ দায়িত্ব তাদের উপর চাপানো যায় না। কেননা শরীয়তের সব মাসআলা এক শ্রেণীর নয়। সকল মাসআলায় দলীল হিসাবে আয়াত বা হাদীস পাঠ করে তরজমা করে দিলেই কাজ শেষ হয় না; বরং এক্ষেত্রে আয়াত বা হাদীস থেকে বিধানটি কীভাবে আহরণ করা হল, তা দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। বলাবাহুল্য, তা শাস্ত্রীয় আলোচনা, যা

অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন ফন ও শাস্ত্রের পারদর্শিতা অপরিহার্য। এটা ছাড়া দলীল ও তা থেকে বিধান আহরণের বিষয়টি বোঝা সম্ভব হবে না, শুধু আলোচনা শোনা সম্ভব হবে। তবে শুধু দলীলবিষয়ক আলোচনা শোনার মাধ্যমে দলীল জানার যে উদ্দেশ্য– দলীলের পর্যালোচনা, তা কি সম্ভব? তাহলে এ শ্রেণীর মানুষের উপর দলীল জানার দায়িত্ব কীভাবে আরোপ করা যায়?

যদি কোন প্রশ্নকারী দলীল জিজ্ঞাসা করে এবং আলেম তাকে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি শোনান তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন হবে, আয়াতের অর্থ তো জানি না, তরজমা করুন। এরপর প্রশ্ন হবে, এখান থেকে উপরোক্ত সমাধান কীভাবে বের হল? আলেম বলবেন, বিধানটি 'ইবারাতুন নস' থেকে নয়, 'ইশারাতুন নস' থেকে গৃহীত। এবার তাকে এই শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলো বোঝাতে হবে। বলাবাহুল্য, তা শুধু মুখে মুখে শুনে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। সুতরাং আলোচ্য বিধানটি বাস্তবিকই 'ইশারাতুন নস' থেকে গৃহীত কি না, তা পরীক্ষা করার তো প্রশ্নই আসে না। ধরে নেওয়া যাক, আলেম তাকে দলীলও বললেন এবং তা থেকে কীভাবে বিধান আহরিত হল তা-ও আলোচনা করলেন, আর শ্রোতা কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে তার কথা মেনে নিলেন, তাহলে এতদূর অগ্রসর হয়েই বা ফল কী হল? এত কিছুর পরও যখন মেনে নেওয়ার প্রশ্নই আসছে তো প্রথমেই মেনে নেওয়া উচিত ছিল।

এবার হাদীস-প্রসঙ্গে আসি। এখানেও একই কথা। আলেম যদি মাসআলার দলীল হিসাবে কোন হাদীস উল্লেখ করেন, তাহলে প্রশ্নকারীর প্রশ্ন হবে, হাদীসটি সহীহ কি না? আলেম বললেন, সহীহ, ইমাম তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন। প্রশ্নকারী বলবেন, আমি তো আলবানী সাহেবের বই পড়েছি, তিনি তো একে যয়ীফ বলেছেন। এখন আলেম যদি এই প্রসঙ্গে আলোচনাও করেন, তবে এটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় বিষয় হওয়ায় শ্রোতা তা কতটুকুই বা বুঝতে সক্ষম হবে আর তার পর্যালোচনাই বা কীভাবে করবে? এখানেই শেষ নয়, এরপর প্রশ্ন হবে, হাদীসটির তরজমা বলুন। তরজমা বলা হলে প্রশ্ন হতে পারে, আমি তো ফাউন্ডেশনের তরজমা পড়েছি, ওখানে তরজমা অন্যভাবে করা হয়েছে। আলেম বললেন, ওই তরজমা সঠিক নয়। বলাবাহুল্য, এই প্রশ্নোত্তরের কোন ফল দাঁড়াবে না। হয়ত প্রশ্নকারী শুধু শুনতে থাকবে কিংবা অযথা তর্ক করবে।

আরো কথা আছে, অনেক ক্ষেত্রে শুধু তরজমা থেকে মাসআলা বোঝা যাবে না, তখন প্রশ্ন হবে, এই হাদীস থেকে বিধান কীভাবে বের হল? অনেক মাসআলায় এই প্রশ্নও হবে যে, আপনি যে হাদীসটি বললেন, আমি তো এর বিপরীত হাদীস অমুক অমুক কিতাবে পড়েছি। ফলে 'তাআরুযুল আদিল্লাহ'র জটিল প্রসঙ্গে প্রবেশ

করতে হবে, যা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়, যদিও কিছু বাংলা-ইংরেজি বইপত্রের সাহায্যে কিছু পরিভাষা তার রপ্ত থাকে। তাহলে সেই প্রশ্নই আসছে যে, আলেমের আলোচনা শোনার পরও তা মেনে নেওয়াই হচ্ছে শেষ কথা; যেহেতু পর্যালোচনার যোগ্যতা নেই। তাহলে এতসব প্রশ্নের ফায়েদা কী হল? আর যদি পর্যালোচনার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তা মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে তো সেটা অজ্ঞ লোকের বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হবে। এ তো চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের পরামর্শের ব্যাপারে রোগীর কিংবা উকিলের পরামর্শের ব্যাপারে মক্কেলের অনধিকার তর্কের মতো। মোটকথা সাধারণ মানুষকে দলীলসহ মাসআলা জানতে বাধ্য করা যুক্তির বিচারেও অগ্রহণযোগ্য। তারপরও যদি তাদেরকে বাধ্য করতে হয়, তাহলে উত্তম এই যে, সবাইকে কুরআন সুন্নাহর পারদর্শী আলেম হতেই বাধ্য করা। তবে এটাও ইসলাম পরিপন্থী।

এখান থেকেও বোঝা যায় যে, ইসলাম যখন সবাইকে আলেম হতে বাধ্য করে না, তখন সবাইকে মাসআলার দলীল জানতে বাধ্য করবে, তাও হতে পারে না।

এখানে একটি কথা বলে দেওয়া দরকার যে, তাওহীদ, রিসালাত ও অন্যান্য মৌলিক আকায়েদ এবং শরীয়তের বড় বড় মাসআলা সাধারণত সবারই জানা থাকে এবং এ বিষয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। দ্বীনের মামুলী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ দলীলগুলো জানেন। এসব বিষয়ে দলীল বলে দেওয়া সহজ। তবে এই দলীলগুলো সাধারণত কেউ জানতে আসে না।

যাহোক, আমাদের আলোচ্যবিষয় অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য মাসআলা দলীলসহ জানা জরুরি নয়-এর মত একটি সহজবোধ্য কথাও কেউ অস্বীকার করতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমি কিছু বাংলাদেশী সালাফী ভাইয়ের কাছেই প্রথম শুনি যে, সাধারণ মানুষের জন্য দলীলসহ মাসআলা জানা জরুরি। মুফতী যদি মাসআলা বলেন, কিন্তু দলীল না বলেন, তাহলে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়ে এই যে, তারা এ কথাটার উপর কোন দলীল উল্লেখ করেনি। যেন আমাকেও একথাটা দলীল উল্লেখ করা ছাড়া স্বীকার করাতে চাচ্ছেন। অবশ্য এরূপ পরিষ্কার ভুল কথার দলীলই বা কোথায় পাওয়া যাবে। এটা ছিল প্রথম। এরপর এক বন্ধু সৌদি থেকে একটি ক্যাসেট পাঠালেন, যাতে এক বাঙ্গালী সালাফীর বয়ান সংরক্ষিত ছিল। এ ব্যক্তি বাঙ্গালীদের মধ্যে সালাফী মতবাদ প্রচারে নিযুক্ত। ওই বন্ধুর আগ্রহ ছিল, আমি যেন ক্যাসেটটি শুনে মতামত লিখি। কেননা, এ জাতীয় বক্তৃতার মাধ্যমে নাকি সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের

পেরেশান করা হয়। ক্যাসেটটা শুনে আমার খুব আশ্চর্য হল। ওই বক্তা সূরা নাহলের ৪৩-৪৪ নং আয়াত– فَسْئَلُوٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ পড়ল এবং এর তরজমা এভাবে করল যে, "যদি তোমরা না জান তবে কুরআন ওয়ালা, হাদীস ওয়ালা উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস কর দলীলের সাথে।"

আমি এটা শোনামাত্র ইন্নালিল্লাহ পড়লাম। কেননা, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ এটা নয়। আল্লাহ এই আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত-বিশ্বাস খণ্ডন করেছেন। মুশরিকদের প্রশ্ন ছিল, মানুষ রাসূল কীভাবে হয়? আল্লাহ এই ভ্রান্তি খণ্ডন করে উপরোক্ত আয়াতে বলেছেন, আমি পূর্ববর্তী সকল রাসূল তো মানুষের মধ্যেই প্রেরণ করেছি এবং সবাইকে 'বাইয়িনাত' অর্থাৎ মুজিযা এবং 'যুবুর' অর্থাৎ কিতাব দান করেছি। যদি তোমাদের তা জানা না থাকে তাহলে আহলে ইলমের কাছে জিজ্ঞাসা কর। সালাফী আলেমদের লিখিত তরজমা ও তাফসীরেও এই মর্মই দেখতে পাবেন। ওই বক্তা 'বিলবায়্যিনাতি ওয়াযযুবুর'কে 'ফাসআলূ'এর সাথে যুক্ত করে অর্থ করেছে 'দলীলসহ জিজ্ঞেস কর।' এ তরজমা আরবী কাওয়ায়েদ, সুস্থ বিচার-বুদ্ধি এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুফাসসিরের ইজমা পরিপন্থী।

প্রথমত ওই বক্তা উপরোক্ত আয়াতে তাহরীফ বা মর্মগত বিকৃতি সাধন করেছে, দ্বিতীয়ত একটি সম্পূর্ণ ভুল কথা আয়াতের উপর আরোপ করার অপচেষ্টা করেছে। সাধারণ মানুষের জন্য সমাধান দলীলসহ জানা জরুরি–এই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। এ ভুল কথাটাকেই তিনি উপরোক্ত আয়াতের উপর আরোপ করে আয়াতের তাহরীফ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ মানুষ দলীলের শুদ্ধতা কীভাবে যাচাই করবে? এর উত্তর এই যে, সাত-আটটি মাসআলা দলীলসহ জিজ্ঞেস করবে। যখন দেখা যাবে যে, মুফতী সাহেব দলীলসহ উত্তর দিচ্ছেন, তো এরপর দলীল ছাড়াও তার কথা মেনে নেওয়া যাবে।'

সচেতন পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, তার এ বক্তব্য মোটেও আলেমসুলভ হল না এবং শরীয়তের ব্যাপারে দায়িত্বশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করে না।

তার উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, তার দাবি অনুযায়ী যদি কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের অর্থ এই হয় যে, আলেমদের কাছে দলীলসহ জিজ্ঞেস কর, তাহলে সাত-আটটি মাসআলা দলীলসহ জিজ্ঞেস করার পর বাকিগুলোতে তা আর লাগবে না–এ কথাটা তিনি কোথায় পেলেন? একবার

আয়াতের এই অর্থ করলেন যে, মাসআলা দলীলসহ জানতে হবে। এরপর আরোপিত মর্ম থেকে স রে এসে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন। কুরআনের আয়াতের সাথে এতখানি দায়িত্বহীনতা কীসের পরিচয় বহন করে?

দ্বিতীয় কথা এই যে, যে সাধারণ মানুষটি শাস্ত্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অনবগত তিনি সাত-আট মাসআলা কেন এক মাসআলার দলীলও কি পর্যালোচনা করতে পারবে? এটা তো খুবই সহজ কথা যে, যিনি শাস্ত্রীয় জ্ঞানে পারদর্শী তিনি সকল মাসআলার দলীলই পর্যালোচনা করতে পারবেন আর যার কাছে শাস্ত্রীয় জ্ঞান নেই তিনি এক মাসআলার দলীলও পর্যালোচনা করতে পারবেন না। তাহলে তার উপরোক্ত কথাটি কি একটি অসার কথা হল না?

তৃতীয় কথা এই যে, যে মুফতী সাহেব সাত-আট মাসআলায় দলীলসহ উত্তর দিলেন, পরবর্তী সময়ে তাঁর কথা দলীল ছাড়াই গ্রহণ করা যাবে বলে তিনি যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, সে অনুযায়ী প্রশ্ন হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও অন্যান্য মুজতাহিদ ইমাম, যাঁরা শত শত মাসআলা দলীলসহ উল্লেখ করেছেন এবং তা সঠিক হওয়ার বিষয়ে সমগ্র উম্মাহর ইজমা রয়েছে, তাঁদের সিদ্ধান্ত দলীল জানা ছাড়া গ্রহণ করার বৈধতা কি তার ওই মূলনীতি দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে না? অথচ ইমামগণের তাকলীদ অবৈধ সাব্যস্ত করার জন্যই তার এইসব অপপ্রয়াস।

যাহোক মূলকথা হচ্ছে, তিনি কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে তাহরীফ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানকার কিছু কিছু গাইরে মুকাল্লিদও তাদের বিভিন্ন পুস্তিকা ও লিফলেটে জেনে-বুঝে হোক বা অজ্ঞতার কারণে হোক, এই তাহরীফেরই পুনরাবৃত্তি করে থাকে। সৌদির এই বাঙ্গালী প্রচারক যদি সৌদি আলেমগণের এবং সৌদি দারুল ইফতা 'আললাজনাতুদ দাইমা'র ফত্ওয়া সংকলনও উল্টে-পাল্টে দেখতেন তাহলে সেখানে এমন অনেক মাসআলা পেয়ে যেতেন, যাতে দলীল উল্লেখ নেই।

ওখানকার আলেমদের একাধিক ফত্ওয়া-সংকলন রয়েছে এবং فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ও মুদ্রিত রয়েছে। এগুলোতে আমরা বহু মাসআলা এমন দেখেছি, যাতে মুফতী সাহেব কোন দলীল উল্লেখ করেননি। আবার অনেক মাসআলা এমন আছে, যেগুলোতে দলীলের প্রতি শুধু ইঙ্গিত করা হয়েছে বা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দলীলের বিস্তারিত আলোচনা এবং দলীল থেকে মাসআলা আহরণের পদ্ধতি কিছুই উল্লেখিত হয়নি। বলাবাহুল্য, সাধারণ মানুষের পক্ষে দলীল শুনে এই সমস্ত কিছু বুঝে ফেলা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই একেও দলীল উল্লেখ করা বলা যায় না।

হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের গাইরে মুকাল্লিদ আলেমদের ফত্ওয়ার বিভিন্ন সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এসব সংকলনেও আমরা দেখি যে, তাঁরাও অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীকে দলীলের উল্লেখ ছাড়াই উত্তর দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশের গাইরে মুকাল্লিদরা তাদের যেসব আলেমের শরণাপন্ন হয়, যাদেরকে 'আহলে হাদীস উলামা' বা 'সালাফী উলামা' বলা হয়, তারা কয়টি মাসআলায় দলীল উল্লেখ করেন? এক সালাফী আলেমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি যখন লোকদের মাসআলা বলেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেন, তখন কি প্রত্যেক মাসআলার সাথে দলীল উল্লেখ করেন? তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি দলীল জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিয়ে থাকি।' তখন আদবের সাথে প্রশ্ন করা হল যে, কথা তো এমন ছিল না। আপনাদের মতে যখন দলীল ছাড়া মাসআলা শুনলে তা মানাই জায়েয নয়, তখন আপনারা দলীল উল্লেখ না করে চুপ থাকেন কীভাবে? আর দলীল জিজ্ঞেসের সুযোগ দিলেই কি সমস্যার সমাধান হয়? তাছাড়া আপনারাই বা তাদের জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় থাকবেন কেন? আপনাদের উচিত নিজেরাই মাসআলার দলীল উল্লেখ করা এবং দলীলসংক্রান্ত সকল আলোচনার পাশাপাশি কীভাবে এই দলীল থেকে বিধানটি গৃহীত হল তা-ও উল্লেখ করা, এমনকি এক মাসআলা বয়ান করতে এক সপ্তাহ লাগলেও।

সূরা নাহলের আলোচিত আয়াতের এবং এর সমার্থক আয়াত (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৭)এর তাফসীর যে কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থে দেখা যেতে পারে। আমি এখানে দু'তিনটি কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

১. মসজিদে নববীর ওয়ায়েয শাইখ আবু বকর জাবির আলজাযাইরীর প্রসিদ্ধ তাফসীর– আইসারুত্ তাফাসীর ৩/১১৯-১২১; ৩৯৭-৩৯৯

তিনি সেখানে একথাও লিখেছেন যে–

وفي الاية دليل على وجوب تقليد العامة العلماء إذ هم أهل الذكر ووجوب العمل بما يفتونهم به ويعلمونهم به

"এই আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, সাধারণ মানুষের জন্য আলেমগণের তাকলীদ ওয়াজিব এবং তাঁদের কুরআন হাদীসভিত্তিক ফত্ওয়া ও নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কেননা, তাঁরাই হলেন আহলুয যিক্র।"

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৬২৮-৬২৯; ৩/১৯২-১৯৩

৩. তাফসীরে কুরতুবী ১/১০৮-১০৯; ১১/২৭১-২৭২

কুরতুবী এখানে এ কথাও লিখেছেন যে, "আলেমগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন

দ্বিমত নেই যে, সাধারণ মানুষের জন্য আলেমগণের তাকলীদ অপরিহার্য এবং কুরআনের আয়াত- فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ দ্বারা আলেমগণই বোঝানো হয়েছে। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, অন্ধ ব্যক্তি যদি কেবলার দিক নির্ণয়ে অক্ষম হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির তাকলীদ করতে হয় তেমনি ইলম ও অন্তর্দৃষ্টিহীন লোকদেরও দ্বীনের বিধি-বিধান মোতাবেক চলার জন্য আলেমের তাকলীদ করতে হবে। তদ্রূপ এ বিষয়েও আলেমদের কারো দ্বিমত নেই যে, সাধারণ মানুষের জন্য ফত্ওয়া দেওয়া জায়েয নয়। কেননা হালাল-হারামের সূত্র সম্পর্কে তারা অজ্ঞ।" #

[মে '০৭ঈ.]

আহলে হাদীস আলেমগণ যদি ভেবে দেখতেন

এই লেখায় আহলে হাদীস আলেমগণের প্রতি কিছু কথা আরয করতে চাই। তা এই যে, হাদীসের অনুসরণ অপরিহার্য হওয়ার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই, থাকতেও পারে না। সকল ফিক্‌হী মাযহাবের ভিত্তিই হল কুরআন, হাদীস ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল। হাদীস ইসলামী বিধিবিধানের অন্যতম দলীল এবং ফিক্‌হের অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বজন স্বীকৃত বিষয় এবং এতে কারো বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এসব বিষয় আপনারা ভালেভাবেই জানেন। আপনারা আরো জানেন যে, হানাফী মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের স্বীকৃত ও অনুসৃত (মুফতাবিহী) যেসব মাসআলায় আপনারা দ্বিমত পোষণ করেন তার সবগুলোর স্বপক্ষেই সহীহ হাদীস বা অন্য কোন শরয়ী দলীল রয়েছে।

এখন আপনাদের কাছে আরয এই যে, আপনাদের অনুসারী কিছু আম-মানুষ বিভিন্ন ধরনের অবাস্তব কথা বলে থাকে। যেমন বলে যে, আমরা মুহাম্মাদী আর ওরা হানাফী; আমরা হাদীস মানি আর ওরা হাদীস বাদ দিয়ে ফিক্‌হ মানে; আমাদের ও তাদের মাঝে পার্থক্য হল হাদীস মানা, না মানার। এসব কথা কি তারা নিজেদের পক্ষ থেকে বলে, না আপনারা তাদেরকে শিখিয়ে দেন? যদি নিজেদের পক্ষ থেকে বলে, তাহলে আপনারা তাদেরকে সংশোধন করেন না কেন? আর যদি আপনারাই শিখিয়ে থাকেন, তাহলে এসব অবাস্তব কথা শেখান কীভাবে? মানুষকে অবাস্তব জিনিস শিক্ষা দেওয়া কিংবা বিজ্ঞ ফকীহগণের ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন হাদীসের বিধান অনুসরণকারীদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা যে হাদীস অনুসরণের আওতায় আসে না– এ তো অতি সাধারণ মানুষও বোঝে।

তদ্রূপ তাদের বলতে শোনা যায় যে, হানাফীদের নামায হয় না। কেউ বলে, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত নামায পড়ে না। হাদীস অনুযায়ী না পড়ে ফিক্‌হ অনুযায়ী পড়ে, যা হাদীস বিরোধী।

তাদের এ সমস্ত কথা যদি আপনাদের শেখানো হয়ে থাকে তবে তা খুবই দুঃখজনক। আপনারা জেনেশুনে এসব ভ্রান্ত কথা কীভাবে শিক্ষা দেন? আর যদি আপনারা না শিখিয়ে থাকেন; বরং তারা মূর্খতার কারণে কিংবা আপনাদের বক্তব্য ও আচরণ থেকে এই ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকে, তাহলে আপনাদের দায়িত্ব তাদেরকে সত্য কথাটি জানিয়ে দেওয়া এবং এই বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখা। আপনাদের কথাই তারা শুনবে। কেননা আপনারা নিজেরাও 'আহলে হাদীস' এবং আহলে হাদীসদের মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ।

এটা তো হতেই পারে না যে, আপনারা নিজেরাই –হানাফীদের নামায হয় না বা তাদের নামায হাদীসের পরিপন্থী– এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার। কিন্তু আল্লাহ না করুন! বাস্তব অবস্থা যদি এমনই হয়, তাহলে আপনাদের নিকট অনুরোধ থাকবে যে, দয়া করে হাদীসের কিতাবগুলো পুনরায় পাঠ করুন এবং একটু বুঝেশুনে পাঠ করার চেষ্টা করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে অন্যায়ভাবে কাউকে গোমরাহ সাব্যস্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত হবেন না।

এখানে বলে দেওয়া অসংগত হবে না যে, অনেক সালাফী ও আহলে হাদীস আলেমের ব্যাপারে আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, তাদের কাছে তালীমপ্রাপ্ত সাধারণ লোকেরা এসে আমাদেরকে বলে, 'তোমাদের নামায হয় না।' এরপর আমরা যখন তাদের সামনেই তাদের শিক্ষকদের নিকট অভিযোগ করি যে, এরা আমাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলে থাকে, তাই আমরা আপনাদের কাছে বিশুদ্ধ নামায শিখতে এসেছি, তখন সেসব আলেম বলেন যে, হানাফীদের নামায হয় না–একথা তো আমরা বলি না! এ সব অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ লোকেরা মূর্খতাবশত অনেক কথা নিজেদের পক্ষ থেকেও বলে থাকে।

আপনাদের নিকট দ্বিতীয় আরয এই যে, আপনাদের অনেকেই লিফলেট তৈরিতে অভ্যস্ত। আপনারা বা আপনাদের তত্ত্বাবধানে আপনাদের সহযোগীরা বিভিন্ন ধরনের ইশতেহার, লিফলেট ও বুকলেট তৈরি করে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন; অনেক ইশতেহারে শুধু মাসআলার শিরোনাম, হাদীসের কিতাবের নাম, খণ্ড ও পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করা হয়। হাদীসও উল্লেখ করা হয় না এবং কীভাবে হাদীস দ্বারা আপনাদের দাবি প্রমাণিত হল তাও বলা হয় না। কিছু ইশতেহারে হানাফীদের জন্য ঘর খালি রাখা হয় এবং চ্যালেঞ্জ করা হয় যে, তোমাদের পক্ষে কোন হাদীস থাকলে এখানে তার বরাত (হাওলা) লিখে দাও।

এ জাতীয় কার্যকলাপ যে চরম দায়িত্বহীনতা, তা আপনারা বোঝেন না বললেও কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? একে তো যেসব শাখাগত মাসআলায় সাহাবা-যুগ থেকেই

মতপার্থক্য রয়েছে এবং উভয় দিকেই দলীল-প্রমাণ আছে এবং উভয় মত অনুসারেই সাহাবা-যুগ থেকে আমল জারি আছে, তাকে ঝগড়া-বিবাদ বা দলাদলির মাধ্যম বানানো কোনক্রমেই সমীচীন নয়। উপরন্তু আপনারা জানেন যে, যাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তারাও হাদীসের উপরই আমল করে এবং তাদের নিকট সহীহ হাদীস আছে। এরপরও এজাতীয় লিফলেট বিতরণের কী অর্থ? আর যদি হাদীস জানার প্রয়োজন হয় তবে আম-মানুষকে কেন, হাদীসশাস্ত্রে পণ্ডিত হানাফী আলেমগণকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। অথচ তা কেন করা হয় না? এখানে অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবেই এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, আপনারা 'রফয়ে য়াদাইন' (নামাযের মধ্যে বিভিন্ন সময় হাত ওঠানো, 'কেরাআত খাল্‌ফাল ইমাম' (ইমামের পেছনে কেরাআত পড়া) 'আমীন বিল জাহ্‌র' (উচ্চস্বরে আমীন বলা) বুকের উপর হাত বাঁধা এবং ঈদের নামাযে ১২ তাকবীর বলার হাদীসের জন্য যখন কিতাব খোলেন তখন কি 'রফয়ে য়াদাইন' না করা, ইমামের পেছনে কেরাআত না পড়া, চুপে চুপে আমীন বলা, নাভির নিচে হাত বাঁধা এবং ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর বলা প্রভৃতি বিষয়ের হাদীস দেখতে পান না? তাহলে এসব চ্যালেঞ্জের উদ্দেশ্য কী?

গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুদের প্রকাশিত একটি লিফলেটের পর্যালোচনা

এ কথাগুলো লেখার সময়ও আমার সামনে একটি ইশতেহার রয়েছে, যার শিরোনাম হল 'আহলে হাদীস ও হানাফী মাযহাবের ভাইদের মত-বিরোধপূর্ণ মাসআলা, ঐকমত্যের প্রচেষ্টা।' –প্রচারে : সরদার আশরাফ হোসেন, লালপাড়া, বাসাবাটি, বাগেরহাট; পুনঃপ্রচারে : জমঈয়ত শুব্বানে আহ্‌লে হাদীস, সাতক্ষীরা জেলা শাখা, সাতক্ষীরা।

এ মুহূর্তে এই ইশতেহারের পর্যালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু এতটুকু অনুরোধ করব যে, আপনারা উক্ত ইশতেহারের নিম্নোক্ত কথাগুলোর অন্তর্নিহিত মর্ম নিয়ে একটু চিন্তা করবেন।

"... তাই চিন্তা করে দেখলাম, দুই মিষ্টিওয়ালাকে আপোষে এক জায়গায় বসানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমরা সাধারণ ও আধুনিক শিক্ষিত মুসল্লী ভাইয়েরা উভয় দোকানের মিষ্টি এক জায়গায় এনে স্বাদ নিয়ে দেখতে পারি। উক্ত চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে নমুনা হিসেবে মাত্র চারটি মাসআলায় আহলে হাদীস আলেমদের দলীলভিত্তিক মতামত সংগ্রহ করত নিম্নে প্রদত্ত হল এবং তার নিচে

চারটি ঘর ফাঁকা রাখা হল। এখন সচেতন হানাফী মুসল্লী ভাইদের প্রতি আবেদন, আপনারা নিজেদের পছন্দসই যে কোন শ্রদ্ধেয় আলেমের কাছ থেকে নিচের ফাঁকা ঘরগুলো পূরণের ব্যবস্থা করুন। এরপর উভয় দোকানের মিষ্টি অর্থাৎ উভয় আলেমের লিখিত বক্তব্য পর্যালোচনা করে, যে আলেমের বক্তব্য কুরআন হাদীসের বেশি কাছাকাছি বলে বিবেচিত হবে আমরা সকলে এক সঙ্গে সেই মাসআলা অনুযায়ী আমল করব।"

আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা করুন, এটা কি দ্বীন ও ইলমে দ্বীনকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করা নয়? কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা লিখে দেওয়াই কী মাসআলা প্রমাণিত হওয়া বা মাসআলা বোঝা ও বোঝানোর জন্য যথেষ্ট? আপনাদের মতে বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা কি শরীয়তের বিরোধপূর্ণ মাসায়েলের দলীল নিয়ে গবেষণা করার যোগ্যতা রাখে? শুধু তাই নয়, এখানে তো বলা হয়েছে যে, উভয় দলের আলেমদের নিকট থেকে কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর নিয়ে তারা নিজেরাই দলীলসমূহ যাচাই করবে এবং যাদের দলীল তুলনামূলকভাবে কুরআন সুন্নাহর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তার উপর আমল করবে। কেমন মজার কথা! দুইজন ডাক্তারের মতপার্থক্যের ফয়সালা করে ফেলবেন একজন সাধারণ মানুষ! আপনারা কি কখনো চিন্তা করেছেন, সাধারণ লোকদের আপনারা কোথায় পৌছে দিচ্ছেন?

ওই ইশতেহারে যে চারটি মাসআলার কথা বলা হয়েছে, তার দুটি হচ্ছে 'উচ্চস্বরে আমীন বলা' এবং 'ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া।' এই দুই মাসআলায় সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বরাত দেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃত পৃষ্ঠাগুলো খুললেই প্রকাশিত হয় এই উদ্ধৃতির হাকীকত! এত দীর্ঘ ভূমিকার পর দলীলের এই হাল আশ্চর্যজনকই বটে। কেননা উচ্চস্বরে আমীন বলার দলীল হিসেবে সহীহ বুখারী ১/১০৮ ও সহীহ মুসলিমের ১/১৬০ ও ১৬২এর বরাত দেওয়া হয়েছে। সহীহ বুখারীর উল্লিখিত পৃষ্ঠায় আমীন সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো পাওয়া যায়, যা প্রকৃতপক্ষে একই হাদীসের বিভিন্ন রূপ :

ক. إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه.

"ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।"

খ. إذا قال أحدكم آمين، قالت الملائكة في السماء آمين،

فوافقت إحديهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.

"তোমাদের মধ্য থেকে যখন কেউ আমীন বলে তখন আসমানের ফেরেশতারা আমীন বলে। উভয়ের আমীন একসাথে হলে পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।"

গ. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

"যখন ইমাম غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলেন তখন তোমরা আমীন বল। কেননা যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে তার অতীতের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।"

আপনারাই বলুন, এখানে কোন্ শব্দটির অর্থ উচ্চস্বরে আমীন বলা। এই সমস্ত হাদীস দ্বারা তো আমীন বলার ফযীলত এবং তা কখন বলা হবে তা জানা যায়। আরো জানা যায় যে, ইমাম মুক্তাদী উভয়েই আমীন বলবে। কিন্তু আমীন উচ্চস্বরে বলতে হবে, এটা কোথাও বলা হয়েছে কি?

অতএব এই মাসআলায় সহীহ বুখারীর বরাত দেওয়া কি সঠিক? তদ্রূপ সহীহ মুসলিমে (১/১৭৬) (১৬২ নয়) এই হাদীসগুলোই বর্ণিত হয়েছে। তাতেও উচ্চস্বরে আমীন বলার কোন হাদীস নেই। অতএব সহীহ মুসলিমের বরাত দেওয়া কীভাবে সঠিক হয়? প্রশ্ন হল আপনাদের এজাতীয় কীর্তিকলাপ সরলমনা মুসলমানদের সাথে তাদের দ্বীন ও ঈমান নিয়ে তামাশা করা নয় কি?

এমনিভাবে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়ার মাসআলায়ও সহীহ বুখারীর (১/১০৪) বরাত দেওয়া হয়েছে। অথচ বুখারীর ১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠায় এসম্পর্কে শুধু তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

ক. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন—

أما والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء. فأركد في الأوليين وأخفف في الأخريين.

"আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত নামায

পড়াতাম। এতে কোন ক্রটি করতাম না। আমি যখন ইশার নামায পড়াতাম তখন প্রথম দুই রাকাআত লম্বা করে পড়তাম এবং শেষের দুই রাকাআত হালকা করতাম।"

খ. لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না।"

গ. নামাযে ক্রটিকারীর প্রসিদ্ধ হাদীস, "জনৈক ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে নামায পড়ছিলেন, তখন নবীজী তাকে নামাযের তরীকা শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন-

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ.

"যখন তুমি নামাযে দাঁড়াও তখন তুমি যতটুকু পার কুরআন তেলাওয়াত কর। এরপর রুকূ কর।"

এখন বলুন, উল্লেখিত হাদীসগুলোর কোন্‌টিতে মুক্তাদীকে সূরা ফাতেহা পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে?

প্রথম হাদীসে ইমামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তৃতীয় হাদীসে যে ব্যক্তি একাকী নামায পড়ে তার কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীসে মুক্তাদীর কথা উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না।" 'যে ব্যক্তি' বলতে কি ইমামকে বোঝানো হয়েছে, না মুক্তাদীকে, না একাকী নামায আদায়কারীকে-এর সুস্পষ্ট সমাধান এই হাদীসে নেই। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য হাদীসের প্রতি লক্ষ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীসটি ইমামের পেছনে নামায আদায়কারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসের প্রতি লক্ষ করুন:

(ক) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

"যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক।" -সূরা আরাফ ২০৪

(খ) فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ.

"যখন ইমাম তাকবীর বলে তোমরাও তাকবীর বল, আর যখন কেরাআত পড়ে তখন চুপ থাক...।" -সহীহ মুসলিম ১/১৭৪

(গ) مَنْ كَانَ لَهُ الْإِمَامُ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে তার জন্য ইমামের কেরাআতই যথেষ্ট।" –মুআত্তা মুহাম্মাদ ১০১; তহাবী ১/১৫৯

এরপরও যদি আপনারা তা না মানেন এবং এই হাদীসকে ব্যাপক অর্থে ধরে মুক্তাদীকেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে চান –যা ইমাম বুখারী (রহ.)এর মত– তবে তা হবে কোন সহীহ হাদীসের ব্যাখ্যায় একজন নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ। পক্ষান্তরে অনেক ইমাম –যাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহ.)এর উস্তাদ ও উস্তাদের উস্তাদগণও রয়েছেন– দলীলের ভিত্তিতে এ হাদীসের অন্য ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এ হাদীসটি ইমাম বা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য বলা হয়েছে। আর মুক্তাদীর জন্য তো ইমামের ফাতেহাই তার ফাতেহা বলে পরিগণিত হবে। এখন যারা এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করে, তাদের ব্যাপারে কেন বলেন যে, এরা হাদীস মানে না বা বুখারী শরীফের হাদীস মানে না; বরং বলুন, তারা এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারীর পরিবর্তে অন্য ইমামগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এ মাসআলায় সহীহ মুসলিমের বরাতও দেওয়া হয়েছে। অথচ সহীহ মুসলিমে এমন কোন স্পষ্ট 'মারফূ' হাদীস নেই, যাতে মুক্তাদীদেরকে সূরা ফাতেহা পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বরং সেখানে মুক্তাদীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে– وَإِذَا قَرَءَ فَأَنْصِتُوا 'ইমাম যখন কেরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে। –সহীহ মুসলিম ১/১৭৪

যা হোক, আপাতত আপনাদের কাছে সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, যদি কোন হাদীসের মর্ম নির্ধারণ বা সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খোদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং উভয় দিকে দলীল-প্রমাণ থাকে, তবে আপনারা এক ইমামের তাকলীদ (অনুসরণ) করে নিজেদেরকে আহলে হাদীস আর অন্য ইমামদের অনুসারীদেরকে হাদীস না মানার অপবাদে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। কেননা আপনারা জানেন যে, এটা এক ধরনের সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা, যা কখনো কুরআন হাদীসের হুকুম হতে পারে না।

আহলে হাদীস চিন্তাবিদ ও নেতৃবৃন্দের খেদমতে

সীমালংঘনকারী ও কট্টরপন্থীদের বাড়াবাড়ি বাদ দিলে আহলে হাদীস ও হানাফীদের মতবিরোধ অনেকটা শাখাগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে। আর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য নতুন কিছু নয়। 'খাইরুল কুরূন' থেকেই তা

চলে আসছে এবং এই মতপার্থক্য যেহেতু যথাযথ আদব ও নীতিমালা মেনেই হত, তাই এতে মুসলিম উম্মাহ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অথচ আপনাদের দাঈ ও মুবাল্লিগগণ সেসব দলীলপূর্ণ বিষয়কেই –যাতে 'খাইরুল কুরূন' থেকেই দলীলভিত্তিক একাধিক মত বিদ্যমান– উম্মতের বিভেদ ও বিভক্তির উপায় হিসেবে অবলম্বন করছে। এ প্রসঙ্গে আপনাদের কোন দায়িত্ব নেই? বিশেষত এমন এক শোচনীয় মুহূর্তে যখন ইসলাম ও মুসলমানদের উপর চার দিক থেকে কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার আক্রমণ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর এবং কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে এবং যে সময় মুসলিম উম্মাহর জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি?

অমুসলিম এনজিওগুলো যখন মুসলমানদেরকে খৃস্টান ও বেদ্বীন বানানোর জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করছে, তখন এর প্রতিরোধের ব্যাপারে বাস্তব কোন পদক্ষেপ না নিয়ে আপনাদেরই লোকেরা, কোন কোন বিশেষ ব্যক্তির ভাষায়, হানাফীদেরকে মুসলমান বানানোর খেদমতে নিয়োজিত হয়েছে! আল্লাহর ওয়াস্তে নির্জনে বসে একটু ভাবুন, এ ধরনের কাজ কতটুকু হাদীসসম্মত।

নাস্তিক ও অমুসলিম এনজিওদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশন হল, সাধারণ মানুষকে আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং আলেমদের প্রতি আস্থাহীন ও বীতশ্রদ্ধ করে তোলা। আপনাদের দাঈ ও মুয়াল্লিমগণ বুঝে হোক বা না বুঝে হোক এ কাজই করে যাচ্ছেন। শাখাগত বিভিন্ন বিষয় –যাতে একাধিক দলীলভিত্তিক মত রয়েছে সেসবকে– আম-জনতার সামনে এমন একপেশেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, তারা অজান্তেই একথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে, আমাদের আলেমগণ আজ পর্যন্ত আমাদেরকে সত্য ও সঠিক বিষয়টি জানাননি এবং ইহুদী পণ্ডিতদের মত কুরআন হাদীসের বিধান আমাদের নিকট গোপন রেখেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

শুধু এই নয় যে, আপনাদের দাঈগণের কর্মপন্থা থেকে সাধারণ মানুষ এই মারাত্মক ভুল ধারণায় নিপতিত হচ্ছে; বরং তারা স্পষ্ট ভাষায় এই অপবাদ আরোপ করে থাকেন। প্রশ্ন হল, এ প্রসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করে আপনাদের দাঈদের জন্য সঠিক কোন কর্মনীতি নির্ধারণ করা আপনাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না?

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হাদীসের অনুসরণ করার এবং হাদীসের প্রতি মানুষকে আহবান করার সুমহান দায়িত্ব হাদীস ও সুন্নত অনুসারেই পালন করার তওফীক দিন এবং অন্যান্য বেদআত থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজেও বেদআত থেকে মুক্ত থাকার তওফীক দিন, আমীন।

[ডিসেম্বর '০৫]

‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসিয়ত’ শীর্ষক পুস্তিকা : একটি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : জনাব! কিছুদিন আগে আমি একটি পুস্তিকা পেয়েছি, যার নাম ‘নবী করীম সা.-এর অসিয়ত।’ প্রথম পৃষ্ঠায় আল্লামা আবুল ফযল আবদুর রহমান সুয়ূতীকে এর সংকলক বলা হয়েছে। পুস্তিকাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০ঈ. এবং দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩ঈ.। আমার কাছে দ্বিতীয় এডিশনের একটি কপি রয়েছে।

পুস্তিকাটির দু'টি অংশ: ১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসিয়ত হযরত আলী (রা.)-এর উদ্দেশে। ২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসিয়ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর উদ্দেশে।

অনুবাদকের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ পুস্তকের ‘মাখতূতা’ (পাণ্ডুলিপি) মাকতাবাতুল হারামিল মক্কিয়িশ শরীফ মক্কা মুকাররমায় সংরক্ষিত আছে।

আমার প্রশ্ন এই যে, বাস্তবিকই এই অসিয়ত কি সুয়ূতী (রহ.) কর্তৃক সংকলিত? সুয়ূতী (রহ.) এই অসিয়ত কোথায় পেয়েছেন? এর শুরুতে বা শেষে কোনো সনদও পাইনি। তাছাড়া উভয় অসিয়তের মধ্যে যেমন ভালো কিছু কথা আছে তেমনি কিছু কথা মুনকার ও আপত্তিকরও মনে হয়েছে। তাই সন্দেহ জাগছে, সম্ভবত অসিয়তটি উপরোক্ত দুই সাহাবীর নামে তৈরি করা হয়েছে। আশা করি, প্রকৃত বিষয়টি অনুসন্ধান করবেন এবং আমাদের অবহিত করবেন।

আবু লুবাবা
চাঁদপুর

উত্তর : আপনার আগেও একজন এ পুস্তিকার ফটোকপি আমাকে দিয়েছিলেন এবং তিনিও একই প্রশ্ন করেছিলেন। ‘উসূলে হাদীস’ এবং ‘জায়েযায়ে মাখতূতাত’ (পাণ্ডুলিপি-সমালোচনা)-এর নীতিমালা অনুযায়ী সে সময়ই উত্তর

দেওয়া যেত, কিন্তু আমি পুরো বিষয়টি ভালোভাবে জানার জন্য 'মাকতাবুল হারামিল মক্কী'তে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি সরাসরি দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। এজন্য উত্তর লিখতে বিলম্ব হয়েছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ, মাকতাবাতুল হারামিল মক্কীতে (যা আযীযিয়াতে জামেয়া উম্মুল কুরার কাছে মুহতাশফাত তিউনিসীর উল্টো দিকে অবস্থিত) এই পাণ্ডুলিপি সচক্ষে দেখার সুযোগ হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে একথা জেনে নেওয়া উচিত যে, এই দুই অসিয়তনামার কোনোটিই আবুল ফযল (জালালুদ্দীন) সুয়ূতীর সংকলন বলে প্রমাণিত নয়। একে তাঁর সংকলন বলে দাবি করা পরিষ্কার ভুল; না আলী (রা.) বা আবু হুরায়রা (রা.) এই অসিয়তনামা বর্ণনা করেছেন আর না রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের এটা দান করেছেন। এটা সাহাবা-যুগের অনেক পরের বস্তু। কোনো মিথ্যুক বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু ভালো কথা সহীহ হাদীসের কিছু বাণী সংগ্রহ করে, আর কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা কেচ্ছা-কাহিনীকারদের নিকট থেকে নিয়ে কিংবা নিজে বানিয়ে একটা বিশেষ বিন্যাসে সংকলন করেছে। এরপর একে 'অসিয়্যতুন নবী লি আলী ইবনে আবী তালিব' নামে চালিয়ে দিয়েছে। আরেক মিথ্যুক বা একই লোক এরকম আরেক পুস্তিকা তৈরি করে 'অসিয়্যতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি আবী হুরায়রা' নামে প্রচার করেছে।

এজন্য এই পুস্তিকার প্রচার-প্রসার এবং একে রাসূলের হাদীস বা নবীজীর অসিয়ত হিসেবে বর্ণনা করা সম্পূর্ণ হারাম। এ পুস্তিকায় বিদ্যমান আছে বলে কোনো কথাকে হাদীস মনে করা যাবে না; বরং আহলে ইলমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে যে, কথাটা কোনো সহীহ হাদীসে আছে কি না কিংবা কোনো শরয়ী দলীলের দ্বারা তা প্রমাণিত কি না।

পুস্তিকাটি জাল কেন?

এই পুস্তিকা জাল কেন—এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় আলোচনা করতে গেলে অনেক কথা বলা যায় এবং অনেক দলীল পেশ করা যায়, কিন্তু সংক্ষিপ্ততা ও সহজবোধ্যতার স্বার্থে আপাতত কয়েকটি মৌলিক কথা পেশ করছি।

১. কোনো মাখতূতা (পাণ্ডুলিপি) সম্পর্কে এই দাবি করার জন্য যে তা অমুকের রচিত, যে শর্তগুলো অপরিহার্য তা এখানে পূরণ হয়নি। যথা—পাণ্ডুলিপির লিপিকর 'ছিকা' (নির্ভরযোগ্য) হওয়া, পূর্ববর্তী কোন কপি থেকে এটি তৈরি হয়েছে তা জানা থাকা এবং সেই আদর্শ কপিটি নির্ভরযোগ্য হওয়া। রচয়িতার নিজ পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত

এ কপির অবিচ্ছিন্ন সূত্র বিদ্যমান থাকা। প্রতিলিপি তৈরির পর আদর্শ কপির সাথে সঠিক পদ্ধতিতে 'মুকাবালা' করা। এ শর্তগুলো বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। আরেকটি পদ্ধতি হল রচনাটি উল্লেখিত রচয়িতার বলে তাওয়াতুরের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া কিংবা অন্তত আহলে ইলমের মাঝে বিষয়টা স্বীকৃত হওয়া।

উপরোক্ত মাখতূতায় (পাণ্ডুলিপিতে) এই শর্তগুলোর সবগুলোই অনুপস্থিত। লিপিকর ছিকাহ হওয়া তো দূরের কথা, তারাজিম ও তবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থে তার কোনো খোঁজই পাওয়া যায় না। তবে পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকা (Colophon) থেকে অনুমিত হয় যে, সে একজন অনারব ব্যক্তি এবং আরবী ভাষার সাথেও তার কোনোরূপ যোগসূত্র নেই। যেমন প্রথম অসিয়তের পুষ্পিকায় লেখা রয়েছে–

تمت الوصية النبي عليه التحية إلى حضرت علي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه، على يد شيخ الحاج محمد بشكطاش المولوي في أواخر شهر محرم الحرام سنة خمس وثلاثين ومئة وألف.

আহলে ইলম বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন, এ বাক্যগুলোতে আরবী ভাষার ওপর কীরূপ অত্যাচার করা হয়েছে। এখান থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে, পাণ্ডুলিপিটির লিপিকাল হল ১১৩৫ হি. অথচ ফাউন্ডেশনের অনুবাদের ভূমিকায় লিপিকাল ১০৩৫ হিজরী বলে দাবি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অসিয়তের পুষ্পিকায় লেখা হয়েছে–

... سلخ شهر محرم الحرام سنة خمس وثلاثين ومئة وألف، على يد الحقير الفقير الحاج شيخ محمد المولوي ابن علي الشيخ، في زاوية المولوية ببشكطاس، غفر لهما وعفى عنهما.

দুটো উদ্ধৃতিই হুবহু পেশ করা হয়েছে। ভুলত্রুটি বা অসঙ্গতিগুলো পাঠক যেন মুদ্রণের ভুল মনে না করেন।

এগুলো ছাড়াও পাণ্ডুলিপির শুরু বা শেষে কোথাও আদর্শ পাণ্ডুলিপিরই (Exemplar) নাম-পরিচয় নেই, স্বাক্ষরিক পাণ্ডুলিপি (Autograph) বা লেখকের কপি পর্যন্ত এ কপির সূত্র বিদ্যমান থাকার তো প্রশ্নই আসে না।

তাছাড়া পাণ্ডুলিপির কোথাও জালালুদ্দীন সুয়ূতীর দিকে নিসবতের উল্লেখ নেই। শুধু এক কোণায় 'রিসালায়ে ইমাম সুয়ূতী' শব্দটি লিখিত আছে। কিন্তু এ শব্দ কার লেখা–তা অজ্ঞাত। আলামত থেকে অনুমিত হয় যে, এটি কোনো সাধারণ পাঠকের প্রক্ষেপ বা সংযুক্তি। মোটকথা, বিষয়টি অজ্ঞাত।

তাছাড়া উপরোক্ত বাক্যের অর্থ যদি এই হয় যে, অসিয়তটি সুয়ূতীর 'রিসালা' তাহলে লেখকের অজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়। কেননা, এই অসিয়ত সুয়ূতীর বর্ণনা হলে একে 'জুয' বলা হত, 'রিসালা' নয়। এরপর কীসের ভিত্তিতে একে সুয়ূতীর 'রিসালা' বলা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বক্তার নাম-পরিচয় অজ্ঞাত, মন্তব্য অজ্ঞতাপূর্ণ এবং দাবি দলীলবিহীন। এভাবে কি কোনো পাণ্ডুলিপির রচয়িতার বা সংকলকের পরিচয় প্রমাণ হয়?

তেমনি 'তাওয়াতুর' ও 'তালাক্কী বিল কবুল'-এর যে পন্থা উপরে উল্লেখিত হয়েছে সে পন্থায় উপরোক্ত দাবি প্রমাণিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না; বরং আহলে ইলমের মাঝে এর বিপরীত বিষয়টিই স্বীকৃত যে, এই অসিয়তনামা সুয়ূতীর সংকলন হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সুয়ূতী (রহ.) তাঁর রচনাবলির তালিকা নিজেই প্রস্তুত করে গেছেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞরাও তা করেছেন। কোনো তালিকাতেই এই অসিয়তনামার উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়; বরং স্বয়ং জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর রচিত 'আললাআলিল মাসনূআ ফিলআহাদীসিল মওযূআ' গ্রন্থে, যা তিনি জাল ও প্রক্ষিপ্ত বর্ণনাসমূহের স্বরূপ আলোচনার জন্য লিখেছেন, এই দুই অসিয়ত মওযূ ও জাল হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

সুয়ূতী 'আললাআলিল মাসনূআ' (খ. ২, পৃ. ৩৭৪; কিতাবুল মাওয়ায়িজ ওয়াল ওছায়া)-এ প্রথম অসিয়তনামার প্রথম দিকের বাক্যগুলো উল্লেখ করেছেন, যেখানে মুমিন, তাকাল্লুফকারী, রিয়াকার, জালেম, মুনাফেক ও অলস প্রভৃতি লোকদের তিনটি করে বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, এরপর অসিয়তনামার অন্যান্য বিষয়ের কিছু বাক্য উল্লেখ করে বলেন–

موضوع، والمتهم به حماد بن عمرو، وهو كذاب وضاع.

অর্থাৎ এই অসিয়তনামা মওযূ। এ সম্পর্কে অভিযুক্ত হচ্ছে হাম্মাদ ইবনে আমর, যে একজন মিথ্যুক ও জাল বর্ণনা প্রস্তুতকারী।

এ প্রসঙ্গে সুয়ূতী (রহ.) ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তিনিও এই অসিয়তনামাকে মওযূ বলেছেন।

৩. ইমাম বায়হাকীর মন্তব্য তাঁর কিতাব 'দালায়েলুল নুবুওয়াহ'তে (৭/২২৯) রয়েছে। মূল আরবী পাঠ নিম্নরূপ–

... عن حماد بن عمرو النصيبي، عن السري بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها،

فإنك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي يا علي، يا علي إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة، فذكر حديثا طويلا في الرغائب والآداب، وهو حديث موضوع، وقد شرطت في أول الكتاب ألا أخرج في هذا الكتاب حديثا أعلمه موضوعا.

... يحي بن معين يقول: حماد بن عمرو النصيبي ممن يكذب ويضع الحديث ...

বায়হাকী (রহ.)-এর উপরোক্ত মন্তব্যের সারকথা এই যে, এই অসিয়তনামায় যদিও আদাব ও ফাযায়েল সংক্রান্ত বিষয়াদি রয়েছে তবুও তা মওযূ। এর সনদে হাম্মাদ ইবনে আমর আননাসীবী নামক একজন রাবী রয়েছে, যার সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, সে হাদীসের নামে মিথ্যা কথাবার্তা তৈরি করে বর্ণনা করত। (দালায়েলুন নুবুওয়াহ ৭/২২৯)

অসিয়তের অনুবাদের শুরুতে সনদের দুএকটি নাম উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু পাণ্ডুলিপির ভুল সম্পর্কে অনুবাদক অবগত না থাকায় সেখানে 'খালেদ ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ' লেখা হয়েছে। অথচ তা হবে 'ছারী ইবনে খালেদ আন জাফর ইবনে মুহাম্মাদ'। প্রশ্ন এই যে, ছারী ইবনে খালেদ যে এটা বর্ণনা করেছেন–এই তথ্য কোথায় পাওয়া গেল? এই তথ্যটা দিচ্ছে হাম্মাদ ইবনে আমর, যার সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে একজন মিথ্যুক ও জাল বর্ণনা প্রস্তুতকারী।

মোটকথা, বায়হাকী (রহ.) ও সুয়ূতী (রহ.) যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সকল হাদীস বিশারদের সিদ্ধান্তও তাই। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– আলমাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মওযূ'–মোল্লা আলী কারী ২৩৪-২৩৭; 'তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ' ইবনে আররাক ২/৩৩৯; 'আলমওযূআত' ইবনুল জাওযী ২/৩৬২; 'আলফাওয়াইদুল মাজমূআ' শাওকানী ৪২৪ ইত্যাদি।

৪. এ আলোচনাগুলো ছিল প্রথম অসিয়তনামা সম্পর্কে। দ্বিতীয় অসিয়তনামা সম্পর্কেও হাদীস বিশারদগণের সিদ্ধান্ত অভিন্ন। মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.) কিতাবুল মওযূআত (খ. ২, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫)-এ এই অসিয়তনামার কিছু বাক্য উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, "বর্ণনাকারী পুরো অসিয়ত বর্ণনা করেছে। এটি একটি দীর্ঘ বর্ণনা, যা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বর্ণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সনদে একাধিক 'মাজহুল' রাবী রয়েছে, যাদের কোনো নাম-পরিচয় পাওয়া যায় না। এটি কোনো জাহেল কাহিনীকারের প্রস্তুতকৃত বর্ণনা। সনদ

তৈরিতেও সে আশ্চর্য জগাখিচুরি পাকিয়েছে। সনদে পরিচিত রাবী হাম্মাদ ইবনে আমর। তবে সে হল ওই ব্যক্তি যার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহ.) বলেছেন, 'এ লোক মিথ্যা বলত এবং মিথ্যা হাদীস তৈরি করত।' ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেছেন, 'ছিকা রাবীদের নামে সে মিথ্যা বর্ণনা তৈরি করতে থাকত।'

সুয়ূতী (রহ.)ও একে মওযূ বর্ণনা বিষয়ক গ্রন্থ 'আললাআলিল মাসনূআ' (২/৩৭৭-৩৭৮)-এ উল্লেখ করেছেন এবং সংক্ষেপে ইবনুল জাওযীর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে তা বহাল রেখেছেন। আরো দেখুন– 'আলমাসনূ ফিল হাদীসিল মওযূ' ২/২০৯-২১১ (টীকা); 'তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ' ২/৩৪০

মোটকথা, যখন খোদ আবুল ফযল সুয়ূতী (রহ.) এবং অন্যান্য হাদীস বিশারদ উভয় অসিয়তনামাকে মওযূ বলছেন তখন কীভাবে সম্ভব যে, সুয়ূতী নিজেই তা নবীজীর অসিয়তনামা হিসেবে সংকলন করবেন এবং তা মানুষের সামনে পেশ করবেন?

৫. অনুবাদক অসিয়তনামার দ্বিতীয় অংশের শুরুতেও সনদের একটি অংশ উল্লেখ করেছেন। এটা দেখে বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক হবে না। কেননা ওই সনদটিও জাল। এ প্রসঙ্গে হাদীসবিশারদদের মন্তব্য ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর পাণ্ডুলিপির ত্রুটির কারণে অনুবাদক সনদের নামগুলো সঠিকভাবে পড়তে পারেননি। যেমন একটি নাম লেখা হয়েছে 'হাম্মাদ ইবনে আতিয়্যা' অথচ প্রকৃত পাঠ 'হাম্মাদ ইবনে আমর।' ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, সে একজন মিথ্যুক রাবী। আরেকজনের নাম এভাবে লেখা হয়েছে 'সালামা ইবনে মীম মাকান শামী থেকে'। প্রকৃত কথাটা হবে– 'মাসলামা ইবনে আমর মাকহুল শামী থেকে।' দেখুন– কিতাবুল মওযূআত, ইবনুল জাওযী- ২/৩৬৪; আললাআলিল মাসনূআ ২/৩৭৭

৬. প্রথম অসিয়তনামার অনুবাদে শেষের কয়েকটি বাক্য বাদ দেওয়া হয়েছে। ওইগুলো অনুবাদ করা হয়নি। অনুবাদ করা হলে অসিয়তনামাটি জাল হওয়ার প্রসঙ্গ আরো পরিষ্কার হয়ে যেত। আহা! অনুবাদক যদি অন্তত ওই কথাগুলো থেকে, যেগুলো অনুবাদ করাও তিনি সমীচীন মনে করেননি, উপলব্ধি করতে সক্ষম হতেন যে, এটি নবীজীর অসিয়তনামা নয়; বরং পরের যুগের বানানো বস্তু!

এখানে কারো এই প্রশ্ন হওয়া উচিত নয় যে, এই দুই অসিয়তনামা যদি আগাগোড়া মওযূ ও জালই হয়ে থাকে তবে এর পাণ্ডুলিপি কেন সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে, উপরন্তু 'মাকতাবাতুল হারামিল মক্কী'র মতো কুতুবখানায়? কেননা, এটা খুব সহজ কথা যে, কোনো কুতুবখানায় কোনো পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত কিতাব সংরক্ষণ

করার অর্থ এই হয় না যে, কিতাবটি বিশুদ্ধ বা সেই কিতাবের সকল তথ্য নির্ভরযোগ্য। কুতুবখানায় জাদুঘরের মতো সব ধরনের বস্তুই সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত বস্তুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে, যার আলোকে বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। এজন্য কুতুবখানায় জাল পুস্তিকাও থাকে, মুলহিদ ও বেদ্বীন লোকদের ইসলাম বিরোধী বইপত্রও সংরক্ষিত থাকে। জাল বর্ণনাসমূহের কোনো সংকলন যদি কেউ জেনে বা না জেনে তৈরি করে এবং তার কপি কোনো কুতুবখানার দায়িত্বশীলদের হস্তগত হয়। তবে অবশ্যই তারা তা সংরক্ষণ করবেন। এটা এজন্য নয় যে, প্রক্ষিপ্ত বস্তুটি তাদের দৃষ্টিতে একটি প্রমাণিত বস্তু বা এর তথ্যাবলি নির্ভরযোগ্য; বরং এজন্য যে, জালকারীর কর্মের দলীল হিসেবে এবং একে সহীহ মনে করে যারা এর প্রতিলিপি প্রস্তুত করে তাদের মূর্খতার দলীল হিসেবে তা সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব কোনো সাদাসিধে লোক যদি কোনো গ্রন্থশালায় এরূপ কোনো পাণ্ডুলিপি পেয়ে যায় এবং আগপিছ বিচার না করেই একে সহীহ মনে করে এবং তা প্রকাশ করে তবে এর দায় গ্রন্থশালার দায়িত্বশীলদের ওপর বর্তায় না।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও কিছু মূর্খ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রকাশক প্রথম অসিয়তনামা আরবী ভাষায় প্রকাশ করেছে। আরবের মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করে লেখেন– (তরজমা) 'সাইয়্যেদেনা আলী (রা.)-এর সঙ্গে সম্বন্ধকৃত এই অসিয়তনামা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ, ... একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে এবং এখনও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। অসচেতন ও উদাসীন প্রকৃতির লোকেরা এটা সংগ্রহ করে থাকে। যে মিথ্যুক এটা প্রস্তুত করেছে সে পাপী, অভিশপ্ত! এর প্রকাশক পাপী, অভিশপ্ত! এর বিক্রেতা পাপী, অভিশপ্ত এবং একে যে সত্য মনে করে সেও পাপী, অভিশপ্ত! আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির অমঙ্গল করুন যে নিজের দ্বীন-ধর্ম ও বিচার-বুদ্ধির ব্যাপারে বোধহীন!' –আলমাসনূ ২৩৫ (টীকা)

একটি জরুরি সতর্কীকরণ

এই অসিয়তনামাকে 'মওযূ' বলার অর্থ হচ্ছে, এ ধরনের কোনো অসিয়তনামা মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত

আলী (রা.)কে বা হযরত আবু হুরায়রা (রা.)কে কিংবা অন্য কোনো সাহাবীকে প্রদান করেননি। আর না ওই দুই সাহাবী বা অন্য কোনো সাহাবী বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শোনা নসীহতগুলো একত্রে সংকলন করেছেন। কোনোটাই হয়নি। এটা খায়রুল কুরূনের অনেক পরে কোনো মিথ্যুকের রচনার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

তবে এই মিথ্যুক রচনাকার যেহেতু অনেক কথা সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করেছে এবং জ্ঞানী লোকদের কিছু জ্ঞানগর্ভ বাণীও তাতে সংযুক্ত করেছে এজন্য উভয় অসিয়তনামাতেই কিছু সঠিক কথা পাওয়া যাবে। কিছু জ্ঞানের কথা, যা সাধারণ বিচার-বুদ্ধি ও শরীয়তের সাধারণ নীতিমালার আলোকে সঠিক, আর কিছু বিষয়, যা সরাসরি হাদীস শরীফে এসেছে; যেমন প্রথম অসিয়তনামার প্রথম বাক্যটি সহীহ হাদীসে আছে এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) তা 'কিতাবুস সহীহ'তে বর্ণনা করেছেন। আরবী পাঠ এই–

أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

অর্থাৎ হারূন মুসার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব লাভ করেছিলেন তুমিও আমার পক্ষ থেকে তেমন দায়িত্ব লাভ করছ, তবে আমার পরে কোনো নবী নেই। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪০৪

এটি হচ্ছে অনেক প্রতারকের ব্যবহৃত একটি পুরানো কৌশল। তারা যখন কোনো 'জুয' প্রস্তুত করে তখন যেমন বিভিন্ন ভিত্তিহীন বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করে কিংবা নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথাবার্তা উদ্ধৃত করে তেমনি জ্ঞানীদের জ্ঞানগর্ভ কিছু কথা কিংবা সহীহ হাদীস থেকেও কিছু কিছু বিষয় নিয়ে সেখানে সংযুক্ত করে। আলোচিত দুই অসিয়তনামার প্রস্তুতকারী মিথ্যুকরাও এই কৌশল অবলম্বন করেছে।

পাঠকবৃন্দের করণীয় এই যে, তারা এই অসিয়তনামা পাঠ করা থেকে বিরত থাকবেন এবং কারো কাছে এর কোনো কপি থাকলে তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করবেন না। তবে উক্ত অসিয়তনামার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কথাকেই নির্দ্বিধায় ভুল বা ভিত্তিহীন বলে দেওয়াও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে করণীয় হল যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, এ বিষয়ে আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

আপাতত এ কয়েকটি কথা পেশ করেই আলোচনা সমাপ্ত করছি। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং মাকবুলিয়ত দান করুন।

[অক্টোবর '০৮ঈ.]

একটি প্রচলিত বর্ণনা : প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : গত মাসে 'আলকাউসারের প্রচলিত ভুল বিভাগে-

اطلبوا العلم ولو بالصين

বর্ণনাটিকে হাদীস নয় বলে লেখা হয়েছে। সেখানে অনেক কিতাবের হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমি আল্লামা ইসমাঈল আজলুনী লিখিত 'কাশফুল খাফা' কিতাবে এবং আহসানুল ফাতাওয়ায় এ সম্পর্কিত বিস্তারিত একটি আলোচনা দেখেছি। যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এই হাদীসটি ভিত্তিহীন নয়। অতএব হাদীসটি যদি বাস্তবেই ভিত্তিহীন হয় তাহলে এই আলোচনার জবাব কী হবে?

যদি এই হাদীসটির ভিত্তি প্রমাণিত হয় তাহলে যারা এর দ্বারা প্রমাণ করতে চায় যে, তৎকালীন যুগে চীনে তো দ্বীনি শিক্ষা ছিল না; বরং জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানই ছিল। অতএব জাগতিক শিক্ষাও দ্বীনী শিক্ষার্জনের মতোই ফরয। আবার কোনো কোনো সেক্যুলার লেখক বলেছেন যে, এর দ্বারা নবী চীনে গিয়ে সেক্যুলার জ্ঞান আহরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন! তাঁদের এসব কথাই বা কতটুকু প্রামাণ্য? বিস্তারিত জানিয়ে খুশি করবেন বলে আশা রাখি।

মুহাম্মাদ আবদুল মাজীদ

রংপুর

উত্তর : আপনি এ প্রসঙ্গে 'কাশফুল খাফা' ও 'আহসানুল ফাতাওয়া' গ্রন্থ-দুটির উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত কিতাব দুটিতে যে তাসামুহ (ভুল) হয়েছে তা আপনি লক্ষ্য করেননি। আসলে এখানে দুটি পৃথক বাক্য রয়েছে। একটি হল-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

আর অপর বাক্যটি হল-

اطلبوا العلم ولو بالصين

প্রথম বাক্যটি বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্য থেকে কোনো সনদে দুর্বলতা তুলনামূলক কম। এজন্য ইমাম আবুল হাজ্জাজ আলমিযযী বলেছেন, 'এই বর্ণনাটি সমষ্টিগতভাবে 'হাসান' পর্যায়ের হতে পারে।'

ইমাম উকায়লী (রহ.)-এর যে আলোচনা আমরা গত সংখ্যায় উল্লেখ করেছি তাতেও এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেন-

«وفريضة على كل مسلم» الرواية فيها لين أيضا، متقاربة في الضعف

-আযযুআফাউল কাবীর ২/২৩০

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যটি- اطلبوا العلم ولو بالصين শুধু একটি সনদে বর্ণিত। যার মধ্যে আবু আতিকা নামক একজন রাবী রয়েছে, যে মাতরূক ও মুত্তাহাম অর্থাৎ পরিত্যাজ্য ও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। এজন্য ইমাম উকায়লী (রহ.) এই বাক্য সম্পর্কে বলেন- لا يحفظ অর্থাৎ এই বর্ণনা সংরক্ষিত নয়। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তো সরাসরি বাতেল ও ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন। -আলমাকাসিদুল হাসানা ৮৬

মুহাদ্দিস আহমদ আলগুমারী طلب العلم فريضة على كل مسلم-এর সনদসমূহের উপর একটি পৃথক পুস্তিকা রচনা করেছেন, যা المسهم في بيان حال حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم নামে প্রকাশিত হয়েছে। এটি অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, এত সনদের মধ্যে এক আবু আতিকার বর্ণনা ছাড়া অন্য কোনো সনদে اطلبوا العلم ولو بالصين বাক্যটি নেই। আর থাকলেও তা রয়েছে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আলজুয়াইবারীর বর্ণনায়, যে মারাত্মক ধরনের মিথ্যাবাদী এবং নির্লজ্জ হাদীস জালকারী কিংবা ইয়াকুব ইবনে ইসহাক-এর মতো আরেক মিথ্যাবাদীর বর্ণনায়। -দেখুন আলকামিল, ইবনে আদী ১/২৯২; মীযানুল ইতিদাল ১/১০৬; লিসানুল মীযান ৮/৫২৫-৫২৬

কাশফুল খাফা ও আহসানুল ফাতাওয়ার তাসামুহ এটিই যে-طلب العلم فريضة على كل مسلم বর্ণনা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্তকে اطلبوا العلم ولو بالصين-এর সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে উদ্ধৃত কিতাবগুলো যদি আপনি সরাসরি অধ্যয়ন করতেন এবং মনোযোগের সাথে মুতালাআ করতেন তাহলে এই ভুল

ধারণার শিকার হতেন না। আপনি বায়হাকীর 'শুআবুল ঈমান' (২/২৫৪) খতীবে বাগদাদীর 'তারীখে বাগদাদ' (৯/৩৬৪) ইবনে আবদুল বারের 'জামিউ বায়ানিল ইলম' (১/৯) অধ্যয়ন করলে দেখতেন যে, সকলের সনদে উক্ত আবু আতিকা রয়েছে। আর মিযযী ও যাহাবীর বক্তব্য মূল কিতাব থেকে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, তাদের বক্তব্য 'তালাবুল ইলমি ফারিযাহ' হাদীস সম্পর্কে, 'ওয়ালাও বিছছীন' বর্ণনা সম্পর্কে নয়।

আর আজলুনীর বক্তব্য– رواه أبو يعلى عن أنس بلفظ اطلبوا العلم ولو بالصين فقط (কাশফুল খাফা ১/১২৪) সুস্পষ্ট ভুল। মুসনাদে আবু ইয়ালা প্রকাশিত হয়েছে। আপনি এই কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের পৃ. ২০৫ (হাদীস ২৮২৯) ও পৃ. ২২৩ (হাদীস ২৮৯৬) অধ্যয়ন করলেও দেখবেন, বর্ণনাটি শুধু 'তালাবুল ইলমি ফারিযাতুন আলা কুল্লি মুসলিম' পর্যন্ত রয়েছে, তাতে 'উতলুবুল ইলমা ওয়ালাও বিছছীন' নেই।

মোটকথা, আমাদের আলোচিত বাক্য– اطلبوا العلم ولو بالصين শুধু একটি প্রবাদমাত্র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। কোনো কাযযাব বা মুত্তাহাম রাবী এটিকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছে, যার কোনো ভিত্তি নেই। দরসে নিযামীর ছাত্রদের অজানা নয় যে, মুখতাসারুল মাআনী গ্রন্থে ভুলবশত এটিকে হাদীস বলা হয়েছে। তাই হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বায়নাস সুতুর-এ লিখেছেন– قال ابن حبان : لا أصل له

সুতরাং যখন তা হাদীস হওয়াই প্রমাণিত নয় তখন এর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এ কথা বলা যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে 'ইলম' দ্বারা কোন ইলম উদ্দেশ্য করেছেন–এটি একটি অর্থহীন কাজ। কেননা, এটি তো তাঁর বাণীই নয়। ফলে এই প্রশ্নেরই তো অবকাশ নেই যে, এ দ্বারা তিনি কী উদ্দেশ্য করেছেন?

আর এটিকে যদি হাদীস বলে মেনেও নেওয়া হয় তাহলে এখানে ইলম দ্বারা তা-ই উদ্দেশ্য হবে যা তাঁর অন্যান্য ইরশাদাতের মধ্যে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইলমে ওহী ও ইলমে দ্বীন। ফলে বাক্যটির অর্থ হবে 'ইলমে দ্বীনের জন্য দূর-দূরান্তে সফরের প্রয়োজন হলেও তা অর্জন কর। (ফয়যুল কাদীর, মুনাবী ১/৫৪৩)

সেক্যুলারিজম তো কোনো ইলমই নয়; শুধু মূর্খতা ও অন্ধকার; যা দূর করে ইলমে নবুওয়ত ও ওহীর আলো ছড়ানোর জন্যেই প্রেরিত হয়েছেন সকল

নবী-রাসূল এবং সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের নবী।

আর কাওনী ইলম তথা জাগতিক বিদ্যার উপকারী অংশ প্রয়োজনীয় হলেও তার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি মানুষের স্বভাবের মাঝেই বিদ্যমান, এর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে তারগীব (উৎসাহ প্রদান) উচ্চারিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই এ বিষয়ে সরাসরি কোনো স্পষ্ট বাণী সহীহ সনদে পাওয়া যায় না। #

[ফেব্রুয়ারি '১০ঈ.]

তারাবীহ বিষয়ক দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি লিফলেট বিতরণ করা হয়, যার শিরোনাম হচ্ছে তারাবীর নামায বিশ রাকাআত না আট রাকাআত এবং তাতে ১ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : এটা তো অনেক পুরানো কাগজ! এখনো তারা এটাই বিলি করছে! প্রায় পাঁচ বছর আগে মাওলানা আবু তোরাব এর বিস্তারিত জবাব লিখেছেন, যার শিরোনাম ছিল : 'বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক থাকুন, হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে তারাবীহ বিশ রাকাআত, আট রাকাআত নয়।' জবাবটি আলআবরার ট্রাস্ট, বাংলা বাজার থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে মাসিক আলকাউসারের প্রকাশনা শুরু হওয়ার পর অক্টোবর ও নভেম্বর ২০০৫ ঈ. সংখ্যায় এ বিষয়ে আমার একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো সংগ্রহ করে বারবার পাঠ করুন, ইনশাআল্লাহ সকল সংশয় দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলেন যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায। রমযানে রাতের শুরুভাগে এক নামাযকে তারাবীহ আর শেষভাগে অন্য নামাযকে তাহাজ্জুদ বলার পক্ষে কোনো দলীল নেই। কথাটি কি সঠিক?

উত্তর : এটাই আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের প্রথম চাল বা প্রথম ভুল। যেহেতু আট রাকাআত তারাবীহ কোনোভাবেই হাদীসে দেখানো সম্ভব নয়, তাই তাহাজ্জুদের হাদীস দিয়ে তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা প্রমাণ করার জন্য তারা এই অনর্থক কসরত করে থাকে। আল্লাহ সহীহ সমঝ নসীব করুন।

তাহাজ্জুদের বিধান ইসলামের বিধান। ইসলামের প্রথম দিকে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার অনেক আগে কুরআন মজীদের সূরায়ে মুযযাম্মিল অবতীর্ণ হয়। তাতে তাহাজ্জুদের বিধান দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে রমযানের রোযা ফরয হয়েছে

হিজরতের পর। আর তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ

"আল্লাহ তাআলা এই মাসের রোযা তোমাদের উপর ফরয করেছেন এবং আমি তোমাদের জন্য এই মাসে রাত জেগে নামায পড়াকে সুন্নত করেছি।" –সুনানে নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ

লক্ষ করুন, এ হাদীসে যে কিয়ামে রমযানকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত করেছেন, তা যদি তাহাজ্জুদই হয় তবে তাঁর এই বাণী কি অর্থহীন হয়ে যায় না? (নাউযুবিল্লাহ!) কারণ তাহাজ্জুদের বিধান তো পুরো বছরের জন্য আগে থেকেই আছে। রোযা ফরয হওয়ার আগে যে রমযানগুলো গত হয়েছে তাতে কি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম তাহাজ্জুদ পড়তেন না?

আরো লক্ষ করুন, তাহাজ্জুদের বিধান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সরাসরি কুরআন মজীদে অবতীর্ণ করেছেন। তাহলে এ বিষয়ে হাদীসের এ বাণী–(আমি কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহকে সুন্নত করেছি) কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? তা ওই নামাযের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে, যার বিধান কুরআন মজীদের মাধ্যমে নয়; বরং হাদীসের মাধ্যমেই এসেছে। আর তা হল তারাবীর নামায।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ভিন্ন দুই নামায হওয়ার আরো অনেক দলীল রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য ফকীহুন নফস, মুহাদ্দিসে দাওরান হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া পৃ. ৩০৬-৩২৩ দেখা যেতে পারে।

তাছাড়া এই বন্ধুদেরকে আরেকটি কথা বলার আছে। তারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অনুসরণের জোর দাবি করে থাকে; অথচ ইমাম বুখারী (রহ.) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে ভিন্ন ভিন্ন নামাযই মনে করতেন। রাতের প্রথম ভাগে তারাবীহ পড়তেন এবং শেষভাগে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

তারাবীর প্রতি রাকাআতে বিশ আয়াত করে পড়তেন এবং এভাবে তারাবীতে কুরআন খতম করতেন। তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সনদে তা (খ. ২, পৃ. ১২) বর্ণিত হয়েছে এবং মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল বারীতে তা উদ্ধৃত আছে।

এই ঘটনা থেকে যেমন প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) অন্যান্য উলামায়ে সালাফের মতো তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে ভিন্ন নামায মনে করতেন; তেমনি একথাও প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তারাবীহ নামায আট

রাকাআতের বেশি (বিশ রাকাআত) পড়তেন। কারণ তারাবীহ আট রাকাআত পড়লে রমযান মাস ত্রিশ দিনের হলেও প্রতি রাকাআতে বিশ আয়াত করে পড়ে কুরআন খতম করা সম্ভব নয়।

মনে রাখবেন, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের উপরোক্ত দাবির পক্ষে কোনো দলীল নেই। তাই সহীহ হাদীস এবং উলামায়ে সালাফের তরীকা মতে রমযানে তারাবীর প্রতি গুরুত্ব দিন, পূর্ণ বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়ুন এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। #

[সেপ্টেম্বর '০৮ঈ.]

কালেমা তাইয়েবা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাব

আজকাল অনেকে এই প্রশ্নও করেন যে, পুরো কালেমা তাইয়েবা لا إله إلا الله محمد رسول الله কোন্ হাদীসে আছে? আমরা হাদীস শরীফে শুধু لا إله إلا الله দেখতে পাই; لا إله إلا الله محمد رسول الله দুটি বাক্য এক সাথে পাই না। অতএব দুই বাক্য একসাথে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মুহাম্মাদপুর এলাকার একজন সাধারণ গাইরে মুকাল্লিদকে তো এমন কথাও বলতে শোনা গেছে যে, যদি কেউ এভাবে (অর্থাৎ لا إله إلا الله محمد رسول الله একসাথে মিলিয়ে) কালেমা পড়ে সে কাফের হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ! অথচ তারা একথাও বলে যে, ঈমান সঠিক হওয়ার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। এটা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না। তবে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কালেমা তাইয়েবার অংশ নয়। কেননা কোন হাদীসেই এই অংশটুকু কালেমা তাইয়েবার সাথে পাওয়া যায় না।

জবাবের আগে কিছু কথা

এ ধরনের উদ্ভট প্রশ্ন যদিও বিস্ময়কর, কিন্তু এই আশ্চর্য পৃথিবীতে কোন কিছুই অভাবিত নয়। তা না হলে রাসূলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সর্বযুগে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' একসাথে মিলিয়ে পড়া হচ্ছে। সর্বযুগের 'অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা' বিদ্যমান আছে। এরপর দু চারটে হাদীস পড়েই এমন 'মুতাওয়াতির' ও 'মুতাওয়ারাস' (অসংখ্য অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা সম্বলিত) বিষয়ের বিরুদ্ধে কীভাবে বলা যায় যে, এর কোন প্রমাণ নেই, আশ্চর্যজনক বৈকি!

এতো একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বলাবাহুল্য, এটা কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষের, যে অন্তত নিজের বিবেককে শ্রদ্ধা করে, তার কাজ হতে পারে না। তবে আগেই বলেছি, আজকের পৃথিবীতে এমনটা

সচরাচর ঘটছে। এখানে তো এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখা যায় যে, নিজের স্রষ্টা সম্পর্কে যে যত অজ্ঞ এবং স্রষ্টাপ্রদত্ত বুদ্ধি ও ভাষাকে স্রষ্টার বিরুদ্ধে যে যত বেশি ব্যবহার করতে পারে সে তত বড় বুদ্ধিজীবী। চিন্তা করুন, ন্যূনতম বোধ-বিবেকহীন এই প্রাণীরাই বুদ্ধিজীবী!

এই আজব দুনিয়ায় এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়, যারা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'এর প্রতি ঈমান রাখার দাবিদার হয়েও তাঁকে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় স্বীকার করেন না। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, কিন্তু তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ অপরিহার্য নয়! তাঁর হাদীস শরীয়তের দলীল নয়! (নাউযুবিল্লাহ!) এসব প্রলাপকে আকীদা-বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণকারী লোক আমাদের দেশেও আছে। এ ধরনের আরো কত যে অলীক ধ্যান-ধারণার লোকের বাস এ জগতে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

যাহোক, মূর্খতা ও মুনাফেকির ভিত্তিতে শরীয়তে নব-সংযোজনের বেদআত যদি এ জগতে থাকতে পারে, তবে একই কারণে বা অন্য কোন ছুঁতোয় শরীয়তের কিছু অংশ অস্বীকারের বেদআতও বিচিত্র কিছু নয়। এটা নতুন নয়। এ গোমরাহির ইতিহাস অনেক পুরনো।

মনে রাখতে হবে, যে বিষয়টি দ্বীন হিসাবে প্রমাণিত তা অস্বীকার করা তেমনি গোমরাহি, যেমন দ্বীন নয় এমন কিছুকে দ্বীনে শামিল করা গোমরাহি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়।

ইনশাআল্লাহ কালেমা তাইয়েবার পরিপূর্ণ শব্দাবলি এবং দুটি অংশ একসাথে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে 'তারিখী তাওয়াতুর' ও 'অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা'এর আলোকে কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করব। সেখানে সংশ্লিষ্ট জরুরি বিষয়াবলির বিশ্লেষণও থাকবে। আপাতত উক্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব উল্লেখ করছি।

একটি হাদীস

এ কথা সত্য নয় যে, হাদীস শরীফে কালেমা তাইয়েবার দুই অংশ একসাথে নেই। বরং নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় দুটো অংশই একসাথে রয়েছে। এখানে আমি শুধু একটি বর্ণনা উল্লেখ করছি–

(১) ইমাম ইউনুস ইবনে বুকাইর (রহ.) তাঁর 'যিয়াদাতুল মাগাযী' গ্রন্থে সহীহ সনদে বুরাইদা ইবনুল হুসাইব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবী (বুরাইদা) বলেন, আবু যর ও তার চাচাত ভাই নুয়াইম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বের হলেন। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। নবীজী একটি পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আবু যর তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ!

আমরা আপনার পয়গাম শুনতে এসেছি। নবীজী বললেন, আমি বলি- لا إله إلا الله محمد رسول الله একথা শোনার পর আবু যর ও তার সঙ্গী (চাচাত ভাই) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনলেন।

হাদীসটির সনদ ও আরবী পাঠ নিম্নরূপ-

يونس قال: عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: انْطَلَقَ أَبُوْ ذَرٍّ وَنُعَيْمٌ ابْنُ عَمِّ أَبِي ذَرٍّ، وَأَنَا مَعَهُمْ يَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِالْجَبَلِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ ذَرٍّ: يَا مُحَمَّدُ أَتَيْنَاكَ لِنَسْمَعَ مَا تَقُوْلُ، قَالَ: أَقُوْلُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ، فَآمَنَ بِهِ أَبُوْ ذَرٍّ وَصَاحِبُهُ.

ইমাম ইউনুস ইবনে বুকাইর (রহ.)এর কিতাব থেকে হাদীসটি ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) 'আলইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সনদ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। এর সব কজন বর্ণনাকারীই 'সিকাহ' তথা নির্ভরযোগ্য। তাঁদের 'তারাজিম'-জীবনবৃত্তান্ত এবং তাঁদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণের উক্তিসমূহের জন্য উলামায়ে কেরাম ধারাবাহিকভাবে নিম্নের কিতাবগুলো দেখতে পারেন-

(১) তাহযীবুল কামাল, আবুল হাজ্জাজ মিযযী ২০/৫২৭, ৪৯০, ১০৩৬, ৩/৩০; (২) তাহযীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার আসকালানী ১১/৪৩৪, ৪১৫, ৫/১৫৭, ১/৪৩২ (৩) সিয়ারু আলামিন নুবালা, শামসুদ্দীন যাহাবী ৮/১৫৫, ৫/৫৩২, ৪/১০১ (৪) কিতাবুস সিকাত, ইবনে হিব্বান বুসতী ৭/৬৫১, ৬৩৫, ৫/১৬, ৩/২৯

এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি। বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করব।#

[জুলাই '০৬ঈ.]

সম্মিলিত দুআ : একটি প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : আমি জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার একজন ফাযেলের এক ইংরেজি বইয়ে পড়েছি যে, শরীয়তে সম্মিলিত দুআর কোনো অস্তিত্ব নেই। কুরআন হাদীস দ্বারা সম্মিলিত দুআ কোথাও প্রমাণিত নয়। একবার উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইস্তেসকার জন্য হযরত আব্বাস (রা.)কে ওসীলা বানিয়েছিলেন। সে সময়ও আব্বাস (রা.) একা দুআ করেছেন। তেমনিভাবে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা (হাদীস ৬২৪২)-তে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার উমর (রা.)-এর নিকটে এই সংবাদ পৌছল যে, কিছু মানুষ একত্র হয়ে মুসলিম উম্মাহ ও উমর (রা.)-এর জন্য দুআ করছে। এটা শোনামাত্র তিনি তার গোলামকে লাঠি হাতে পাঠালেন, যেন তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন এই যে, তার এই দাবি কি সঠিক এবং উপরোক্ত রেওয়ায়েত কি ইবনে আবী শায়বায় বিদ্যমান আছে? যদি থাকে তবে তার সনদ কেমন?

শামসুল আরেফীন
ধানমণ্ডি, ঢাকা

উত্তর : উপরোক্ত দাবি সম্পূর্ণ ভুল। আর প্রশ্নোক্ত বর্ণনা মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় নেই।

এ বিষয়ে বাস্তব কথা এই যে, দুআ অনেক বড় আমল, এমনকি হাদীস শরীফে এসেছে যে, 'দুআই ইবাদত।' এই দুআ যেমন একা একা করা যায়, তেমনি সম্মিলিতভাবেও। শরীয়ত যেখানে কোনো একটি পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে সেখানে ওইভাবে দুআ করতে হবে-একা হলে একা এবং সম্মিলিতভাবে হলে সম্মিলিতভাবে। কিন্তু শরীয়ত যেখানে কোনো একটি পন্থা নির্দিষ্ট করেনি, সেখানে উভয় পন্থাই মুবাহ। বিনা দলীলে কোনো একটিকে যেমন নাজায়েয বলা যায় না, তেমনি সুন্নত বা জরুরিও বলা যায় না। এধরনের ক্ষেত্রে উভয় পন্থাই মুবাহ ও দুআকারীর ইচ্ছাধীন থাকে।

উল্লেখ্য, সম্মিলিত দুআ দুইভাবে হতে পারে– এক, সমবেত লোকদের মধ্যে একজন দুআ করবে এবং অন্যরা আমীন বলবে। দুই, একস্থানে সমবেত হয়ে সবাই দুআ করবে, প্রত্যেকে নিজে নিজে দুআ করবে। এই উভয় অবস্থা জায়েয।

এছাড়া সমবেত হওয়ারও দুই অবস্থা হতে পারে। শুধু দুআর উদ্দেশ্যেই সমবেত হওয়া কিংবা কোনো দ্বীনি বা দুনিয়াবী কাজের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে মজলিসের শুরু বা শেষে সম্মিলিতভাবে দুআ করা। এই দুই অবস্থাই জায়েয। তবে কোথাও যদি কোনো শরয়ী সমস্যা যুক্ত হয় তবে তার হুকুম ভিন্ন।

এই সংক্ষিপ্ত মৌলিক আলোচনার পর শরীয়তের দলীলসমূহে সম্মিলিত দুআর সূত্র লক্ষ করুন।

১. প্রথম কথা তো হল, শরীয়তে সম্মিলিত দুআর এমন কিছু ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে যা একেবারেই সুস্পষ্ট এবং যে বিষয়ে দ্বিমতের কোনোই অবকাশ নেই। যেমন (ক) জামাতের নামাযের জাহরী (সশব্দের) কেরাতে ইমাম যখন সূরা ফাতেহা সমাপ্ত করেন তো সবাই 'আমীন' বলে। নামাযে সূরা ফাতেহা মূলত কেরাত হিসেবে পড়া হলেও তা একই সাথে দুআও বটে। এজন্যই তা সমাপ্ত হওয়ার পর আমীন বলা সুন্নত। একই কারণে সূরা ফাতেহার অপর নাম 'দুআউল মাসআলাহ।'

(খ) জানাযার নামায একদিকে যেমন নামায অন্যদিকে তা দুআও বটে। জানাযার নামাযের মূলকথা হচ্ছে দুআ। এই নামাযও জামাতের সাথে আদায় করা হয় এবং তৃতীয় তাকবীরের পর ইমাম-মুকতাদী সবাই একসঙ্গে মাইয়্যেতের জন্য দুআ করে।

(গ) অনাবৃষ্টি দেখা দিলে এবং প্রয়োজন সত্ত্বেও যথারীতি বৃষ্টি না হলে শরীয়তে 'ইস্তিসকা'র (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে রহমতের বৃষ্টি কামনা করার) নির্দেশ এসেছে। 'ইস্তিসকা'র বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতি এই যে, সবাই সম্মিলিতভাবে দুআ করবে। যেমন সহীহ বুখারীতে আনাস (রা.)এর বর্ণনা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য উভয় হাত উঠিয়ে দুআ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে উপস্থিত সকলে হাত উঠিয়ে দুআ করেছেন। –সহীহ বুখারী

(ঘ) জুমা ও দুই ঈদের খুতবায় খতীব দুআ করেন এবং শ্রোতাগণ মনে মনে আমীন বলেন। সম্মিলিত দুআর এই পদ্ধতিও সব জায়গায় প্রচলিত রয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত 'ইস্তিগফার'-এর মাধ্যমে খুতবা সমাপ্ত করতেন। –মারাসীলে আবু দাউদ; যাদুল মাআদ ১/১৭৯

২. কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে– قد أجيبت دعوتكما

"তোমাদের দু'জনের দুআ কবুল করা হয়েছে।"

এ আয়াতে 'তোমাদের দু'জনের দুআ' বলতে মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)এর দুআ বোঝানো হয়েছে। একাধিক সাহাবী ও বেশ কয়েকজন তাবেঈ ইমামের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুসা (আ.) দুআ করেছেন এবং হারুন (আ.) আমীন বলেছেন। একেই আল্লাহ তাআলা 'দু'জনের দুআ' বলেছেন। –তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৪৭০; আদ্দুররুল মানসূর ৩/৩১৫)

এটা তাঁদের দু'জনের সম্মিলিত দুআ ছিল, যা আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন এবং খোশখবরী দিয়েছেন যে, 'তোমাদের দু'জনের দুআ কবুল করা হয়েছে।'

৩. সাহাবী হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা আলফিহরী (রা.), যিনি বড় 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ' ছিলেন। একবার তাঁকে একটি বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হয়। তিনি যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সমাপ্ত করার পর যখন যুদ্ধের সময় নিকটবর্তী হল তখন সহযোদ্ধাদের লক্ষ করে বললেন–

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله.

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কিছু মানুষ যখন একত্র হয় এবং একজন দুআ করে আর অন্যরা আমীন বলে তো আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদের দুআ কবুল করেন।"

এই হাদীস বর্ণনা করে তিনি আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা করলেন এবং দুআ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর দুআর একটি অংশ এই ছিল–

اَللّٰهُمَّ احْقِنْ دِمَائَنَا وَاجْعَلْ أُجُوْرَنَا أُجُوْرَ الشُّهَدَاءِ

"ইয়া আল্লাহ, আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে শহীদদের সমতুল্য সওয়াব দান করুন।"

তাঁরা সবাই দুআয় মশগুল, ইতোমধ্যে রোমক বাহিনীর সেনাপতি (অস্ত্র ত্যাগ করে) হাবীব ইবনে মাসলামা (রা.)-এর তাঁবুতে এসে উপস্থিত হল। –মুজামে কাবীর, তবারানী ৪/২২দ, হাদীস ৩৫৩৬; মুস্তাদরাকে হাকেম ৩/৩৪৭

বর্ণনাটির সম্পূর্ণ আরবী পাঠ নিম্নরূপ :

عن حبيب بن مسلمة الفهري، وكان مستجابا أنه أمر على جيش،

فدرب الدروب، فلما لقي العدو قال للناس: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلاَّ أَجَابَهُمُ اللهُ»، ثُمَّ إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فقال: اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا، وَاجْعَلْ أُجُورَنَا أُجُورَ الشُّهَدَاءِ، فبينما على ذلك إذ نزل الهنباط أمير العدو، فدخل على حبيب سرادقه.

رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، والراوي عن ابن لهيعة أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو أحد العبادلة الذين تعد روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة.

এই রেওয়ায়েতের সনদ গ্রহণযোগ্য এবং কম করে বললেও তাকে 'হাসান' বলতে হবে।

প্রশ্ন এই যে, সম্মিলিত দুআর ভিত্তি প্রমাণের জন্য এরচেয়ে স্পষ্ট বর্ণনার প্রয়োজন আছে কি?

৪. ইতিহাসে 'আলা আলহাযরামী (রা.)-এর ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। বাহরাইনের মুরতাদদের সাথে ১১ হিজরীতে যে লড়াই হয়েছিল তাতে তিনি সিপাহসালার ছিলেন। সেই অভিযানের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এই যে, মুসলিম বাহিনী একস্থানে যাত্রাবিরতি করতেই কাফেলার সকল উট রসদপত্রসহ পলায়ন করল। একটি উটও পাকড়াও করা গেল না। অবস্থা এই দাঁড়াল যে, পরণের কাপড় ছাড়া কোনো কিছুই কাফেলার সাথে রইল না। সবার পেরেশান অবস্থা। 'আলা আলহাযরামী (রা.) ঘোষকের মাধ্যমে সবাইকে একত্র করলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তোমরা মুসলমান, আল্লাহর রাস্তায় আছ, তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী। অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করবেন না।' ইতোমধ্যে ফজরের আযান হল। তিনি নামাযে ইমামতি করলেন। নামাযের পর দোজানু হয়ে বসে অত্যন্ত বিনয় ও কাতরতার সাথে দুআয় মশগুল হয়ে গেলেন। কাফেলার সবাই দুআ করতে লাগল। এ অবস্থায় সূর্য উদিত হল, কিন্তু তাঁরা দুআয় মশগুল রইলেন। একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদের সন্নিকটে একটি বড় জলাশয় সৃষ্টি করে দিলেন। সবাই সেখানে গেলেন, তৃষ্ণা নিবারণ করলেন এবং গোসল করলেন। বেলা কিছু চড়ার পর একে একে সকল উট রসদপত্রসহ ফিরে আসতে লাগল।

হাদীস ও তারীখের ইমাম ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন, এটা ওই লড়াইয়ের অনেকগুলো অলৌকিক ঘটনার একটি, যা লোকেরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে।

আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরবী ইবারতটুকু তুলে দিচ্ছি :

فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس، ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله ...

দেখুন, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ৫/৩৪; তারীখে তাবারী ২/৫২৩

মোটকথা, শরীয়তের নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা সম্মিলিত দুআ প্রমাণিত এবং এতে কোনো অস্পষ্টতাও নেই। অতএব এ বিষয়ে আরো দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আরো হাদীস জানতে হলে শায়েখ আব্দুল হাফিজ মাক্কী সংকলিত 'ইসতিহ্বাবুদ দুআ বা'দাল ফারায়িয' কিতাবটি (পৃ. ৬৮-৭৯) দেখা যেতে পারে।

প্রশ্নোক্ত বর্ণনা দু'টির স্বরূপ

প্রশ্নে আপনি জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার ওই ফাযেলের উদ্ধৃতিতে দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি সম্মিলিত দুআর ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

প্রথম বর্ণনা : একবার ইস্তিসকার সময় হযরত উমর (রা.) হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)কে দুআর জন্য ওসীলা বানিয়েছিলেন। তিনি সেসময় একা দুআ করেন, সম্মিলিতভাবে নয়।

লক্ষ করুন, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এই রেওয়ায়েত সঠিক তবুও এর দ্বারা শুধু একা দুআর বৈধতা প্রমাণ হতে পারে অথবা খুব বেশি হলে এটুকু যে, দুআ সম্মিলিতভাবে হওয়া অপরিহার্য নয়, কিন্তু এ বর্ণনা থেকে সম্মিলিত দুআ নিষেধ−এটা কীভাবে বোঝা গেল?!

এরপর মজার বিষয় এই যে, উপরোক্ত ঘটনায় হযরত আব্বাস (রা.) একা দুআ করেছিলেন−এই তথ্যটাই বানানো। সত্য কথা এই যে, সে সময় হযরত আব্বাস (রা.) ও অন্যরা সম্মিলিতভাবে দুআ করেছিলেন।

সহীহ বুখারী ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে পূর্ণ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। সংক্ষেপে তা এই যে, লোকেরা বৃষ্টির জন্য দুআর উদ্দেশ্যে একত্র হল। হযরত উমর (রা.) খুতবা দিলেন এবং বললেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর চাচা) আব্বাসকে পিতার মতো মনে করতেন। অতএব তোমরা তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ কর এবং

তাঁকে আল্লাহ তাআলার দরবারে ওসীলা বানাও। এরপর হযরত আব্বাস (রা.) ও উপস্থিত সবাই দুআ করতে আরম্ভ করেন। হযরত আব্বাস (রা.)-এর দুআ এই ছিল–

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلاءٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ، وَلَمْ يَكْشِفْ إِلاَّ بِتَوْبَةٍ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِيْ إِلَيْكَ لِمَكَانِيْ مِنْ نَبِيِّكَ، وهذه أَيْدِيْنَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوْبِ، وَنَوَاصِيْنَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ.

সবাই দুআয় মশগুল ছিলেন। ইতোমধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি হতে আরম্ভ করল। –ফাতহুল বারী ২/৫৭৭, কিতাবুল ইস্তিসকা

দুআটির তরজমা এই, "ইয়া আল্লাহ, গোনাহের কারণে বিপদাপদ আসে আর তওবার মাধ্যমেই তা দূর হয়। যেহেতু আপনার নবীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাই সবাই আমাকে ওসীলা বানিয়ে আপনার করুণা-ভিখারী হয়েছে। আমাদের গোনাহগার হাতগুলো আপনার দরবারে উত্তোলিত আর আমাদের কপাল তওবার সাথে আনত। অতএব বৃষ্টির মাধ্যমে আপনি আমাদের ফরিয়াদ কবুল করুন।"

পাঠকবৃন্দই বলুন, এই দুআ সম্মিলিত ছিল না একাকী? তাছাড়া এ বিষয়ে তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সে দুআয় ওমর (রা.) এবং সকল মানুষ হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্রন্দন করেছিলেন।

দ্বিতীয় বর্ণনা : আপনি বলেছেন যে, দ্বিতীয় বর্ণনা তিনি মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা (হাদীস ৬২৪২)-এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, কিন্তু মুসান্নাফের কোনো এডিশনেই উপরোক্ত নম্বরে এমন কোনো রেওয়ায়েত নেই। অদ্রূপ মুসান্নাফের অন্য কোনো স্থানেও আমরা ওই বর্ণনা পাইনি। তবে মুসান্নাফের ২৬৭১৫ নম্বরে (নতুন সংস্করণ) একটি রেওয়ায়েত আছে, সম্ভবত লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞাতসারে তা বিকৃত করে উল্লেখ করেছেন। কেননা, সম্মিলিত দুআর সাথে ওই বর্ণনার কোনো সম্পর্ক নেই। পূর্ণ বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল–

عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَيْهِ: أَنَّ هٰهُنَا قَوْمًا يَجْتَمِعُوْنَ، فَيَدْعُوْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلِلأَمِيْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَقْبِلْ وَأَقْبِلْ بِهِمْ مَعَكَ، فَأَقْبَلَ، وَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ: أَعِدَّ لِيْ سَوْطًا، فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَى عُمَرَ، أَقْبَلَ عَلَى أَمِيْرِهِمْ ضَرْبًا بِالسَّوْطِ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ:

إنّا لسنا أولئك الّذين، يعنى أولئك قوم يأتون من قبل المشرق.

"আবু উসমান বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর একজন প্রশাসক তাকে পত্র লিখলেন যে, এখানে কিছু মানুষ আছে যারা একস্থানে একত্র হয় এবং মুসলমানদের জন্য ও 'আমীরে'র জন্য দুআ করে। (হযরত) উমর (রা.) তাঁকে উত্তরে লিখলেন, 'তুমি তাদেরকে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও।' প্রশাসক তাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এদিকে (হযরত) উমর (রা.) প্রহরীকে বললেন, একটি চাবুক প্রস্তুত করে রাখ। যখন তারা (হযরত) উমর (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হল তখন তিনি তাদের আমীরকে চাবুক মারতে লাগলেন। সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমরা ওই দলের লোক নই, যারা মাশরিক থেকে আসে।" -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ২৬৭১৫, কিতাবুল আদব, 'মান কারিহাল কাসাসা ওয়াযযারবা ফীহ

উপরোক্ত রেওয়ায়েত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, হযরত উমর (রা.) কেন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং কেন প্রহার করেছিলেন।

এরা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছিল এবং নিজেদের মধ্যে একজনকে আমীর বানিয়েছিল। এরপর প্রতিদিন একত্র হয়ে মুসলমানদের জন্য ও নিজেদের আমীরের জন্য (আমীরুল মুমিনীন উমর রা.-এর জন্য নয়) দুআ করত। বলাবাহুল্য, ইসলামী খেলাফত বিদ্যমান থাকা অবস্থায় গোপনে ভিন্ন নেতৃত্ব তৈরির কোনো অবকাশ নেই। হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন। তাদের এই কার্যকলাপ থেকে বিদ্রোহ বা ফেতনার আশঙ্কা করে তৎক্ষণাৎ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

মোটকথা, বিষয়টি সম্মিলিত দুআর নয়, গোপন নেতৃত্ব সৃষ্টির। এজন্য এই ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ভুল হবে যে, হযরত উমর (রা.) তাদেরকে সম্মিলিত দুআর জন্য প্রহার করেছিলেন।

সহীহ বুখারী (হাদীস ৬৪০৮) সহীহ মুসলিম (হাদীস ২৬৮৯)সহ বহু হাদীসের কিতাবে একটি হাদীস আছে, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিকিরের হালকার ফযীলত বয়ান করেছেন। তাতে যিকিরের হালকায় কী আমল করা হয় তারও বিবরণ রয়েছে। এই হাদীস যাদের জানা আছে তাদের বলে দিতে হবে না যে, তাতে তাসবীহ ও তাহলীলের সাথে জান্নাতের প্রার্থনা, জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া ও ইস্তেগফার অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্ন এই যে, জান্নাত লাভের আবেদন

এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রার্থনা, ইসতিগ্ফার-এগুলো কি দুআ নয়? আর যিকিরের হালকায় যিকিরের সাথে যখন দুআও রয়েছে তো এটা কি সম্মিলিত দুআ হল না?

এই হাদীস এবং এ বিষয়ের অন্যান্য হাদীস ছাড়াও অন্যান্য শরয়ী দলীল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সম্মিলিত দুআর কারণে কীভাবে কাউকে প্রহার করা যেতে পারে?

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেল। তবুও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইঙ্গিত করে দেওয়া মুনাসিব মনে করছি। তা এই যে, সম্মিলিত দুআ সম্পর্কে এখানে যে আলোচনা করা হল তা এমন দুআর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই। যদি কোথাও সম্মিলিত দুআর নামে এমন কোনো কাজ করা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর, তবে অবশ্যই তা সংশোধন করতে হবে। যেমন কোথাও এই রেওয়াজ হয়ে গেল যে, মাইয়্যেতের ঈসালে সওয়াবের জন্য অবশ্যই মাহফিল করে সম্মিলিত দুআ করতে হবে। তা না হলে মাইয়্যেতের নিকট সওয়াব পৌঁছবে না এবং তার হক আদায় হবে না! এটি অবশ্যই ভ্রান্ত ধারণা যা সংশোধন করা জরুরি।

কিংবা যেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত সম্মিলিত দুআকে শুধু মুস্তাহাব বা মুবাহ বলেছে কোনো অঞ্চলের মানুষ যদি তাকে এমন অপরিহার্য মনে করতে থাকে, যেন তা একটি অবশ্য পালনীয় সুন্নত, তবে তা-ও একটা ভুল ধারণা, যা সংশোধন করা জরুরি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল বিষয় নির্ধারিত সীমারেখার ভেতরে রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন। #

[আগস্ট '০৮ঈ.]

সুন্নাহসম্মত নামায : কিছু মৌলিক কথা

নামায ঈমানের মানদণ্ড। ইসলামের স্তম্ভ ও নিদর্শন। আর কালেমার পরে মুসলমানের সবচেয়ে বড় পরিচয়। খুশু-খুযুর সাথে সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

নামাযের বিধান যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে এসেছে তেমনি তার নিয়ম-পদ্ধতিও তিনিই উম্মতকে শিখিয়েছেন। দ্বীন ও শরীয়তের ইলম অর্জনের তিনিই একমাত্র সূত্র।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নামাযের পদ্ধতি সর্বপ্রথম শিখেছেন সাহাবায়ে কেরাম। নবীজী তাঁদেরকে মৌখিকভাবেও শিখিয়েছেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে নিয়মিত নামায আদায় করেছেন। তাঁর ইরশাদ–

صَلُّوْا كما رأيتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"তোমরা সেভাবেই নামায আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।"

এরপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়ীন, তাবেয়ীন থেকে তাবে-তাবেয়ীন, এভাবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

দুই

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক সাহাবী তাঁর সঙ্গে মদীনাতেই অবস্থান করতেন। কিছু সাহাবী ছিলেন, যাঁরা নিজ অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণের পর এক দুই বার মদীনায় নবীজীর সাহচর্যে এসেছেন এবং কিছুদিন অবস্থান করে নিজ এলাকায় ফিরে গিয়েছেন। বলাবাহুল্য যে, এই আগন্তুক সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল অধিক সময় প্রত্যক্ষ করার

এবং সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাননি এবং তাঁরা দ্বীনের বহু বিষয়ের, বরং অধিকাংশ বিষয়ের জ্ঞান সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লাভ করেননি। এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় শরীয়তের বিধি-বিধান মানসূখ বা রহিত হওয়ার ধারাও চলমান ছিল। এজন্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সাহাবীরা কোনো বিধান বা পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেছেন, পরে তা মানসূখ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাঁদের পক্ষে সেটা জানার সুযোগ হয়নি। অথচ মদীনার সাহাবীরা খুব সহজেই সে সম্পর্কে অবগত হয়ে যেতেন।

মদীনার সাহাবীরাও সবাই নবীজীর সমান সাহচর্য পেয়েছেন–এমন নয়। কিছু সাহাবী সার্বক্ষণিক সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁরা খুব কমই অনুপস্থিত থাকতেন। এঁদের মধ্যে প্রবীণ সাহাবীগণ যাঁদেরকে 'সাবিকীনে আওয়ালীন' ও বদরী মুজাহিদীনের মধ্যে গণ্য করা হয় তাঁরা ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবিশেষ আস্থার পাত্র। সাধারণত তাঁরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে প্রথম কাতারে নামায আদায় করতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ছিল–

لِيَلِنِي مِنكُمْ أُولُوا الأَحْلَامِ وَالنُّهَى

"তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে।" এ নির্দেশ অনুযায়ী এঁরা নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে দাঁড়াতেন।

বলাবাহুল্য যে, এই সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায ও তাঁর দিনরাতের আমল প্রত্যক্ষ করার যতটা সুযোগ পেয়েছেন তা অন্যরা পাননি। আর তাঁরা যেমন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে বিষয়গুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হতেন অন্যদের জন্য তা এত সহজ ছিল না।

এই বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আরো অনেকে শামিল ছিলেন। এখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সফরে-হযরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম ছিলেন। হাদীস ও তারীখে তাঁর উপাধী 'ছাহিবুল না'লাইন ওয়াল বিসাদ ওয়াল মিতহারা' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাদুকা, তাকিয়া ও অযুর পাত্র-বহনকারী। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৯৬১)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন, আমরা অনেক দিন পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তার মাতাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আহলে

বাইত' (পরিবারের সদস্য) মনে করতাম। কেননা নবীজীর গৃহে তাদের আসা-যাওয়া ছিল খুব বেশি। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৭৬৯, ৪৩৮৪)

তিন

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর যখন ইসলামী খেলাফতের পরিধি বিস্তৃত হতে লাগল এবং নতুন নতুন অঞ্চল বিজিত হল তখন সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন ও ঈমানের তালীমের জন্য দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ফারূক (রা.) বড় বড় সাহাবীকে সাধারণত মদীনার বাইরে যেতে দিতেন না। তবে কাদেসিয়্যা (ইরাক) জয়ের পর যখন কুফা নগরীর গোড়াপত্তন হল তখন সে অঞ্চলে দ্বীন ও শরীয়ত এবং কুরআন ও সুন্নাহর তালীমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)কে পাঠালেন। তিনি কূফাবাসীকে পত্র লিখলেন যে, "আমি আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে (রা.) তোমাদের আমীর হিসেবে এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা.) উযীর ও মুয়াল্লিম হিসেবে প্রেরণ করছি। এঁরা দুজনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনীষী সাহাবীদের অন্যতম এবং বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তোমরা তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তাদের অনুসরণ করবে। মনে রাখবে, আবদুল্লাহকে আমার নিজের প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমি তোমাদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য তাকে পছন্দ করেছি। (আততবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৬/৩৬৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/৪৮৬)

এই দুই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কূফাতেই আরো পনেরো শ সাহাবী অবস্থান করছিলেন। যাঁদের মধ্যে সত্তরজন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা.), হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.), সালমান ফারেসী (রা.), আবু মূসা আশআরী (রা.), প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবী সবাই কূফাতেই ছিলেন। হাদীস ও তারীখের ইমাম আবুল হাসান ইজলী (রহ.) 'তারীখ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, কূফায় দেড় হাজার সাহাবী এসে বসতি স্থাপন করেন। (ফতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম খ. ১, পৃ. ৯১)

খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) তো একে তাঁর দারুল খিলাফা বানিয়েছিলেন।

কূফায় অবস্থানকারী সাহাবীদের নিকট থেকে কূফার অধিবাসীরা দ্বীন ও ঈমান গ্রহণ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন। নামায, রোযা, হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি সকল ইবাদতের নিয়ম-কানূন শিক্ষা লাভ করেছেন। কূফার

অধিবাসীরা হজ্ব-ওমরা ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনায় যেতেন এবং সেখানকার সাহাবীদের নিকট থেকেও ইলম অর্জন করতেন। লক্ষ করার বিষয় এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী যেভাবে কূফাবাসীকে নামায পড়তে শিখিয়েছেন তাঁরা মক্কা-মদীনায় গিয়েও সেভাবেই নামায পড়তেন, কিন্তু খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা.) থেকে নিয়ে হারামাইনের কোনো সাহাবী বা কোনো তাবেয়ী তাঁদের নামাযকে খেলাফে সুন্নত বলেছেন–এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাস থেকে দেখানো যাবে না।

এই কূফানগরীতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন ৮০ হিজরীতে এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। সে সময় ইসলামী বিশ্বে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। কূফাতেও কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। আর এটা প্রমাণিত যে, ইমাম ছাহেব একাধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ এবং তাঁদের থেকে রেওয়ায়েত করার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এজন্য ইমাম ছাহেবের তাবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এমন অনেক মনীষী এর স্বীকৃতি দিয়েছেন যাদের ফিকহী মাসলাক হানাফী নয়। কয়েক বছর আগে ড. মুহাম্মাদ আবদুশ শহীদ নুমানী (দামাত বারাকাতুহুম, প্রফেসর শো'বায়ে আরবী, করাচি ইউনিভার্সিটি) রচিত 'ইমাম আবু হানীফা কী তাবেঈয়্যত আওর সাহাবা ছে উনকী রেওয়ায়াত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম ছাহেব বিপুল সংখ্যক তাবেয়ী মনীষীর সাহচর্য পেয়েছিলেন যাঁরা অসংখ্য সাহাবী কিংবা তাঁদের সমসাময়িক প্রবীণ তাবেয়ীদের সাহচর্য পেয়েছিলেন। এজন্য 'আমলে মুতাওয়ারাছ' অর্থাৎ কর্মগত ধারায় চলে আসা নবী-নামাযকে যতটা কাছে থেকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল ততটা হাদীস ও ফিকহের অন্য ইমামদের হয়নি। কেননা, তাঁরা সবাই তাঁর পরের যুগের ছিলেন। (ইমাম ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান, মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী পৃ. ৫০-৫৭ ও ৬৭-৭১; ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম, যাহিদ কাওছারী পৃ. ৫১-৫৫; ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী পৃ. ৩৬-৪৩ ও ১১৬-১১৯; আততা'আমুল, হায়দার হাসান খান টুংকী)

মোটকথা, উত্তর প্রজন্ম পূর্ব প্রজন্ম থেকে নামায আদায়ের পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে 'তা'আমুল' ও তাওয়ারুছের মাধ্যমেই গ্রহণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীগণকে শেখানোর সময় কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরাত উল্লেখ করতেন– তাঁর কোনো বাণী কিংবা কর্ম, আবার কখনও বিনা বরাতে শেখাতেন। কিন্তু সর্বাবস্থায় তাঁরা তাবেয়ীদেরকে ওই নামাযই শেখাতেন যা তাঁরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন। কখনও এমন হয়েছে যে, কেউ তাঁদের সামনে নামাযে কোনো ভুল

করেছে, সুন্নতের খেলাফ কোনো কাজ করেছে তো তাঁরা তা সংশোধন করে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীস উল্লেখ করেছেন।

যেহেতু নামাযের পদ্ধতি শুধু মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে শেখার বিষয় নয়; বরং দেখে শেখার বিষয় এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তা'আমুলের' মাধ্যমে শেখানোর ওপরই জোর দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও এ পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন, তাদের পরে তাবেয়ীনও। এজন্য আপনি দেখবেন, পূর্ণ নামাযের বিবরণ কোনো এক হাদীসে উল্লেখিত হয়নি; বরং দশ-বিশটি বা শ দুইশ হাদীসেও নয়। হাদীসের দু চারটি বা আট-দশটি কিতাব থেকেও যদি কিতাবুস সালাতের সকল হাদীস একত্র করা হয় তবুও দুই রাকাত নামাযের সকল মাসআলা এবং তার পূর্ণ কাঠামো পরিষ্কারভাবে সামনে আসবে না। এর কারণ তা-ই যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ তারা এই হাদীসগুলো নামায শেখানোর সময় প্রয়োজন অনুসারে উল্লেখ করতেন। রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্যই এটা ছিল না যে, শুধু মৌখিক বর্ণনার মধ্যে গোটা নবী-নামাযের রূপ-রেখা একই মজলিসে বা এক আলোচনায় পেশ করা হবে।

সারকথা এই যে, নামাযের নিয়ম-কানূন মূলত 'তাআমুল' ও 'তাওয়ারুছের' মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রসঙ্গে মৌখিক বর্ণনার ধারাও অব্যাহত ছিল।

চার

যখন আল্লাহ তাআলার গাইবী ইশারায় আইম্মায়ে দ্বীন উলূমে দ্বীন সংকলনের প্রতি মনোনিবেশ করলেন তখন আইম্মায়ে হাদীস দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের মতো নামায বিষয়ক সকল মৌখিক বর্ণনাও–নবীজীর বাণী হোক বা কর্ম, সনদসহ সংকলন করতে লাগলেন। প্রথমদিকে মরফূ হাদীসের সাথে সাহাবায়ে কেরামের; বরং তাবেয়ীনের কর্ম ও সিদ্ধান্তও সংকলিত হয়েছে। কেননা, এগুলো প্রকৃতপক্ষে ওই আমলে মুতাওয়ারাছেরই মৌখিক বিবরণ বা তার ব্যাখ্যা ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হল মরফূ রেওয়ায়েত সংকলনের দিকে।

ফুকাহায়ে কেরাম নামায বিষয়ে মৌখিক বর্ণনা এবং সাহাবা-তাবেয়ীনের কর্মধারা দু'টোই সামনে রেখেছেন। এ দুয়ের আলোকে একদিকে তারা মাসনূন নামাযের (সুন্নাহসম্মত নামাযের) পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা পেশ করেছেন, তেমনি নামায সংক্রান্ত সকল মাসআলার সমাধানও পেশ করেছেন। নামাযের এই পূর্ণাঙ্গ কাঠামো

ও মাসায়েল দু' ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে : ১. দলীলের উল্লেখ ছাড়া। যেন পঠন-পাঠনে সুবিধা হয়। ২. দলীলের সাথে বিস্তারিত আলোচনাসহ, যেন নামাযের কাঠামো ও মাসায়েলের সূত্রও মানুষের কাছে সংরক্ষিত থাকে।

এভাবে মুসলিম উম্মাহ সংকলিত আকারে দুইটি নেয়ামত লাভ করেছে : ১. মাসায়েলের উৎস হাদীসসমূহ। ২. ওই সব হাদীস ও অন্যান্য শরয়ী দলীলের নির্যাসরূপে নামাযের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো, প্রত্যেক অংশের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট মাসায়েল ইত্যাদি।

প্রথম নেয়ামত হাদীসের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় নেয়ামত সংরক্ষিত হয়েছে ফিকহ, তাফসীর ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা-গ্রন্থাদিতে।

পাঁচ

প্রথম বিষয়ের কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও সংকলকদের নাম উল্লেখ করা হল :

১. 'আলমুসান্নাফ', আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম (১২৬ হি.- ২১১ হি.) এগারো খণ্ডে।

২. 'আলমুসান্নাফ', ইবনে আবী শায়বা (১৫৯ হি.- ২৩৫ হি.) ২৬ খণ্ডে।

৩. 'আলমুসনাদ', আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪ হি.-২৪১ হি.) ৫২ খণ্ডে।

৪. 'সহীহ বুখারী', আবু আবদুল্লাহ বুখারী (১৯৪ হি. -২৫২ হি.)।

৫. 'সহীহ মুসলিম', মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২০৪ হি.-২৬১ হি.)।

৬. 'আসসুনান', আবু দাউদ সিজিস্তানী (২০২ হি.-২৭৫ হি.)।

৭. 'আলজামিউস সুনান', আবু ঈসা তিরমিযী (২১০ হি.-২৭৯ হি.)।

৮. 'আসসুনানুল কুবরা', নাসায়ী (২১৫ হি.-৩০৩ হি.)।

৯. 'সহীহ ইবনে খুযাইমা', আবু বকর ইবনে খুযায়মা (২২৩ হি.-৩১১ হি.)।

১০. 'শরহু মাআনিল আছার', আবু জাফর তহাবী (২৩৯ হি.-৩২১ হি.)।

১১. 'শরহু মুশকিলিল আছার', আবু জাফর তহাবী (২৩৯-৩২১ হি.) ১৬ খণ্ডে।

১২. 'সহীহ ইবনে হিব্বান', আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (আনুমানিক ২৭১ হি.-৩৫৪ হি.) ১৬ খণ্ডে।

১৩. 'আলমু'জামুল কাবীর' ২৫ খণ্ডে।

১৪. 'আলমু'জামুল আওসাত' ১১ খণ্ডে।

১৫. 'আলমু'জামুস সগীর' ১ খণ্ডে।

তিনটিই ইমাম তবারানী, আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহমদ (২৬০ হি.-৩৬০ হি.)-এর সংকলিত।

১৬. 'সুনানুদ দারাকুতনী', আলী ইবনে উমর দারাকুতনী (৩০৬-৩৮৫ হি.)।
১৭. 'আলমুস্তাদরাক', হাকিম আবু আব্দিল্লাহ (৩২১-৪০৫ হি.)।
১৮. 'আসসুনানুল কুবরা', আবু বকর বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি.) দশ খণ্ডে।
১৯. 'আততামহীদ', ইবনু আবদিল বার (৩৬৮ হি.-৪৬৩ হি.) ২৬ খণ্ডে।
২০. 'আলইস্তিযকার', ইবনু আবদিল বার (৩৬৮ হি.-৪৬৩ হি.) ৩০ খণ্ডে।

অন্য নেয়ামত অর্থাৎ ফিকহের প্রসিদ্ধ সংকলক হলেন :

১. ইমাম আবু হানীফা, নুমান ইবনে ছাবিত আলকূফী (৮০ হি.-১৫০ হি.)। অর্থাৎ ইমাম বুখারীর জন্মগ্রহণেরও চুয়াল্লিশ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শাগরিদ দুজন : ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩ হি.-১৮২ হি.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (১৩২-১৮৯ হি.।) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর শাগরিদদের সংকলিত ফিকহ আলফিকহুল হানাফী নামে পরিচিত।

২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস আলমাদানী (৯৪ হি.-১৭৯ হি.) তাঁর সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুল মালিকী' নামে পরিচিত।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশশাফেয়ী (১৫০ হি.-২০৪ হি.) তাঁর সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুশ শাফেয়ী' নামে পরিচিত।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪ হি.-২৪১ হি.) তাঁর সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুল হাম্বলী' নামে পরিচিত।

এই চারজন যেমন ফিকহশাস্ত্রের ইমাম তেমনি হাফেযুল হাদীস হিসেবেও গণ্য। শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.)-এর 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে, যা হাফিযুল হাদীসগণের জীবনী বিষয়ে রচিত, উক্ত চার ইমামেরই জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে তাঁদের বিশিষ্ট শাগরিদ এবং শাগরিদের শাগরিদগণ হাফেযুল হাদীসের মধ্যে গণ্য, যাঁরা এই ইমামদের সংকলিত ফিকহ বিশদভাবে আলোচনা ও সংরক্ষণ করেছেন। ফিকহের প্রসিদ্ধ ইমামগণ হাদীস শাস্ত্রে কীরূপ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য রাখতেন সে সম্পর্কে বিশদ জানা যাবে তাঁদের জীবনীতে এবং হাদীস বিষয়ক তাঁদের কর্ম ও রচনাবলি অধ্যয়নের মাধ্যমে।

সহজ ও সংক্ষেপে এ বিষয়ে ধারণা পেতে চাইলে আলেম-তালেবে ইলমগণ নিম্নোক্ত কিতাবগুলোর কোনো একটি অধ্যয়ন করতে পারেন:

১. মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস, মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী।

২. ইমাম আযম আওর ইলমে হাদীস, মুহাম্মাদ আলী সিদ্দীকী কান্দলভী।

৩. আলইমাম আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন, যফর আহমদ উছমানী।

৪.মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশশাফেয়ী, খতীব বাগদাদী।

৫. মানাকিবু আহমদ, ইবনুল জাওযী।

৬. তারতীবুল মাদারিক, কাযী ইয়ায (ভূমিকা)।

উম্মতের উপর ফকীহগণের বড় অনুগ্রহ এই যে, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানের যেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি তা সংকলনও করেছেন। বিশেষ করে ইবাদতের পদ্ধতি ও পূর্ণাঙ্গ কাঠামো স্পষ্টভাবে পেশ করেছেন; যা হাদীস ও সুন্নাহ এবং 'আমলে মুতাওয়ারাছ' (যা সুন্নাহর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকার) থেকে গৃহীত। এর বড় সুবিধা এই যে, কোনো মানুষ মুসলমান হওয়ার পর সংক্ষেপে ওই পদ্ধতি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় আর সে সাথে সাথে নামায পড়া আরম্ভ করে। শিশুদেরকে শেখানো হয়, সাত বছর বয়স থেকেই তারা নামায পড়তে থাকে। সাধারণ মানুষ, যাদের দলীলসহ বিধান জানার সুযোগ নেই এবং শরীয়তও তাদের উপর এটা ফরয করেনি, তাদেরকে শেখানো হয় আর তারা নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে থাকে।

যদি অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের পরে এবং শিশুকে বালেগ হওয়ার পর বাধ্য করা হত যে, তোমরা নামায আদায়ের পদ্ধতি হাদীসের কিতাব থেকে শেখ, কারো তাকলীদ করবে না, দলীল-প্রমাণের আলোকে সকল বিষয় নিজে পরীক্ষা করে নামায পড়বে তাহলে বছরের পর বছর অতিবাহিত হবে কিন্তু বেচারার নামায পড়ার সুযোগ হবে না। একই অবস্থা হবে যদি সাধারণ মানুষকে এই আদেশ করা হয়।

খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, কুতুবে ছিত্তা (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস-গ্রন্থের সংকলক ইমামগণও প্রথমে নামায শিখেছেন ফিকহে ইসলামী থেকেই, এরপর পরিণত বয়সে হাদীসের কিতাব সংকলন করেছেন। অথচ হাদীসের কিতাব সংকলন করার পর তারা না ফিকহে ইসলামীর উপর কোনো আপত্তি করেছেন, আর না মানুষকে ফিকহ সম্পর্কে আস্থাহীন করেছেন। বরং তারা নিজেরাও ইসলামের ফকীহগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থেকেছেন। তবে যেখানে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়েছে সেখানে তারা নিজেদের বিচার-বিবেচনা মোতাবেক কোনো এক মতকে অবলম্বন করেছেন এবং অন্য মত সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন।

মোটকথা, হাদীসের কিতাবসমূহের সংকলক এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের যেমন বড় অবদান উম্মতের প্রতি রয়েছে, তেমনি ফিকহে ইসলামীর সংকলক ও ফিকহের ইমামগণেরও বড় অবদান রয়েছে। উম্মাহর অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত উভয় শ্রেণীর মনীষীদের অবদান স্বীকার করা এবং উভয় নেয়ামত : হাদীস ও ফিকহকে সাথে রেখে চলা।

আট

বাস্তবতা এই যে, উম্মতের যে শ্রেণী খাইরুল কুরূনের মতাদর্শের উপর বিদ্যমান রয়েছেন তাঁরা সর্বদা হাদীস ও ফিকহ এই দুই নেয়ামতকে একত্রে ধারণ করে অগ্রসর হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারাই অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাদের কারো মনে শয়তান এই কুমন্ত্রণা দিতে পারেনি যে, হাদীসের হুকুম-আহকাম ফিকহের আকারে সংকলিত হয়ে যাওয়ার পর হাদীস শরীফের পঠন-পাঠন, চর্চা ও গবেষণার কোনো প্রয়োজন নেই। (নাউযুবিল্লাহ!) তেমনি শয়তান এই প্রশ্নও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি যে, হাদীস শরীফ থাকা অবস্থায় ফিকহ ও ফুকাহার প্রয়োজন কী? কেননা, তাদের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে, কুরআন মজীদের পরে দ্বীনের সবচেয়ে বড় ও বিস্তৃত দলীল সুন্নাহর সবচেয়ে বড় সূত্র হচ্ছে হাদীস শরীফ। এটা দ্বীনের দ্বিতীয় দলীল ও দ্বীনী বিধি-বিধানের দ্বিতীয় সূত্র। অতএব এর প্রয়োজন কখনও ফুরোবে না। একইভাবে এটাও তাদের সামনে পরিষ্কার ছিল যে, ফিকহে ইসলামী হাদীস শরীফ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং হাদীস শরীফ ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিধিবিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও সংকলন। খোদ হাদীস শরীফেও ফিকহের গুরুত্ব ও ফকীহর মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে এবং স্বয়ং হাদীস বিশারদ ইমামগণও ফকীহদের শরণাপন্ন হতেন এবং অন্যদেরকেও এর পরামর্শ দিতেন। এজন্য এই প্রশ্নই অবান্তর যে, হাদীস শরীফ থাকা অবস্থায় ফিকহের প্রয়োজন কী?

প্রত্যেক যুগে যারা সঠিক উদ্দেশ্যে ও সঠিক পন্থায় হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করেছেন তারা ফিকহ ও ফুকাহার প্রয়োজন বোধ করেছেন প্রচণ্ডভাবে। হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন কী এই প্রশ্নটা তখনই এসেছে যখন হাদীস চর্চার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

নয়

উদাহরণস্বরূপ 'নামাযের পদ্ধতি' সম্পর্কেই চিন্তা করুন। ছিফাতুস সালাত বা সালাত-পদ্ধতি বিষয়ক যত বেশি হাদীস আপনি সংগ্রহ করবেন এবং তাতে যত

বেশি চিন্তা-ভাবনা করবেন পাশাপাশি আপনার প্রতিদিনের নামায আদায়ের পদ্ধতি এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যতবেশি ভাববেন ততই ফিকহ ও ফুকাহার প্রয়োজন আপনার সামনে পরিষ্কার হতে থাকবে।

কিছু সহজ বিষয় লক্ষ করুন :

গোটা নামাযের পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে কোনো এক হাদীসে নেই।

পূর্ণ নামাযের ধারাবাহিক নিয়ম হাদীসের এক দুই কিতাব নয়, ছয় বা দশ কিতাবেও বিদ্যমান নেই।

নামাযের মধ্যে বা নামায সম্পর্কে অনেক নামাযীর এমন সব সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার কোনো শিরোনাম তারা হাদীসের কিতাবে খুঁজে পান না।

বহু বিষয় এমন রয়েছে যা হাদীস শরীফে বিদ্যমান থাকলেও হাদীসের কিতাবসমূহে তা শিরোনাম করা হয়নি। কেননা, সকল হাদীস ওইসব কিতাবেই সংকলিত হয়নি যা হাদীসের কিতাব নামে পরিচিত। সীরাতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এবং সীরাতের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলোতেও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। হাদীসের একটি বড় অংশ আমলে মুতাওয়ারাছের মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে।

ফিকহের ইমামগণ যখন নামাযের নিয়ম-কানূন ধারাবাহিকভাবে সংকলন করেছেন তখন তারা শুধু হাদীসের দু'চার কিতাবেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং হাদীস ও সুন্নাহর গোটা ভাণ্ডার তাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। এ জন্য তাঁরা ছিফাতুস সালাত বা নামাযের পদ্ধতি বিষয়ক ওইসব দিকও উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন যেগুলো শুধু 'হাদীসের কিতাব' থেকে কেউ বের করতে পারবে না। যেমন কওমাতে দুই হাত বাঁধা থাকবে না ছেড়ে দেওয়া হবে, রুকু-সিজদার তাসবীহাত, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দুআ আস্তে পড়া হবে না জোরে, মুকতাদী এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাওয়ার তাকবীর আস্তে বলবে না জোরে ইত্যাদি।

নামাযের বিভিন্ন কাজকর্মের ফিকহী বিধান যেমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ, সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা, আদব, মুস্তাহাব ইত্যাদির বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়নি, তেমনি নামাযে বর্জনীয় বিষয়াদি যেমন, মাকরূহে তাহরীমী, মাকরূহে তানযীহী বা নামায বিনষ্টকারী কাজকর্মও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে নেই।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি : হাদীস শরীফে এটা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআ পড়তে

বলেছেন, কিন্তু এদের মধ্যে কোনটা ফরয বা ওয়াজিব আর কোনটা সুন্নত বা মুস্তাহাব তার বিবরণ হাদীস শরীফে নেই।

কিংবা বলুন, নামাযের কাজকর্মের মধ্যে কোনটা পরিত্যাগ করলে নামায নষ্ট হয় এবং পুনরায় নামায আদায় করা ফরয বা ওয়াজিব হয় আর কোনটা ছেড়ে দিলে নামায বিনষ্ট হয় না তবে সওয়াব কমে যায়–এই বিষয়গুলো বিবরণ আকারে হাদীস শরীফে বলা হয়নি। অথচ সচেতন মুসল্লীদের অজানা নয় যে, নামাযীকে নামাযের কাজকর্মগুলোর শ্রেণী ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়াও অপরিহার্য। এ বিষয়গুলো হাদীস শরীফ থেকেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এত সহজ বিবরণ আকারে নেই যে, হাদীস শরীফের তরজমা পাঠ করলেই সব জানা যাবে। হাদীস শরীফ থেকে এই বিষয়গুলো আহরণ করার জন্য ইজতিহাদের যোগ্যতা এবং ফকীহ ও মুজতাহিদের অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের সারকথা এই যে, হাদীস শরীফ অধ্যয়নের পরও আমাদের ফিকহ ও ফুকাহার শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই সমাধানগুলো আমরা তাঁদের কাছেই পাই। যদি হাদীসের কোনো কোনো ভাষ্যগ্রন্থে কিংবা ফিকহুল হাদীসের আলোচনা সম্বলিত হাদীস শরীফের কোনো বিশদ গ্রন্থে এ বিষয়ক কিছু সমাধান পাওয়া যায়; তবে দেখা যাবে যে, এই গ্রন্থের সংকলকগণ তা ফিকহে ইসলামী ও ফকীহদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছেন। এজন্য ফিকহের প্রয়োজন আজও ঠিক তেমনি আছে যেমনি গতকাল ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে।

সামনের আলোচনা থেকে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

দশ

নামায প্রসঙ্গে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ খোলার অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে, অন্তত সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী এবং মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় যারা নামাযপ্রসঙ্গ অধ্যয়ন করেছেন অথবা শুধু যদি শরহু মাআনিল আছারেও (তহাবী শরীফ) নামাযের হাদীসসমূহ পড়ে থাকেন তাহলে তাদের জানতে বাকি থাকেনি যে, অনেক বিষয়েই হাদীস শরীফে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। অথচ হাদীসের উৎস হল ওহী আর ওহীর ইলমের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষায় স্ববিরোধিতা থাকা একেবারেই অসম্ভব। অতএব প্রকৃত বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

দেখা যায়, এক রেওয়ায়েতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও রাফয়ে

ইয়াদাইন না-করার কথা আছে, তো অপর রেওয়ায়েতে আরো দুই জায়গায় তা করার কথা এসেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে আরো অধিক স্থানে করার কথা।

কোথাও 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার কথা আছে, কোথাও আছে জোরে পড়ার কথা। কোথাও আমীন আস্তে বলার কথা আছে, আবার কোথাও জোরে পড়ার কথা। কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, ইমামের পেছনে ফাতেহা পড়া চাই অথচ অন্যান্য রেওয়ায়েতে এসেছে কিরাত (ফাতেহা ও সূরা) না পড়ার কথা?

কোনো হাদীসে তাশাহহুদের পাঠ এক রকম, অন্য হাদীসে অন্য রকম। তেমনি ছানা, তাসবীহাত, দরূদ ও দুআয়ে কুনূতেরও বিভিন্ন পাঠ রয়েছে। এ ধরনের আরো বহু বিরোধ ও বৈচিত্র।

তো প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল নন তারা কখনও কখনও দিশেহারা হয়ে পড়েন। আর এটাই স্বাভাবিক। তবে বিশেষজ্ঞরা জানেন যে, এখানে বাহ্যত যে বিরোধগুলো দেখা যাচ্ছে তা এজন্য সৃষ্টি হয়নি যে, –নাউযুবিল্লাহ– ওহীর শিক্ষাতেই কোনো বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। কিংবা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে স্ববিরোধী নির্দেশনা দিয়েছেন! না, কক্ষণও না। ওই বাহ্যিক বিরোধগুলোর প্রকৃত পরিচয় এই :

১. সুন্নাহর বিভিন্নতা। অর্থাৎ অনেক বিষয়ে একাধিক মাসনূন তরীকা রয়েছে। এই হাদীসে যে পন্থাটা এসেছে সেটাও মাসনূন এবং অন্য হাদীসে যা এসেছে তা-ও মাসনূন। যেমন ছানায় 'সুবহানাকা ...' পড়াও সুন্নাহ, আবার 'আল্লাহুম্মা ইন্নী ওয়াজজাহতু ...' পড়াও সুন্নাহ।

কুনূতে 'আল্লাহুম্মাহ্দিনী ...' পড়াও সুন্নাহ আবার 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ...' পড়াও সুন্নাহ।

কওমাতে 'রাব্বানা লাকাল হামদ'ও বলা যায়, 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ'ও বলা যায়, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ'ও বলা যায়; তেমনি নিম্নোক্ত দুআও পড়া যায়, সবগুলোই সুন্নাহ–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ، وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ: وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

২. বহু বিরোধ এমন রয়েছে যেখানে দুটো বিষয়ই হাদীস শরীফ কিংবা কোনো

শরয়ী দলীলের দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ দুটোরই উৎস সুন্নাহ, কিন্তু বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে কোনো ফকীহ তাদের একটিকে উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে করেন আর অন্যটিকে মনে করেন বৈধ ও অনুমোদিত। আবার অন্য ফকীহ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

এটাও মূলত 'সুন্নাহর বিভিন্নতা'রই অন্তর্ভুক্ত। রাফয়ে ইয়াদাইন, আমীন ইত্যাদি বিষয়গুলো এই শ্রেণীর।

৩. কিছু দৃষ্টান্ত এমনও রয়েছে যে, প্রথমে একটা বিষয় 'মাসনূন' বা 'মুবাহ' ছিল পরে তা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। এর স্থলে অন্য একটি পদ্ধতি প্রদান করা হয় আর প্রথম পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হয় বা সেটা 'মাসনূনে'র পর্যায় থেকে 'মুবাহ' বা 'বৈধতা'র পর্যায়ে নেমে আসে। পরিভাষায় একে 'নাসিখ-মানসূখ' বলে।

ইসলামের প্রথম যুগে নামাযে সালামের জবাব দেওয়া যেত। এটা বৈধ ছিল। তখন প্রয়োজনীয় কথা বলারও অবকাশ ছিল। কিন্তু পরে তা মানসূখ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تُكَلِّمُوْا فِي الصَّلَاةِ.

(সহীহ বুখারী, তাওহীদ, পরিচ্ছেদ ৪২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৯২০)

তেমনি একটা সময় পর্যন্ত রুকূতে দুই হাত একত্র করে দুই হাঁটুর মধ্যে রাখা ছিল মাসনূন পদ্ধতি। পরে দুই হাতের আঙ্গুল দ্বারা দুই হাঁটু ধরা মাসনূন সাব্যস্ত হয়। তবে প্রথম পদ্ধতি নাজায়েয করা হয়নি।

৪. কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একটি পদ্ধতি হল সুন্নাহ আর অন্যটি করা হয়েছিল ওজরবশত। কিন্তু কেউ কেউ একেও সুন্নাহ মনে করলেন। যেমন শেষ বৈঠকে বসার একটি মাসনূন পদ্ধতি রয়েছে যা কারো অজানা নয়। আরেকটি পদ্ধতি হল যেটা মহিলাদের জন্য মাসনূন। কোনো কোনো বর্ণনায় চারজানু হয়েও বসার কথা এসেছে। কিন্তু প্রাসঙ্গিক সকল হাদীস সামনে রাখলে এবং নামাযের পদ্ধতি প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ও ধারা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যায় যে, পুরুষের জন্য ওই প্রসিদ্ধ পদ্ধতিটাই মাসনূন তরীকা। অন্য পদ্ধতিগুলোও কখনো কখনো অনুসরণ করা হয়েছিল ওজরবশত কিংবা শুধু বৈধতা বোঝানোর জন্য।

৫. এমন কিছু উদাহরণও রয়েছে যেখানে মাসনূন তরীকা একটিই, বিভিন্ন হাদীসে যা উল্লেখিত হয়েছে। আর ভিন্ন পদ্ধতি যা কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় সেটা সহীহ হাদীস নয়, বর্ণনাকারীর ভ্রান্তি। কিন্তু কোনটা সহীহ হাদীস আর

কোনটা বর্ণনাকারীর ভুল এই সিদ্ধান্ত শুধু হাদীসবিশারদ ইমামগণই দিতে পারেন। তাঁরা যদি একমত হয়ে কোনো ফয়সালা প্রদান করেন তবে সেটাই নির্ধারিত। আর যেখানে তাদের মধ্যে মতভেদ হয় এবং অবশ্যই তা যুক্তিসংগত মতভেদ, সেখানে প্রাজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কোনো এক মত অবলম্বন করবেন। সাধারণ মানুষ অনুসরণ করবেন কোনো একজনের সিদ্ধান্ত।

এবার চিন্তা করুন, এই বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন করা যে, কোনটা সুন্নাহর বিভিন্নতা আর কোনটা উত্তম-অনুত্তমের পার্থক্য আর কোথায় সুন্নাহ বনাম ওজরের প্রসঙ্গ—এটা অবশ্যই দলীলের ভিত্তিতে হতে হবে। কিন্তু এই দলীল, আলামত ও লক্ষণগুলো এত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয় যে, যে কারো পক্ষে তা অনুধাবন করা এবং তার আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এটা এমন এক ক্ষেত্র যেখানে ইজতিহাদ ও ফিকহী প্রজ্ঞা অপরিহার্য। প্রথম থেকেই এই গুরু দায়িত্ব উম্মাহর ফকীহ ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের উপরই ন্যস্ত ছিল এবং এটা ফিকহে ইসলামীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ। আর যেহেতু এই ক্ষেত্রগুলো ইজতিহাদ-নির্ভর তাই এখানে দ্বিমত সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

৬. অনেক বিষয়ে মতভেদ শুধু এজন্য হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা কোনো একটি ব্যাখ্যাকে শুধু অগ্রগণ্যই বলা যায়, এই ব্যাখ্যাটাই সুনিশ্চিত আর অন্যটা ভুল—এটা বলা যায় না। এ ধরনের ক্ষেত্রেও কিতাব ও সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ ফুকাহায়ে উম্মাহর (আইম্মায়ে মুজতাহিদীন) মাঝে মতভেদ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কোনো কোনো 'নুসূসে শরইয়্যাহ'-এ (দলীলের পাঠ, আয়াত হোক বা হাদীস) একাধিক ব্যাখ্যার যে অবকাশ থাকে সেটা কখনও লুগাত বা ভাষাগত কারণে হয়। অর্থাৎ আরবী ভাষাতেই সে শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ রয়েছে। কখনও এজন্যও হয় যে, আলোচ্য বিষয়ে এই 'নস' ছাড়াও অন্যান্য দলীল ও 'নস' বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো সামনে রাখা হলে দেখা যায়, প্রথমে ওই নসের যে অর্থ বোঝা যাচ্ছিল তা আর নিশ্চিত থাকছে না। অন্য ব্যাখ্যারও অবকাশ সৃষ্টি হচ্ছে।

এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন লক্ষণ ও আলামতের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোন ব্যাখ্যাটা অধিক উপযোগী বা অধিক সামঞ্জস্যশীল। বলাবাহুল্য, যখন লক্ষণ বিভিন্ন হবে তো নসের ব্যাখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এ ধরনের মতভেদের দৃষ্টান্ত নবীযুগেও বিদ্যমান ছিল। এখানে এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ ঘটনাটি উল্লেখ করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দকের যুদ্ধে)-এর মতো কঠিন গযওয়া থেকে ফিরে আসলেন এবং হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন। ইতিমধ্যে হযরত জিব্রীল (আ.) এসে বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! আমরা তো এখনও পর্যন্ত অস্ত্র ছাড়িনি। জলদি চলুন। এটাই আল্লাহর আদেশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন দিকে যাব? জিব্রীল (আ.) বনু কুরাইযার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওই দিকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে বের হলেন এবং হযরত বিলাল (রা.)-কে ঘোষণা দিতে বললেন–

مَنْ كَانَ سَامِعًا مُّطِيعًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ إِلاَّ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ.

"যে রাসূলুল্লাহর বাধ্য ও অনুগত সে যেন বনু কুরাইযায় গিয়েই আছরের নামায পড়ে।"

ঘোষণা শোনামাত্র সবাই অস্ত্র হাতে রওনা হয়ে গেলেন। অনেকেই সময়মতো পৌছে গেলেন। আর কিছু সাহাবী রাস্তায় ছিলেন। এদিকে আছরের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এঁদের মধ্যে মতভেদ হল যে, নামায কোথায় পড়া হবে। কিছু সাহাবী বললেন, আমরা সেখানেই নামায পড়ব যেখানে পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন। অন্যরা বললেন, রাসূলুল্লাহর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আমরা নামায কাযা করি। শেষে কিছু সাহাবী পথিমধ্যেই নামায পড়ে রওনা হলেন, অন্যরা বনু কুরাইযায় পৌছে নামায পড়লেন। তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালন করেছি। অতএব আমাদের কোনো অপরাধ নেই। বর্ণনাকারী বলেন–

فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا، وَتَرَكَتْ طَائِفَةٌ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا

অর্থাৎ যারা পথিমধ্যে নামায পড়েছেন তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানের কারণে সওয়াবের আশায় নামায পড়েছেন আর যারা কাযা করেছেন তারাও রাসূলুল্লাহর আদেশের উপর ঈমান ও সওয়াবের আশায় কাযা করেছেন।

পরিশেষে এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থাপিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেই ভর্ৎসনা করলেন না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস ৪১১৯; সহীহ মুসলিম কিতাবুল জিহাদ, হাদীস ১৭৭০; সীরাতে ইবনে হিশাম খ. ৬, পৃ. ২৮২, ২৮৪; দালাইলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী খ. ৪, পৃ. ৬-৭; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী খ. ১৯, পৃ. ৮০)

এই মতভেদ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের অর্থ নির্ধারণ নিয়ে হয়েছিল এবং প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল নবীজীর আনুগত্য ও আদেশ পালন তাই কোনো দলকেই তিরস্কার করা হয়নি।

ইবনুল কাইয়েম (রহ.) 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যে, বাস্তবে কাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, যারা নামায কাযা করেননি তাদের সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক। তারা দুই সওয়াবের অধিকারী। আর অন্যরাও যেহেতু 'নস'-এর বাহ্যিক অর্থ অনুসরণ করেছেন এবং তাদেরও লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহর আনুগত্যই তাই তারা 'মাযূর' এবং এক সওয়াবের অধিকারী। (যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খ. ৩, পৃ. ১১৮-১১৯; হাদয়ুহূ ফিল আমান)

আমি যে বিষয়টি আরজ করতে চেয়েছিলাম তা এই যে, 'শরয়ী নস'-এর অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও সাহাবা-যুগেও মতভেদ হয়েছে এবং যেহেতু তা যুক্তিসংগত ছিল তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো উপরই আপত্তি করেননি।

আমাদের আলোচনা নামাযের নিয়ম সম্পর্কে। এজন্য এ বিষয়েরই আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

এই হাদীসের শাব্দিক তরজমা হল 'ফাতেহা ছাড়া কোনো নামায নেই।' নামাযের কিরাত প্রসঙ্গে যদি এটিই একমাত্র হাদীস হত এবং এ বিষয়ে অন্য কোনো হাদীস বা শরীয়তের অন্য কোনো দলীল না থাকত তাহলে একথা বলা ছাড়া উপায় থাকত না যে, নামাযে ইমাম ও মুনফারিদের মতো মুক্তাদীরও ফাতেহা পড়া অপরিহার্য। কিন্তু যখন এই হাদীসের সাথে কুরআন মজীদের এই আয়াতও সামনে থাকবে–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

এবং ওই হাদীসগুলোও সামনে থাকবে যেগুলোতে বলা হয়েছে–

وإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قُولُوا: آمِينَ. مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

এবং ওইসব হাদীসও থাকবে যেগুলোতে আস্তে কিরাতের নামাযেও ইমামের

পেছনে কিরাত পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তখন কি দ্বিধাহীনভাবে বলা যাবে যে, মুকতাদীর জন্যও ফাতেহা পড়া অপরিহার্য? আর এটাই এই হাদীসের বিধান? বরং উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের কারণে বলা হবে যে, প্রথম হাদীস দ্বারা নামাযে ফাতেহা পাঠ জরুরি প্রমাণিত হয়। তবে অন্যান্য হাদীস থেকেই জানা যাচ্ছে যে, ইমামের ফাতেহা পাঠই মুকতাদীর ফাতেহা পাঠ। অতএব সে আলাদা করে ফাতেহা পড়বে না; বরং নিশ্চুপ থাকার ও শ্রবণ করার আদেশ পালন করবে।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে প্রতি যুগের বিপুল সংখ্যক ফকীহ উপরোক্ত হাদীসের এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। মুকতাদীর জন্যও ফাতেহা পাঠ অপরিহার্য হওয়াকে তারা উপরোক্ত হাদীসের সাথে প্রাসঙ্গিক মনে করেননি। অন্যদিকে অনেক ফকীহর মত এই ছিল যে, আস্তে কিরাতের নামাযে মুকতাদী ফাতেহা পড়বে, জোরে কিরাতের নামাযে পড়বে না। কেউ কেউ মনে করতেন, মুকতাদী জোরে কিরাতের নামাযেও ফাতেহা পড়বে। বলাবাহুল্য যে, এ বিষয়ের সকল দলীল এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় সামনে রাখা হলে এই ব্যাখ্যাগুলোকেও নিশ্চিতভাবে ভুল বলা কঠিন।

কথা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, নামায বা শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ে যেসব ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে বাহ্যত বিরোধ দেখা যায় সেখানে ওই বিরোধের ধরন ও তাৎপর্য নির্ণয় করা ছাড়া হাদীসের নির্দেশনার উপর আমল করা মোটেই সম্ভব নয়। এবার বলুন, এই বিষয়ে সমাধান কারা দিতে পারেন? কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা ফিকহে ইসলামী ও ফুকাহায়ে উম্মতেরই কাজ। এজন্য সর্বযুগেই হাদীসের সাথে ফিকহও দ্বীনের খাদেম হিসাবে বিদ্যমান ছিল, আছে এবং থাকবে। আর ওয়ারিসে নবীর কাতারে যখন থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ছিলেন ঠিক তখন থেকেই ফুকাহায়ে কেরামও ছিলেন।

প্রসঙ্গত, শরীয়তের রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা নেই তারা মতভেদ শব্দটি শোনামাত্রই ভ্রূকুঞ্চিত করেন এবং কিছুটা যেন বিব্রত হয়ে পড়েন, বিশেষত নামাযের মতো মৌলিক ইবাদতের বিষয়ে মতভেদ, যা ঈমানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় রোকন, তাদের পক্ষে একেবারেই যেন অসহনীয়!

তাদের জানা থাকা উচিত যে, মতভেদমাত্রই পরিত্যাজ্য নয়। কেননা কিছু মতভেদ আছে, যার প্রেরণা দলীলের অনুসরণ। স্বয়ং দলীলই ওই মতভেদের উৎস। আর কিছু মতভেদ আছে যা সৃষ্টি হয় মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে। দলীল সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা দলীলের শাসন মানতে অস্বীকৃতিই এই মতভেদের উৎস। প্রথম মতভেদ শরীয়তে স্বীকৃত আর দ্বিতীয়টা নিন্দিত। বিষয়গত দিক থেকে

ঈমানিয়াত ও আকাইদ অর্থাৎ ইসলামের সকল মৌলিক আকীদা এবং শরীয়তের সকল অকাট্য মাসআলা ওই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে দলীলভিত্তিক কোনো ইখতিলাফ-মতভেদ হতেই পারে না। এজন্য দেখবেন, এসব বিষয়ে আইম্মায়ে দ্বীনের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। এক্ষেত্রে কেউ মতভেদ করলে তা অবশ্যই হঠকারিতা। আর ওই মতভেদকারী হয় মুবতাদি (বেদআতী) কিংবা মুলহিদ (বেদ্বীন)। কিন্তু ফুরূয়ী মাসায়েল, এতেও শ্রেণীভেদ রয়েছে, এর ধরনটা ভিন্ন। এখানে দলীলভিত্তিক মতভেদ হতে পারে এবং হয়েছে। শরীয়তে এটা স্বীকৃত এবং শরীয়তই একে বহাল রেখেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং সাহাবা ও তাবেয়ীন যুগেও এটা ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এই মতভেদের বিষয়ে শরীয়তের বিধান হল তা বিলুপ্ত করার চেষ্টা ভুল এবং একে বিবাদ-বিসংবাদের মাধ্যম বানানো অপরাধ। দলীলভিত্তিক মতভেদ স্বীকৃত; বরং নন্দিত, কিন্তু বিবাদ-বিসংবাদ হারাম ও নিষিদ্ধ।

এই শ্রেণীর ফুরূয়ী ইখতিলাফ (শাখাগত বিষয়ে মতভেদ) প্রকৃতপক্ষে গন্তব্যে পৌঁছার একাধিক পথ। সিরাতে মুস্তাকীমেরই বিভিন্ন পথরেখা। এগুলোর কোনোটাকেই প্রত্যাখ্যান করা কিংবা অনুসরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এটা ইলাহী নীতির বিরোধী, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবান মুবারকে উচ্চারিত হয়েছে– كِلَاهُمَا حَسَنٌ فَاقْرَءَا

'দুজনই সঠিক, অতএব পড়তে থাক।' (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৬২)

তেমনি তাঁর কর্ম দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে– فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ

'অতপর কোনো দলকেই তিনি ভর্ৎসনা করলেন না।' এ ধরনের কথা আরো বহু দলীলে উল্লেখিত হয়েছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, এই মতভেদ বিদ্যমান রাখার তাৎপর্য কী, তাহলে এর সুনিশ্চিত ও বিস্তারিত উত্তর তো আখেরাতেই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জানা যেতে পারে। কেন তিনি দ্বীনের সকল বিষয় এক পর্যায়ের দলীল قطعي الثبوت وقطعي الدلالة-এর মাধ্যমে দিলেন না, অভিন্ন গন্তব্যের জন্য বিভিন্ন পথ কেন নির্দেশ করলেন, সিরাতে মুস্তাকীমে বিচিত্র পথ-রেখার সমাবেশ কেন তিনি ঘটালেন? তিনি কি ইচ্ছা করলে সিরাতে মুস্তাকীমের একটিমাত্র ধারাই জারি করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু এখানে রয়েছে প্রজ্ঞার অতল গভীরতা, যার সবটা জেনে ফেলার আকাঙ্ক্ষাই হাস্যকর। তবে যতটুকু তিনি

বান্দার সামনে প্রকাশ করেছেন তা-ও প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট। যারা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক তারা 'আসবাবুল ইখতিলাফ' ও 'আদাবুল ইখতিলাফ' বিষয়ে বিশদ ও গ্রহণযোগ্য কিতাবপত্র অধ্যয়ন করতে পারেন।

মনে রাখা দরকার, যে মতভেদের ভিত্তি দলীলের উপর নয়; বরং মূর্খতা, হঠকারিতা এবং ধারণা ও সংশয়ের উপর, তা আপাদমস্তক নিন্দিত। দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি এবং অকাট্য ও ইজমায়ী মাসআলাগুলোতে দ্বিমত প্রকাশ এই নিন্দিত মতভেদেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এটা 'মতভেদ' নয়, 'দলীলের বিরোধিতা'। এই বিরোধী ব্যক্তি সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত। তার গন্তব্য আর ন্যায়নিষ্ঠ মুমিনের গন্তব্য এক নয়। সে তো এক ভিন্ন লক্ষ্যের অভিযাত্রী, যার পরিচয় হল- من شذ شذ في النار

বলাবাহুল্য, সিরাতে মুস্তাকীমের অন্তর্গত বিভিন্ন পথ এবং সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন পথের হুকুম এক নয়। প্রথম ক্ষেত্রে পথরেখা বাহ্যত বিভিন্ন হলেও প্রকৃত পক্ষে তা একই পথের অন্তর্গত। আর লক্ষ্য ও মঞ্জিল যে অভিন্ন তা তো বলাই বাহুল্য। আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে পথও ভিন্ন লক্ষ্যও ভিন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে পথগুলো নিরাপদ ও স্বীকৃত আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিপদসঙ্কুল ও পরিত্যক্ত।

এগার

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামাযের পদ্ধতিগত কিছু বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকেই বিভিন্নতা ছিল। এটা খাইরুল কুরূনেও ছিল এবং পরের যুগগুলোতেও তার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। এর কারণ সম্পর্কেও ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে উম্মতের করণীয় কী তা শরীয়তের দলীলের আলোকে ফিকহে ইসলামীতে নির্দেশিত হয়েছে। হাদীস মোতাবেক নামায পড়ার জন্য ওই নির্দেশনা গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই।

এ ধরনের বিষয়ে উম্মাহর যে নীতি 'খাইরুল কুরূন' তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন-এর যুগ থেকে অনুসৃত তা সংক্ষেপে এই :

১. যে অঞ্চলে যে সুন্নাহ প্রচলিত সেখানে তা-ই চলতে দেওয়া উচিত। এর উপর আপত্তি করা ভুল। কেননা আপত্তি ওই বিষয়ে করা হয়, যা বেদআত বা সুন্নাহর পরিপন্থী। কিন্তু এক সুন্নাহর উপর এজন্য আপত্তি করা যায় না যে, এটা আরেক সুন্নাহ মোতাবেক নয়।

এ প্রসঙ্গে ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি একবার রুকূ ইত্যাদিতে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করতে আরম্ভ করেছিলেন। অথচ সে সময় গোটা ভারতবর্ষের সর্বত্র (ক্ষুদ্র কিছু অঞ্চল ব্যতিক্রম ছিল, যেখানে ফিকহে শাফেয়ী অনুযায়ী আমল হত) নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার সুন্নতটি প্রচলিত ছিল। শাহ শহীদ (রহ.)-এর বক্তব্য এই ছিল যে, মৃত সুন্নত জীবিত করার সওয়াব অনেক বেশি। হাদীস শরীফে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে–

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيْدٍ

"উম্মতের ফাসাদের মুহূর্তে যে আমার সুন্নাহকে ধারণ করে সে একশ শহীদের মর্যাদা পাবে।"

তখন তাঁর চাচা হযরত মাওলানা আবদুল কাদের দেহলভী (রহ.) (শাহ ওলীউল্লাহ রহ.-এর পুত্র, তাফসীরে মূযিহুল কুরআন-এর রচয়িতা) তাঁর এই ধারণা সংশোধন করে দেন। তিনি বলেন, "মৃত সুন্নাহকে জীবিত করার ফযীলত যে হাদীসে এসেছে সেখানে বলা হয়েছে যে, উম্মাহর ফাসাদের যুগে যে ব্যক্তি সুন্নাহকে ধারণ করে তার জন্য এই ফযীলত। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কোনো বিষয়ে যদি দুটো পদ্ধতি থাকে এবং দুটোই মাসনূন (সুন্নাহভিত্তিক) হয় তাহলে এদের কোনো একটিকেও 'ফাসাদ' বলা যায় না। সুন্নাহর বিপরীতে শিরক ও বিদআত হল ফাসাদ, কিন্তু দ্বিতীয় সুন্নাহ কখনও ফাসাদ নয়। কেননা, দুটোই সুন্নাহ। অতএব রাফয়ে ইয়াদাইন না-করাও যখন সুন্নাহ, তো কোথাও এ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল হতে থাকলে সেখানে রাফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নাহ 'জীবিত' করে উপরোক্ত সওয়াবের আশা করা ভুল। এটা ওই হাদীসের ভুল প্রয়োগ। কেননা এতে পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় সুন্নাহকে ফাসাদ বলা হয়, যা কোনো মতেই সঠিক নয়।"

এই ঘটনাটি আমি বিশদ করে বললাম। মূল ঘটনা মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত খ. ১, পৃ. ৫৪০-৫৪১, মালফুয ১১১২ ও খ. ৪, পৃ. ৫৩৫, মালফুয ১০৫৬ এবং মাজালিসে হাকীমুল উম্মত পৃ. ৬৭-৬৯তে উল্লেখিত হয়েছে।

সারকথা এই যে, সালাফে সালেহীন বিদআত থেকে দূরে থাকতেন এবং বিদআতের বিরোধিতা করতেন। আর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতেন এবং সুন্নাহকে জীবিত করতেন। কিন্তু কখনও তাদের নীতি 'ইবতালুস সুন্নাহ বিসসুন্নাহ' বা 'ইবতালুস সুন্নাহ বিলহাদীস' ছিল না। অর্থাৎ তারা এক সুন্নাহকে অন্য সুন্নাহর মোকাবেলায় দাঁড় করাতেন না। তেমনি 'সুন্নতে মুতাওয়ারাছা' দ্বারা প্রমাণিত

আমলের বিপরীতে রেওয়ায়েত পেশ করে তাকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করতেন না। এক সুন্নাহর সমর্থনে অন্য সুন্নাহকে খণ্ডন করা আর এটাকে 'মুর্দা সুন্নত জিন্দা করা' বলে অভিহিত করা তাঁদের নীতি ছিল না। এটা একটা ভুল নীতি, যা খাইরুল কুরূনের শত শত বছর পরে জন্মলাভ করেছে।

২. যেসব মাসআলার ভিত্তি হল ইজতিহাদ কিংবা দলীলে নকলী বিদ্যমান থাকলেও তা থেকে বিধান আহরণের জন্য ইজতিহাদের প্রয়োজন সেগুলোকে 'মুজতাহাদ ফীহ' বিষয় বলে। এ ধরনের বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এজন্য যেসব 'মুজতাহাদ ফীহ' বিষয়ে জায়েয না-জায়েযের মতভেদ হয়েছে সেখানেও এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে যে, এগুলো 'নাহি আনিল মুনকার'-এর বিষয় নয়। অর্থাৎ যেভাবে কোনো মুনকার বা গর্হিত বিষয়ের প্রতিবাদ করা হয় এবং তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয় তা এই ধরনের মাসআলায় করা যাবে না। এক মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদের উপর কিংবা অন্য মুজতাহিদের অনুসারীর উপর আপত্তি করবেন না। 'মুজতাহাদ ফীহ' মাসায়েল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে, মতবিনিময় হতে পারে, কিন্তু একে বিভেদ-বিভক্তির বিষয় বানানো যাবে না। তেমনি এর ভিত্তিতে কাউকে গোমরাহ বলা, ফাসিক বা বিদআতী আখ্যা দেওয়াও বৈধ নয়। সাহাবা-তাবেয়ীন যুগ অর্থাৎ খাইরুল কুরূন থেকেই এই নীতি অনুসৃত হয়েছে এবং এতে কারো কোনো দ্বিমত ছিল না। তো জায়েয-নাজায়েযের বিতর্ক যেসব মাসআলায় তাতেই যদি নীতি এই হয় তাহলে যেখানে শুধু উত্তম-অনুত্তমের প্রশ্ন, তার বিধান কী হবে? বালাবাহুল্য যে, এ ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিদ্বেষ ছড়ানো, বিভক্তি সৃষ্টি করা, একে অন্যকে ফাসেক, গোমরাহ, বেদআতী আখ্যা দেওয়া ইত্যাদির কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই। তেমনি এ কারণে একজন অন্যজনকে হাদীস-বিরোধী বা সুন্নাহ-বিরোধী বলারও কোনো সুযোগ নেই।

স্বয়ং আইম্মায়ে হাদীস এই ইখতিলাফকে 'ইখতিলাফুল মুবাহ' বা 'ইখতিলাফু তাআদ্দুদিস সুন্নাহ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ এমন কিছু পদ্ধতি যেখানে প্রত্যেক পদ্ধতিই 'মুবাহ' অথবা 'মাসনূন'। তাহলে এখানে গোমরাহ বলা, ফাসেক বলা কিংবা হাদীস বিরোধিতার অভিযোগ দায়ের করার কী অর্থ?

আজকাল রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে ওঠার সময় এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা নিয়ে, আমীন জোরে বা আস্তে বলা নিয়ে এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় নিয়ে কোনো কোনো মহলে কত যে ঝগড়া-বিবাদ, চ্যালেঞ্জবাজি, লিফলেটবাজি হতে থাকে তার হিসাব কে রাখে? অথচ এই সব

মাসআলায় যে মতভেদ তা হল সুন্নাহর বিভিন্নতা, যেখানে ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্নই অবান্তর।

শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.) হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু রাফয়ে ইয়াদাইনকে 'আহাব্বু ইলাইয়া' (আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়) বলেছেন এবং তার কিছু হেকমতও বয়ান করেছেন। এরপরও লিখেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রাফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, কখনও করেননি। উভয় পদ্ধতিই সুন্নাহ এবং সাহাবা, তাবেয়ীন ও পরবর্তীদের মধ্যে উভয় পদ্ধতিরই অনুসারী ছিলেন। এটা ওই সব মাসআলার অন্যতম যাতে আহলে মাদীনা (মদীনার ফকীহবৃন্দ) ও আহলে কূফা (কূফার ফকীহবৃন্দ)-এর মধ্যে মতভেদ হয়েছে। আর প্রত্যেকের কাছেই রয়েছে শক্তিশালী দলীল। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা খ. ২, পৃ. ১০)

অন্যদিকে শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)-এর আগের ও পরের অসংখ্য মুহাক্কিক-গবেষক রাফয়ে ইয়াদাইন না-করাকে উত্তম বলেছেন। (আমরাও দলীলের বিচারে এ কথাই বলে থাকি) কিন্তু এই পর্যন্তই। একে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ কেউ করেননি। সকলেই শাহ ওলীউল্লাহর মতো একে সুন্নাহর বিভিন্নতা বলেই মনে করেছেন।

ইবনুল কাইয়েম (রহ., ৭৫১ হি.) 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে ফজরের নামাযে কুনূত পড়া-প্রসঙ্গে পরিষ্কার লেখেন–

وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه فاعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع.

"এটা ওইসব ইখতিলাফের অন্তর্ভুক্ত যাতে কোনো পক্ষই নিন্দা ও ভর্ৎসনার পাত্র নন। এটা তেমনই যেমন নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না-করা, তেমনি 'আত্তাহিয়্যাতু'র বিভিন্ন পাঠ, আযান-ইকামতের বিভিন্ন ধরন, হজ্বের বিভিন্ন প্রকার–ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু বিষয়ে ইখতিলাফের মতোই।"

শায়খ ইবনে তাইমিয়া (রহ. ৭২৮ হি.) লেখেন, "এ বিষয়ে আমাদের নীতি–আর এটাই বিশুদ্ধতম নীতি– এই যে, ইবাদতের পদ্ধতিগত বিষয়ে (যেসব ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে তাতে) যে পদ্ধতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য 'আছর' রয়েছে তা মাকরূহ হবে না; বরং তা হবে শরীয়তসম্মত। সালাতুল খওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানের দুই নিয়ম–তারজী'যুক্ত বা তারজী'বিহীন; ইকামতের দুই নিয়ম–বাক্যগুলো দুইবার করে বলা বা একবার করে; তাশাহহুদ, ছানা, আউযু-এর বিভিন্ন

পাঠ, কুরআনের বিভিন্ন কিরাআত, এ সবগুলো এই নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। এভাবে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরসংখ্যা (ছয় তাকবীর বা বারো তাকবীর) জানাযার নামাযের বিভিন্ন নিয়ম, সাহু সিজদার বিভিন্ন নিয়ম, কুনূত রুকূর পরে না আগে, রাব্বানা লাকাল হামদ 'ওয়া'সহ অথবা 'ওয়া' ছাড়া–এই সবগুলোই শরীয়তসম্মত। কোনো পদ্ধতি উত্তম হতে পারে; কিন্তু অন্যটি মাকরূহ কখনও নয়।" (মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৪/২৪২/২৪৩; আরো দেখুন, আলফাতাওয়াল কুবরা ১/১৪০)

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) 'মাজমূউল ফাতাওয়া'এর বিভিন্ন স্থানে এবং 'ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম' গ্রন্থে আরো বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কার লেখেন, "ইখতিলাফে তানাউউ (অর্থাৎ পদ্ধতিগত বিভিন্নতা)-এর ক্ষেত্রসমূহে যে যেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে চায় (এই জন্য যে, তার শহরে এই পদ্ধতিটাই প্রচলিত বা তার মাশায়েখ এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন অথবা তার দৃষ্টিতে ওই পদ্ধতিটাই উত্তম) সে তা করতে পারে। এখানে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। নিজে যে পন্থা ইচ্ছা অবলম্বন করুক কিন্তু অন্যের অনুসৃত পদ্ধতিকে (যা শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত) প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নেই; বরং এটা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়ে শায়খ ইবনে তাইমিয়ার বিভিন্ন পুস্তিকা ও ফতোয়ার সংকলন 'রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর সম্পাদনায় তা বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। রিসালাটি অবশ্যই পড়ার মতো।

রাফয়ে ইয়াদাইন, আমীন ইত্যাদি বিষয়ের ইখতিলাফ যে 'মুবাহ' বা 'সুন্নাহ'র বিভিন্নতা, তা শুধু উপরোক্ত ব্যক্তিদেরই কথা নয়, চার মাযহাবের বড় বড় ফকীহ অনেক আগেই তা বলেছেন। ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী (মৃ. ৩৭০ হি.) আহকামুল কুরআনে (খ. ১, পৃ. ২০৩-২০৪) এ কথাই লিখেছেন। ইমাম ইবনে আবদুল বার মালেকী 'আততামহীদ' ও 'আলইসতিযকার' দুই গ্রন্থেই এ কথা বলেছেন। তিনি রাফয়ে ইয়াদাইন-এর আলোচনায় আহমদ ইবনে খালিদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, 'আমাদের আলেমদের মধ্যে কেউ রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন আর কেউ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। তবে তারা একে অন্যের নিন্দা করতেন না।

فما عاب هؤلاء هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء.

তিনি তার উস্তাদ আবু উমার আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে,

তিনি বলতেন, আমাদের উস্তাদ আবু ইবরাহীম ইসহাক সকল ওঠা-নামায় হাত তুলতেন। ইবনে আবদুল বার উস্তাদজীকে বললেন, 'তাহলে আপনি কেন রাফয়ে ইয়াদাইন করেন না, তাহলে আমরাও আপনার অনুসরণে রাফয়ে ইয়াদাইন করতাম?' তিনি বললেন, ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাফয়ে ইয়াদাইন শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হবে। আমাদের অঞ্চলে এই রেওয়ায়েত মোতাবেকই আমল হয়ে থাকে। আর মুবাহ বিষয়ে (অর্থাৎ যেখানে দুটো পদ্ধতিই বৈধ ও মুবাহ, যদিও কারো দৃষ্টিতে একটির তুলনায় অন্যটি উত্তম হতে পারে) সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পথ পরিহার করা আইম্মায়ে সালাফের নীতি ছিল না।

ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليست من شيم الأئمة.

(আততামহীদ খ. ৯, পৃ. ২২৩; আলইসতিযকার খ. ৪, পৃ. ১০২)

ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) আততামহীদের শুরুতে এক ভিন্ন প্রসঙ্গে এই মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কর্তব্য হল তাদের পূর্বসূরীদের তরীকা অনুসরণ করা। ভালো কাজের যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছিলেন তাই অনুসরণ করা উচিত, যদিও অন্য কোনো মুবাহ পন্থা অধিক পছন্দনীয় বোধ হয়।

فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير، وسلوك منهاجهم فيما احتملوه عليه من البر، وإن كان غيره مباحا مرغوبا فيه.

(আততামহীদ খ. ১, পৃ. ১০)

এই মনীষীগণ দলীলভিত্তিক ফুরূয়ী ইখতিলাফ বিশেষত 'ইখতিলাফুল মুবাহ'-এর ক্ষেত্রে যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন এটা তাদের ব্যক্তিগত মত নয়; বরং শরীয়তের দলীল ও ইজমায়ে সালাফের দ্বারা প্রমাণিত। শায়খ ওলীউল্লাহ (রহ.) ও শায়খ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এ বিষয়ে প্রমাণিক আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক তাদের উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে তা পড়ে নিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা-কৃত 'আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ দ্বীন' এবং ত্বহা জাবির-কৃত 'আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলাম' অত্যন্ত চমৎকার ও প্রামাণিক গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থের শুরুতে শায়খ উমর উবাইদ হাসানা-র ভূমিকাটি বিশেষভাবে অধ্যয়নযোগ্য।

আমি পাঠকবৃন্দকে শুধু একটি বিষয়ে চিন্তা করতে বলব। আজকাল

উপমহাদেশের অনেক অঞ্চলে এবং অনেক মসজিদে (আল্লাহ মাফ করুন) যে হৈ-হাঙ্গামা হচ্ছে, বিশেষ কিছু ফুরূয়ী মাসআলাকে কেন্দ্র করে চ্যালেঞ্জবাজি, লিফলেটবাজি এবং নির্বোধ-পথভ্রষ্ট ইত্যাদি কটুবাক্য ব্যবহারের রীতি যারা আরম্ভ করেছেন তাদের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত যে, এই সব মতভেদ তো সাহাবা-তাবেয়ীন আমলেও ছিল, কিন্তু তাই বলে (নাউযুবিল্লাহ) এইসব চ্যালেঞ্জবাজি ও ফের্কাবাজি তো দূরের কথা, নিন্দা-সমালোচনাও কখনও হয়নি। আমাদের এই বন্ধুরা যদি একটু চিন্তা করতেন যে, নামাযের একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা যে একেই নবী-নামায ও হাদীসের নামায বলে আখ্যায়িত করছেন আর অন্য সব পন্থাকে হাদীস-সুন্নাহর বিরোধী সাব্যস্ত করছেন, এমনকি তাদের কট্টরপন্থী লোকেরা তো অন্য নামাযকে একেবারে বাতিলই বলে থাকে–তাহলে কি খোলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশশারা ও অন্যান্য সাহাবীদের নামাযও সুন্নাহবিরোধী ছিল? প্রশ্নটি এজন্য আসে যে, আমাদের এ সকল বন্ধুরা নামাযের যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে এঁদের কারো নামাযের সাথেই কিন্তু মিল নেই। তাহলে কি প্রকারান্তরে উপরোক্ত সাহাবীদের নামাযকেও খেলাফে সুন্নত বলা হচ্ছে না?

কয়েক বছর আগের ঘটনা। তখনও শায়খ আলবানী মরহুমের কিতাব 'ছিফাতুস সালাহ' পুরো নাম-صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها-এর বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়নি। আমার কাছে একজন জেনারেল শিক্ষিত ভাই এসেছিলেন, যাকে বোঝানো হয়েছিল কিংবা তাদের বোঝানোর দ্বারা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, এই দেশের অধিকাংশ মুসলমান যে পদ্ধতিতে নামায পড়ে তা হাদীস মোতাবেক হয় না। তিনি আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের সাথে 'সুসংবাদ' দিলেন যে, আলবানী মরহুমের কিতাব বাংলায় অনূদিত হয়েছে! শীঘ্রই তা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে! জিজ্ঞাসা করলেন, এ কিতাব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা আছে কি না! জানা নেই, তিনি মাসআলা জানার জন্য এসেছিলেন না 'হেদায়েত' করার জন্য এসেছিলেন। আমি শুধু এটুকু আরজ করেছিলাম যে, আপনি আপনার শিক্ষকদের কাছ থেকে তিন-চারজন সাহাবীর নাম নিয়ে আসুন যাদের নামায শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলবানী মরহুমের কিতাবে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী ছিল! তিনি ওয়াদা করে গিয়েছিলেন, কিন্তু সাত-আট বছর অতিবাহিত হল আজও তাঁর দেখা পাইনি!

একটু চিন্তা করুন। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযের অন্য কিছু তাকবীরের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদাইন করা যদি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং অন্য কিছু

সাহাবীর আমল হয়ে থাকে তাহলে রাফয়ে ইয়াদাইন না-করা হল তাঁর পিতা খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আমল। তেমনি চতুর্থ খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) ও প্রবীণ সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবীদের এক জামাত এই নিয়মেই নামায পড়েছেন। তো এদের মধ্যে কার নামাযকে আপনি খেলাফে সুন্নত বলবেন?

আমাদের যে বন্ধুরা শুধু রাফয়ে ইয়াদাইনকেই সুন্নত মনে করেন এবং রাফয়ে ইয়াদাইন না-করাকে ভিত্তিহীন বা খেলাফে সুন্নত মনে করেন তারা ফাতেহা পাঠ সম্পর্কে বলে থাকেন যে, ইমামের পেছনে জোরে ও আস্তে সব কিরাতের নামাযে মুকতাদীর জন্য ফাতেহা পড়া ফরয, না পড়লে নামায হবে না। কোনো কোনো কট্টর লোক তো এমনও বলে যে, ফাতেহা ছাড়া যেহেতু নামায হয় না তো যারা ইমামের পেছনে ফাতেহা পড়ে না তারা সব যেন বে-নামাযী। আর বে-নামাযী হল কাফের!! (নাউযুবিল্লাহ)

আমাদের এই বন্ধুরা যদি চিন্তা করতেন যে, যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)এর হাদীস মোতাবেক তারা রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকেন তিনিও তো ইমামের পেছনে কুরআন (সেটা ফাতেহা হোক বা ফাতেহার সাথে কিরাত) পড়তেন না। মুয়াত্তায় সহীহ সনদে এসেছে, তিনি বলেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ

"যখন তোমাদের কেউ ইমামের পেছনে নামায পড়ে তখন ইমামের কিরাতই তার জন্য যথেষ্ট। আর যখন একা পড়ে তখন সে যেন (কুরআন) পড়ে।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ নাফে (রহ.) তাঁর এই ইরশাদ বর্ণনা করে বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইমামের পেছনে পড়তেন না।' –মুয়াত্তা পৃ. ৮৬

ওই বন্ধুদের 'নীতি' অনুযায়ী তো আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এরও নামায হত না! আর যখন তাঁর নামায হত না তাহলে রাফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ে কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যাবে কি? কেননা (তাদের কথা অনুযায়ী আল্লাহ মাফ করুন) বেনামাযীর হাদীস কীভাবে গ্রহণ করা যাবে!

অথচ শরীয়তের দলীল দ্বারা ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁর হাদীস অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তাহলে এটা কি প্রমাণ করে না যে, এ ধরনের বিষয়ে কারো নিন্দা-সমালোচনা করা কিংবা গোমরাহ ও ফাসেক আখ্যা দেওয়া নাজায়েয ও অবৈধ?

আমীন জোরে বলা হবে না আস্তে–এ নিয়ে আমাদের এই বন্ধুরা ঝগড়া-বিবাদ করে থাকেন। হাদীস ও আছারের গ্রন্থসমূহ তারা যদি সঠিক পন্থায় অধ্যয়ন করতেন তবে জানতে পারতেন যে, সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) যাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের ভিত্তিতে এরা জোরে আমীন বলে থাকেন, স্বয়ং তিনিই আমীন আস্তে বলতেন। (আলমুহাল্লা, ইবনে হায্ম খ. ২, পৃ. ২৯৫)

যদি বিষয়টা 'সুন্নাহর বিভিন্নতা' না হত কিংবা অন্তত 'মুজতাহাদ ফীহ' না হত তাহলে এই প্রশ্ন কি আসত না যে, যে ব্যক্তি নিজের রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের উপর নিজেই আমল করে না তার রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণগ্রহণ জায়েয হবে কি?

এভাবে অন্যান্য বিষয়েও যদি চিন্তা করতে থাকেন তাহলে এই সব ক্ষেত্রে সাহাবা-যুগ থেকে চলে আসা মতভেদ আপনাকে বিচলিত করবে না। আর একে বিবাদ-বিসংবাদের মাধ্যম বানানোর প্রবণতাও দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা সবাই জানি যে, সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন ইসলামী শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যে শহরে যে সাহাবী অবস্থান করছিলেন তার নিকট থেকেই ওই শহরের অধিবাসীরা দ্বীন ও ঈমান, কিতাব ও সুন্নাহর ইলম অর্জন করেছেন। ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি ও জীবনযাপনের আহকাম ও বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। যেসব অঞ্চলে ইসলাম সাহাবায়ে কেরামের পরে প্রবেশ করেছে কিংবা ইসলামের ব্যাপক প্রচার সাহাবায়ে কেরামের পরে হয়েছে সেখানকার লোকেরা তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনের কাছ থেকে এই বিষয়গুলো শিখেছেন। কিংবা ওই সব দাঈ ইলাল্লাহ, মুজাহিদীন ও মুয়াল্লিমীনের কাছ থেকে, যাঁদের মাধ্যমে ওই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে।

শরীয়তের অনেক বিধানের মধ্যে যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের যুগেই মতভেদ হয়েছে, যা ধারাপরম্পরায় পরবর্তীতেও বিদ্যমান ছিল, তাই এটাই স্বাভাবিক যে, প্রত্যেক ইসলামী শহরে নামায ইত্যাদির পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিন্ন হবে না। ওই বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে আগের ভিন্নতা বিদ্যমান থাকবে।

এই উপমহাদেশে যেই দাঈ ইলাল্লাহ, মুজাহিদীন, মুয়াল্লিমীন ও আওলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপক প্রচার হয়েছে তাঁরা ফিকহে হানাফী অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করতেন, ফিকহে হানাফীর সহযোগিতায় কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবিধান পালন করতেন। এজন্য এই অঞ্চলে নামাযের ওই পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে যা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ফকীহ ও মুহাদ্দিস শাগরিদগণ ফিকহের গ্রন্থাদিতে সংকলন করেছেন, যার ভিত্তি হল কুরআন ও সুন্নাহ, হাদীস ও আছার

এবং যার ভিত্তি হল ওই 'আমলে মুতাওয়ারাছ'-ব্যাপক কর্মধারা, যা ইরাকে অবস্থানকারী হাজারেরও অধিক সাহাবায়ে কেরামের সূত্রে তাঁদের কাছে পৌঁছেছিল।

যেহেতু সালাফের নীতি এই ছিল যে, যেসব মাসআলায় একাধিক পন্থা দলীল দ্বারা প্রমাণিত তাতে যে এলাকায় যে পন্থা প্রচলিত, সে এলাকার জনগণকে ওই পন্থা অনুযায়ীই আমল করতে দেওয়া উচিত, এজন্য উলামায়ে কেরাম এসব অঞ্চলে অন্য কোনো পন্থা প্রচার করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু কিছু অপরিণামদর্শী মানুষ, দ্বীনের সাধারণ রুচি ও মেযাজের সাথে যাদের পরিচয় ছিল না, রেওয়ায়েতের ইলম ছিল কিন্তু তাফাক্কুহ ফিদ্দীন পর্যাপ্ত ছিল না, তারা এই সূক্ষ্ম বিষয়টা অনুধাবন করতে পারেননি। তাই তারা এক মাসনূন তরীকাকে অন্য মাসনূন তরীকার দ্বারা, এক মুবাহ তরীকাকে অন্য মুবাহ তরীকার দ্বারা এবং এক 'মুজতাহাদ ফীহ' মতকে অন্য 'মুজতাহাদ ফীহ' মতের দ্বারা খণ্ডন করার মধ্যে সওয়াব অন্বেষণ করেছেন। তেমনি অন্য মতটিকে (যার ভিত্তিও দলীলের উপর) বাতিল বলে দেওয়াকে সওয়াবের কাজ বলে মনে করেছেন। ফলে বিবাদ-বিসংবাদের সূত্রপাত হয়েছে যা নিশ্চিতভাবে হারাম। আর ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে, যার বিষফল আজও মুসলমানদেরকে ভুগতে হচ্ছে। অথচ আমরা এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করিনি। আমরা এই বিভিন্নতার বিষয়গুলোতে 'ই'এর পরিবর্তে 'ও'কে অবলম্ব করতে পারিনি!

যেখানে রাস্তা শুধু একটি সেখানে তো আমরা 'ই' বলব, যেমন 'ইসলামই' আমার দ্বীন। ইসলামই হক্ক ও আল্লাহর কাছে মকবুল দ্বীন।' 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ-এর পথই সঠিক। কিন্তু যেখানে সুন্নাহর বিভিন্নতা, মুবাহের বিভিন্নতা এবং একাধিক সম্ভাবনার অবকাশযুক্ত 'মুজতাহাদ ফীহ' বিষয়ের প্রশ্ন সেখানে 'ই' অবলম্বনের কী অর্থ? এখানে তো বলতে হবে 'ও'। অর্থাৎ এটাও সঠিক, ওটাও সঠিক। কোনোটাই খেলাফে সুন্নত নয়।

আজকাল বেমক্কা 'ই' ব্যবহারের ব্যাধি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। দ্বীনের প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য নানা অঙ্গনে খেদমতের প্রয়োজন রয়েছে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কারো একার পক্ষে সব খেদমত আঞ্জাম দেওয়া কখনও সম্ভব নয়। এজন্য কর্মবণ্টনের বিকল্প নেই। এতদসত্ত্বেও দেখা যায় যে, খাদেমে দ্বীনের বিভিন্ন শ্রেণী, যারা পরস্পর একে অন্যের সতীর্থ, এদেরই কমসমঝ লোকেরা নিজেদেরকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ মনে করে থাকে। আমাদের আকাবির বলতেন,

'সতীর্থ হও, প্রতিপক্ষ হয়ো না।' যেখানে সতীর্থতা কাম্য সেখানে যদি প্রতিপক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হয় তবে তো বিবাদ ও বিসংবাদের সূত্রপাত ঘটবেই।

তেরো

এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হাদীস অনুযায়ী আমল করারও নির্ধারিত পন্থা রয়েছে। এই পন্থার বাইরে গেলে সেটা আর হাদীস অনুসরণ থাকে না। ইত্তেবায়ে সুন্নতেরও মাসনূন পদ্ধতি রয়েছে। ওই পদ্ধতি পরিহার করে সুন্নতের অনুসরণ করতে গেলে তা একটা অসম্পূর্ণ ও সংশোধনযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

কেউ যদি রাফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নত অনুযায়ী আমল করে তবে এতে অসুবিধার কী আছে? শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের লোকেরাও তো এই সুন্নত মোতাবেক আমল করে থাকেন। হারামাইনের অধিকাংশ ইমাম হাম্বলী মাযহাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তারাও এই সুন্নতের উপর আমল করে থাকেন। কিন্তু তারা তো রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার সুন্নতকে প্রত্যাখ্যান করেন না। যারা এই সুন্নত অনুযায়ী আমল করেন তাদের সাথে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হন না, তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জবাজি, লিফলেটবাজি করেন না। তারা অন্যের নামাযকে বাতিল বলা তো দূরের কথা খেলাফে সুন্নতও বলেন না। তারা হাদীস অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে 'আহলুয যিক্‌র' আইম্মায়ে ফিকহের উপর নির্ভর করে থাকেন।

এখানে ওই ঘটনাটা উল্লেখ করা যায়, যা হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর মালফূযাতে রয়েছে। ঘটনার সারসংক্ষেপ এই যে, এক জায়গায় আমীন জোরে বলা নিয়ে হাঙ্গামা হয়ে গেল এবং বিষয়টা মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়াল। ঘটনার তদন্তের জন্য যাকে দায়িত্ব দেওয়া হল তিনি তদন্ত শেষে রিপোর্টে লিখলেন যে, 'আমীন বিলজাহ্‌র' অর্থাৎ আমীন জোরে বলা হাদীস শরীফে আছে এবং মুসলমানদের এক মাযহাবে তা অনুসরণ করা হয়। তেমনি 'আমীন বিছ্‌ছির' অর্থাৎ আস্তে আমীন বলাও হাদীস শরীফে এসেছে আর মুসলমানদের এক মাযহাবে তা অনুসৃত। আরেকটি হল 'আমীন বিশ্‌শার' অর্থাৎ হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য উচ্চ আওয়াজে আমীন পাঠ। এটা উপরোক্ত দুই বিষয় থেকে ভিন্ন। প্রথম দুই প্রকার অনুমোদিত হওয়া উচিত আর তৃতীয়টা নিষিদ্ধ। (মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত খ. ১, কিস্ত ২, পৃ. ২৪০-২৪১; খ. ২, কিস্ত ৫, পৃ. ৫০৬ প্রকাশনা দেওবন্দ)

অনেকেই এই বিষয়টা অনুধাবন করতে পারেন না। তারা 'আমীন বিশশার' ও 'আমীন বিলজাহ্‌র' অর্থাৎ মাসনূন তরীকার জোরে আমীন আর হাঙ্গামার জোরে

আমীনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। বলাবাহুল্য যে, আস্তে আমীন বলাকে ভুল বা হাদীস পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে একমাত্র নিজেদেরকে সুন্নতের অনুসারী দাবি করে উচ্চস্বরে আমীন পাঠ করা বস্তুত তা ওই আমীন বিলজাহ্‌র নয়, যা হাদীস শরীফে এসেছে এবং সালাফ যার অনুসরণ করতেন।

চৌদ্দ

ব্যক্তি ও সমাজের সংস্কার-সংশোধনের জন্য করণীয় বিষয় ছিল বেনামাযীদের উৎসাহ দিয়ে নামাযী বানানো এবং অজ্ঞতা বা উদাসীনতার কারণে যারা এমন সব ভুল করেন যার কারণে নামায মাকরূহ বা খেলাফে সুন্নত হয়ে যায় বরং কখনও কখনও ওয়াজিব পর্যন্ত ছুটে যায়, এমন লোকদের সংশোধনের চেষ্টা করা। আমাদের পূর্বসূরীরা এদিকেই মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ওই বন্ধুদের চিন্তা ও মনোযোগের সিংহভাগ ব্যয় হয় নামাযীদেরকে বিরক্ত করার কাজে। তাদের সকল কর্মকাণ্ড শুধু এমন কিছু বিষয় কেন্দ্র করে হয়ে থাকে, যে সব বিষয়ে এ অঞ্চলের লোকেরাও সুন্নাহরই অনুসারী। যে পন্থায় তারা নামায আদায় করেন তাও শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং নবীযুগ ও সাহাবা-যুগ থেকে অনুসৃত। তারা এক সুন্নাহকে ভুল সাব্যস্ত করে লোকদেরকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন আর একে এত বড় সওয়াবের কাজ মনে করলেন যে, এর স্বার্থে সব ধরনের বিবাদ-বিসংবাদ এবং ফেতনা-ফাসাদকে খুশির সাথে মঞ্জুর করে নিলেন!

এদের ডাকে আমাদের যে সব ভাই সাড়া দিয়ে থাকেন, তাদের কর্তব্য ছিল আলেমদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যে, আপনাদের অনুসরণে আমরা যে নামায পড়ছি, কিছু লোক বলে, এটা হাদীস পরিপন্থী, সুন্নাহ পরিপন্থী। তাদের এইসব কথা কি ঠিক? কিন্তু অনেক সরলমনা বা অতিউৎসাহী মানুষ কোনোরূপ অনুসন্ধান না করেই তাদের দাওয়াত গ্রহণ করে নেন। তারা নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করতে আরম্ভ করেন, আস্তে আমীন বলা ছেড়ে জোরে আমীন বলতে থাকেন। বিষয়টা শুধু এই পর্যন্ত সীমিত থাকলে বলার কিছু ছিল না। কেননা এগুলোও মাসনূন বা মুবাহ তরীকা। কিন্তু তারা আমল পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু অদ্ভুত ধ্যান-ধারণা ও কাজ কর্মও আরম্ভ করেন।

তারা রাফয়ে ইয়াদাইন এজন্য আরম্ভ করেননি যে, এটাও মাসনূন বা মুবাহ; বরং তারা মনে করেন যে, এটাই সুন্নাহ এবং রাফয়ে ইয়াদাইন না করা সুন্নাহর পরিপন্থী। এতদিন তারা সুন্নাহ বিরোধী কাজ করে এসেছেন এবং এখন যারা রাফয়ে ইয়াদাইন ছাড়া নামায পড়ছে তারা সুন্নাহবিরোধী কাজই করে চলেছেন।

অতএব তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং প্রয়োজনে তাদের সাথে 'জিহাদ' করা জরুরি! এমনকি তারা এই ধারণাও পোষণ করেন যে, নাউযুবিল্লাহ, এ অঞ্চলের আলেমরা হয়তো কুরআন-হাদীসের কোনো জ্ঞান রাখে না কিংবা মাযহাবকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে!

বলাবাহুল্য, এই কুধারণার কারণে তারা নিন্দা-সমালোচনা, কটুবাক্য ব্যবহার এমনকি গালিগালাজ পর্যন্ত করছে। ফিকহ-ফুকাহা ও আইম্মায়ে দ্বীনের অনুসারীদের সম্পর্কে কটুবাক্য, গালিগালাজ এবং তাদেরকে গোমরাহ-ফাসেক এমনকি কাফের পর্যন্ত আখ্যা দেওয়াও গোপন কোনো বিষয় নয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত বন্ধুরাই এই সব ভ্রান্ত ধারণা গ্রহণ এবং এই ভুল পথ অবলম্বনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী। হাদীসের দু'চারটি কিতাবের অনুবাদ পড়ে তারা ভাবতে থাকেন যে, তারা হাদীস ও সুন্নাহর সুপণ্ডিত হয়ে গেছেন। অতএব গবেষণার যোগ্যতাও তাদের অর্জিত হয়েছে এবং অন্যদেরকে অজ্ঞ ও জাহেল আখ্যা দেওয়ারও অধিকার তারা অর্জন করেছেন। তারা যদি শুধু এটুকুও চিন্তা করতেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে অনুবাদের উপর নির্ভর করছি। আমার তো এটুকুও বোঝার যোগ্যতা নেই যে, এই অনুবাদটা যিনি করেছেন তিনি কি সঠিক করেছেন না ভুল করেছেন। আর যেসব কিতাবের অনুবাদ হয়নি সেসব কিতাবের হাদীস সম্পর্কে আমার কীইবা জানা আছে। অনূদিত গ্রন্থগুলোও কি আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছি? এক বিষয়ের সকল তথ্য কি সংগ্রহ করেছি? সংগ্রহ করলেও শুধু সেগুলোর তরজমা জানাই কি সঠিক বিষয় অনুধাবন ও আমলের জন্য যথেষ্ট?

যেখানে বিভিন্ন ধরনের দলীল রয়েছে সেখানে আমলের আগে কতগুলো পর্যায় অতিক্রম করে আসতে হয়, যা শুধু ইজতিহাদ ও তাফাক্কুহ-র মাধ্যমেই অতিক্রম করা সম্ভব। ওই সব ক্ষেত্রে ফকীহ ও মুজতাহিদের সহযোগিতা গ্রহণ না করার অর্থই হল, বিষয়গুলো যাচ্ছেতাইভাবে ও নীতিহীনভাবে অতিক্রম করতেই তিনি আগ্রহী কিংবা নিজের পছন্দের কোনো মৌলভীর তাকলীদ করে ফিকহের ইমাম ও খাইরুল কুরূনের ইমামদের যারা অনুসারী তাদের উপর আপত্তি করতে আগ্রহী।

এই ব্যক্তিদের প্রতি আমার অভিযোগ এই যে, এই অসম্পূর্ণ জানার উপর ভিত্তি করে আপনারা 'সিদ্ধান্ত' দেন কীভাবে? তেমনি 'তাকলীদী ইলম' অর্থাৎ যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভরশীল তার ভিত্তিতে গবেষণাসুলভ বা মুজতাহিদসুলভ সিদ্ধান্ত দেন কীভাবে? আপনি এত অসংখ্য উলামা-মাশায়েখের বিপরীতে এক নতুন দাওয়াতে এত সহজে সাড়া দিয়ে দিলেন, তাদের প্রতি

আপনার এত আস্থা তাহলে আজ পর্যন্ত যাদের কাছ থেকে আপনি দ্বীন শিখেছেন কিংবা যাদেরকে দেখে আপনি নামায শিখেছেন তাদের প্রতিই বা এত মন্দ ধারণা কেন?

তাদের মধ্যে কি এটুকু ঈমানী জযবাও নেই যতটুকু আপনার মধ্যে আছে? এতটুকুও নবীপ্রেম নেই যতটুকু আপনার মনে আছে?!

আপনি কি কখনও তাদের কাছে নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের দলীল জানার চেষ্টা করেছেন, যাকে আপনি ভুল ঘোষণা দিচ্ছেন?

একবার আমার একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ফোন করলেন। তিনি মূলত জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু একই সাথে উলামা-মাশায়েখের সোহবত-সাহচর্যও লাভ করেছেন। তিনি বললেন, অমুক (একজন জেনারেল শিক্ষিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) আসতে চান, কিছু বিষয়ের দলীল দেখার জন্য। এরপর বললেন, তিনি যদি দলীল শোনার জন্য বা দলীল জানার জন্য বলতেন তাহলেও একটা কথা ছিল কিন্তু তিনি বলেছেন, দলীল দেখতে চান!

দেখুন, তিনি তো এই দুই বাক্যের সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন কিন্তু ওইসব লোকদের তো এ সম্পর্কে কোনো খবরই নেই। এরপরও সৌভাগ্য যে, দলীল দেখতে চেয়েছেন, এর আগেই যদি কোনো 'সিদ্ধান্ত' দিয়ে দিতেন তাহলেই বা কী করার ছিল?

এই ভাইদের কাছে আমার শেষ কথা এই যে, আপনি যে প্রথম পদ্ধতিটা পরিত্যাগ করেছেন কেন পরিত্যাগ করেছেন? সেটা কি ভুল ছিল? ভুল হওয়ার দলীল কী? কিংবা উভয়টাই সঠিক? তাহলে একটা ছেড়ে অন্যটা ধরার কী অর্থ? কিংবা একটির তুলনায় অন্যটি কি অগ্রগণ্য?

প্রশ্ন হল, কীসের ভিত্তিতে আপনি এটা চিহ্নিত করলেন?

পনেরো

যদি সাধারণ মানুষের কাছে উলামা-মাশায়েখের আমলের বিপরীত কোনো দাওয়াত পৌঁছে তাহলে তাদের জন্য যা করণীয় তা এই যে, তারা পরিষ্কার বলে দেবেন যে, ভাই, আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের নিজেদের পক্ষে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তোমাদের কথা যদি মানতে হয় তাহলে তোমাদের উপরই নির্ভর করে মানতে হবে, সেক্ষেত্রে উলামা-মাশায়েখের কথার উপর নির্ভর করতে অসুবিধা কী?

আর যদি এ বিষয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতেই হয় তাহলে তার পদ্ধতি এই :

১. কেউ যদি আপনাকে বলে, (উদাহরণস্বরূপ) ভাই, তুমি যে রাফয়ে ইয়াদাইন করছ না-এটা তো হাদীস বিরোধী! আপনি আদবের সাথে বলুন, সব হাদীসের বিরোধী না রফয়ে ইয়াদাইন না-করারও কোনো হাদীস আছে? তারা বলবে, হ্যাঁ, হাদীস তো কিছু আছে, কিন্তু সব যয়ীফ বা ভিত্তিহীন। আপনি প্রশ্ন করুন, এটা কি আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, না হাদীস বিশারদদের ফয়সালা? এরপর সব হাদীস-বিশারদের ফয়সালা না তাদের কারো কারো? একজন ইমামও কি রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার হাদীসকে 'সহীহ' বলেননি? যদি তার মধ্যে সততা থাকে তাহলে সে বলতে বাধ্য হবে যে, জী, একাধিক ইমাম ওই হাদীসকেও সহীহ বলেছেন।

আপনি বলুন, আমার জন্য এই যথেষ্ট। যখন সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের একটি বিশিষ্ট জামাত রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার হাদীস মোতাবেক আমল করেছেন তো আপনি তার বিশেষ কোনো সনদকে যয়ীফ বললে কী আসে যায়? সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা এবং উম্মাহর উলামা-মাশায়েখের মাঝে স্বীকৃত বিষয়কে শুধু সংশ্লিষ্ট একটি হাদীসের সনদের দুর্বলতা দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ করা কত বড় ভুল!

আর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল, আপনি তাকে হেকমতের সাথে কোনো বিশেষজ্ঞ আলেমের কাছে নিয়ে যাবেন, যার হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহের উপর এবং ফিকহে মুদাল্লাল ও ফিকহে মুকারানের কিতাবসমূহের উপর দৃষ্টি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ সকল ভুল ধারণার অবসান ঘটবে এবং কটুকথা, নিন্দা-সমালোচনার ধারাও বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্যা এই যে, আমাদের এই বন্ধুরা শুধু সাধারণ মানুষকেই 'হেদায়েত' করে থাকেন, আলেমদের কাছে যান না। এটা তো ঠিক না। আলেমদের কাছেই তো আগে যাওয়া উচিত। কেননা, তাদেরকেই তো 'হেদায়েত' করার প্রয়োজন বেশি। তারা হেদায়েত পেলে গোটা জাতির হেদায়েতের সম্ভাবনা!

ষোল

যারা খতীব বা মুদাররিসের দায়িত্বে রয়েছেন কিংবা দ্বীনী বিষয়ে সাধারণ মানুষ যাদের শরণাপন্ন হয় তাদের খেদমতে আবেদন এই যে, যদিও আম মানুষ ও জেনারেল শিক্ষিত মানুষের পক্ষে দলীল ও দলীল দ্বারা দাবি প্রমাণের পদ্ধতি বোঝা কঠিন, তবুও তাদেরকে এই প্রশ্ন না করাই ভালো যে, দলীল জানতে চাওয়ার অধিকার তাদের আছে কি না? বরং 'রাহমাতান বি-ইবাদিল্লাহ' তাদের সাথে কোমল

আচরণ করুন এবং অনুগ্রহপূর্বক তাদের কথাবার্তা–যদিও তা উল্টাসিধা হোক না কেন–শুনুন। তারা যদি দলীল জানতে চায় তাহলে অন্তত দু'একটি স্পষ্ট দলীল তাদেরকে জানিয়ে দিন। তবে এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। আপনাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে হবে এবং সকল বিষয়ের সর্বাধিক সহজ ও সবচেয়ে বিশুদ্ধ দলীল সহজভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।#

[জানুয়ারি-মে'০৯ঈ.]

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি

ভূমিকা : আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। বিশেষ হেকমতের কারণেই মানুষকে দুটি শ্রেণীভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও মহিলা। সন্দেহ নেই, এই উভয় শ্রেণী মানুষ হিসেবে ও মনুষ্যত্বের সার্বিক বিচারে সমান মানুষ। তাদের মাঝে মানুষ হিসেবে কোন তারতম্য নেই। কিন্তু তারপরও স্বতঃসিদ্ধ যে, এ উভয় শ্রেণীর মাঝে শারীরিক গঠন, সক্ষমতা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, নিরাপত্তা এবং সতর ও পর্দাসহ বেশ কিছু বিষয়ে বড় রকম পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্যের এ দিকটিকেও বাহ্যিক জীবন যাপনে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোন কোন পর্যায়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেসব ইবাদত ও মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার মাঝে কিছু পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে শরীয়ত, সেসবের অন্যতম হল নামায। গ্রহণযোগ্য কোন দলীল ও যুক্তির ওপর ভিত্তি না করেই কোন কোন মহলের পক্ষ থেকে নামাযের মাঝের এই পার্থক্য অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে বলেই মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে দলীল ও যুক্তিভিত্তিক কিছু আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সে কারণেই এ আলোচনার সূত্রপাত। আমরা মনে করি, অপরাপর কিছু ইবাদত ও মাসআলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মাঝের সর্বসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ পার্থক্যসমূহের উদাহরণ ও গ্রহণযোগ্য দলীলসমূহের ধারাবাহিক উপস্থাপন, আলোচনার কার্যকারিতা ও সফল বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তাই আমরা সেভাবেই অগ্রসর হতে চাই। দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার হুকুম এক; কিন্তু এমন অনেক মাসআলা রয়েছে যেখানে মহিলাদের হুকুম পুরুষদের থেকে ভিন্ন। আর সেক্ষেত্রে কারো মাঝেই কোন মতভেদ নেই। যেমন :

১. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপরই হজ্ব ফরয; কিন্তু মহিলাদের জন্য পথখরচ ছাড়াও হজ্বের সফরে স্বামী বা মাহ্‌রাম পুরুষের উপস্থিতি শর্ত।

২. ইহ্রাম অবস্থায় পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ; অথচ মহিলাদের জন্য ইহরাম অবস্থায়ও মাথা ঢেকে রাখা ফরয।

৩. ইহ্রাম খোলার সময় পুরুষ মাথা মুণ্ডাবে; কিন্তু মহিলার মাথা মুণ্ডানো নিষেধ।

৪. হজ্ব পালনের সময় পুরুষ উচ্চ আওয়াযে 'তালবিয়া' পাঠ করে; অথচ মহিলার জন্য নিম্ন আওয়াযে পড়া জরুরি।

অনুরূপ আরো অনেক মাসআলা রয়েছে যেখানে উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে পুরুষ ও মহিলার হুকুম এক নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন।

এই সব মাসআলার মতই একটি হল নামাযের মাসআলা। নামাযের বেশ কিছু আহকামে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন :

১. ইমাম ও খতীব পুরুষই হতে পারে। মহিলা ইমাম ও খতীব হতে পারে না।

২. আযান শুধু পুরুষই দেয়; মহিলাকে মুয়াজ্জিন বানানো জায়েয নয়।

৩. ইকামত শুধু পুরুষই দেয়; মহিলা নয়।

৪. পুরুষের জন্য জামাআত সুন্নতে মুআক্কাদা; অথচ মহিলাকে মসজিদ ও জামাআতের পরিবর্তে ঘরের ভেতরে (قعر البيت) নামায পড়ার হুকুম করা হয়েছে।

৫. সতরের মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য রয়েছে; সে কথা বলাই বাহুল্য।

৬. নামাযে সতর্ক করার মত কোন ঘটনা ঘটলে সতর্ক করার জন্য কিংবা অবহিত করার জন্য পুরুষকে তাসবীহ পড়ার হুকুম করা হয়েছে; অথচ মহিলাদের জন্য হুকুম হল 'তাসফীক' করা তথা হাতে শব্দ করে অবহিত করা।

৭. জুম্মার নামায শুধু পুরুষের উপর ফরয; মহিলার উপর নয়।

উপরোক্ত মাসআলাসমূহে লক্ষণীয় বিষয় হল যে, অনেকগুলো কাজ সুন্নত বা ফরয হওয়া সত্ত্বেও মহিলাদের সতর ও পর্দার বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের জন্য স্বতন্ত্র হুকুম দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ নামায আদায়ের পদ্ধতির মধ্যেও মহিলাদের সতর ও পর্দার বিশেষ বিবেচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু জায়গায় শরীয়ত মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র হুকুম নির্ধারণ করেছে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমরা চার ধরনের দলীলের আলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। وبالله تعالى التوفيق

প্রথমত হাদীস শরীফের আলোকে।

দ্বিতীয়ত আসারে সাহাবা তথা সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও কর্মের আলোকে।

তৃতীয়ত তাবেয়ী ঈমামগণের ঐকমত্যের আলোকে।

চতুর্থত চার ইমামের ইত্তিফাক ও ঐকমত্যের আলোকে।

সবশেষে আমরা একথাও উল্লেখ করব যে, খোদ গায়রে মুকাল্লিদ আলেমরাও -যাদের কথিত অনুসারীরা এ পার্থক্যটিকে আজ মানতে চান না- মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতেই তাদের ফত্ওয়া বিদ্যমান।

হাদীস শরীফের আলোকে

হাদীস : ১

قال الإمام أبو داود في كتاب المراسيل له، وهو جزء من «سننه» :حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا ابن وهب، أخبرنا حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن يزيد بن أبي حبيب أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: «إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِيْ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ».

(سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح، وهو مرسل جيد، عضده ما في هذا الباب من موصول وآثار وإجماع وصرح الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه لاعلة فيه سوى الإرسال)

"তাবেয়ী য়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (রহ.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সেজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষের মত নয়।" -কিতাবুল মারাসিল, ইমাম আবু দাউদ ১১৮, হাদীস ৮৭

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আওনুল বারী, (১/৫২০)তে লিখেছেন, 'উল্লিখিত হাদীসটি সকল ইমামের উসূল অনুযায়ী দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্য।'

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী 'সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম' গ্রন্থে (১/৩৫১, ৩৫২) এই হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সেজদার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

হাদীস : ২

أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قال: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلٰى فَخِذِهَا الْأُخْرٰى، وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِى فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُوْنَ لَهَا، وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُوْلُ: يَا مَلَائِكَتِيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهَا».

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ٢: ٢٢٣ في كتاب الصلاة (باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود) وأعله بأبي مطيع البلخي ولكن الصحيح فيه عندنا قول العقيلي: «كان مرجئا صالحاً في الحديث إلا أن أهل السنة أمسكوا عن الرواية عنه» نقله الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٣: ٢٤٨.

قال الراقم: أما إرجاؤه فهو إرجاء السنة، كمايدل عليه كتابه الذي رواه عن أبى حنيفة وهو كتاب الفقه الأكبر، فإذا ظهر أن إمساك من أمسك من الرواية عنه كان لأجل الإرجاء المزعوم، فلا عبرة بهذا الإمساك، وإنما العبرة بما نص عليه العقيلي أنه كان صالحاً في الحديث. فافهم.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন (ডান) উরু অপর উরুর উপর রাখে। আর যখন সেজদা করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে; যা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ তাআলা তাকে দেখে (ফেরেশতাদের সম্বোধন করে) বলেন, ওহে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" –সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২৩, অধ্যায় সালাত, পরিচ্ছেদ : মহিলার জন্য রুকূ ও সেজদায় এক অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে পৃথক না রাখা মুস্তাহাব। এটি হাসান হাদীস।

হাদীস : ৩

قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثتني ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، قالت: سمعتُ عمتي أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيها عبد الجبار، عن علقمة عمها، عن وائل بن حجر، قال : جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (فساق الحديث)، وفيه :«يَا وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ! إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا».

[رواه الطبراني في الكبير ج٢٢ ص ١٩-٢٠، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ج ٢ ص ٢٧٢: رواه الطبراني في حديث طويل في مناقب وائل من طريق ميمونة بنت حجر، عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار، ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات». انتهى.

قال الراقم: وفي الإسناد تعريف كاشف عن هذه المرأة، وهي من أتباع التابعين إن لم تكن تابعية، والمستور من هذه الطبقة محتج به على الصحيح، لا سيما ولحديثها هذا شواهد من الأصول والآثار]

"হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম, তখন তিনি আমাকে (অনেক কথার সাথে একথাও) বললেন, হে ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা বুক বরাবর হাত উঠাবে।" –আলমু'জামুল কাবীর, তাবারানী ২২/১৯-২০, এই হাদীসটিও হাসান

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কিছু কিছু হুকুমের ক্ষেত্রে মহিলার নামায আদায়ের পদ্ধতি পুরুষের নামায আদায়ের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। বিশেষত ২ নং হাদীসটি দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মহিলার নামায আদায়ের শরীয়ত নির্ধারিত ভিন্ন এই পদ্ধতির মধ্যে ওই দিকটিই বিবেচনায় রাখা হয়েছে যা তার সতর ও পর্দার সর্বাধিক সুন্দর ও উত্তম মাধ্যম।

উল্লেখ্য, এই সব হাদীসের সমর্থনে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতির পার্থক্য ও ভিন্নতাকে চিহ্নিত করে আরো কিছু হাদীস থাকলেও বিশাল হাদীস ভাণ্ডারে কোথাও এগুলোর সাথে বিরোধপূর্ণ একটি হাদীসও এমন পাওয়া যাবে না, যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই; বরং উভয়ের নামাযই এক ও অভিন্ন।

সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে

১. খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রা.)-এর বক্তব্য :

عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال «إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا».

رواه عبد الرزاق في «المصنف» واللفظ له، وابن أبي شيبة في المصنف أيضاً، وإسناده جيد، والصواب في الحارث هو التوثيق.

"হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মহিলা যখন সেজদা করবে তখন যেন খুব জড়সড় হয়ে সেজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে।" –আলমুসান্নাফ, আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৮, অনুচ্ছেদ : মহিলার তাকবীর, কিয়াম, রুকূ ও সেজদা; আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৪, হাদীস২৭৯৩; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২২

২. মহিলাদের জন্য জড়সড় হয়ে নামায পড়ার এ হুকুমটি শুধু সেজদার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পুরো নামাযেই এর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা এবং এ বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখা জরুরি। ইমাম ইবনে আবী শায়বা 'মুসান্নাফ'-এ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন–

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: «تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ». رواه ابن أبي شيبة، ورجاله ثقات.

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, মহিলা কীভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে।" –আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৫, হাদীস ২৭৯৪

প্রথম বক্তব্যটি খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রা.)-এর; দ্বিতীয় বক্তব্যটি উম্মতে মুসলিমার ফকীহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর। এ দুজন সাহাবী মহিলাদের নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, আমাদের জানামতে গোটা হাদীস ভাণ্ডারের কোথাও কোন একজন সাহাবী থেকেও এর বিপরীত একটি হরফও বিদ্যমান নেই।

মোটকথা, খলীফায়ে রাশেদের সুন্নত ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নতের আলোকেও একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহিলাদের নামায কোন কোন হুকুমের

ক্ষেত্রে পুরুষ থেকে ভিন্ন। আর এই পার্থক্য ও ভিন্নতার ভিত্তি হল মহিলাদের সতর ও পর্দার অধিক সংরক্ষণের বিবেচনা।

তাবেয়ীগণের বক্তব্যের আলোকে

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নামায শিক্ষা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম; তাঁদের কাছ থেকে তাবেয়ীগণ। হাদীসে রাসূল ও সুন্নতে সাহাবার পর এখন আমরা দেখাতে চাচ্ছি তাবেয়ী ইমামগণ মহিলাদের নামাযের কোন্ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। পুরুষদের মতই; নাকি কিছু আহ্কামের মধ্যে পুরুষদের থেকে ভিন্ন। এ সম্পর্কে মশহুর আয়িম্মায়ে তাবেয়ীন যাঁরা সাবাহায়ে কেরাম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরবর্তীদের কাছে পৌছিয়েছেন উল্লেখিত মাসাআলায় তাঁদের ফত্ওয়া কী ছিল, নিম্নে তা পেশ করা হল :

১. আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ. মৃত্যু ১১৪হি.) মক্কাবাসীদের ইমাম।

ইমাম ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

قال هشيم : أخبرنا شيخ لنا قال: سمعتُ عطاءً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ: كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: حَذْوَ ثَدْيَيْهَا».

"হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হল, নামাযে মহিলা কতটুকু হাত উঠাবে? তিনি বললেন, 'বুক বরাবর।'" –আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৪২১ হাদীস ২৪৮৬

ইমাম ইবনে আবী শায়বা (রহ.) আরো বর্ণনা করেন–

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ كَالرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا تَرْفَعُ بِذٰلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ، وأشار فخفض يديه جداً، وجمعهما إليه جداً، وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ، وَإِنْ تركت ذلك فلا حرج.

"ইবনে জুরাইজ (রহ.) বলেন, আমি আতা ইবনে আবী রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলা তাকবীরের সময় পুরুষের সমান হাত তুলবে? তিনি বললেন, মহিলা পুরুষের মত হাত উঠাবে না। এরপর তিনি (মহিলাদের হাত তোলার ভঙ্গি দেখালেন এবং) তাঁর উভয় হাত (পুরুষ অপেক্ষা) অনেক নিচুতে রেখে শরীরের

সাথে খুব মিলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, মহিলাদের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন। তবে এমন না করলেও কোন অসুবিধা নেই।" –আলমুসান্নাফ, প্রাগুক্ত, ২/৪২১ (২৪৮৯)

২. **মুজাহিদ ইবনে জাবর** (রহ. মৃত্যু ১০৪হি.) মক্কাবাসীদের আরেক ইমাম।

ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

عن مجاهد بن جبر أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ.

"হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহ.) পুরুষের জন্য মহিলার মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সেজদা করাকে অপছন্দ করতেন।" –আলমুসান্নাফ, প্রাগুক্ত; পরিচ্ছেদ 'মহিলা সেজদায় কীভাবে থাকবে' ১/৩০২

৩. **ইবনে শিহাব যুহরী** (রহ. মৃত্যু ১২৪হি.) মদীনাবাসীদের ইমাম।

ইমাম ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

عن الزهري قال: تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا.

"যুহরী (রহ.) বলেন, মহিলা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে।" –আলমুসান্নাফ, প্রাগুক্ত ২/৪২১ (২৪৮৭)

৪. **হযরত হাসান বসরী** (রহ. মৃত্যু ১১০হি.) বসরাবাসীদের ইমাম।

৫. **হযরত কাতাদাহ ইবনে দিআমা** (রহ. মৃত্যু ১১৮হি.) বসরাবাসীদের ইমাম।

আব্দুর রাযযাক (রহ.) ও ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

عن الحسن وقتادة قالا: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ وَلَاتَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا.

"হযরত হাসান বসরী (রহ.) ও হযরত কাতাদাহ (রহ.) বলেন, মহিলা যখন সেজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা রেখে সেজদা দেবে না; যাতে কোমর উচুঁ হয়ে না থাকে।" –আলমুসান্নাফ, আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭; আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৫ (২৭৯৭)

৬. **হযরত ইবরাহীম নাখায়ী** (রহ. ৯৬হি.) কুফাবাসীদের ইমাম।

ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

عن إبراهيم قال: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا ، وَلْتَضَعْ بطْنَها عليهما.

"ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) বলেন, মহিলা যখন সেজদা করবে তখন যেন সে উভয় উরু মিলিয়ে রাখে এবং পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে।" –আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৫ (২৭৯৫)

আব্দুর রাযযাক (রহ.) বর্ণনা করেন–

عن إبراهيم النخعي قَالَ: كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تضع ذراعها وبطْنها على فَخِذَيْها إذا سَجدَتْ، وَلَاتَتَجَافَى كما يتجافى الرَّجُلُ، لِكَيْ لَاتَرْفَعُ عَجِيزَتُهَا.

"হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) আরো বলেন, মহিলাদেরকে হুকুম করা হতো সেজদা অবস্থায় হাত ও পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখতে, পুরুষের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা না রাখতে; যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে।" –আলমুসান্নাফ, আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭; আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৫ (২৭৯৮)

উল্লেখ্য, ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, মহিলাদেরকে পৃথক ও ভিন্ন পদ্ধতিতে নামায শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন সাধারণ ও ব্যাপক ছিল। كانت শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, এই তালীম পূর্ব থেকে চলে এসেছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের যুগেই এই তালীমের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং স্বভাবত সে অনুযায়ী মহিলা সাহাবীগণ নামায আদায় করতেন।

৭. খালেদ ইবনে লাজলাজ (রহ. মৃত্যু দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে) সিরিয়াবাসীদের ইমাম।

ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

عن خالد بن اللجلاج قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ في الصَّلَاةِ، وَلا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ، يتقي ذٰلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيْءُ.

"হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ (রহ.) বলেন, মহিলাদেরকে হুকুম করা হত যেন তারা নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে।

পুরুষদের মত যেন না বসে। কোন কিছু আবরণযোগ্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়।" –আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৬ (২৭৯৯)

উপরোক্ত বক্তব্যে মহিলাদের বসার পদ্ধতি বোঝানোর জন্য تربع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আবুল ওয়ালীদ বাজী (রহ.) 'মুয়াত্তা'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আলমুনতাকা'য় লিখেছেন, 'تربع' এর দুটি অর্থ আছে। এক, চারজানু হয়ে বসা। দুই, উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসা। অর্থাৎ বাম পা ডান উরু ও গোছার নিচে রাখবে। আর ডান পায়ের উপরিভাগ কিবলার দিকে করে নিতম্বের কাছে রাখবে।" –আলমুনতাকা ১/৩৫৬; আওজাযুল মাসালিক ২/১১৮

উপরোক্ত বর্ণনায় تربعএর দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। বিশেষত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস যা পরবর্তিতে উল্লেখ করব এবং হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে একথাই বুঝে আসে। যদি ধরেও নেওয়া হয় এখানে تربعএর প্রথম অর্থই (চারজানু হয়ে বসা) উদ্দেশ্য; তথাপি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি এক নয়। কারণ একথা সকলেরই জানা যে, পুরুষের জন্য চারজানু হয়ে বসা সুন্নতের পরিপন্থী ও মাকরূহ।

পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলো ছাড়াও আয়িম্মায়ে তাবেয়ীনের আরো কিছু বর্ণনা রয়েছে যার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহিলার নামায পুরুষের নামায থেকে ভিন্ন। আয়িম্মায়ে তাবেয়ীনের কোন একজন থেকেও এর বিপরীত বক্তব্য প্রমাণিত নেই।

মোটকথা তাবেয়ীদের যুগে ইসলামের শহরগুলোর যারা ইমাম ও ধর্মের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ছিলেন তাদের মতামত থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, মহিলা ও পুরুষের নামাযের পদ্ধতিকে অভিন্ন মনে করা এবং এ ধরনের দাবি করা ভুল এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের শেখানো পদ্ধতির সাথে এই দাবির কোন মিল নেই।

চার ইমামের ফিক্হের আলোকে

ফিক্হে ইসলামী হল কুরআন ও সুন্নাহরই ব্যাখ্যা ও তার আমলী নমুনার সংরক্ষণকারী। কুরআন হাদীসে বিদ্যমান 'সরীহ' আহকামের সংকলন ও বিন্যাস এবং 'মুজমাল' আহকামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই হল ফিক্হে ইসলামীর মূল আলোচ্যবিষয়।

ফিক্‌হে ইসলামীর চারটি বিশ্লেষণ ও সংকলন উম্মতের মাঝে প্রচলিত। যেমন ফিক্‌হে হানাফী, ফিক্‌হে মালেকী, ফিক্‌হে হাম্বলী ও ফিক্‌হে শাফেয়ী। দলীলের আলোকে বিভিন্ন মাসআলায় তাদের মধ্যে ইখতিলাফও হয়েছে; কিন্তু মহিলাদের নামাযের পদ্ধতির ব্যাপারে চারো ফিক্‌হের ভাষ্য ও বক্তব্য এক ও অভিন্ন যে, তাদের নামাযের পদ্ধতি কোন কোন হুকুমের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে ভিন্ন।

ফিক্‌হে হানাফী

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অন্যতম প্রধান শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন–

أحبُّ إلينا أنْ تجمعَ رجليها في جانبٍ ولا تنتصبَ انتصابَ الرَّجل.

"আমাদের নিকট মহিলাদের নামাযে বসার পছন্দনীয় পদ্ধতি হল উভয় পা একপাশে মিলিয়ে রাখবে, পুরুষের মত একপা দাঁড় করিয়ে রাখবে না।" –কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মাদ ১/৬০৯

এ স্থানে মুহাদ্দিস আবুল ওয়াফা আফগানী (রহ.) 'কিতাবুল আসার'এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন–

روى إمامنا الأعظم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنّه سئل كيف كان النّساءُ يُصلّينَ على عهد رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وسلّم، قال: كنّ يتربّعن ثمّ أُمِرن أنْ يّحتفزن.

أخرجه أبو محمد الحارثي والأشناني وابن خسرو من طريقه عن سفيان الثوري عنه. راجع جامع المسانيد (ج ١ ص ٤٠٠) وهذا أقوي وأحسن ما روي في هذا الباب، ولذا احتج به إمامنا وجعله مذهبه وأخذ به.

"আমাদের ইমামে আজম আবু হানীফা (রহ.) নাফে' (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারা কীভাবে নামায পড়তেন? তিনি বললেন, আগে তারা চারজানু হয়ে বসতেন, পরে তাদেরকে জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে।" –জামেউল মাসানিদ ১/৪০০

উক্ত হাদীসটি এ বিষয়ে বর্ণিত সবকিছুর চেয়ে অধিক শক্তিশালী। এ কারণেই

আমাদের ইমাম এর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এ অনুযায়ী আমল করেছেন এবং এটিকে মাযহাব বানিয়ে নিয়েছেন। (কিতাবুল আসার (টীকা) ১/৬০৭

২. ইমাম আবুল হাসান কারখী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৩৪০ হি.)ও তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মুখতাসার'-এ মহিলাদের নামাযের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবুল হোসাইন আল-কুদুরী আল-হানাফী (রহ. মৃত্যু ৪২৮হি.) উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১০১-১০২ পাণ্ডুলিপি) বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে দলীলসহ লিখেছেন।

তাঁদের সম্পূর্ণ বক্তব্য আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত 'কিতাবুল আসার'-এর টীকায় দেখা যেতে পারে। (১/৬০৯)

৩. আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী হানাফী (রহ.) বলেন–

«هذا كله في حق الرجال، وأما في حق النساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع اليدين على الصدر، لأنه أستر لهن .... وفي المضمرات ناقلاً عن الطحاوي : المرأة تضع يديها على صدرها، لأن ذلك أستر لها.

"মহিলাদের ব্যাপারে সকলে একমত যে, তাদের জন্য সুন্নাত হল বুকের উপর হাত বাঁধা। কারণ এটাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত সতর।" –আসসিআয়া ২/১৫৬

৪. আরো দ্রষ্টব্য :

(ক) হিদায়া ১/১০০, ১১০, ১১১

(খ) বাদায়িউস সানায়ে আবু বকর কাসানী ১/৪৬৬

(গ) আল-মাবসূত সারাখসী ১/২৫

(ঘ) ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৫০৪

(ঙ) ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৭৩,৭৫

ফিক্‌হে মালেকী

১. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবুল আব্বাস আল-কারাফী (রহ. মৃত্যু ৬৮৪হি.) বলেন–

وأما مساواة النساء للرجال ففي النوادر عن مالك: تضع فخذها اليمني على اليسرى وتنضم قدر طاقتها، ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس، بخلاف الرجل.

"নামাযে মহিলা পুরুষের মত কিনা, এ বিষয়ে ইমাম মালেক (রহ.) থেকে উল্লেখ আছে যে, মহিলা ডান উরু বাম উরুর উপর রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে বসবে। রুকূ, সেজদা ও বৈঠক কোন সময়ই ফাঁক ফাঁক হয়ে বসবে না; পুরুষের পদ্ধতি ভিন্ন।" -আযযাখীরা, ইমাম কারাফী ২/১৯৩

ফিক্‌হে শাফেয়ী

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন-

وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار، وأدبهن بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب للمرأة أن تضم بعضا إلى بعض، وتلصق بطنها بفخذيها، وتسجد كأسترما يكون لها، وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأستر ما يكون لها.

"আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে পুরোপুরি আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর রাসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমার নিকট পছন্দনীয় হল, সেজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে মিলিয়ে রাখবে; পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং সেজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের চূড়ান্ত হেফাযত হয়। অনুরূপ রুকূ, বৈঠক ও গোটা নামাযে এমনভাবে থাকবে যাতে সতরের পুরাপুরি হেফাযত হয়।" -কিতাবুল উম্ম, ইমাম শাফেয়ী ১/১৩৮

২. ফিক্‌হে শাফেয়ীর বড় ভাষ্যকার ইমাম বায়হাকী (রহ. মৃত্যু ৪৫৮ হি.) বলেন-

وجماع ما يفارق المرأة فيه الرجل من أحكام الصلاة راجع إلى الستر، وهو أنها مامورة بكل ما كان أستر لها، والأبواب التي تلي هذه تكشف عن معناه وتفصيله، وبالله التوفيق.

"নামাযের বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার নামাযের (পদ্ধতিগত) ভিন্নতার প্রধান বিবেচ্যবিষয় হল সতর। অর্থাৎ মহিলার জন্য (শরীয়তের) হুকুম হল সকল ওই পদ্ধতি অবলম্বন করা যা তার পর্দার জন্য অধিক উপযোগী। সামনের অধ্যায়গুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।" -সুনানে কুবরা, ইমাম বায়হাকী ২/২২২

ফিক্‌হে হাম্বলী

১. ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসী আলহাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৬২০ হি.) বলেন-

فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد، إحداهما ترفع، لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما، وهو قول طاوس، ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل، فعلى هذا ترفع قليلاً. قال أحمد: رفع دون رفع.

والثانية: لا يشرع، لأنه في معنى التجافي، ولا يشرع ذلك لها، بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها.

"তাকবীরের সময় মহিলারা হাত উঠাবে কি উঠাবে না এসম্পর্কে কাজী (আবু ইয়ালা) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী হাত তুলবে। কেননা, খাল্লাল হযরত উম্মে দারদা ও হযরত হাফ্‌সা বিনতে সীরীন (রা.) থেকে সনদসহ বর্ণনা করেন যে, তারা হাত উঠাতেন। ইমাম তাউসের বক্তব্যও অনুরূপ। উপরন্তু যার ব্যাপারে তাকবীর বলার বিধান রয়েছে তার ব্যাপারে হাত উঠানোরও বিধান রয়েছে। যেমন পুরুষ করে থাকে এ হিসেবে মহিলা হাত উঠাবে, তবে সামান্য। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, তুলনামূলক কম পরিমাণে হাত উঠাবে।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হল, মহিলাদের জন্য হাত উঠানোরই হুকুম নেই। কেননা, হাত উঠালে কোন অঙ্গকে ফাঁক করতেই হয়। আর মহিলাদের জন্য এর বিধান দেওয়া হয়নি। বরং রুকূ সেজদাসহ পুরো নামাযে নারীরা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখবে।" –আলমুগনী, ইবনে কুদামা ২/১৩৯

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, হাম্বলী মাযহাবে মহিলাদের হাত উঠানো নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে; কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই যে, রুকূ সেজদা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জড়সড় হয়ে থাকতে হবে। আর যে মতে হাত উঠানোর কথা বলা হয়েছে সেখানেও খুবই সামান্য পরিমাণ হাত উঠাতে বলা হয়েছে। যার ফলে সতর রক্ষার্থে সতর্কতা অবলম্বনেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

২. ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) তাঁর অপর গ্রন্থ 'আলমুকনি'তে পুরুষের নামাযের পদ্ধতি উল্লেখ করার পর বলেন–

والمرأة كالرجل في ذلك، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود. وكذا في بقية الصلاة بلانزاع، وتجلس متربعةً أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها.

"এসব ক্ষেত্রে মহিলার হুকুম পুরুষের মতই। তবে মহিলা রুকূ ও সেজদায় নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। অনুরূপ নামাযের অন্যান্য রুকনেরও এই হুকুম। এতে কারো দ্বিমত নেই; মহিলা চারজানু হয়ে বসবে কিংবা উভয় পা এক সাথে করে ডান পাশ দিয়ে বের করে দেবে।" –আলমুগনি ২/৯০ (আলইনসাফসহ)

আল্লামা মারদাভী (রহ.) উপরোক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করে বলেন, "ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, মহিলাদের জন্য উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে দিয়ে বসাই উত্তম।" –আলইনসাফ ফী মারিফাতির রাজিহী মিনাল খিলাফ, আল্লামা মারদাভী (রহ. মৃত্যু ৮৮৫) ২/৯০

আলোচনার এ পর্যায়ে হাদীস, আসারে সাহাবা, তাবেয়ীন ও চার ইমামের ঐকমত্যের প্রমাণ পেশ করার পর আমরা দেখব, আমাদের যে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা মহিলাদের নামাযের ভিন্ন পদ্ধতির বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন এবং পুরুষ ও মহিলার নামাযের অভিন্ন পদ্ধতির পক্ষে কথা বলেন, তাদের আলেমগণ এ বিষয়ে কী ফত্ওয়া দিয়েছেন?

গায়রে মুকাল্লিদ আলেমগণের ফত্ওয়া

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ হাদীস শরীফ, সুন্নতে খলিফায়ে রাশেদ, সুন্নতে সাহাবা, ইজমায়ে তাবেয়ীন ও চারো ফিক্হের ঐকমত্য তথা যুগযুগ ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসা উম্মতে মুসলিমার সর্বসম্মত ও দলীলভিত্তিক আমলের আলোকে এই নিবন্ধে যা কিছু পেশ করা হয়েছে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও এ সব কিছুর স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সেই আলোকে ফত্ওয়াও প্রদান করেছেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ গযনবী (রহ.)-এর পিতা আল্লামা আব্দুর জাব্বার গযনবী (রহ.)কে যখন জিজ্ঞেস করা হল, মহিলাদের নামাযে জড়সড় হয়ে থাকা কি উচিত? জবাবে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে লেখেন–

"এর উপরই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের চারমাযহাব ও অন্যান্যের মাঝে আমল চলে আসছে।"

এরপর তিনি চার মাযহাবের কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করার পর লেখেন, "মোটকথা, মহিলাদের জড়সড় হয়ে নামায পড়ার বিষয়টি হাদীস ও চারমাযহাবের ইমামগণ ও অন্যান্যের সর্বসম্মত আমলের আলোকে প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী হাদীসের কিতাবসমূহ ও উম্মতের সর্বসম্মত আমল সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ।" –ফাতাওয়া গযনবিয়্যা ২৭ ও ২৮; ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস ৩/১৪৮ ও ১৪৯–মাজমুআয়ে রাসায়েল, মাওলানা আমীন সফদর সাহেব উকারবী ১/৩১০-৩১১

মাওলানা আলী মুহাম্মাদ সাঈদ সাহেব 'ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস' -এ এই পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন। –মাজমুয়ায়ে রাসায়েল ১/৩০৫

মাওলানা আব্দুল হক হাশেমী মুহাজির মক্কী সাহেব তো এই পার্থক্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তিকাই রচনা করেছেন। পুস্তিকাটির নাম نصب العمود في تحقيق مسألة «تجافي المرأة في الركوع والسجود والقعود»

ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের (মৃত্যু ১৩০৭) 'আউনুল বারী'র উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে; যিনি তৎকালীন আহলে হাদীসের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। অনুরূপ মুহাদ্দিস আমীর ইয়ামানীর 'সুবুলুস সালামে'র উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে; গায়রে মুকাল্লিদ ও সালাফী ভাইদের দেখা যায়, তারা তাকে নিজেদের লোক মনে করে থাকেন এবং তার এই কিতাবকে নিজেদেরই কিতাব মনে করে থাকেন।

আলবানী সাহেবের অসার বক্তব্য

আশ্চর্য কথা হল, উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ এবং উম্মতের মাঝে নববী যুগ থেকে পর্যায়ক্রমে চলে আসা এই সর্বসম্মত আমলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আলবানী সাহেব তাঁর 'সিফাতুস সালাতে' ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতি এক।"

কিন্তু এই দাবির স্বপক্ষে তিনি না কোন আয়াত পেশ করেছেন, না কোন হাদীস। আর না কোন সাহাবী বা তাবেয়ীর ফত্ওয়া। এহেন বক্তব্যের ভিত্তি তিনি শুধু এটাকেই বানিয়েছেন যে, পুরুষ মহিলার নামাযের পদ্ধতিগত পার্থক্যের ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। অথচ তার এই দাবি প্রমাণ করার জন্য উচিত ছিল উপরোল্লিখিত দলীলগুলোর বিশ্লেষণ করা। কিন্তু তিনি তা না করে কেবল পার্থক্যসম্বলিত একটি হাদীসকে (যা বক্ষমান নিবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে) শুধু এ কথা বলে যয়ীফ আখ্যা দিলেন যে, হাদীসটি 'মুরসাল'। আর মুরসাল হওয়ায় এটি যয়ীফ। এ ছাড়া অন্য কোন আলোচনাই তিনি দলীল সম্পর্কে করেননি।

আমি সাধারণ পাঠকবর্গের সাথে এই ছোট্ট পরিসরের একটি নিবন্ধে হাদীসশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলা নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। সংক্ষেপে এখানে শুধু এতটুকু বলব যে, মুরসাল হাদীস কেবল মুরসাল হওয়ার কারণেই অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। কেননা প্রথমত আয়িম্মায়ে দীনের অধিকাংশের নিকট, বিশেষত স্বর্ণযুগের ইমামগণের নিকট যদি প্রয়োজনীয় শর্তাবলি উপস্থিত থাকে তবে মুরসাল হাদীসও সহীহ্ হাদীসের মত গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত যে ইমামগণের নিকট 'মুরসাল'কে 'সহীহ' বলার ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে তারাও মূলত কিছু শর্তের সাথে মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করার উপযোগী মনে করেন।

আমাদের এই নিবন্ধে যে মুরসাল হাদীস সম্পর্কে আলোচনা চলছে তাতে প্রয়োজনীয় সে সব শর্ত বিদ্যমান রয়েছে; যার কারণে গায়রে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব 'আউনুল বারী' (১/৫২০ দারুর রাশীদ, হালাব, সিরিয়া)তে লিখেছেন, 'এই মুরসাল হাদীসটি সকল ইমামের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলীল হওয়ার যোগ্য।' তাঁর পূর্ণ বক্তব্য নিম্নরূপ–

«فمن يرى المرسل حجة –وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في طائفة والإمام أحمد في المشهور عنه– فحجتهم المرسل المذكور، ومن لا يرى المرسل حجة، كالشافعي وجمهور المحدثين فباعتضاد كل من الموصول والمرسل بالأخر، وحصول القوة من الصورة المجموعة، قال في فتح الباري: وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند. وقال النووي: الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقي عن الضعيف إلى الحسن، ويصير مقبولا معمولا به، قال الحافظ السخاوي: ولا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف، فإن الاحتجاج هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث اعتضد بمرسل أخر، ولو ضعيفا، كما قاله الشافعي والجمهور، كذا في عون الباري ١٥٩/٢ مع النيل، و١/ ٥٢٠ طبع دار الرشيد، حلب، سوريا.

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পদ্ধতির অভিন্নতার পক্ষে প্রদত্ত তার রায়ের সমর্থন পেশ করতে গিয়ে দ্বিতীয় যেই কাজটি আলবানী সাহেব করেছেন তা হল, ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)এর নামে একটি কথা চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি বলেছেন–

تفعلُ المرأةُ في الصّلاة كما يفعلُ الرّجُلُ

"মহিলা পুরুষের মতই নামায আদায় করবে।" উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা'এর। অথচ এর কোথাও এই কথাটি নেই। আল্লাহ তাআলা ভাল জানেন, এই ভুল উদ্ধৃতি তিনি কীভাবে লিখে দিলেন?! অথচ ইতিপূর্বে একাধিক সহীহ সনদের উদ্ধৃতিসহ ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)এর বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন হুকুমের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্যের কথা উল্লেখ রয়েছে।

নিজের দাবি প্রমাণের জন্য তৃতীয় যে কাজটি তিনি করেছেন তা হল ইমাম বুখারী (রহ.)এর রিজালশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ 'তারীখে সগীর' থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি পেশ করেছেন–

عَنْ أُمِّ الدَّرداءِ أَنَّهَا كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ

"উম্মে দারদা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নামাযে 'পুরুষের মত বসতেন।"

আলবানী সাহেব খেয়াল করতে পারেননি যে, এই রেওয়ায়েত দ্বারা নামাযে পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি ভিন্ন হওয়াই প্রমাণিত হয়; এক হওয়া নয়। যদি উভয়ের বসার পদ্ধতি এক হত তাহলে (جِلْسَةَ الرَّجُلِ) 'পুরুষের মত বসা' কথাটির কোন অর্থ হতে পারে না। তাই এই বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, সেই যামানায় পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি এক ছিল না। তথাপি উম্মে দারদা মহিলা হওয়া সত্ত্বেও পুরুষদের মত বসতেন; যার ফলে ব্যতিক্রমি একটি ঘটনা হওয়ায় এই ঘটনাটি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

উম্মে দারদা ছিলেন তাবেয়ী; ৮০হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। যদি নামাযের পদ্ধতি প্রমাণের ক্ষেত্রে তাবেয়ীদের আমল দলীল হয়ে থাকে এবং বাস্তবও তাই, তাহলে ইতিপূর্বে বিখ্যাত একাধিক তাবেয়ী ইমামগণের উদ্ধৃতিতে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এ কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছি যে, আয়িম্মায়ে তাবেয়ীনের তালীম ও শিক্ষা অনুযায়ী রুকূ, সেজদা ও বৈঠক সহ একাধিক আমলের মধ্যে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন ছিল। এ ক্ষেত্রে শুধু একজন তাবেয়ী মহিলার ব্যক্তিগত আমলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারটি যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে যখন ঠিক এই রেওয়ায়াতের মধ্যেই একথার সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে এ মহিলা অন্য সাহাবী ও তাবেয়ী মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

[জুন '০৫ ঈ.]

সহীহ হাদীসের আলোকে ঈদের নামায

রমযানের রোযা এবং এ মাসের অন্যান্য খায়ের-বরকতের শোকরানা ছাড়াও আরো অনেক হেকমতের কারণে ঈদুল ফিতরের নামাযের হুকুম দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে এই নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদীসে এর তাকিদ করেছেন, সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এই নামায আদায় করেছেন এবং মৌখিক নির্দেশনা ও বাস্তবে সম্পাদনের মাধ্যমে এর নিয়মকানুন শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে সংক্ষেপে এই নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি উল্লেখ করছি।

ঈদের নামাযের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

১. ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা কোন নামাযেই আযান-ইকামত নেই। এই দুই নামাযে জামাত অপরিহার্য, কিন্তু আযান-ইকামত বিধিবদ্ধ নয়।[১]

২. উভয় ঈদের নামায ঈদগাহ বা খোলা মাঠে আদায় করা সুন্নত।[২] বিনা ওযরে এই নামায মসজিদে আদায় করা অনুচিত ।

৩. উভয় ঈদের নামায দুই রাকাত করে। এর আগে-পরে কোন সুন্নত বা নফল নামায নেই।[৩]

১-সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮৬
২-সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮৯
৩-সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮১

৪. ঈদের নামায আদায় করার নিয়ম হল, প্রথমে মনে মনে ঈদের নামাযের নিয়ত করবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে কানের লতি পর্যন্ত হাত ওঠাবে। তারপর হাত বাঁধবে ও সানা পড়বে। সানা পড়া শেষ হলে 'আল্লাহু আকবার' বলবে এবং তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত ওঠাবে; এরপর হাত ছেড়ে দেবে। দুই-এক বার 'সুব্হানাল্লাহ' পড়া যায় এ পরিমাণ সময় অপেক্ষা করে দ্বিতীয়বার তাকবীর দেবে এবং উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত ওঠাবে, এরপর হাত ছেড়ে দেবে। এবারও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কানের লতি পর্যন্ত হাত ওঠাতে ওঠাতে তাকবীর দেবে এবং হাত বেঁধে নেবে। এবার যথানিয়মে 'আউযুবিল্লাহ' 'বিসমিল্লাহ' পড়ে ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা পড়বেন এবং অন্য একটি সূরা মিলাবেন। আর মুক্তাদীরা চুপ থাকবে। তারপর যথানিয়মে তাকবীর দিয়ে রুকূতে যাবে এবং রুকূ-সেজদা সমাপ্ত করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় রাকাতে ইমাম সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। আর মুক্তাদীরা চুপ থাকবে। ইমামের কেরাত সমাপ্ত হওয়ার পর রুকূতে যাওয়ার আগে পূর্বের নিয়মে তিনটি বাড়তি তাকবীর দেবে এবং চতুর্থ তাকবীর দিয়ে রুকূতে যাবে। নামাযের অন্যান্য তাকবীরের মত বাড়তি ছয় তাকবীরও ইমাম-মুক্তাদী উভয়ই দেবে, তবে ইমাম উচ্চস্বরে ও মুক্তাদীরা অনুচ্চস্বরে তাকবীর দেবে। এরপর যথানিয়মে নামায শেষ করবে।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীরসহ মোট তাকবীর পাঁচটি। রুকূর তাকবীর হিসাব থেকে বাদ দিলে তাকবীর হয় চারটি। দ্বিতীয় রাকাতে রুকূর তাকবীরসহ মোট তাকবীর চারটি। তাকবীর বিষয়ক হাদীসসমূহ সামনে উল্লেখ করা হবে।

৫. ঈদের নামাযে জাহ্রী (উচ্চস্বরে) কেরাত পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে কখনো সূরা 'আ'লা' ও সূরা 'গাশিয়াহ' আবার কখনো সূরা 'কাফ' ও সূরা 'কামার' পড়তেন।[১]

৬. নামায শেষ হওয়ার পর দাঁড়িয়ে আরবী ভাষায় দুটি খুতবা দেওয়া সুন্নত এবং দুই খুতবার মাঝে বসাও সুন্নত। ঈদের খুতবা নামাযের পরে হবে, আগে নয়।[২]

১-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৮৭, ৮৯১

২-সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৬২, ৯৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১২৮৯; মুসনাদুশ শাফেয়ী (কিতাবুল উম্ম) খ. ৫, পৃ. ৪৭৩

কতিপয় গায়রে মুকাল্লেদ ভাইয়ের এই বক্তব্য- 'দুই ঈদে একটি করে খুতবা হবে' সহীহ হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত কর্মের পরিপন্থী।

ঈদের নামাযে মোট তাকবীর কয়টি

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত তাকবীর ও রুকূর তাকবীর সবমিলে পাঁচ তাকবীর হয়। রুকূর তাকবীর বাদ দিলে ফাতেহা ও সূরার আগে যে তাকবীরসমূহ থাকে তা চারটি। আর দ্বিতীয় রাকাতে ফাতেহা ও সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর যে তাকবীরসমূহ হয় রুকূর তাকবীরসহ তার সংখ্যা চার। তাহলে এক হিসাবে প্রতি রাকাতে তাকবীর সংখ্যা চারটি করে মোট আটটি। আর অপর হিসাবে প্রথম রাকাতে পাঁচ এবং দ্বিতীয় রাকাতে চার সর্বমোট নয় তাকবীর হবে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে তিনটি করে ছয়টি। বাকিগুলো তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর। এবার এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ লক্ষ করুন-

١. عن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدّثني بعض أصحاب النّبيّ صلّى اللّهُ عليه وسلّم قال: صلّى بنا النّبيُّ صلّى اللّهَ عليه وسلّم يوم عيد فكبّر أربعا وأربعا ثمّ أقبل علينا بوجهه حين انصرف، فقال: لا تنسوا، كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه.

رواه الطحاوي وقال: هذا حديث حسن الإسناد، وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية، ليس كمن روينا عنه الآثار الأول. فإن كان هذا الباب من طريق صحة الإسناد يؤخذ فإن هذا أولى أن يؤخذ به مما خالفه غيره. قال الراقم: أراد بالحسن الصحيح، كما يدل عليه السياق والواقع، ولم يكن الطحاوي ممن يفرق بين الصحيح والحسن.

১. "প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আব্দুর রহমান কাসেম (ইবনে আব্দুর রহমান) বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী ঈদের দিন আমাদের নামায পড়ান এবং চারটি করে তাকবীর দেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করেন, ভুলো না যেন। তারপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে বাকি চার অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন,

জানাযার তাকবীরের মত (ঈদের নামাযেও চারটি করে তাকবীর হয়ে থাকে)।"[১]

এই হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী 'সিকাহ' নির্ভরযোগ্য। ইমাম তহাবী (রহ.)এর ভাষ্য অনুযায়ী এঁদের বর্ণনাসমূহ সহীহ হওয়া একটি প্রসিদ্ধ কথা। ইমাম তহাবী (রহ.) এও বলেছেন যে, এই হাদীসের সনদ ওই সব হাদীসের সনদ থেকে অধিক সহীহ যেখানে বারো তাকবীরের কথা উল্লেখ আছে।

٢. عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عليه وَسلّم يُكبّرُ فِي الأَضحى والفطر؟

فقال أبُوْ مُوسى : كَان يَكبّرُ أربَعًا تكبيرَةً على الجنائز، فقال حُذيفةُ: صدق، فقال أبُو مُوسى: كذلكَ كُنتُ أُكبّرُ في البصرة حيثُ كُنتُ عليهم. قال أبُو عائشةَ: وأنا حَاضرٌ سَعيدَ بنَ العَاص.

وفي رواية ابن أبي شيبة في «المصنف» زيادة : فما نسيت قوله أربعا كالتكبير على الجنازة. أخرجه أحمد في «مسنده» ٤:٤١٦، وأبو داود في «سننه» ١: ١٦٣.

২. "(প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম) মাকহূল (দামেস্কী) বলেছেন, আমাকে আবু হুরায়রা (রা.)এর একজন সঙ্গী আবু আয়েশা (আলউমাভী) জানিয়েছেন যে, (কুফার আমীর) সাঈদ ইবনুল 'আস আবু মূসা আশআরী (রা.) ও হুযায়ফা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর-এ কয় তাকবীর দিতেন? আবু মূসা (রা.) উত্তরে বলেন, জানাযার তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। হুযায়ফা (রা.) (আবু মূসা রা.এর সমর্থনে) বললেন, তিনি ঠিক বলেছেন। আবু মূসা (রা.) আরো বললেন, আমি যখন বসরার আমীর হিসেবে সেখানে অবস্থান করছিলাম তখন আমি সেখানে এভাবে চার তাকবীর দিতাম।

আবু আয়েশা বলেন, সাঈদ ইবনুল 'আসের এই প্রশ্নের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আবু মূসা (রা.)এর বাক্য 'জানাযার মত চার

১–তহাবী শরীফ খ. ২, পৃ. ৩৭১ (কিতাবুয যিয়াদাত ১ম বাব)

তাকবীর' এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।"[১]

সনদের বিবেচনায় এই হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের এবং হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হাদীসেরই একটি প্রকার।[২]

সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া ও আমল

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, দুই ঈদের নামাযে (প্রতি রাকাতে) জানাযার মত চার তাকবীর হবে।[৩]

রেওয়ায়েতটির সনদ 'সহীহ'। হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়েদে (খ. ২, পৃ. ৪৪২) বলেছেন, رجاله ثقات 'রেওয়ায়েতটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।'

১-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৫০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা খ. ৪, পৃ. ২১৩, হাদীস ৫৭৪৪

২-আসারুস সুনান ৩১৪

الحديث سكت عليه أبو داود ثم المنذري بعده، فأقل أحواله أن يكون صالحا للعمل، وقال النيموي في «آثار السنن» ص ٣١٤: «إسناده حسن». ولا وجه لإعلاله بابن ثوبان؛ فإن الراجح فيه التوثيق، وما فيه من جرح لا ينزله عن درجة الحسن، ولذا ذكره الذهبي في رسالته: «من تكلم فيه وهو موثق» ص ١٣٣، وأبو عائشة من التابعين من طبقة الحسن وابن سيرين، وهو قرشي أموي، وناهيك أنه كان جليسا لأبي هريرة، وروى عنه إمامان: مكحول وخالد بن معدان، فهو أرفع مما قيل في التقريب من أنه مقبول، ولحديثه هذا شواهد صحيحة من مرفوع وموقوف.

وأما إعلال البيهقي قائلا: «والمشهور أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه...، ولو كان عند أبي موسى فيه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل ابن مسعود»، ففيه نظر واضح، فالقصتان مختلفتان، احداهما لم يشهدها ابن مسعود، راجع سياقهما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره، وكان من شأن الصحابة عند الإفتاء أو التحديث الإحالة على غيره، ولو كان عنده علم، وهذا معروف من أمرهم، وأما أبو موسى الأشعري فهو القائل: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يريد عبد الله بن مسعود.

৩-আলমু'জামুল কাবীর, তবরানী খ. ৯, পৃ. ৩০৫, হাদীস ৯৫২২

জানাযার মত দুই ঈদের তাকবীর চারটি হওয়ার ব্যাখ্যা খোদ ইবনে মাসউদ (রা.)এর বিভিন্ন আলোচনায় রয়েছে। এখানে তাঁর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল-

عَنْ كُرْدُوْسٍ قَالَ: أَرْسَلَ الْوَلِيْدُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِيْ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا عِيْدُ الْمُسْلِمِيْنَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ فَقَالُوْا: سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ، فَتِلْكَ خَمْسٌ، ثُمَّ يَقُوْمُ، فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ فِيْ آخِرِهِنَّ، فَتِلْكَ تِسْعٌ فِي الْعِيْدَيْنِ، فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ.

رواه الطبراني، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢: ٢٠٥: رجاله موثقون، وقال النيموي في «آثار السنن» ص ٣١٥: «إسناده حسن». وله شواهد كثيرة بأسانيد صحيحة.

"কুরদূস (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়ালীদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হুযায়ফা (রা.) আবু মাসউদ (রা.) এবং আবু মূসা আশআরী (রা.)এর কাছে ইশার নামাযের পর একথা জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠাল যে, মুসলিম জাতির ঈদ অত্যাসন্ন। এর নামাযের নিয়ম কী হবে? (সাহাবীগণ) সবাই (দূতকে) বললেন, আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ)কে জিজ্ঞেস করুন। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তিনি উত্তরে বললেন, (নামাযে) দণ্ডায়মান হবে এবং চার তাকবীর দেবে। এরপর সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। তারপর রুকূর তাকবীর দিয়ে রুকূ করবে। (প্রথম রাকাতে) এই পাঁচ তাকবীর হল। তারপর (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) ওঠবে এবং সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। তারপর চার তাকবীর দেবে এবং শেষ তাকবীরের সময় রুকূ করবে। (দুই রাকাতে) সর্বমোট নয় তাকবীর হল। (এটাই) দুই ঈদের নিয়ম। উপস্থিত সাহাবীগণ কেউই তার সাথে দ্বিমত করেননি।"

উপরোক্ত বর্ণনায় ঈদের তাকবীরের যে নিয়ম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) অপর তিন সাহাবীর উপস্থিতিতে শিক্ষা দিয়েছেন এই একই নিয়ম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত আনাস (রা.) এবং হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা.) থেকেও 'সহীহ' সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের রেওয়ায়েতসমূহ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা খ. ৪, পৃ. ২১৬-২১৭; মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক খ. ৩, পৃ.

২৯৪-২৯৫ এবং তহাবী শরীফ খ. ২, পৃ. ৩৭২-৩৭৩-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকেও এই নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। তবে শেষোক্ত তিন সাহাবীর রেওয়ায়েতে সাধারণ কিছু আপত্তির সুযোগ আছে।

ঈদের তাকবীর প্রসঙ্গে 'সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া ও আমল' শিরোনামে যে আলোচনা চলছে এ ব্যাপারে একটি মৌলিক কথা মনে রাখা খুব জরুরি তা হল নামাযে তাকবীর কয়টি হবে–এ এমন কোন বিষয় নয় যা কিয়াস ও যুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায়। কেননা, ইবাদতের নিয়মপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ওহীর ওপর নির্ভরশীল। তাই এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের কোন শিক্ষা শুধু কিয়াসের ভিত্তিতে হওয়া সম্ভবপর নয়। এর বুনিয়াদ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত সাহাবীগণকে ঈদের নামাযের নিয়মপদ্ধতি নবীজীই শিখিয়েছেন এবং তাঁরা পরবর্তী ব্যক্তিদেরকে সেই নিয়মই শিক্ষা দিয়েছেন। এজন্য ঈদের নামাযের তাকবীর প্রসঙ্গে যে নিয়ম আমরা একাধিক সাহাবীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছি একে তাঁদের কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর মত আখ্যা দেওয়া– যা আমাদের অনেক গায়রে মুকাল্লেদ ভাইদের অভ্যাস– একটি মারাত্মক অন্যায়। এধরনের কথাবার্তা সাহাবায়ে কেরামের শানে বেয়াদবির শামিল। কেননা তাদের কথার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নিজেদের মনমতো একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক!)

তাছাড়া এই শিরোনামের আগের শিরোনামে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। এরপর তো আর কোন কথাই বাকি থাকা উচিত নয়। কিন্তু আপনি ওই সব বন্ধুদের কাছে যান। দেখবেন তারা এই সহীহ হাদীসগুলোকে 'যয়ীফ' প্রমাণ করার জন্য যেন মরণপণ চেষ্টা করছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়েত নসীব করুন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) 'মুয়াত্তা'এর দুটি অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত্তামহীদ' খ. ১৬, পৃ. ৮৭ ও 'আলইস্তিযকার' খ. ৭, পৃ. ৪৯-এ এধরনের এক প্রসঙ্গে বড় সুন্দর কথা লিখেছেন–

ومعلوم أن هذا وما كان مثله لا يكون رأيا، لأنه لا فرق من جهة الرأي والاجتهاد بين سبع في هذا وأربع، ولا يكون إلا توقيفا ممن يجب التسليم له.

"যুক্তির বিচারে 'সাত' এবং 'চার'এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এজন্য এ ধরনের বিষয় কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর হতে পারে না। এটা একমাত্র ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ভিত্তিতেই হতে পারে।"

সারকথা, দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি এবং তাকবীর সংখ্যা– যা ফিক্‌হে হানাফীতে বলা হয়েছে এবং যে মোতাবেক অসংখ্য মানুষ ঈদের নামায আদায় করছে– তার ভিত্তি প্রথমত সহীহ হাদীসের ওপর এবং দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষার ওপর, নববী শিক্ষাই যার উৎস।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়ীগণ নামায শিখেছেন। আপনি হাদীস ও আসারের সংকলনসমূহ হাতে নিন, শুধু মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা এবং শরহু মাআনিল আসার'ই পড়ে দেখুন, সেখানে অনেক তাবেয়ী ইমামকে এই নিয়ম শিক্ষা দিতে এবং এই ফতোয়া দিতেই দেখবেন, যা বিভিন্ন হাদীস ও আসারের উদ্ধৃতিতে আমরা ইতিপূর্বে লিখে এসেছি।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে একটি পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহর অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ এবং অগণিত আলেম উলামার মাধ্যমে অনুসৃত হয়ে আসছে আর আমাদের গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা কলমের এক খোঁচাতেই তাকে 'গলদ' সাব্যস্ত করে ফেলছেন অথবা হুট করে বলে বসছেন যে, এই পদ্ধতি কিয়াস-নির্ভর। এর স্বপক্ষে না কোন সহীহ হাদীস আছে, আর না কোন যয়ীফ হাদীস। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়েত নসীব করুন এবং চোখের জ্যোতি ও দিলের নূর উভয়টাই দান করুন। যাতে তারা হাদীসের কিতাবসমূহে উল্লিখিত হাদীস ও আসারসমূহ দেখতে পান এবং তার মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

তাকবীর বিষয়ক মতভিন্নতার ধরন

সবশেষে এই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে ঈদের নামাযের তাকবীর সংক্রান্ত আরো কিছু নিয়ম বর্ণিত আছে। সেসবের মধ্যে বারো তাকবীরের নিয়মটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ বা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া (দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা অনুসারে) সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর। এই পদ্ধতিতে উভয় রাকাতে তাকবীরসমূহ কেরাতের আগে বলতে হয়। ফিক্‌হের বেশ কয়েকজন ইমাম এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং অন্য দুএকজন সাহাবী থেকে এই পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে এবং এর সমর্থনে হাসান পর্যায়ের দুএকটি মারফূ হাদীসও রয়েছে।[১]

বারো তাকবীরের কথাও যেহেতু হাদীস শরীফে আছে, তাই এটিও একটি জায়েয পন্থা। কোন দেশে বা কোন ঈদগাহে যদি এই পদ্ধতিতে নামায হয় তাহলে সেখানে আপত্তি করার প্রয়োজন নেই। ঝগড়া-বিবাদের তো প্রশ্নই আসে না। মনে রাখতে হবে, এ মাসআলায় যে মতভিন্নতা রয়েছে তা জায়েয-নাজায়েয নিয়ে নয়; বরং কোন্ পদ্ধতিটি উত্তম তা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে ফিক্‌হে হানাফীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী (রহ.) 'মুয়াত্তা'এ বলেন, "দুই ঈদের তাকবীরের ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। সুতরাং তুমি যেটাই গ্রহণ করবে সেটাই ভাল, তবে আমাদের মতে সেই নিয়মটিই উত্তম যা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি প্রত্যেক ঈদে নয় তাকবীর বলতেন, প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীরসহ পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে রুকূর তাকবীরসহ চার তাকবীর। প্রথম রাকাতের কেরাত তাকবীরের পরে এবং দ্বিতীয় রাকাতের কেরাত তাকবীরের আগে পড়তেন। এটাই আবু হানীফা (রহ.)এর মত।"[২]

ফিক্‌হে হাম্বলীর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)ও বলেছেন যে, ঈদের তাকবীর প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ ছিল। তাঁদের অনুসৃত পন্থাগুলোর যে কোনটিই অবলম্বন করা যায়।[৩]

ফিক্‌হে মালেকীর সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) এই মতভেদের ব্যাপারে বলেন, এসব পদ্ধতির সবগুলোই জায়েয। কোনটিতেই কোন অসুবিধা নেই। সকল পদ্ধতিই সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণ করেছেন।[৪]

ফিক্‌হে হাম্বলীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)ও

---

(١) وذلك إذا اعترفوا بمنهج أئمة الحنفية في النقد، وأما علي طريقة إخواننا غير المقلدين في جرح أدلة أئمة الفقه، فتلك ضعيفة بالطريق الأولى، كما يعلمون هم أنفسهم.

২-মুয়াত্তা মুহাম্মাদ পৃ. ১৪১

৩-ফাতহুল বারী, ইবনে রজব হাম্বলী খ. ৬, পৃ. ১৭৯

৪-আলইস্‌তিয্‌কার খ. ৭, পৃ. ৫৪

তাকবীরের এই মতভেদকে শুধু উত্তম নির্ণয়ের মতভেদ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, এর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে অপর পদ্ধতিকে ভুল বলা বা তার ব্যাপারে আপত্তি করা একটি ভ্রান্তি।[১]

কত ভাল হত যদি আমাদের গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুগণ ইবনে তাইমিয়া (রহ.)এর এই অবস্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন! তারা তো নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী হিসেবেই প্রকাশ করেন। কিন্তু কোথায় ইবনে তাইমিয়া (রহ.)এর ইলম ও ফিক্হ, তাক্ওয়া ও ইনসাফপ্রিয়তা, আর কোথায় তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুবর্গ!!

সবশেষে যে প্রশ্নটি বাকি থাকে তা হল, যখন উভয় পন্থাই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রচলিত ছিল তো হানাফী ফকীহগণ প্রথমটিকে (যেখানে দুই রাকাতে অতিরিক্ত তাকবীর সর্বমোট ছয়টি) উত্তম বলছেন কেন? এর জবাব হল, এ পদ্ধতিটিকে উত্তম বলার অনেক কারণ আছে। যথা :

১. হাদীস শরীফে এই পন্থাটি অত্যন্ত তাকিদ ও গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এ পদ্ধতিতে নামায পড়েছেন শুধু তা-ই নয়, নামায শেষে আবার মৌখিক আলোচনার মাধ্যমেও পদ্ধতিটি শিখিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন, তোমরা ভুলে যেয়ো না। এরপর হাতের অঙ্গুলি তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন তাকবীরের সংখ্যা কয়টি হবে।

২. এ পদ্ধতি যে হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সনদ অন্যান্য পদ্ধতির হাদীসগুলোর সনদের চেয়ে অধিক সহীহ ও শক্তিশালী।

৩. প্রবীণ ও বড় বড় সাহাবীর আমল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি মোতাবেক ছিল। তাঁদের এক বড় জামাত থেকে এ পদ্ধতিটিই বর্ণিত হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লেদ ভাইদের এই দাবি যে, খুলাফায়ে রাশেদীন অন্য পদ্ধতিটি (বারো তাকবীর) অনুসরণ করেছেন, তা ঠিক নয়। কেননা, তারা যে বর্ণনার ভিত্তিতে এই দাবিটি করেন একে তো তার সনদ বা সূত্র 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন।) দ্বিতীয়ত সেই সনদে ইবরাহীম আলআসলামী নামীয় এক ব্যক্তি আছে যে মাতরূক (পরিত্যাজ্য)। এমনকি তাকে কায্যাব (মিথ্যাবাদী)ও বলা হয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি কারণ ছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে এই পদ্ধতিটি উত্তম, যার

১-মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া খ. ২৪, পৃ. ২২৪; রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন, ইবনে তাইমিয়া পৃ. ৪৫-৪৮, ৫৯-৬২

বিস্তারিত বিবরণ ফিক্হের দলিলবিষয়ক বড় বড় কিতাবে রয়েছে।

এসব আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই মাসআলায় গায়রে মুকাল্লেদ ভাইদের সাথে আমাদের মতভেদ এই জায়গায় নয় যে, তারা যে পদ্ধতিটি কোন কোন ইমামের তাকলীদ করে প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ বারো তাকবীরের পদ্ধতি, তা ভুল বা খেলাফে সুন্নত; তাদের ওপর আমাদের আপত্তি হল, তারা নিজেদের অবলম্বিত পদ্ধতিটিকেই একমাত্র মাসনূন পদ্ধতি বলে থাকেন এবং অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে এই দাবি করেন যে, হানাফীরা যে পদ্ধতিতে ঈদের নামায পড়ে তার প্রমাণে না কোন সহীহ হাদীস আছে, আর না কোন সাহাবীর আমল; তাদের পদ্ধতিটি একটি ভিত্তিহীন ও খেলাফে সুন্নত পদ্ধতি। নাউযুবিল্লাহ মিন-যালিক!

তাদের এই উভয় দাবি একদম ভুল। কেননা, তাদের অবলম্বিত পদ্ধতিটি ঈদের নামাযের একমাত্র পদ্ধতি নয়। একাধিক জায়েয পদ্ধতির একটি। তার বিপরীতে শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অধিকাংশই যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছেন এবং যা দলিলের বিচারেও অগ্রগণ্য আমরা তা-ই অবলম্বন করেছি।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং প্রতিটি মতভেদকে তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার তাওফীক দান করুন। মাসাআলা-মাসায়েলের যে ইখতেলাফ শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদিত ও সমর্থিত তার মাধ্যমে নিজেদের ঐক্য ও শক্তিমত্তাকে বিনষ্ট করা থেকে নিরাপদ রাখুন, আমীন।

[অক্টোবর-নভেম্বর '০৫ ঈ.]

বিতর নামায আদায়ের পদ্ধতি

একটি প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : আরামবাগ এলাকার এক মসজিদের খতীবকে অনেকবার এ কথা বলতে শুনেছি যে, বিতর নামাযের একাধিক পদ্ধতি হাদীসের কিতাবে রয়েছে, তবে হানাফীরা যেভাবে বিতর পড়ে, অর্থাৎ দুই বৈঠক ও এক সালামে তিন রাকাত-এই পদ্ধতি হাদীস শরীফে নেই। তার বক্তব্য হল, বিতর যদি তিন রাকাতই পড়তে হয় তাহলে দ্বিতীয় রাকাতে বসা যাবে না। অন্যথায় তা মাগরিবের নামাযের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। আর হাদীস শরীফে বিতরকে মাগরিবের সাদৃশ্য বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, দুই বৈঠক ও এক সালামে কি বিতর পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়? যদি না থাকে তাহলে আমরা কোন ভিত্তিতে এভাবে বিতর নামায আদায় করছি?

ইবনে আক্তার
ধানমণ্ডি, ঢাকা
০৫/০৫/২০০৯ঈ.

উত্তর :

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد.

আলহামদু লিল্লাহ, ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল লাযিনাস তাফা, আম্মা বাদ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত তাহাজ্জুদের পর বিতর নামায পড়তেন। এটি ছিল নবীজীর সাধারণ অভ্যাস। বয়স ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থার কারণে তাহাজ্জুদের রাকাতসংখ্যা কম-বেশি হত। কিন্তু বিতর সর্বদা তিন রাকাতই পড়তেন। এক রাকাত বিতর পড়া নবীজী থেকে প্রমাণিত নয়। যে সব রেওয়ায়াতে পাঁচ, সাত বা নয় রাকাতের কথা এসেছে, তাতেও বিতর তিন রাকাতই। বর্ণনাকারী আগে-পরের রাকাত মিলিয়ে সমষ্টিকে 'বিতর' শব্দে ব্যক্ত

করেছেন। হাদীসের রেওয়ায়াতসমূহে ব্যাপকভাবে বিতর ও তাহাজ্জুদের সমষ্টিকে 'বিতর' বলা হয়েছে। এটি একটি উপস্থাপনাগত বিষয়।

নবীজী বিতর তিন রাকাত পড়তেন। এটিই তাঁর অনুসৃত পন্থা। নিম্নের হাদীসসমূহ থেকে বিষয়টি সুপ্রমাণিত।

আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রমযানে নবীজীর নামায কেমন হত? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে এবং রমযানের বাইরে এগার রাকাতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না! এরপর আরও চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা তো বলাই বাহুল্য! এরপর তিন রাকাত (বিতর) পড়তেন। –সহীহ বুখারী ১/১৫৪, হাদীস ১১৪৭; সহীহ মুসলিম ১/২৫৪, হাদীস ৭৩৮; সুনানে নাসায়ী ১/২৪৮, হাদীস ১৬৯৭; সুনানে আবু দাউদ ১/১৮৯, হাদীস ১৩৩৫; মুসনাদে আহমদ ৬/৩৬, হাদীস ২৪০৭৩

সা'দ ইবনে হিশাম (রহ.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) তাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন না। –সুনানে নাসায়ী ১/২৪৮; হাদীস ১৬৯৮; মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ১৫১ (বাবুস সালাম ফিল বিতর) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৪, হাদীস ৬৯১২; সুনানে দারাকুতনী ২/৩২, হাদীস ১৫৬৫; সুনানে কুবরা বাইহাকী ৩/৩১

এই হাদীসটি ইমাম হাকেম আবু আব্দুল্লাহ (রহ.)ও 'মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তার আরবী পাঠ এই–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন না।

ইমাম হাকেম (রহ.) তা বর্ণনা করার পর বলেন–

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

অর্থাৎ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ। ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) 'তালখীসুল মুস্তাদরাক'-এ হাকেম (রহ.)-এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। –মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন ১/৩০৪, হাদীস ১১৪০

এই হাদীস দ্বারা একদিকে যেমন প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাধারণ নিয়মে তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন,

তেমনি একথাও প্রমাণিত হয় যে, তিন রাকাতের দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদের জন্য বসতেন, কিন্তু সালাম ফেরাতেন না। সালাম ফেরাতেন সবশেষে তৃতীয় রাকাতে। যদি দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করার নিয়ম না থাকত তাহলে সালাম করার বা না করার প্রসঙ্গই আসত না। কেননা সালাম তো ফেরানো হয়ে থাকে বৈঠকে।

ইমাম ইবনে হাযম যাহেরী (রহ.) 'মুহাল্লা' কিতাবে বিতরের বিভিন্ন পদ্ধতির মাঝে আলোচিত পদ্ধতিটিও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বিতর তিন রাকাত পড়া হবে। দ্বিতীয় রাকাতে বসবে এবং (তাশাহহুদ পড়ে) সালাম ফেরানো ছাড়াই দাঁড়িয়ে যাবে। তৃতীয় রাকাত পড়ে বসবে, তাশাহহুদ পড়বে এবং সালাম ফেরাবে, যেভাবে মাগরিবের নামায পড়া হয়। এটিই ইমান আবু হানীফা (রহ.)-এর মত। এর দলিল হচ্ছে, সাদ ইবনে হিশাম (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যাতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন না। –মুহাল্লা ইবনে হাযম ২/৮৯

সাদ ইবনে হিশাম (রহ.)-এর রেওয়ায়াতটি আরও একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার আরবী পাঠ নিম্নরূপ–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর পড়তেন এবং শুধু সর্বশেষ রাকাতে সালাম ফেরাতেন।

হাকেম (রহ.) এই রেওয়ায়াতের পর লেখেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)ও এভাবে বিতর পড়তেন এবং তাঁর সূত্রে মদীনাবাসীগণ তা গ্রহণ করেছেন। –মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন ১/৩০৪, হাদীস ১১৮১

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কাইস বলেন–

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ؟ قَالَتْ: يُوْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَّثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَّثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَّثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَّثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

অর্থাৎ আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবীজী বিতরে কত রাকাত পড়তেন? উত্তরে তিনি বলেন, চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন। তিনি বিতরে সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক পড়তেন না। –সুনানে আবু দাউদ ১/১৯৩, হাদীস ১৩৫৭ (১৩৬২); তহাবী শরীফ ১/১৩৯; মুসনাদে আহমদ ৬/১৪৯, হাদীস ২৫১৫৯

চিন্তা করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায কখনো চার রাকাত, কখনো ছয় রাকাত, কখনো আট রাকাত, কখনো দশ রাকাত পড়তেন; কিন্তু মূল বিতর সর্বদা তিন রাকাতই হত।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ফাতহুল বারী ৩/২৬ كتاب التهجد-এর باب كيف صلاة الليل-এ লেখেন– هذا أصح ما وقفت عليه من ذلك وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك والله أعلم.

"আমার জানামতে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধিক সহীহ রেওয়ায়াত। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এর দ্বারা সে সবের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব।"

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ ও বিতর প্রত্যক্ষ করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এক রাতে তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন। তিনি যা যা প্রত্যক্ষ করেছেন বর্ণনা করেছেন। তাঁর শাগরেদরা সে বিবরণ বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে সুনানে নাসায়ী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাব থেকে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করছি– 'মুহাম্মাদ ইবনে আলী তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয্যা থেকে উঠলেন, এরপর মেসওয়াক করলেন, এরপর দুই রাকাত পড়লেন, এরপর শুয়ে গেলেন। তারপর পুনরায় শয্যা ত্যাগ করলেন, মেসওয়াক করলেন, অযু করলেন এবং দুই রাকাত পড়লেন; এভাবে ছয় রাকাত পূর্ণ করলেন। এরপর তিন রাকাত বিতর পড়লেন। এরপর দুই রাকাত পড়েন। حتى صلى ستا ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين–সুনানে নাসায়ী ১/২৪৯, হাদীস ১৭০৪; মুসনাদে আহমাদ ১/৩৫০, হাদীস ৩২৭১; তহাবী শরীফ ১/২০১-২০২

(৫) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম সাঈদ ইবনে জুবাইর, যিনি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْرَأُ فِي الْأُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর পড়তেন, প্রথম

রাকাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা', দ্বিতীয় রাকাতে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন।" –সুনানে দারেমী ১/৩১১, হাদীস ১৫৯৭; জামে তিরমিযী ১/৬১, হাদীস ৪৬২; সুনানে নাসায়ী ১/২৪৯; হাদীস ১৭০২; তহাবী শরীফ ১/২০১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৪/৫১২, হা. ৬৯৫১

ইমাম নববী (রহ.) 'আলখুলাসা' কিতাবে উক্ত হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। –নাসবুর রায়াহ, জামালুদ্দীন যাইলায়ী ২/১১৯

বিতরের তিন রাকাতে উপরোক্ত তিন সূরা, এক এক রাকাতে এক এক সূরা পড়া সম্পর্কে একাধিক সাহাবী থেকে রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিটি রেওয়ায়াত প্রমাণ করে যে, বিতরের নামায তিন রাকাত।

মোটকথা, বিতরের নামায তিন রাকাত হওয়ার বিষয়ে হাদীস ও সুন্নাহর বহু প্রমাণ রয়েছে এবং অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমলও তাই ছিল। এখানে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করছি–

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ خُذْ عَنِّي فَإِنِّي أَخَذْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهِ وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ أَحَدٍ أَوْثَقَ مِنِّي قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ يُسَلِّمُ فِيْ آخِرِهِنَّ.

"প্রসিদ্ধ তাবেয়ী সাবেত বুনানী (রহ.) বলেন, আমাকে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রহ.) বলেছেন, হে আবু মুহাম্মাদ! (সাবেত রা.-এর কুনিয়াত-উপনাম) আমার কাছ থেকে শিখে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিখেছি। আর তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থেকে। তুমি শেখার জন্য আমার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য কাউকে পাবে না। একথা বলে তিনি আমাকে নিয়ে ইশার নামায আদায় করেন। এরপর ছয় রাকাত পড়েন, তা এভাবে যে, প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরান। এরপর তিন রাকাত বিতর পড়েন এবং সবশেষে সালাম ফেরান।" –মুসনাদে রুয়ানী, তারীখে ইবনে আসাকির; ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন, এই হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য (কানযুল উম্মাল ৮/৬৬-৬৭, হাদীস ২১৯০২ 'আলবিতরু মিন কিতাবিস সালাত, কিসমুল আফআল)

জরুরি জ্ঞাতব্য

বিতর নামাযের ব্যাপারে আজকাল এক ব্যাপক অবহেলা এই পরিলক্ষিত হচ্ছে

যে, একে এমন এক নামায মনে করা হয় যার আগে কোন নফল নামায নেই, যেমন মাগরিবের নামায; এর আগে নফল নামায মাসনূন নয়; অথচ বিতরের ব্যাপারে শরীয়তের কাম্য এই যে, তা কিছু নফল নামায পড়ার পর আদায় করা। সবচেয়ে ভাল এই যে, যার শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগার নিশ্চয়তা রয়েছে, সে তাহাজ্জুদের পরে বিতর পড়বে। যদি বিতর রাতের শুরু ভাগে ইশার পর পড়া হয় তবুও উত্তম এই যে, দুই-চার রাকাত নফল নামায পড়ার পর বিতর আদায় করবে। মাগরিবের মত আগে কোন নফল ছাড়া শুধু তিন রাকাত বিতর পড়া পছন্দনীয় নয়।

হাদীস শরীফে আছে–

لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

"তোমরা শুধু তিন রাকাত বিতর পড়ো না, এতে মাগরিবের সাদৃশ্যপূর্ণ করে ফেলবে; বরং পাঁচ, সাত, নয়, এগার বা এরও অধিক রাকাতে বিতর পড়ো।" –মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৩০৪, হাদীস ১১৭৮; সুনানে কুবরা বাইহাকী ৩/৩১, ৩২

মোটকথা, বিতরের আগে কিছু নফল অবশ্যই পড়–দুই, চার, ছয়, আট–যত রাকাত সম্ভব হয় পড়ে নাও। ৩ নং-এর অধীনে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন–বিভিন্ন সংখ্যায় রাতের নামায আদায় করতেন। উল্লিখিত হাদীসে ওই নির্দেশনাই এসেছে যে, শুধু তিন রাকাত বিতর পড়ো না, আগে কিছু নফল অবশ্যই পড়। তবে বিতর সর্বাবস্থায় তিন রাকাতই।

উক্ত হাদীসের সাথে একথার কোন সম্পর্ক নেই যে, তিন রাকাত এক বৈঠকেই পড়তে হবে, তাহলেই শুধু তা মাগরিবের সাদৃশ্য থেকে বেঁচে যাবে। তাই তিন রাকাত পড়তে হলে তা এক বৈঠকেই পড়তে হবে।

স্মরণ রাখতে হবে, মাগরিবের সাদৃশ্য থেকে বাঁচার পদ্ধতি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তিন রাকাত বিতরের আগে নফল পড়ে নাও। হাদীসের ব্যাখ্যা ছেড়ে নিজের পক্ষ থেকে বিতরের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শরীয়তে সকল নামাযের মূলকথা এই যে, প্রতি দুই রাকাতে বৈঠক হবে এবং তাশাহহুদ পড়া হবে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে সহীহ মুসলিম ১/১৯৪, হাদীস

৪৯৮-এ একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক ব্যাপক বাণী উদ্ধৃত রয়েছে। তাতে তিনি ইরশাদ করেন–

وَفِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ

"প্রতি দুই রাকাতে তাশাহহুদ রয়েছে।" একই হুকুম একাধিক সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। শরীয়তের ব্যাপক শিক্ষা পরিহার করে কোন রেওয়ায়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে একথা বলা যে, তিন রাকাত বিতর পড়লে শুধু এক বৈঠকেই পড়া–এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা– من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা উম্মতকে উক্ত অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপরই লেখাটি সমাপ্ত করছি। তবে বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ তাই আগামী কোনো সংখ্যায় হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী (রহ.)এর একটি বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ করা হবে, যা তাঁর 'ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম' কিতাবে প্রকাশিত হয়েছে। #

هذا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[মে '১০ঈ.]

ইমাম ও খতীব-প্রসঙ্গ : শর্ত, যোগ্যতা ও নির্বাচন-পদ্ধতি

তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। ঈমানের পরে একজন মুসলিমের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নামায। ইসলাম নামাযকে ইসলামের শি'আর (নিদর্শন) এবং নামায পরিত্যাগ করাকে কুফর ও শিরকের শি'আর সাব্যস্ত করেছে। ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শন হওয়ার কারণেই ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জুমার নামাযের গুরুত্ব আরো বেশি। জুমার নামায সহীহ হওয়ার জন্য জামাত শর্ত। জামাতবিহীন জুমার নামাযের কোনো ধারণাই শরীয়তে নেই।

জামাতের জন্য ইমাম শর্ত। ইমাম ছাড়া জামাত হয় না। ইসলামে ইমাম ও ইমামত-প্রসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জুমার নামাযে ইমামতির বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ইমামতির সাথে খুৎবা ও বয়ান এবং মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃত্ব দানের বিষয়টিও জড়িত। এজন্য কাউকে ইমাম ও খতীব হিসাবে নির্বাচন করার আগে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্ত-শরায়েত বিদ্যমান আছে কি না তা যাচাই করে দেখা মসজিদ কর্তৃপক্ষের উপর ফরয। অন্যথায় অযোগ্য ব্যক্তির হাতে আমানত সোপর্দ করার দায়ে তারা গোনাহগার হবে। বিশেষত নামাযের মতো দ্বীনী ইবাদতের ক্ষেত্রে তা কত ভয়াবহ একথা তো বলাই বাহুল্য।

হাদীস শরীফের ইরশাদ অনুযায়ী ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নামাযের দায়িত্ব বহনকারী এবং মাবুদের সামনে আবিদ বান্দাদের প্রতিনিধিত্বকারী। এজন্য এমন নেককার ও দ্বীনদার ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকবে :

১. কুরআন মজীদ তাজবীদের সঙ্গে তেলাওয়াত করেন।

২. কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহ বিষয়ে পারদর্শী।

৩. 'আলআদালা' গুণের অধিকারী।

৪. আকীদা-বিশ্বাস, ইলম-আমল এবং আখলাক-চরিত্র সন্তোষজনক, যার কারণে মুসল্লীদের কারো তার প্রতি কোনো যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত আপত্তি থাকবে না এবং সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।

'আদালাহ' অর্থ হল ব্যক্তি সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া, শিরক-বিদআত থেকে মুক্ত থাকা এবং কর্ম ও চরিত্রগতভাবে নেককার হওয়া ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

যিনি ইমাম হওয়ার সাথে সাথে খতীব হবেন তার মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আরও উত্তম পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা জরুরি। কেননা, খতীব শুধু মিহরাবের দায়িত্বশীল নন, মিম্বারেরও দায়িত্বশীল। সাধারণ ইমামের চেয়ে জাতির কাছে তার মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। মানুষ তাকে দ্বীনের অনুসরণীয় ও দ্বীনী রাহনুমা মনে করে এবং তাদের এই ধারণা সঠিক। খতীব তার জাতির শিক্ষক ও ধর্মগুরু। এজন্য সাধারণ ইমামের চেয়ে তার মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা আরো বেশি জরুরি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যারা দ্বীনী বিষয়ে নেতৃত্ব দেন লোকেরা অবচেতনভাবে হলেও তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের সাথে একাত্ম হয়ে যায় এবং তাদের কর্ম ও চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই এ ধরনের পদে কাউকে নির্বাচনের সময় যদি সতর্কতা অবলম্বন না করা হয় তাহলে শুধু একটি না-জায়েয কাজই করা হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে তা মানুষের দ্বীন ও ঈমানকেও বিনষ্ট করে।

এরপর যে মসজিদে উপস্থিতি যত বেশি হবে, যে মিম্বারের গুরুত্ব শরীয়ত বা সামাজিক দিক থেকে যত বেশি হবে সেই মিহরাব-মিম্বারের দায়িত্বও তত গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং এর জন্য সতর্কতা ও সচেতনতা ওই পর্যায়ের লাগবে।

সামনের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একটি ভুল ধারণা সংশোধন করতে চাই। একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভালো-মন্দ সবার পেছনেই নামায আদায় হয়ে যায়। এর অর্থ হল কোথাও ঘটনাচক্রে এমন কোনো লোক নামায পড়িয়ে দিলে (মাকরূহ হলেও) নামায হয়ে যাবে। অর্থাৎ নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে। ওই কথার অর্থ কখনও এই নয় যে, যে কোনো ধরনের লোককে ইমাম বানানো যাবে এবং মিম্বার-মিহরাবের দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে। কখনও কোথাও নামায পড়িয়ে দেওয়া আর মসজিদের ইমাম কিংবা জামে মসজিদের খতীব বানানো–এই দুয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

মোটকথা, কারো হাতে মিহরাব-মিম্বারের দায়িত্ব অর্পণ অত্যন্ত স্পর্শকাতর

বিষয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত শর্তগুলো আছে কি না-সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ঈমানী দায়িত্ব। এ বিষয়ে কোনো ধরনের অবহেলা ইসলামের নিদর্শনের ব্যাপারেই অবহেলা প্রদর্শনের নামান্তর।

ইমাম-খতীব প্রসঙ্গে অন্যান্য শর্ত-শারায়েতের পাশাপাশি যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা করা জরুরি, তা হল ব্যক্তির চিন্তা ও আকীদা। মসজিদ হল তাওহীদের মূল কেন্দ্র। আর তাওহীদের সবচেয়ে বড় প্রকাশ নামাযে। মিম্বার ও মিহরাবের অধিকার প্রকৃতপক্ষে দ্বীনে তাওহীদের নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকার, যার সুন্নাহ গোটা উম্মতের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা তথা উত্তম আদর্শ। এই উত্তরাধিকার সেই লাভ করতে পারে, যে তাওহীদ ও সুন্নাহর ঝাণ্ডাবাহী এবং শিরক ও বেদআতের বিষয়ে সোচ্চার।

জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমকে মানুষ গোটা দেশের দ্বীনী কেন্দ্র মনে করে এবং এই মসজিদের খতীবকে গোটা দেশের উলামা-মাশায়েখের প্রতিনিধি মনে করে। এই সামাজিক গুরুত্বের কারণে এই মসজিদের মিম্বার-মিহরাবের বিষয়টি অন্যান্য মসজিদের চেয়ে অধিক সংবেদনশীল। আমরা যতদূর জানি, অতীতে এ বিষয়ে একটা পর্যায় পর্যন্ত শর্তগুলির প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। কিন্তু সাবেক খতীব মরহুমের ইন্তেকালের পর জটিলতা সৃষ্টি হয়। প্রায় দুই বছর এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। মানুষের ধারণা ছিল, সরকার বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা খুবই ন্যক্কারজনক। এত সময়ক্ষেপণ ও এত মত-বিনিময়ের পর এমন স্পর্শকাতর পদে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হল, যিনি নিজের স্বীকারোক্তি মতেই শিরক-বেদআত সম্পর্কে একেবারেই শিথিল; বরং তার চেয়েও শোচনীয়।

গত ২৫ জানুয়ারি '০৯ ঈ. 'মানবজমিন' পত্রিকায় তার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে-

"বাইতুল মুকাররম মসজিদের খতীব অধ্যাপক মাওলানা সালাহউদ্দীন বলেন, আমি আটরশির পীরের মুরীদ ছিলাম না, তবে তাঁর কাছে যেতাম, তাঁর মিলাদ মাহফিলে যোগ দিতাম, মাদরাসা-মসজিদের দেখাশোনা করতাম, তাঁর কাছ থেকে দোআ নিতাম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি তাঁর কাছের মানুষ ছিলাম। এ কারণে তাঁর মৃত্যুর পর নামাযে জানাযাও আমি পড়িয়েছি।

তিনি বলেন, ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আটরশির পীরের দরবারে যেতাম, তিনি মারা যাওয়ার পর আর যাইনি, আর যখন গিয়েছিলাম তখন আমি খতীবও ছিলাম না।

খতীব অধ্যাপক সালাহউদ্দীন বলেন, কেবল আটরশির পীরের কাছে যেতাম তা নয়, জইনপুরী হুজুরের কাছেও যেতাম, দোআ নিতাম। হযরত শাহ জালাল রাহ.-এর মাজারে যিয়ারত করেছি। আরো দুই এক জায়গায় গিয়েছি।

তিনি বলেন, আমি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করি বলেই গিয়েছি। যখন গিয়েছি তখন খতীব ছিলাম না, এখন খতীব হয়েছি। এখন কোথাও যাব না। যাওয়ার সময়ও হবে না।

তিনি বলেন, আমার পিছনে মুসল্লীদের নামায পড়তে কারো তো কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। গুটিকয়েক লোক সমস্যা করছে, যা ঠিক নয়।

তিনি বলেন, কোন পীরের দরবারে গিয়ে দোআ নিলেও কেউ তার মুরীদ হয়ে যায় না। এটাও মেনে নিতে হবে।

আরো বলা হয়েছে–

তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ একুশ বছর ধানমণ্ডি ঈদগাহ মসজিদের ইমাম ছিলাম, সেই সুবাদে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। বঙ্গবন্ধুর পত্নী আমাকে তাদের বাসায় মিলাদ মাহফিলের জন্য ডাকতেন, আমি যেতাম এবং মিলাদ মাহফিল পড়াতাম।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর পিতার মৃত্যুর সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পরে মিলাদ পড়েছি। কোরআন শরীফ পড়েছি। তিনি বলেন, এলাকার মসজিদের ইমাম হওয়ার কারণেই আমার সঙ্গে পারিবারিকভাবে পরিচয় গড়ে উঠে।"

এর সাথে এ কথাটাও মনে রাখুন যে, আটরশির সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টা যখন প্রথম প্রকাশ পেল তখন তিনি জিগাতলায় এক মসজিদের খতীব ছিলেন। ওই সময় তাকে ওই পদ থেকে অপসারণ করা হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, একটি মহল্লার মসজিদ থেকে যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে অপসারিত একজন ব্যক্তিকে জাতীয় মসজিদের খতীব বানিয়ে দেওয়া হল!

আটরশির দরবার (?) সম্পর্কে জানে না এমন কে আছে? এটি আধ্যাত্মিকতার নামে কুফর-শিরক প্রচারের একটি কেন্দ্র। কারো যদি এ বিষয়ে জানা না থাকে তাহলে তিনি বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। সেখানে ওরসের নামে কোন কাজটা হয় না? আটরশির পীর জনাব শাহ সূফী হাশমত উল্লাহর বয়ান ও বিভিন্ন মজলিসের কথাবার্তা অনেকগুলো খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। 'শাহ সূফী হযরত ফরীদপুরী' মা.জি.আ. ছাহেব-এর নসীহত' নামক ওই সংকলনে চোখ বুলালেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সচেতন ব্যক্তিরা জানেন যে, আধ্যাত্মিকতার নামে (পীরমুরীদী) শরীয়তকে অস্বীকারকারী মুলহিদদের একটি শ্রেণী বহু আগে থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের দেশে এদের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল আটরশি। এই ধারার 'পীর' হাশমত উল্লাহ সাহেব স্পষ্ট বলেছে– (বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, সংবাদদাতা) 'হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এবং তাহলেই কেবল বিশ্বে শান্তি আসবে।

তিনি বলেন, ইসলামের সত্যাদর্শ ও সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জন–মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জন করে শুধু মানুষের জন্য নয়; সৃষ্টির সকল জীব ও বস্তুর প্রতি মর্যাদা ও মমত্ববোধ তার বৃদ্ধি পায়। মানুষের শ্রেয়বোধকে জাগ্রত করাই ধর্মের মূল কথা।'" –সংবাদ ২৮-২-৮৪ ঈ., আটরশির দরবার, আটরশির কাফেলা : পৃষ্ঠা ৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৪ঈ., সংকলনে : মাহফুযুল হক। লেখাটির শিরোনাম– 'মানুষের শ্রেয়বোধকে জাগ্রত করাই ধর্মের মূল কথা।" –আটরশির পীর সাহেব

এ কথা যে সুস্পষ্ট কুফর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে বলেছেন– (তরজমা) "আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।" –সূরা আলে ইমরান ১৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– (তরজমা) "আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অনুসরণ করবে তার এই কাজ কষ্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" –সূরা আলে ইমরান ৮৫

এ ধরনের আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশ ধারণকারীদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হয় তারা পার্থিব বিভিন্ন মকসুদ পূরণের জন্য এবং এই বিশ্বাস নিয়েই সম্পৃক্ত হয় যে, এদের 'নেকনজর' দ্বারা বিনাশ্রমেই 'নাজাত' পাওয়া যাবে। এরা পীরদেরকে হাজত পূরণকারী ও সমস্যা সমাধানকারী বলে বিশ্বাস করে।

আটরশির ওরসের চরিত্র খুবই প্রসিদ্ধ। একটু গভীরভাবে দেখলেই বোঝা যায় যে, এরা এই 'দরবার' কে–আল্লাহ মাফ করুন–হারাম শরীফের মতো পবিত্র মনে করে থাকে। হজ্বের মতো লোকেরা সেখানে জবাইয়ের পশু নিয়ে উপস্থিত হয় যেন এগুলো 'হাদী'র প্রাণী!

তাওহীদে বিশ্বাসী কোনো মুসলিমেরই তো অজানা নেই যে, গায়রুল্লাহর জন্য মান্নত করা শিরক।

ওরস যদি শিরক ও নানা গর্হিত কার্যকলাপ থেকে মুক্তও থাকে তবুও তা নাজায়েয। সাধারণ কোনো স্থানকে 'শাআইরে ইসলাম' কি 'মাশাইর'-এর মতো পবিত্র স্থান মনে করা কুফরী ও শরীয়তের বিকৃতিসাধন।

সারকথা এই যে, কুফর-শিরক ও বেদআত-মুনকারাতের কোনো কেন্দ্রের সাথে 'দুআ চাওয়ার' সম্পর্ক রাখা এবং একে ইসলামী তাসাওউফের একটি ধারা মনে করা এমন একটি স্বতন্ত্র গোনাহ যে, এটাই কারো বিতর্কিত হওয়ার জন্যই যথেষ্ট। এরপর একে গর্বের বিষয় ও আধ্যাত্মিকতা মনে করা এমন অপরাধ যে, কারো আদালাহ গুণ বিনষ্ট হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

যাহোক, 'অন্যায়ে অটল থাকার পরিবর্তে ন্যায়ের দিকে ফিরে আসা উত্তম'-এই শরয়ী নীতি অনুসরণে এই চরম ভুল সংশোধন করে নেওয়া এবং উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় রেখে কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদের জন্য নির্বাচন করা সরকারের জন্য মঙ্গলজনক।

বিগত তিন জুমায় জাতীয় মসজিদে যে বিশৃঙ্খলা ও অশোভন দৃশ্য দৃশ্যায়িত হল এর জন্য ওইসব লোক যেমন অপরাধী, যাদের 'নাহি আনিল মুনকারের' সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তেমনি তারাও অপরাধী যারা খতীব নির্বাচনের বিষয়ে দ্বীনী দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেননি এবং বিশৃঙ্খলার পথ খোলা রেখে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন।

ইদানীং কোনো কোনো পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে যে, সরকার এই নির্বাচনকে সঠিক বলে দাবি করেছে এবং তা বহাল রাখার ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি তা-ই হয় তবে নিঃসন্দেহে তা 'চুরি ফের সিনাজুরি'র এক ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত।

আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত যে, বিষয়টা মিম্বার ও মিহরাবের, ইসলামী নিদর্শনের, বছরের পর বছর হাজার হাজার মুসল্লীর নামাযের। একথা সবারই জানা আছে যে, শিরকের মাধ্যমে মানুষের সকল আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং বেদআতীর নিজেরই কোনো আমল কবুল হয় না। এজন্য শিরক ও বেদআতের ব্যাপারে শিথিল এবং তার কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিদের সাথে আস্থা-ভালোবাসার সম্পর্কধারী কাউকে মুসল্লীরা তাদের নামাযের ইমাম বানাতে পারেন না। এ বিষয়ে তাদেরকে বাধ্য করাও পরিষ্কার জুলুম, যা নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন কোনো সরকারের জন্য কখনও উচিত নয়। নামায ও মসজিদের মতো একান্ত দ্বীনী বিষয়কে নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি এবং সব ধরনের স্বার্থচিন্তার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া যেমন দ্বীনী ফরয তেমনি রাজনৈতিক বিচক্ষণতারও দাবি।

সরকারের এখন কী করা উচিত তা পরিষ্কার। শুধু আলেম-উলামা নন, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরাও এ বিষয়ে সচেতন। দৈনিক প্রথম আলো ২০ জানুয়ারি ০৯ মঙ্গলবার সৈয়দ বদরুল আহসানের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি বিগত কয়েক জুমায় বাইতুল মুকাররমে সংঘটিত বিশৃঙ্খলার উপর নিজস্ব ভঙ্গিতে দুঃখ প্রকাশ করার পর লেখেন–

"দেশের বিভিন্ন ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট আলেমদের সমন্বয়ে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। সেই বোর্ডই সিদ্ধান্ত নেবে কোন ব্যক্তি মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করবেন। সরকারের কিছুটা ভূমিকা অবশ্য থাকবে। সেটা হবে তদারকি এবং সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে। মূল দায়িত্ব হোক প্রস্তাবিত বোর্ডের।"

সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হোক–এটাই কামনা করি। #

[ফেব্রুয়ারি '০৯ঈ.]

যাকাত : তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও মৌলিক নির্দেশনা

কুরআন কারীমের অসংখ্য স্থানে নামাযের সাথে যাকাতের কথা আছে।

اَقِيْمُوا الصَّلاةَ وَاٰتُوا الزَّكٰاةَ

"নামায আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর।"

এই আদেশ কুরআন কারীমের বহু স্থানে করা হয়েছে। এছাড়া যেখানেই মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা এসেছে সেখানেই–

يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰاةَ

"তারা নামায আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে।" বা এ ধরনের কথা বলা হয়েছে।

কুরআন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী নামায আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা হচ্ছে মুসলমানিত্ব ও আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন এবং মুসলিম-ভ্রাতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মানদণ্ড। ইরশাদ হয়েছে–

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلاةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ، اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"এরপর যদি তারা (কাফেররা) তওবা করে, নামায আদায় করতে শুরু করে এবং যাকাত দিতে শুরু করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। বাস্তবিকপক্ষেই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, বড় অনুগ্রহকারী।" –সূরা তওবা ৫

আরো ইরশাদ হয়েছে–

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلاةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

"এরা (কাফেররা) যদি তওবা করে, নামায আদায় করতে শুরু করে এবং যাকাত দিতে শুরু করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আমি বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য বিধানসমূহ খুলে খুলে বয়ান করে থাকি।" -সূরা তওবা ১১

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ না বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান না আনে, আমি যেন তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখি। অতপর তারা যদি এটা করে তাহলে আমার পক্ষ হতে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে ইসলামের বিধান দ্বারা তা রহিত হতে পারে। আর তাদের (অভ্যন্তরের) হিসাব আল্লাহর উপর।" -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১

মোটকথা, মুসলিম মাত্রই জানে যে, যাকাত ইসলামের বুনিয়াদি রোকন এবং ঈমানের পরে নামাযের সমপর্যায়ের ফরয।

যাকাতের স্বরূপ ও তাৎপর্য এবং এর আত্মিক সুফল ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব; তেমনি যাকাত আদায়ে শিথিলতার নৈতিক পরিণাম, সমাজ ও অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব এবং আখেরাতের শাস্তি ও আযাব ইত্যাদি সকল বিষয়ে কুরআন, হাদীস এবং চলমান ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে উম্মাহর আলেমগণ প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন, বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি কিতাব, যা আমাদের জন্য সহজবোধ্য ও সহজলভ্য, মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.) লিখিত 'আরকানে আরবাআ'। এর বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়াদির উপর দীর্ঘ আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য এমন কিছু জরুরি বিষয়ে সতর্ক করা, যেসব বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

১. যাকাতের মূলকথা ও মৌলিক উদ্দেশ্য

যাকাতের মূলকথা হচ্ছে, এটি আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের উপায়। এ বিষয়টি যাকাতের গোটা ব্যবস্থায় দেহের শোণিতধারার ন্যায় প্রবহমান। আর যাকাতের মৌলিক উদ্দেশ্য হল অন্তর ও আত্মার পরিশুদ্ধি। অর্থাৎ কৃপণতা, স্বার্থপরতা, আমিত্ব ও ফকীর-মিসকীনের ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপহীনতা থেকে অন্তরকে পবিত্র করা এবং অনাথ-অসহায়ের পরার্থপরতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে সম্পদে পবিত্রতা ও খায়ের-বরকত আনয়ন করা।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা আলোচিত হয়েছে এবং এই মৌলিক দুটি বিষয়ের উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। যাকাতসংক্রান্ত কুরআন কারীমের আয়াতগুলো মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করলে তা পরিষ্কার বুঝে আসে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

"আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন।" –সূরা তওবা ১০৩

অন্যত্র মুনাফিকের বিপরীতে মুমিনের বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করা হয়েছে যে–

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ، اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ، اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"এবং পল্লীবাসী কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি এবং যা কিছু নেক কাজে খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও রাসূলের দুআ লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। জেনে রেখো, নিঃসন্দেহে তাদের এই খরচ করা তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্যের কারণ। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন তাঁর (বিশেষ) অনুগ্রহে। কেননা, আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, নেহায়েত মেহেরবান।" –সূরা তওবা ৯৯

সূরা রূমে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ، وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

"যা তোমরা এই উদ্দেশ্যে দেবে যে, তা মানুষের সম্পদে পৌঁছে বর্ধিত হবে তা আল্লাহর কাছে বর্ধিত হয় না। আর তোমরা যে যাকাত দেবে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তো এমন মানুষই আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি করতে থাকবে।" –সূরা রূম ৩৯

যাকাতের স্বরূপ ও মৌলিক উদ্দেশ্যের পর তার আর্থ-সামাজিক সুফলের প্রসঙ্গ আসে। যার সারকথা হল, যাকাতের মাধ্যমে একটি কল্যাণকর ও ইনসাফভিত্তিক সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে এবং সমাজের স্বনির্ভরতা অর্জন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়। যাকাত সমাজের প্রত্যেক

সদস্যের জন্য সম্মানজনক জীবন-যাপনের সুযোগ সৃষ্টির একটি কার্যকর ব্যবস্থা।

যাকাতের এই উদ্দেশ্যের প্রতি সহীহ মুসলিমের ১৯ নং হাদীসে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

انَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ اغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرائِهِم.

"আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত অপরিহার্যরূপে নির্ধারণ করেছেন, যা তোমাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের নিকটে পৌছানো হবে।"

২. যাকাতপ্রদান অনুগ্রহ নয়, সৌভাগ্য

মুমিনের অবস্থা এই হয় যে, যাকাত আদায় করতে পেরে সে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে–ইয়া আল্লাহ! আপনার হুকুম মত আপনার নির্দেশিত স্থানে যাকাত আদায় করতে পেরেছি। তেমনি দরিদ্র যাকাত গ্রহণকারীদের প্রতি এ জন্য কৃতজ্ঞ হয় যে, তারা তাকে এই ফরয আদায়ের এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে। যাকাত দেওয়াকে কারো প্রতি অনুগ্রহ বিবেচনা করার চিন্তাও মুমিনের মনে আসে না। কেননা যাকাত প্রদান কারো প্রতি অনুগ্রহ নয়, হকদারকে তার হক পৌছে দেওয়ামাত্র। মুমিনের মানসপটে আল্লাহ তাআলার এই বাণী সর্বদা সমুজ্জ্বল থাকে–

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اٰتَاكُمْ

"এবং তাদেরকে আল্লাহর সম্পদ থেকে দান কর, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন।" –সূরা নূর ৩৩

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْم

"এবং তাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থনাকারীর জন্য এবং বঞ্চিতদের জন্য।" –সূরা মাআরিজ ২৪, ২৫

মুমিনের বিশ্বাস হল সম্পদের প্রকৃত মালিক আমি নই। আমি তা উপার্জন করেছি মাত্র; তাও আল্লাহর দেওয়া উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে। আর এ সব উপায়-উপকরণ তো কত মানুষই ব্যবহার করছে ; কিন্তু সবাই তো সম্পদশালী হতে পারছে না। অতএব অর্থোপার্জনের চেষ্টার দ্বারা সম্পদের অধিকারী হওয়া বিশেষভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পদে আমাকে প্রতিনিধি

বানিয়েছেন। সুতরাং তা তাঁরই হুকুম মত খরচ করতে হবে।

وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

"এবং তোমরা সেই সম্পদ থেকে দান কর, যাতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানানো হয়েছে।" –সূরা হাদীদ ৭

মুমিনের বিশ্বাস এই যে, যাকাত ও অন্যান্য সদকা-খয়রাত ইখলাসের সাথে হলে এবং হালাল মাল থেকে হলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। আখেরাতের খাযানায় জমা করে আল্লাহ তাআলা এক একটি দানাকে উহুদ পাহাড়ের মত বিশাল সম্পদে পরিণত করেন। এই যাকাত মাওলায়ে পাকের গযব থেকে বাঁচার উপায় এবং আখেরাতের মূল্যবান পাথেয়। তাহলে যে কাজ আমি খালিক ও মালিকের সন্তুষ্টির জন্য করছি এবং যে কাজের উত্তম প্রতিদান মালিকের নিকট থেকে আশা করি এবং দুনিয়াতেও যার কিছু কিছু বিনিময় তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করছি; সে কাজে অন্যকে অনুগ্রহের পাত্র মনে করার কোন অবকাশ কোন অবস্থাতেই থাকে না।

মুমিন এ কথা বোঝে যে, অনুগ্রহ প্রকাশ করা সাধারণ ভদ্রতা ও শরাফতের পরিপন্থী এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়ার একটি ঘৃণ্য উপায়। এই কাজ করা হলে যাকাত ও সদকার আসল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যায়। মুমিনের সামনে রাব্বুল আলামীনের এই ইরশাদ সর্বদা জীবন্ত থাকে যে, "যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে এবং এরপর যাকে দিয়েছে তার প্রতি না (কথায়) অনুগ্রহ প্রকাশ করে, আর না (ভাবভঙ্গির মাধ্যমে) তাকে পীড়িত করে, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট নেক আমলের বিনিময় লাভ করবে এবং (কেয়ামতের দিন) না তাদের কোন শঙ্কার কারণ হবে, আর না তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। নম্রকথা বলা এবং ক্ষমা করা এমন দান থেকে উত্তম, যার পর দানগ্রহীতাকে পীড়িত করা হয়। আল্লাহ বেনিয়ায ও সহনশীল।"

যাকাত আদায় করার সময় মুমিনের অবস্থা এমন হয় যা নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ.

"আর যারা যা কিছু দান করে এভাবে দান করে যে, তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত-কম্পিত থাকে যে, তাদেরকে তাদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে।" –সূরা মুমিনূন ৬০

যাকাতকে জরিমানা মনে করা মুনাফেকি এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আস্থাহীনতা

বাহ্যিক বিচারে মনে হয়, সুদ দ্বারা সম্পদ বাড়ে আর যাকাত দ্বারা সম্পদ কমে; কিন্তু যিনি সম্পদ ও সম্পদওয়ালাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃত মালিক তাঁর ঘোষণা হল, সুদের কারণে সম্পদের বরকত নষ্ট হয় আর যাকাত দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়। মুমিনের ঈমান আল্লাহর ঘোষণার উপরই থাকে। মুমিন সকল বিষয়কে ঈমানী দৃষ্টিতে দেখে। আর কাফের ও মুনাফেকরা দেখে বস্তুবাদী চোখে। এ জন্য তারা সুদকে সম্পদ বৃদ্ধির আর যাকাতকে সম্পদ হ্রাসের কারণ মনে করে। ইরশাদ হয়েছে–

"বেদুঈনরা কুফরী ও মুনাফেকীতে বড় শক্ত। আল্লাহ তার রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা তাদের অবস্থার অধিক উপযোগী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বড় প্রজ্ঞাবান। সেই বেদুঈনদের কিছু লোক এমন আছে, যারা তাদের খরচকৃত সম্পদকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের দুর্দিনের অপেক্ষায় থাকে। দুর্দিন তো এদের জন্যই আসবে। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। পল্লীবাসী বেদুঈনদের অন্য কিছু মানুষ এমন আছে, যারা আল্লাহ ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে এবং তাদের খরচকৃত সম্পদকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও রাসূলের দুআ লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। জেনে রেখো, এটা তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হবে। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। বস্তুত আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, নেহায়েত মেহেরবান।" –সূরা তওবা ৯৭-৯৯

আরো ইরশাদ হয়েছে–

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.

"আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন আর সদ্কাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।" –সূরা বাকারা:২৭৬

সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতটি তো কিছুক্ষণ আগেই উল্লেখ করেছি। হাদীস শরীফে এই আয়াতগুলোরই প্রতিধ্বনি হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِّلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ.

"সদকা দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না এবং ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ শুধু বান্দার

সম্মানই বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বনকারীকে আল্লাহ উপরে উঠিয়ে দেন।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৮

যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইরশাদগুলোর উপর আস্থাশীল হয়ে আকীদা-বিশ্বাস দুরুস্ত করে নেওয়া হয় এবং সে মোতাবেক আমল শুরু করা হয় তাহলে তার সত্যতা মানুষ তার চর্মচোখেও অবলোকন করবে। আর আখেরাতের সঞ্চিত ভাণ্ডার তো রয়েছেই।

যাকাতকে ট্যাক্স মনে করা মূর্খতা

যাকাত ট্যাক্স নয়, যাকাত হল ইবাদত। ন্যায়-অন্যায় কোন ধরনের ট্যাক্সের সাথেই স্বরূপ ও উদ্দেশ্য এবং খাত ও সুফল কোন দিক দিয়েই যাকাতের কোন মিল নেই। যাকাতের যে স্বরূপ ও তাৎপর্য ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তা কি ট্যাক্সের মধ্যে আছে? যাকাতের খাত হল দরিদ্র মুসলমান পক্ষান্তরে ট্যাক্সের সুবিধা ভোগ করে বিত্তশালী ও ক্ষমতাসীন শ্রেণী। যাকাত আখলাকের পরিশুদ্ধি ও সম্পদের পবিত্রতার জন্য সৃষ্টিকর্তার হুকুমে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আদায় করা হয়। ট্যাক্স-পরিশোধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন মিল নেই।

মোটকথা ট্যাক্সের সাথে যাকাতের তুলনা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুযোগ থাকলে বিস্তারিত লিখতাম। কিন্তু সম্মানিত পাঠকবৃন্দ যদি মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.)এর কিতাব 'আরকানে আরবাআ' পড়ে নেন তাহলে বিষয়টি দলীল-প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৫. যে কোনভাবে খরচ করা যাকাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয়

কোন কোন বিত্তশালী ভাই মনে করেন যে, আমরা তো বিভিন্ন উপলক্ষে খরচ করে থাকি এবং অল্পস্বল্প নয়, লক্ষকোটি টাকা খরচ করি; অতএব আমাদের জন্য আলাদাভাবে যাকাত আদায়ের প্রয়োজন নেই। মনে রাখতে হবে, এটি খুবই খামখেয়ালি। যাকাত একটি ইবাদত এবং খোদ রাব্বুল আলামীন এর নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কী ধরনের সম্পদ থেকে কী পরিমাণ যাকাত দিতে হবে এবং কাদেরকে দিতে হবে সবই নির্ধারিত। এসব নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করে যাকাতের নিয়তে সম্পদ খরচ করাকে যাকাত বলে। নিজের খুশিমত জন-কল্যাণমূলক কোন কাজে খরচ করা বা কিছু দান-খয়রাত করা যদিও তা ইখলাসের সাথে হলে বড় সওয়াবের কাজ; কিন্তু যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাতের মাসায়েল অনুসারে পাই-পয়সার হিসাব করে যাক'ত আদায় করা জরুরি।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিজের খুশিমত খরচ করে যাকাত আদায় করেছি মনে করার কোন অবকাশ নেই।

৬. উপযুক্ত খাত তালাশ করে যাকাত পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য

যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে তালাশ করে তাদের নিকট যাকাত পৌঁছে দেওয়া যাকাতদাতার দায়িত্ব। আর যাকাতদাতারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন। তাই অনেক ক্ষেত্রে যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ বা তাদের প্রতিনিধিরা যাকাতদাতার কাছে উপস্থিত হন। এ ধরনের উপস্থিতি উচিত কি অনুচিত–এ বিষয়ে অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। কিন্তু যারা যাকাত দেবেন তাদের করণীয় ছিল, এসব মানুষকে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানানো এবং নিজে তাদের কাছে উপস্থিত হতে না পারার জন্য ওজরখাহি করা। এরপর তাদেরকে যা কিছু দেওয়া সম্ভব হাসিমুখে, আদব ও বিনয়ের সাথে পেশ করা। কিন্তু ঈমানী দুর্বলতা বা আমিত্ব ও অহঙ্কারের কারণে বিত্তশালীরা সীমাহীন বিরক্তির সাথে উপস্থিত হয়। চোখের দৃষ্টিতে থাকে তাচ্ছিল্য। ফলে যাকাত দেওয়ার আগেই যাকাতের রূহ ও সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়। বিত্তশালীদের উচিত নিজের কল্যাণের জন্যই এই পন্থা পরিহার করা এবং কুরআন হাদীসে উল্লিখিত যাকাতের আহকাম ও আদব-কায়দার অনুসারী হওয়া।

৭. যাকাত ছাড়া সম্পদের আরো হক রয়েছে

কেউ কেউ মনে করেন, যাকাত দিয়ে ফেললে সম্পদের আর কোন করণীয় থাকে না। সকল দায়িত্ব যাকাতের মাধ্যমেই আদায় হয়ে যায়। এই ধারণা ঠিক নয়। শরীয়তের স্বীকৃত মাসআলা হল–

ان في المال حقا سوى الزكاة

"সম্পদে যাকাত ছাড়া আরো হক রয়েছে।"

হাঁ, একথা ঠিক যে, সম্পদের হকসমূহের মধ্যে যাকাতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সম্পর্ক মানুষের ঈমান-ইসলামের সাথে।

যে বিষয়টি নেহায়েত প্রয়োজন তা হল, বিত্তশালীরা সম্পদের করণীয় সম্পর্কে শরীয়তের ইলম হাসিল করবেন এবং তা অনুসরণে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হবেন।#

[অক্টোবর-নভেম্বর '০৫ঈ.]